প্রকাশক :
রঞ্জন সেনগুপ্ত
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম সংস্করণ : ১লা বৈশাখ, ১৩৬৭

মুদ্রাকর :
নীলরতন পাল
উদ্ভিত উদ্যোগ
৪২, মহেন্দ্র গোঁসাই লেন
কলকাতা-৭০০.০০৬

সূচীপত্র

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর

রজনী

রজনী

[ষষ্ঠ সংস্করণ হইতে মুদ্রিত]

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিজ্ঞাপন

রজনী প্রথমে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। এক্ষণে, পুনর্মুদ্রাঙ্কনকালে, এই গ্রন্থে এত পরিবর্ত্তন করা গিয়াছেযে, ইহাকে নূতন গ্রন্থ বলা যাইতে পারে। কেবল প্রথম খণ্ড পূর্ব্ববৎ আছে; অবশিষ্টাংশের কিছু পরিত্যক্ত হইয়াছে; কিছু স্থানান্তরে সমাবিষ্ট হইয়াছে; অনেক পুনর্লিখিত হইয়াছে।

এখন লর্ড লিটন-প্রণীত "Last Days of Pompeii" নামক উৎকৃষ্ট উপন্যাসে নিদিয়া নামে একটি 'কাণা ফুলওয়ালী' আছে; রজনী তৎস্মরণে সূচিত হয়। যে সকল মানসিক বা নৈতিক তত্ত্ব প্রতিপাদন করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য, তাহা অন্ধ-যুবতীর সাহায্যে বিশেষ স্পষ্টতালাভ করিতে পারিবে বলিয়াই ঐরূপ ভিত্তির উপর রজনীর চরিত্র নির্ম্মাণ করা গিয়াছে।

উপাখ্যানের অংশবিশেষ বা নায়ক-নায়িকাবিশেষের দ্বারা ব্যক্ত করা প্রচলিত রচনা-প্রণালীর মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না, কিন্তু ইহা নূতন নহে; উইল্‌কি কলিন্সকৃত "Woman in White" নামক গ্রন্থপ্রণয়নে ইহা প্রথম ব্যবহৃত হয়। এই প্রথার গুণ এই যে, যে কথা যাহার মুখে শুনিতে ভাল লাগে, সেই কথা তাহার মুখে ব্যক্ত করা যায়। এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছি বলিয়াই, এই উপন্যাসে যে সকল অনৈসর্গিক বা অপ্রাকৃত ব্যাপার আছে, আমাকে তাহার দায়ী হইতে হয় নাই।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রজনী

প্রথম খণ্ড

রজনীর কথা

প্রথম পরিচ্ছেদ

তোমাদের সুখ-দুঃখে আমার সুখ-দুঃখ পরিমিত হইতে পারে না। তোমরা আর আমি ভিন্ন-প্রকৃতি। আমার সুখে তোমরা সুখী হইতে পারিবে না—আমার দুঃখ তোমরা বুঝিবে না—আমি একটি ক্ষুদ্র যূথিকার গন্ধে সুখী হইব, আর ষোলকলা শশী আমার লোচনাগ্রে সহস্র নক্ষত্রমণ্ডলমধ্যস্থ হইয়া বিকসিত হইলেও আমি সুখী হইব না। আমার উপাখ্যান কি তোমরা মন দিয়া শুনিবে? আমি জন্মান্ধ।

কি প্রকারে বুঝিবে? তোমাদের জীবন দৃষ্টিময়—আমার জীবন অন্ধকার—দুঃখ এই, আমি ইহা অন্ধকার বলিয়া জানি না। আমার এ রুদ্ধ-নয়নে তাই আলো। না জানি তোমাদের আলো কেমন।

তাই বলিয়া কি আমার সুখ নাই? তাহা নহে। সুখ-দুঃখ তোমার আমার প্রায় সমান। তুমি রূপ দেখিয়া সুখী, আমি শব্দ শুনিয়া সুখী। দেখ, এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যূথিকা সকলের বৃন্তগুলি কত সূক্ষ্ম, আর আমার এই করস্থ সূচিকাগ্রভাগ আরও কত সূক্ষ্ম! আমি সূচিকাগ্রে এই ক্ষুদ্র পুষ্পবৃন্ত সকল বিদ্ধ করিয়া মালা গাঁথি—আশৈশব মালাই গাঁথিয়াছি—কেহ কখন আমার গাঁথা মালা পরিয়া বলে নাই যে, কাণায় মালা গাঁথিয়াছে।

আমি মালাই গাঁথিতাম। বালিগঞ্জের প্রান্তভাগে আমার পিতার একখানি পুষ্পোদ্যান জমা ছিল—তাহাই তাঁহার উপজীবিকা ছিল। ফাল্গুন মাস হইতে যত দিন ফুল ফুটিত, তত দিন পর্য্যন্ত পিতা প্রত্যহ তথা হইতে পুষ্পচয়ন করিয়া আনিয়া দিতেন, আমি মালা গাঁথিয়া দিতাম। পিতা তাহা লইয়া মহানগরীর পথে পথে বিক্রয় করিতেন। মাতা গৃহকর্ম্ম করিতেন। অবকাশমতে পিতা-মাতা উভয়েই আমার মালা গাঁথার সহায়তা করিতেন।

ফুলের স্পর্শ বড় সুন্দর—পরিতে বুঝি বড় সুন্দর হইবে—ঘ্রাণে পরম সুন্দর বটে। কিন্তু ফুল গাঁথিয়া দিন চলে না। অন্নের বৃক্ষে ফুল নাই, সুতরাং পিতা নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন। মৃজাপুরে একখানি সামান্য খাপরেলের ঘরে বাস করিতেন। তাহারই এক প্রান্তে ফুল বিছাইয়া, ফুল স্তূপাকৃতি করিয়া ফুল ছড়াইয়া আমি ফুল গাঁথিতাম। পিতা বাহির হইয়া গেলে গান গাহিতাম।

"আমার এত সাধের প্রভাতে সই,
ফুটলো নাকো কলি—"

ও হরি—এখনও আমার বলা হয় নাই, আমি পুরুষ কি মেয়ে? তবে, এতক্ষণে যিনি না বুঝিয়াছেন, তাঁহাকে না বলাই ভাল; আমি এখন বলিব না।

পুরুষ হই, মেয়েই হই, অন্ধের বিবাহের বড় গোল। কাণা বলিয়া আমার বিবাহ হইল না। সেটা দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য, যে চোখের মাথা না খাইয়াছে, সেই বুঝিবে। অনেক অপাঙ্গরঙ্গরঙ্গিণী আমার চিরকৌমার্য্যের কথা শুনিয়া বলিয়া গিয়াছে, "আহা, আমিও যদি কাণা হইতাম।"

বিবাহ না হউক—তাতে আমার দুঃখ ছিল না। আমি স্বয়ংবরা হইয়াছিলাম। একদিন পিতার কাছে কলিকাতার বর্ণনা শুনিতেছিলাম। শুনিলাম, মনুমেণ্ট বড় ভারি ব্যাপার, অতি উঁচু, অটল, অচল, ঝড়ে ভাঙ্গে না, গলায় চেন—একা একাই বাবু। মনে মনে মনুমেণ্টকে বিবাহ করিলাম। আমার স্বামীর চেয়ে বড় কে? আমি মনুমেণ্টমহিষী।

কেবল একটা বিবাহ নহে। যখন মনুমেণ্টকে বিবাহ করি, তখন আমার বয়স পনর বৎসর। সতের বৎসর বয়সে, বলিতে লজ্জা করে, সধবা অবস্থাতেই—আর একটা বিবাহ ঘটিয়া গেল। আমাদের বাড়ীর কাছে কালীচরণ বসু নামে একজন কায়স্থ ছিল। চীনাবাজারে তাহার একখানি খেলনার দোকান ছিল। সে কায়স্থ—আমরাও কায়স্থ—সেই জন্য একটু আত্মীয়তা হইয়াছিল। কালী বসুর একটি চারি বৎসরের শিশুপুত্র ছিল। তাহার নাম বামাচরণ। বামাচরণ সর্ব্বদা আমাদের বাড়ী আসিত। এক দিন একটা বর বাজনা বাজাইয়া মন্দগামী ঝড়ের মত আমাদিগের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যায়। দেখিয়া বামাচরণ জিজ্ঞাসা করিল—"ও কে ও?"

আমি বলিলাম, "ও বর।" বামাচরণ তখন কান্না আরম্ভ করিল—"আমি বল হব।"

তাহাকে কিছুতেই থামাইতে না পারিয়া বলিলাম, "কাঁদিস্ না, তুই আমার বর।" এই বলিয়া একটা সন্দেশ তাহার হাতে দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেমন, তুই আমার বর হবি ?" শিশু সন্দেশ হাতে পাইয়া রোদন সংবরণ করিয়া বলিল, "হব।"

সন্দেশ সমাপ্ত হইলে, বালক ক্ষণেক কাল পরে বলিল, "হাঁ গা, বলে কি কলে গা ?" বোধ হয় তাহার ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, বরে বুঝি কেবল সন্দেশই খায়। যদি তা হয় তবে সে আর একটা আরম্ভ করিতে প্রস্তুত। ভাব বুঝিয়া আমি বলিলাম, "বরে ফুলগুলি গুছিয়ে দেয়।" বামাচরণ স্বামীর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুঝিয়া লইয়া, ফুলগুলি আমার হাতে গুছাইয়া তুলিয়া দিতে লাগিল। সেই অবধি আমি তাহাকে বর বলি, সে আমাকে ফুল গুছাইয়া দেয়।

আমার এই দুই বিবাহ—এখন এ কালের জটিলাকুটিলাদিগকে আমার জিজ্ঞাস্য—আমি সতী বলাইতে পারি কি ?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বড় বাড়ীতে ফুল যোগান বড় দায়। সে কালের মালিনী মাসী রাজবাড়ীতে ফুল যোগাইয়া মশানে গিয়াছিল। ফুলের মধু খেলে বিদ্যাসুন্দর, কিল খেলে হীরা মালিনী—কেন না, সে বড় বাড়ীতে ফুল যোগাইত। সুন্দরের সেই রামরাজ্য হইল—কিন্তু মালিনীর কিল আর ফিরিল না।

বাবা ত "বেলফুল" হাঁকিয়া রসিকমহলে ফুল বেচিতেন, মা দুই একটা অরসিকমহলে ফুল নিত্য যোগাইতেন। তাহার মধ্যে রামসদয় মিত্রের বাড়ীই প্রধান। রামসদয় মিত্রের সাড়ে চারিটা ঘোড়া ছিল—(নাতিদের একটা পণি, আর আদত চারিটা) সাড়ে চারিটা ঘোড়া আর দেড়খানা গৃহিণী। এক জন আদত—এক জন চিররুগ্না এবং প্রাচীনা. তাঁহার নাম ভুবনেশ্বরী—কিন্তু তাঁর গলার সাঁই সাঁই শব্দ শুনিয়া রামমণি ভিন্ন অন্য নাম আমার মনে আসিত না।

আর যিনি পুরা একখানি গৃহিণী, তাঁহার নাম লবঙ্গলতা। লবঙ্গলতা লোকে বলিত, কিন্তু তাঁহার পিতা নাম রাখিয়াছিলেন—ললিতলবঙ্গলতা এবং রামসদয় বাবু আদর করিয়া বলিতেন, "ললিতলবঙ্গলতা-পরিশীলনকোমল-মলয়সমীরে।" রামসদয় বাবু প্রাচীন, বয়ঃক্রম ৬৩ বৎসর! ললিতলবঙ্গলতা

নবীনা, বয়স ১৯ বৎসর। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, আদরের আদরিণী, গৌরবের গৌরবিণী, মানের মানীনী, নয়নের মণি, ষোল আনা গৃহিণী। তিনি রামসদয়ের সিন্দুকের চাবি, বিছানার চাদর, পানের চূণ, গেলাসের জল। তিনি রামসদয়ের জ্বরে কুইনাইন, কাসিতে ইপিকা, বাতে ফ্লানেল এবং আরোগ্যে সুরুয়া।

নয়ন নাই—ললিতলবঙ্গলতাকে কখন দেখিতে পাইলাম না—কিন্তু শুনিয়াছি তিনি রূপসী। রূপ যাউক, গুণ শুনিয়াছি, লবঙ্গ বাস্তবিক গুণবতী। গৃহকার্য্যে নিপুণা, দানে মুক্তহস্তা, হৃদয়ে সরলা, কেবল বাক্যে বিষময়ী। লবঙ্গলতার অশেষ গুণের মধ্যে একটি এই যে, তিনি বাস্তবিক পিতামহের তুল্য সেই স্বামীকে ভালবাসিতেন—কোন নবীনা নবীন স্বামীকে সেরূপ ভালবাসেন কি না সন্দেহ। ভালবাসিতেন বলিয়া, তাঁহাকে নবীন সাজাইতেন।—সে সজ্জার রস কাহাকে বলি? আপন হস্তে নিত্য শুভ্রকেশে কলপ মাখাইয়া কেশগুলি রঞ্জিত করিতেন। যদি রামসদয় লজ্জার অনুরোধে কোন দিন মলমলের ধুতি পরিত, স্বহস্তে তাহা ত্যাগ করাইয়া কোকিল পেড়ে, ফিতে পেড়ে, কল্কা পেড়ে পরাইয়া দিতেন—মলমলের ধুতিখানি তৎক্ষণাৎ বিধবা দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিতেন। রামসদয় প্রাচীন বয়সে আতরের শিশি দেখিলে ভয়ে পলাইত—লবঙ্গলতা, তাহার নিদ্রাবস্থায় সর্ব্বাঙ্গে আতর মাখাইয়া দিতেন। রামসদয়ের চশমাগুলি লবঙ্গ প্রায় চুরি করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিত, সোণাটুকু লইয়া যাহার কন্যার বিবাহের সম্ভাবনা, তাহাকে দিত। রামসদয়ের নাক ডাকিলে, লবঙ্গ ছয়গাছা মল বাহির করিয়া পরিয়া ঘরময় ঝম্‌ঝম্ করিয়া রামসদয়ের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া দিত।

লবঙ্গলতা আমাদের ফুল কিনিত—চার আনার ফুল লইয়া দুই টাকা মূল্য দিত। তাহার কারণ, আমি কাণা। মালা পাইলে লবঙ্গ গালি দিত, বলিত, "এমন কদর্য্য মালা আমাকে দিস কেন?" কিন্তু মূল্য দিবার সময় ডবল পয়সার সঙ্গে ভুল করিয়া টাকা দিত। ফিরাইয়া দিতে গেলে বলিত,—'ও আমার টাকা নয়,'—দুইবার বলিতে গেলে গালি দিয়া তাড়াইয়া দিত। তাহার দানের কথা মুখে আনিলে মারিতে আসিত। বাস্তবিক রামসদয় বাবুর ঘর না থাকিলে আমাদিগের দিনপাত হইত না। তবে যাহা রয় সয়,—তাই বলিয়া মাতা লবঙ্গের কাছে অধিক লইতেন না। দিনপাত হইলেই আমরা সন্তুষ্ট থাকিতাম। লবঙ্গলতা আমাদিগের নিকট রাশি রাশি

ফুল কিনিয়া রামসদয়কে সাজাইত—সাজাইয়া বলিত, "দেখ। রতিপতি!" রামসদয় বলিত, "দেখ সাক্ষাৎ—অঞ্জনানান্দন"। সেই প্রাচীনে নবীনে মনের মিল ছিল, দর্পণের মত দুই জনে দুই জনের মন দেখিতে পাইত। তাহাদের প্রেমের পদ্ধতিটা এইরূপ—

রামসদয় বলিত, ললিতলবঙ্গলতাপরিশী—?

লবঙ্গ। আজ্ঞে ঠাকুরদাদা মহাশয়, দাসী হাজির!

রাম। আমি যদি মরি?

লবঙ্গ। "আমি তোমার বিষয় খাইব।" লবঙ্গ মনে মনে বলিত, "আমি বিষ খাইব।" রামসদয় তাহা মনে মনে জানিত।

লবঙ্গ এত টাকা দিত, তবে বড় বাড়ীতে ফুল যোগান দুঃখ কেন? শুন।

এক দিন মা'র জ্বর। অন্তঃপুরে বাবা যাইতে পারিবেন না—তবে আমি বৈ আর কে লবঙ্গলতাকে ফুল দিতে যাইবে? আমি লবঙ্গের জন্য ফুল লইয়া চলিলাম। অন্ধ হই, যা-ই হই—কলিকাতার রাস্তা সকল আমার নখদর্পণে ছিল। বেত্রহস্তে সর্ব্বত্র যাইতে পারিতাম, কখন গাড়ী-ঘোড়ার সম্মুখে পড়ি নাই। অনেক বার পথচারীর ঘাড়ে পড়িয়াছি বটে—তাহার কারণ, কেহ কেহ অন্ধ-যুবতী দেখিয়া সাড়া দেয় না, বরং বলে, "আ মলো দেখতে পাস্‌নি? কাণা না কি?" আমি ভাবিতাম "উভয়তঃ!"

ফুল লইয়া লবঙ্গের কাছে গেলাম। দেখিয়া লবঙ্গ বলিলেন, "কি লো কাণী—আবার ফুল লইয়া মরতে এসেছিস্ কেন?" কাণী বলিলে আমার হাড় জ্বলিয়া যাইত—আমি কি কদর্য্য উত্তর দিতে যাইতেছিলাম; এমন সময়ে সেখানে হঠাৎ কাহার পদধ্বনি শুনিলাম—কে আসিল। যে আসিল—সে বলিল, "এ কে ছোট মা?"

ছোট মা! তবে রামসদয়ের পুত্র। রামসদয়ের কোন্ পুত্র? বড় পুত্রের কণ্ঠ এক দিন শুনিয়াছিলাম, সে এমন অমৃত নহে—এমন করিয়া কর্ণবিবর ভরিয়া সুখ ঢালিয়া দেয় নাই। বুঝিলাম, এ ছোট বাবু।

ছোট মা বলিলেন,—এবার বড মৃদুকণ্ঠে বলিলেন,—"ও কাণা ফুলওয়ালী।"

"ফুলওয়ালী? আমি বলি বা কোন ভদ্রলোকের মেয়ে।"

লবঙ্গ বলিলেন, "কেন গা, ফুলওয়ালী হইলে কি ভদ্রলোকের মেয়ে হয় না?"

ছোট বাবু অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন, "হবে না কেন? এটি ত ভদ্রলোকের মেয়ের মত বোধ হইতেছে। তা ওটি কাণা হ'লো কিসে?"

লবঙ্গ। ও জন্মান্ধ।

ছোট বাবু। দেখি ?

ছোট বাবুর বড় বিদ্যার গৌরব ছিল। তিনি অন্যান্য বিদ্যাও যেরূপ যত্নের সহিত শিক্ষা করিয়াছিলেন, অর্থের প্রত্যাশী না হইয়া চিকিৎসা-শাস্ত্রেও সেই-রূপ যত্ন করিয়াছিলেন। লোকে রাষ্ট্র করিত যে, শচীন্দ্রবাবু (ছোট বাবু) কেবল দরিদ্রগণের বিনামূল্যে চিকিৎসা করিবার জন্য চিকিৎসা শিখিতে-ছিলেন। "দেখি" বলিয়া আমাকে বলিলেন, "একবার দাঁড়াও ত গা।"

আমি জড়সড় হইয়া দাঁড়াইলাম।

ছোট বাবু বলিলেন, "আমার দিকে চাও।" চাব কি ছাই !

"আমার দিকে চোখ ফিরাও।"

কাণা চোখে শব্দভেদী বাণ মারিলাম। ছোট বাবুর মনের মত হইল না, তিনি আমার দাড়ি ধরিয়া মুখ ফিরাইলেন।

ডাক্তারির কপালে আগুন জ্বেলে দি। সে চিবুকস্পর্শে আমি মরিলাম !

সে স্পর্শ পুষ্পময়। সেই স্পর্শে যূথী, জাতি, মল্লিকা, শেফালিকা, কামিনী, গোলাপ, সেউতি—সে ফুলের ঘ্রাণ পাইলাম—বোধ হইল, আমার আশে পাশে ফুল, আমার মাথায় ফুল, আমার পায়ে ফুল—আমার পরনে ফুল, আমার বুকের ভিতর ফুলের রাশি। আ মরি মরি ! কোন বিধাতা এ কুসুমময় স্পর্শ গড়িয়াছিল। বলিয়াছি ত, কাণার সুখ-দুঃখ তোমরা বুঝিবে না ; আ মরি মরি—সে নবনীত-সুকুমার পুষ্পগন্ধময় বীণাধ্বনিবৎ স্পর্শ ! বীণাধ্বনিবৎ স্পর্শ, যার চোখ আছে সে বুঝিবে কি প্রকারে ? আমার সুখ দুঃখ আমাতেই থাকুক, যখন সেই স্পর্শ মনে পড়িত, তখন কত বীণাধ্বনিবৎ কর্ণে শুনিতাম তাহা তুমি বিলোলকটাক্ষ-কুশলিনি কি বুঝিবে ?

ছোট বাবু বলিলেন, "না, এ কাণা সারিবার নয়।"

আমার ত সেই জন্য ঘুম হইতেছিল না।

লবঙ্গ বলিল, "তা না সারুক, টাকা খরচ করিলে কাণার কি বিয়ে হয় না ?"

ছোট বাবু। কেন, এর কি বিবাহ হয় নাই ?

লবঙ্গ। না। টাকা খরচ করিলে হয় ?

ছোট বাবু। আপনি কি উহার বিবাহের জন্য টাকা দিবেন ?

লবঙ্গ রাগিল। বলিল, "এমন ছেলেও দেখি নাই। আমার কি টাকা রাখিবার জায়গা নাই ? বিয়ে কি হয়, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি। মেয়েমানুষ সকল কথাত জানে না। বিবাহ কি হয় ?"

ছোট বাবু ছোট মাকে চিনিতেন। হাসিয়া বলিলেন, "তা মা, তুমি টাকা রেখো, আমি সম্বন্ধ করিব।"

মনে মনে ললিতলবঙ্গলতার মুণ্ডপাত করিতে করিতে আমি সেই স্থান হইতে পলাইলাম।

তাই বলিতেছিলাম, বড়মানুষের বাড়ী ফুল যোগান বড় দায়।

বহুমূর্ত্তিময়ি বসুন্ধরে! তুমি দেখতে কেমন? তুমি যে অসংখ্য অচিন্তনীয় শক্তিধর, অনন্ত বৈচিত্র্য-বিশিষ্ট জড়পদার্থসকল হৃদয়ে ধারণ কর, সে সব দেখিতে কেমন? যাকে যাকে লোকে সুন্দর বলে, সে সব দেখিতে কেমন? তোমার হৃদয়ে যে অসংখ্য বহুপ্রকৃতি-বিশিষ্ট জন্তুগণ বিচরণ করে, তারা সব দেখিতে কেমন? বল মা, তোমার হৃদয়ের সারভূত পুরুষজাতি দেখিতে কেমন? দেখাও মা, তাহার মধ্যে যাহার করস্পর্শে এত সুখ, সে দেখিতে কেমন? দেখা মা, দেখিতে কেমন দেখায়? দেখা কি? দেখা কেমন? দেখিতে কিরূপ সুখ হয়? এক মুহূর্ত্তের জন্য এই সুখময় স্পর্শ দেখিতে পাই না? দেখা মা! বাহিরের চক্ষু নিমীলিত থাকে—থাকুক মা! আমার হৃদয়ের মধ্যে চক্ষু ফুটাইয়া দে, আমি একবার অন্তরের ভিতর অন্তর লুকাইয়া মনের সাধে রূপ দেখে নারীজন্ম সার্থক করি। সবাই দেখে—আমি দেখিব না কেন? বুঝি কীট পতঙ্গ অবধি দেখে, আমি কি অপরাধে দেখিতে পাই না? শুধু দেখা—কারও ক্ষতি নাই, কারও কষ্ট নাই, কারও পাপ নাই, সবাই অবহেলে দেখে—কি দোষে আমি কখন দেখিব না?

না, না। অদৃষ্টে নাই। হৃদয়মধ্যে খুঁজিলাম, শুধু শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ। আর কিছু পাইলাম না।

আমার অন্তর বিদীর্ণ করিয়া ধ্বনি উঠিতে লাগিল, কে দেখাবি দেখা গো—আমার রূপ দেখা! বুঝিল না! কেহই অন্ধের দুঃখ বুঝিল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সেই অবধি আমি প্রায় প্রত্যহ রামসদয় মিত্রের বাড়ী ফুল বেচিতে যাইতাম। কিন্তু কেন, তাহা জানি না। যাহার নয়ন নাই, তাহার এ যত্ন কেন? সে দেখিতে পাইবে না, কেবল কথার শব্দ শুনিবার ভরসা মাত্র। কেন শচীন্দ্রবাবু আমার কাছে আসিয়া কথা কহিবেন? তিনি থাকেন

সদরে—আমি যাই অন্তঃপুরে। যদি তাঁহার স্ত্রী থাকিত তবেও বা কখন আসিতেন। কিন্তু বৎসরেক পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল—আর বিবাহ করেন নাই, অতএব সে ভরসাও নাই। কদাচিৎ কোন প্রয়োজনে মাতাদিগের নিকটে আসিতেন। আমি যে সময় ফুল লইয়া যাইব, তিনিও ঠিক সেই সময়ে আসিবেন, তাহারই বা সম্ভাবনা কি? অতএব যে এক শব্দ শুনিবার মাত্র আশা, তাহাও যদি সফল হইত না, তথাপি অন্ধ প্রত্যহ ফুল লইয়া যাইত। কোন্ দুরাশায়, তাহা জানি না। নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিবার সময় প্রত্যহ ভাবিতাম, আমি কেন আসি? প্রত্যহ মনে করিতাম, আর আসিব না। প্রত্যহই সে কল্পনা বৃথা হইত। প্রত্যহই আবার যাইতাম, যেন কে চুল ধরিয়া লইয়া যাইত। আবার নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতাম, আবার প্রতিজ্ঞা করিতাম, যাইব না—আবার যাইতাম, এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল।

মনে মনে আলোচনা করিতাম, কেন যাই? শুনিয়াছি—স্ত্রীজাতি পুরুষের রূপে মুগ্ধ হইয়া ভালবাসে। আমি কাণা, কাহার রূপ দেখিয়াছি? তবে কেন যাই? কথা শুনিব বলিয়া? কখন কেহ শুনিয়াছে যে, কোন রমণী শুধু কথা শুনিয়াই উন্মাদিনী হইয়াছে? আমি কি তাই হইয়াছি? তাও কি সম্ভব? যদি তাই হয়, তবে বাদ্য শুনিবার জন্য বাদকের বাড়ী যাই না কেন? সেতার, সারেঙ্গী, এসরাজ, বেহালার অপেক্ষা কি শচীন্দ্র সুকণ্ঠ? সে কথা মিথ্যা।

তবে কি সেই স্পর্শ? আমি যে কুসুমরাশি রাত্রি-দিবা লইয়া আছি, কখন পাতিয়া শুইতেছি, কখন বুকে চাপাইতেছি—ইহার অপেক্ষা তাহার স্পর্শ কোমল? তা ত নয়। তবে কি? এ কাণাকে কে বুঝাইবে, তবে কি?

তোমরা বুঝ না, বুঝাইবে কি? তোমাদের চক্ষু আছে, রূপ চেন, রূপই বুঝ। আমি জানি, রূপ দ্রষ্টার মানসিক বিকারমাত্র—শব্দও মানসিক বিকার। রূপ রূপবানে নাই। রূপ দর্শকের মনে—নহিলে এক জনকে সকলে সমান রূপবান্ দেখে না কেন? এক জনে সকলেই আসক্ত হয় না কেন? সেইরূপ শব্দও তোমার। রূপ দর্শকের একটি মনের সুখ মাত্র, শব্দও শ্রোতার একটি মনের সুখ মাত্র। স্পর্শও স্পর্শকের মনের সুখ মাত্র। যদি আমার রূপসুখের পথ বন্ধ থাকে, তবে শব্দ স্পর্শ, গন্ধ কেন রূপসুখের ন্যায় মনোমধ্যে সর্ব্বময় না হইবে?

শুষ্কভূমিতে বৃষ্টি পড়িলে কেন না সে উৎপাদিনী হইবে? শুষ্ককাষ্ঠে অগ্নি সংলগ্ন হইলে কেন না সে জ্বলিবে? রূপে হউক, শব্দে হউক, স্পর্শে হউক, শূন্য রমণী-হৃদয়ে সুপুরুষ-সংস্পর্শ হইলে কেন না প্রেম জন্মিবে? দেখ, অন্ধকারেও ফুল ফুটে, মেঘে ঢাকিলেও চাঁদ গগনে বিহার করে, জনশূন্য অরণ্যেও কোকিল ডাকে, যে সাগরগর্ভে মনুষ্য কখনও যাইবে না, সেখানেও রত্ন প্রভাসিত হয়, অন্ধের হৃদয়েও প্রেম জন্মে, আমার নয়ন বিরুদ্ধ বলিয়া হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হইবে না?

হইবে না কেন, কিন্তু সে কেবল আমার যন্ত্রণার জন্য। বোবার কবিত্ব কেবল তাহার যন্ত্রণার জন্য, বধিরের সঙ্গীতানুরাগ যদি হয়, কেবল তাহার যন্ত্রণার জন্য, আপনার গীত আপনি শুনিতে পায় না। আমার হৃদয়ে প্রণয়-সঞ্চার তেমনি যন্ত্রণার জন্য! পরের রূপ দেখিব কি—আমি আপনার রূপ কখন আপনি দেখিলাম না। রূপ! রূপ! আমার কি রূপ! এই ভূমণ্ডলে রজনী নামে ক্ষুদ্র বিন্দু কেমন দেখায়? আমাকে দেখিলে কখন কি কাহার আবার ফিরিয়া দেখিতে ইচ্ছা হয় নাই? এমন নিশাচর ক্ষুদ্র কেহ কি জগতে নাই যে, আমাকে সুন্দর দেখে? নয়ন না থাকিলে নারী সুন্দর হয় না—আমার নয়ন নাই—কিন্তু তবে কারিগরে পাতর ক্ষোদিয়া চক্ষুশূন্য মূর্ত্তি গড়ে কেন? আমি কি কেবল সেইরূপ পাষাণী-মাত্র? তবে বিধাতা এ পাষাণমধ্যে এ সুখদুঃখ-সমাকুল প্রণয়-লালসা-পরবশ হৃদয় কেন পূরিল? পাষাণের দুঃখ পাইয়াছি, পাষাণের সুখ পাইলাম না, কেন? এ সংসারে এ তারতম্য কেন? অনন্ত দুষ্কৃতকারীও চক্ষে দেখে, আমি জন্ম-পূর্বেই কোন্ দোষ করিয়াছিলাম যে, আমি চক্ষে দেখিতে পাইব না? এ সংসারে বিধাতা নাই—বিধান নাই, পাপপুণ্যের দণ্ডপুরস্কার নাই—আমি মরিব।

আমার এই জীবনে বহু বৎসর গিয়াছে—বহু বৎসর আসিতেও পারে। বৎসরে বৎসরে বহু দিবস—দিবসে বহু দণ্ড দণ্ডে দণ্ডে বহু মুহূর্ত্ত—তাহার মধ্যে এক মুহূর্ত্ত জন্য, এক পলক জন্য আমার চক্ষু কি ফুটিবে না? এক মুহূর্ত্ত জন্য চক্ষু মেলিতে পারিলে দেখিয়া লই, এই শব্দস্পর্শময় বিশ্বসংসার কি—আমি কি—শচীন্দ্র কি?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আমি প্রত্যহই ফুল লইয়া যাইতাম, ছোট বাবুর কথার শব্দশ্রবণ প্রায় ঘটিত না। কিন্তু কদাচিৎ দুই এক দিন ঘটিত। সে আহ্লাদের কথা বলিতে পারি না। আমার বোধ হইত, বর্ষার জলভরা মেঘ যখন ডাকিয়া বর্ষে, তখন মেঘের বুঝি সেইরূপ আহ্লাদ হয়, আমারও সেইরূপ ডাকিতে ইচ্ছা করিত। আমি প্রত্যহ মনে করিতাম, আমি ছোট বাবুকে কতগুলি বাছা ফুলের তোড়া বাঁধিয়া দিয়া আসিব—কিন্তু তাহা এক দিনও পারিলাম না। একে লজ্জা করিত—আবার মনে ভাবিতাম, ফুল দিলে তিনি দাম দিতে চাহিবেন, কি বলিয়া না লইব?—মনের দুঃখে ঘরে আসিয়া ফুল লইয়া ছোট বাবুকে গড়িতাম। কি গড়িতাম, তাহা জানি না—কখন দেখি নাই।

এ দিকে আমার যাতায়াতে একটি অচিন্তনীয় ফল ফলিতেছিল—আমি তাহার কিছুই জানিতাম না; পিতা-মাতার কথোপকথনে তাহা প্রথম জানিতে পারিলাম। একদিন সন্ধ্যার পর আমি মালা গাঁথিতে গাঁথিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। কি একটা শব্দে নিদ্রা ভাঙ্গিল। জাগরিত হইলে কর্ণে পিতা-মাতার কথোপকথনের শব্দ প্রবেশ করিল। বোধ হয়, প্রদীপ নিবিয়া গিয়া থাকিবে, কেন না, পিতা-মাতা আমার নিদ্রাভঙ্গ জানিতে পারিলেন, এমত বোধ হইল না। আমিও আমার নাম শুনিয়া কোন সাড়াশব্দ করিলাম না। শুনিলাম, মা বলিতেছেন, "তবে এক প্রকার স্থিরই হইয়াছে?"

পিতা উত্তর করিলেন, "স্থির বৈ কি? অমন বড় মানুষ লোকে কথা দিলে কি আর নড়চড় আছে? আর আমার মেয়ের দোষের মধ্যে অন্ধ, নইলে অমন মেয়ে লোকে তপস্যা করিয়া পায় না।"

মা। তা পরে এত কর্‌বে কেন?

পিতা। তুমি বুঝতে পার না যে, ওরা আমাদের মত টাকার কাঙ্গালী নয়—হাজার দুই হাজার টাকা ওরা টাকার মধ্যে ধরে না। যে দিন রজনীর সাক্ষাতে রামসদয় বাবুর স্ত্রী বিবাহের কথা প্রথম পাড়িলেন, সেই দিন হইতে রজনী তাঁহার কাছে প্রত্যহ যাতায়াত আরম্ভ করিল। তিনি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, টাকায় কি কাণার বিয়ে হয়? ইহাতে অবশ্য মেয়ের মনে আশা-ভরসা হইতে পারে যে, বুঝি ইনি দয়াবতী হইয়া টাকা খরচ করিয়া আমার বিবাহ দিবেন। সে দিন হইতে রজনী নিত্য যায় আসে। সেই দিন হইতে

নিত্য যাতায়াত দেখিয়া লবঙ্গ বুঝিলেন যে, মেয়েটি বিবাহের জন্য বড় কাতর হয়েছে—না হবে কেন, বয়স ত হয়েছে। তাতে আবার ছোট বাবু টাকা দিয়া হরনাথ বসুকে রাজি করিয়াছেন। গোপালও রাজি হইয়াছেন।

হরনাথ বসু রামসদয় বাবুর বাড়ির সরকার, গোপাল তাহার পুত্র। গোপালের কথা কিছু কিছু জানিতাম। গোপালের বয়স ত্রিশ বৎসর, একটি বিবাহ আছে, কিন্তু সন্তানাদি হয় নাই। গৃহধর্ম্মার্থে তাঁহার গৃহিণী আছে—সন্তানার্থ অন্ধ পত্নীতে তাঁহার আপত্তি নাই। বিশেষ লবঙ্গ তাহাকে টাকা দিবে। পিতামাতার কথায় বুঝিলাম, গোপালের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে—টাকার লোভে কুড়ি বৎসরের মেয়েও বিবাহ করিতে সে প্রস্তুত! টাকায় জাতি কিনিবে। পিতামাতা মনে করিলেন এ জন্মের মত অন্ধ কন্যা উদ্ধারপ্রাপ্ত হইল। তাঁহারা আহ্লাদ করিতে লাগিলেন। আমার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

তার পরদিন স্থির করিলাম, আর আমি লবঙ্গের কাছে যাইব না—মনে মনে তাহাকে শতবার পোড়ারমুখী বলিয়া গালি দিলাম। লজ্জায় মরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইতে লাগিল। রাগে লবঙ্গকে মারিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। দুঃখে কান্না আসিতে লাগিল। আমি লবঙ্গের কি করিয়াছি যে, সে আমার উপর এত অত্যাচার করিতে উদ্যত? ভাবিলাম, যদি বড়মানুষ বলিয়া অত্যাচার করিয়াই সুখী হয়, তবে জন্মান্ধ দুঃখিনী ভিন্ন আর কি অত্যাচার করিবার পাত্র পাইল না? মনে করিলাম, না, আর এক দিন যাইব, তাহাকে এমনই করিয়া তিরস্কার করিয়া আসিব—তার পর আর ফুল বেচিব না—আর তাহার টাকা লইব না—মা যদি তাহাকে ফুল দিয়া মূল্য লইয়া আসেন, তবে তাহার টাকায় অন্ন ভোজন করিব না—না খাইয়া মরিতে হয়, সে-ও ভাল। ভাবিলাম, বলিব, বড়মানুষ হইলেই কি পরপীড়ন করিতে হয়? বলিব, আমি অন্ধ, অন্ধ বলিয়া কি দয়া হয় না? বলিব, পৃথিবীতে যাহার কোন সুখ নাই, তাহাকে নিরপরাধে কষ্ট দিয়া তোমার কি সুখ? যত ভাবি এই এই বলিব, তত আপনার চক্ষের জলে আপনি ভাসি। মনে এই ভয় হইতে লাগিল, পাছে বলিবার সময় কথাগুলি ভুলিয়া যাই।

যথাসময়ে আবার রামসদয় বাবুর বাড়ী চলিলাম। ফুল লইব না মনে করিয়াছিলাম—কিন্তু শুধু হাতে যাইতে লজ্জা করিতে লাগিল—কি বলিয়া

গিয়া বসিব? পূর্ব্ব মত কিছু ফুল লইলাম। কিন্তু আজি মাকে লুকাইয়া গেলাম।

ফুল দিলাম—তিরস্কার করিব বলিয়া লবঙ্গের কাছে বসিলাম। কি বলিয়া প্রসঙ্গ উত্থাপন করিব? হরি! হরি! কি বলিয়া আরম্ভ করিব? গোড়ার কথা কোন্‌টা? যখন চারিদিকে আগুন জ্বলিতেছে আগে কোন্ দিক্ নিবাইব? কিছুই বলা হইল না। কথা পাড়িতেই পারিলাম না। কান্না আসিতে লাগিল।

ভাগ্যক্রমে লবঙ্গ আপনি প্রসঙ্গ তুলিল, "কাণি—তোর বিয়ে হবে!"

আমি জ্বলিয়া উঠিলাম; বলিলাম, "ছাই হবে।"

লবঙ্গ বলিল, "কেন ছোট বাবু বিবাহ দেওয়াইবেন—হবে না কেন?"

আরও জ্বলিলাম, বলিলাম,"কেন আমি তোমাদের কাছে কি দোষ করেছি?"

লবঙ্গও রাগিল। বলিল, "আঃ! মলো! তোর কি বিয়ের মন নাই না কি?"

আমি মাথা নাড়িয়া বলিলাম, "না।"

লবঙ্গ আরও রাগিল, বলিল, "পাপিষ্ঠা কোথাকার! বিয়ে কর্‌বি না কেন?"

আমি বলিলাম, "খুসি।"

লবঙ্গের মনে বোধ হয় সন্দেহ হইল—আমি ভ্রষ্টা—নহিলে বিবাহে অসম্মত কেন? সে বড় রাগ করিয়া বলিল, "আঃ মলো! বেরো বলিতেছি—নহিলে খেঙরা মারিয়া বিদায় করিব।"

আমি উঠিলাম—আমার দুই অন্ধ চক্ষে জল পড়িতেছিল? তাহা লবঙ্গকে দেখাইলাম না—ফিরিলাম। গৃহে যাইতেছিলাম, সিঁড়িতে আসিয়া একটু ইতস্ততঃ করিতেছিলাম, কৈ, তিরস্কারের কথা কিছুই বলা হয় নাই। অকস্মাৎ কাহার পদশব্দ শুনিলাম। অন্ধের শ্রবণশক্তি অনৈসর্গিক প্রখরতা প্রাপ্ত হয়—আমি দুই এক বার সে পদশব্দ শুনিয়াই চিনিয়াছিলাম, কাহার পদবিক্ষেপের শব্দ। আমি সিঁড়িতে বসিলাম। ছোট বাবু আমার নিকটে আসিলেন, আমাকে দেখিয়া দাঁড়াইলেন। বোধ হয়, আমার চক্ষের জল দেখিতে পাইয়াছেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে রজনি!"

সকল ভুলিয়া গেলাম! রাগ ভুলিলাম, অপমান ভুলিলাম, দুঃখ ভুলিলাম, কানে বাজিতে লাগিল, "কে রজনি!" আমি উত্তর করিলাম না। মনে করিলাম, আর দুই একবার জিজ্ঞাসা করুন, আমি শুনিয়া কান জুড়াই।

ছোট বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "রজনি কাঁদিতেছ কেন?"

আমার অন্তর আনন্দে ভরিতে লাগিল। চক্ষের জল আরও উছলিতে

লাগিল। আমি কথা কহিলাম না, আরও জিজ্ঞাসা করুন। মনে করিলাম, আমি কি ভাগ্যবতী! বিধাতা আমায় কাণা করিয়াছেন, কালা করেন নাই।

তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন কাঁদিতেছ ? কেহ কিছু বলিয়াছে ?"

আমি সেবার উত্তর করিলাম, তাঁহার সঙ্গে কথোপকথনে সুখ যদি জন্মে একবার ঘটিতেছে—তবে ত্যাগ করি কেন? আমি বলিলাম, "ছোট মা তিরস্কার করিয়াছেন।"

ছোট বাবু হাসিলেন। বলিলেন, "ছোট মা'র কথা ধরিও না, তাঁর মুখ ঐ রকম—কিন্তু মনে রাগ করেন না। তুমি আমার সঙ্গে এস, এখনই তিনি আবার ভাল কথা বলিবেন।"

তাঁহার সঙ্গে কেন না যাইব ? তিনি ডাকিলে কি আর রাগ থাকে ? আমি উঠিলাম। তাঁহার সঙ্গে চলিলাম। তিনি সিঁড়িতে উঠিতে লাগিলেন, আমিও পশ্চাৎ পশ্চাৎ উঠিতেছিলাম। তিনি বলিলেন, "তুমি দেখতে পাও না, সিঁড়িতে উঠ কিরূপে ? না পার, আমি হাত ধরিয়া লইয়া যাইতেছি।"

আমার গা কাঁপিয়া উঠিল। সর্ব্বশরীরে রোমাঞ্চ হইল। তিনি আমার হাত ধরিলেন। ধরুন না—লোকে নিন্দা করে করুক, আমার নারীজন্ম সার্থক হউক, আমি পরের সাহায্য ব্যতীত কলিকাতার গলি গলি বেড়াইতে পারি, কিন্তু ছোট বাবুকে নিষেধ করিলাম না। ছোট বাবু—বলিব কি ? কি বলিয়া বলিব—উপযুক্ত কথা পাই না—ছোট বাবু হাত ধরিলেন।

যেন একটি প্রভাত-প্রফুল্ল-পদ্ম, দলগুলি দ্বারা আমার প্রকোষ্ঠ বেড়িয়া ধরিল—যেন গোলাপের মালা গাঁথিয়া কে আমার হাতে বেড়িয়া দিল। আমার আর কিছু মনে নাই। বুঝি সেই সময় ইচ্ছা হইয়াছিল—এখন মরি না কেন ? বুঝি তখন গলিয়া জল হইয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিল—বুঝি ইচ্ছা করিয়াছিল, শচীন্দ্র আর আমি দুইটি ফুল হইয়া এইরূপ সংস্পৃষ্ট হইয়া কোন বন্যবৃক্ষে গিয়া একটি বোঁটায় ঝুলিয়া থাকি। আর কি মনে হইয়াছিল, তাহা মনে নাই। যখন সিঁড়ির উপর উঠিয়া ছোট বাবু হাত ছাড়িয়া দিলেন,—তখন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলাম—এ সংসার আবার মনে পড়িল—সেই সঙ্গে মনে পড়িল—"কি করিলে প্রাণেশ্বর! না বুঝিয়া কি করিলে! তুমি আমার পাণি গ্রহণ করিয়াছ। এখন তুমি আমায় গ্রহণ কর না কর—তুমি আমার স্বামী, আমি তোমার পত্নী। ইহজন্মে অন্ধ ফুলওয়ালীর আর কেহ স্বামী হইবে না।"

সেই সময় কি পোড়া লোকের চোখ পড়িল ? বুঝি তাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ছোট বাবু ছোট মা'র কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রজনীকে কি বলিয়াছ গা। সে কাঁদিতেছে।" ছোট মা আমার চক্ষে জল দেখিয়া অপ্রতিভ হইলেন—আমাকে ভাল কথা বলিয়া কাছে বসাইলেন—বয়োজ্যেষ্ঠ সপত্নী-পুত্রের কাছে সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিতে পারিলেন না। ছোট বাবু ছোট মাকে প্রসন্ন দেখিয়া নিজ প্রয়োজনে বড় মা'র কাছে চলিয়া গেলেন। আমিও বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

এ দিকে গোপাল বাবুর সঙ্গে আমার বিবাহের উদ্যোগ হইতে লাগিল। দিন স্থির হইল। আমি কি করিব? ফুল গাঁথা বন্ধ করিয়া দিবারাত্রি কিসে এ বিবাহ বন্ধ করি—সেই চিন্তা করিতে লাগিলাম। বিবাহে মাতার আনন্দ, পিতার উৎসাহ, লবঙ্গলতার যত্ন, ছোট বাবু ঘটক! এই কথাটি সর্বাপেক্ষা কষ্ট-দায়ক—ছোট বাবু ঘটক! আমি একা, অন্ধ, কি প্রকারে ইহার প্রতিবন্ধকতা করিব? কোন উপায় দেখিতে পাইলাম না। মালা গাঁথা বন্ধ হইল। মাতা-পিতা মনে করিলেন বিবাহ-আনন্দে আমি বিহ্বল হইয়া মালা গাঁথা ত্যাগ করিয়াছি।

ঈশ্বর আমাকে এক সহায় আনিয়া দিলেন। বলিয়াছি, গোপাল বসুর বিবাহ ছিল—তাঁহার পত্নীর নাম চাঁপা—বাপ রেখেছিল, চম্পকলতা। চাঁপাই কেবল এ বিবাহে অসম্মত। চাঁপা একটু শক্ত মেয়ে। যাহাতে ঘরে সপত্নী না হয়, তাহার চেষ্টার কিছু ত্রুটি করিল না।

হীরালাল নামে চাঁপার এক ভাই ছিল—চাঁপার অপেক্ষা দেড় বৎসরের ছোট। হীরালাল মদ খায়—তাহাও অল্প মাত্রায় নহে। শুনিয়াছি, গাঁজাও টানে। তাহার পিতা তাহাকে লেখাপড়া শিখান নাই—কোন প্রকারে সে হস্তাক্ষরটি প্রস্তুত করিয়াছিল মাত্র, তথাপি রামসদয় বাবু তাহাকে কোথা কেরাণীগিরি করিয়া দিয়াছিলেন। মাতলামির দোষে সে চাকরীটি গেল। হরনাথ বসু, তাহার দমে ভুলিয়া লাভের আশায় তাহাকে দোকান করিয়া দিলেন। দোকানে লাভ দূরে থাক, দেনা পড়িল—দোকান উঠিয়া গেল। তারপর কোন গ্রামে বার টাকা বেতনে হীরালাল মাষ্টার হইয়া গেল। সে গ্রামে মদ পাওয়া যায় না বলিয়া হীরালাল পলাইয়া আসিল। তারপর সে এক খানা খবরের কাগজ করিল। দিন কতক তাহাতে খুব লাভ হইল, বড় পসার জাঁকিল, কিন্তু অশ্লীলতা দোষে পুলিশ টানাটানি আরম্ভ করিল। ভয়ে

হীরালাল কাগজ ফেলিয়া রূপোষ হইল। কিছু দিন পরে হীরালাল আবার হঠাৎ ভাসিয়া উঠিয়া ছোট বাবুর মোসাহেবী করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু ছোট বাবুর কাছে মদের চলে নাই দেখিয়া আপনা-আপনি সরিল। অনন্যোপায় হইয়া নাটক লিখিতে আরম্ভ করিল। নাটক একখানিও বিক্রয় হইল না। তবে ছাপাখানার দেনা শুধিতে হয় না বলিয়া সে যাত্রা রক্ষা পাইল। এক্ষণে এ ভবসংসারে আর কূল-কিনারা না দেখিয়া হীরালাল চাঁপা-দিদির আঁচল ধরিয়া বসিয়া রহিল।

চাঁপা হীরালালকে স্বকার্য্যোদ্ধার জন্য নিয়োজিত করিল। হীরালাল ভগিনীর কাছে সবিশেষ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "টাকার কথা সত্য ত? যেই, কাণীকে বিবাহ করিবে সেই টাকা পাইবে?"

চাঁপা সেই বিষয়ে সন্দেহ ভঞ্জন করিল। হীরালালের টাকা বড় দরকার। সে তখনই আমার পিতৃভবনে আসিয়া দর্শন দিল। পিতা তখন বাড়ী ছিলেন; আমি তখন সেখানে ছিলাম না। আমি নিকটস্থ অন্য ঘরে ছিলাম—অপরিচিত পুরুষে পিতার সঙ্গে কথা কহিতেছে, কণ্ঠস্বরে জানিতে পারিয়া কান পাতিয়া কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিলাম, হীরালালের কি কর্কশ কদর্য্য সুর!

হীরালাল বলিতেছে, "সতীনের উপর কেন মেয়ে দিবে?"

পিতা দুঃখিতভাবে বলিলেন, "কি করি। না দিলে ত বিয়ে হয় না—এত কাল তা হলো না।"

হীরালাল। কেন, কেন, তোমার মেয়ের বিবাহের ভাবনা কি?

পিতা হাসিলেন, বলিলেন, "আমি গরীব ফুল বেচিয়া খাই—আমার মেয়েকে বিবাহ করিবে? তাতে আমার কাণা মেয়ে তাতে আবার বয়সও ঢের হয়েছে।"

হীরা। কেন, পাত্রের অভাব কি? আমায় বলিলে আমি বিয়ে করি। এখন বয়স্থা মেয়ে ত লোকে চায়। আমি যখন স্তুশ্চভিশ্চ্‌শাৎ পত্রিকার এডিটার ছিলাম, তখন আমি মেয়ে বড় করিয়া বিবাহ দিবার জন্য কত আর্টিকেল লিখেছি—পড়িয়া আকাশের মেঘ ডেকে উঠেছিল। বাল্যবিবাহ! ছি! ছি! মেয়ে ত বড় করিয়াই বিবাহ দিবে। এসো! আমাকে দেশের উন্নতির একজাম্পল সেট্ করিতে দাও—আমিই এ মেয়ে বিবাহ করিব।

আমরা তখন হীরালালের চরিত্রের কথা সবিশেষ শুনি নাই—পশ্চাৎ শুনিয়াছি। পিতা ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। এত বড় পণ্ডিত জামাই হাত-

ছাড়া হয় ভাবিয়া শেষে একটু দুঃখিত হইলেন। শেষে বলিলেন, "এখন কথা ধার্য্য হইয়া গিয়াছে, এখন আর নড়চড় হয় না, বিশেষ এ বিবাহের কর্ত্তা শচীন্দ্র বাবু। তাঁহারই বিবাহ দিতেছেন। তাঁহারা যাহা করিবেন, তাহাই হইবে। তাঁহারাই গোপাল বাবুর সঙ্গে সম্বন্ধ করিয়াছেন।"

হীরা। তাহাদের মতলব তুমি কি বুঝিবে? বড়মানুষের চরিত্রের অন্ত পাওয়া ভার। তাহাদের বড় বিশ্বাস করিও না।

এই বলিয়া হীরালাল চুপি চুপি কি বলিল, তাহা শুনিতে পাইলাম না। পিতা বলিলেন, "সে কি? না—আমার কাণা মেয়ে।"

হীরালাল তৎকালে ভগ্নমনোরথ হইয়া ঘরের এদিক্ সেদিক্ দেখিতে লাগিল। চারিদিক দেখিয়া বলিল, "তোমার ঘরে মদ নাই, বটে হে?" পিতা বিস্মিত হইলেন; বলিলেন, "মদ! কি জন্য রাখিব?"

হীরালাল মদ নাই জানিয়া বিজ্ঞের ন্যায় বলিল, "সাবধান করিয়া দিবার জন্য বল্‌ছিলাম। এখন ভদ্রলোকের সঙ্গে কুটুম্বিতা করিতে চলিলে ওগুলো যেন না থাকে।"

কথাটা পিতার বড় ভাল লাগিল না। তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। হীরালাল না বিবাহে, না মদে, কোন দিকেই দেশের উন্নতির একজাম্পল্ সেট্ করিতে না পারিয়া ক্ষুণ্ণমনে বিদায় হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিবাহের দিন অতি নিকট হইল—আর এক দিনমাত্র বিলম্ব আছে। উপায় নাই। নিষ্কৃতি নাই। চারিদিক হইতে উচ্ছ্বসিত বারিরাশি গর্জ্জিয়া আসিতেছে—নিশ্চিত ডুবিব।

তখন লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া, মাতার পায়ে আছড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলাম—যোড়হাত করিয়া বলিলাম, "আমার বিবাহ দিও না—আমি আইবুড়ো থাকিব।"

মা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন? কেন?" তাহার উত্তর দিতে পারিলাম না। কেবল যোড়হাত করিতে লাগিলাম—কেবল কাঁদিতে লাগিলাম। মাতা বিরক্ত হইলেন, রাগিয়া উঠিলেন, গালি দিলেন। শেষে পিতাকে বলিয়া দিলেন। পিতাও গালি দিয়া মারিতে আসিলেন। আর কিছু বলিতে পারিলাম না।

উপায় নাই। নিষ্কৃতি নাই। ডুবিলাম।

সেই দিন বৈকালে কেবল গৃহে আমি একা ছিলাম—পিতা বিবাহের খরচ সংগ্রহে গিয়াছেন,—মাতা দ্রব্য সামগ্রী কিনিতে গিয়াছিলেন। এ সব যে সময় হয়, সে সময়ে আমি দ্বার দিয়া থাকিতাম না হয় বামাচরণ আমার কাছে বসিয়া থাকিত। বামাচরণ এই দিন বসিয়াছিল। একজন কে দ্বার ঠেলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। চেনা পায়ের শব্দ নহে। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে গো।"

উত্তর, "তোমার যম।"

কথা কোপযুক্ত বটে, কিন্তু স্বর স্ত্রীলোকের। ভয় পাইলাম না। হাসিয়া বলিলাম—"আমার কি যম আছে? তবে এত দিন কোথায় ছিলে?"

স্ত্রীলোকটির রাগ-শান্তি হইল না। "এখন জান্‌বি। বড় বিয়ের সাধ। পোড়ারমুখী। আবাগী।" ইত্যাদি গালির ছড়া আরম্ভ হইল। গালি সমাপ্তে সেই মধুরভাষিণী বলিলেন, "হাঁ দেখ, কাণি, যদি আমার স্বামীর সঙ্গে তোর বিয়ে হয়, তবে যে দিন তুই ঘর করিতে যাইবি, সেই দিন তোকে বিষ খাওয়াইয়া মারিব।"

বুঝিলাম, চাঁপা খোদ। আদর করিয়া বসিতে বলিলাম। বলিলাম, "শুন তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

এত গালির উত্তরে সাদর-সম্ভাষণ দেখিয়া চাঁপা একটু শীতল হইয়া বসিল।

আমি বলিলাম, "শুন, এ বিবাহে তুমি যেমন বিরক্ত, আমিও তেমনি। আমার এ বিবাহ যাহাতে না হয়, আমি তাহাই করিতে রাজি আছি। কিসে বিবাহ বন্ধ হয়, তাহার উপায় বলিতে পার?"

চাঁপা বিস্মিত হইল। বলিল, "তা তোমার বাপ-মাকে বল না কেন?"

আমি বলিলাম, "হাজার বার বলিয়াছি। কিছু হয় নাই।"

চাঁপা। বাবুদের বাড়ীতে গিয়া তাঁহাদের হাতে-পায়ে ধর না কেন?

আমি। তাতেও কিছু হয় নাই।

চাঁপা একটু ভাবিয়া বলিল, "তবে এক কাজ করিবি?"

আমি। কি?

চাঁপা। দুই দিন লুকাইয়া থাকিবি?

আমি। কোথায় লুকাইব? আমার স্থান কোথায় আছে?

চাঁপা আবার একটু ভাবিল। বলিল, "আমার বাপের বাড়ী গিয়া থাকিবি?"

তোমার ইচ্ছা থাকিলেও তুমি আমার উপর অত্যাচার করিতে সাহস করিবে না।"

হীরালাল চুপ করিয়া রহিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

হীরালাল জগন্নাথের ঘাটে গিয়া নৌকা করিল। রাত্রিকালে দক্ষিণা বাতাসে পাল দিল। সে বলিল, তাহাদের পিত্রালয় হুগলী। আমি তাহা জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

পথে হীরালাল বলিল, "গোপালের সঙ্গে তোমার বিবাহ ত হইবে না— আমায় বিবাহ কর।"

আমি বলিলাম, "না।"

হীরালাল বিচার আরম্ভ করিল। তাহার যত্ন যে,—বিচারের দ্বারা প্রতিপন্ন করে যে, তাহার ন্যায় সৎপাত্র পৃথিবীতে দুর্লভ, আমার ন্যায় কুপাত্রীও পৃথিবীতে দুর্লভ। আমি উভয়ই স্বীকার করিলাম—তথাপি বলিলাম যে, "না, তোমাকে বিবাহ করিব না।"

তখন হীরালাল বড় ক্রুদ্ধ হইল। বলিল, "কাণাকে কে বিবাহ করিতে চাহে?" এই বলিয়া নীরব হইল। উভয়ে নীরব রহিলাম—এইরূপে রাত্রি কাটিতে লাগিল।

তাহার পর শেষ-রাত্রে হীরালাল অকস্মাৎ মাঝিদিগকে বলিল, "এইখানে ভিড়ো।" মাঝিরা নৌকা লাগাইল—নৌকাতলে ভূমিস্পর্শের শব্দ শুনিলাম। হীরালাল আমাকে বলিল, "নাম—আসিয়াছি।" সে আমার হাত ধরিয়া নামাইল। আমি কূলে দাঁড়াইলাম।

তাহার পর শব্দ শুনিলাম, যেন হীরালাল আবার নৌকায় উঠিল। মাঝি-দিগকে বলিল, "দে, নৌকা খুলিয়া দে, নৌকা খুলিয়া দে।" আমি বলিলাম, "সে কি? আমাকে নামাইয়া দিয়া নৌকা খুলিয়া দাও কেন?"

হীরালাল বলিল, "আপনার পথ আপনি দেখ।" মাঝিরা নৌকা খুলিতে লাগিল, দাঁড়ের শব্দ শুনিলাম। আমি তখন কাতর হইয়া বলিলাম, "তোমার পায়ে পড়ি, আমি অন্ধ—যদি একান্তই আমাকে ফেলিয়া যাইবে, তবে কাহারও বাড়ী পর্য্যন্ত আমাকে রাখিয়া দিয়া যাও। আমি ত এখানে কখনও আসি নাই—এখানকার পথ চিনিব কি প্রকারে?"

হীরালাল বলিল, "আমাকে বিবাহ করিতে সম্মত আছ ?"

আমার কান্না আসিল। ক্ষণেক রোদন করিলাম, রাগে হীরালালকে বলিলাম, "তুমি যাও। তোমার কাছে কোন উপকার পাইতে নাই—রাত্রি প্রভাত হইলে তোমার অপেক্ষা দয়ালু শত শত লোকের সাক্ষাৎ পাইব। তাহারা অন্ধের প্রতি তোমার অপেক্ষা দয়া করিবে।"

হীরা। দেখা পেলে ত ? এ যে চড়া ; চারিদিকে জল। আমাকে বিবাহ করিবে ?

হীরালালের নৌকা তখন কিছু বাহিরে গিয়াছিল, শ্রবণশক্তি আমার জীবনাবলম্বন—শ্রবণই আমার চক্ষের কাজ করে! কেহ কথা কহিলে—কত দূরে কোন্ দিকে কথা কহিতেছে, তাহা অনুভব করিতে পারি। হীরালাল কোন্ দিকে কত দূর থাকিয়া কথা কহিল, তাহা মনে মনে অনুভব করিয়া জলে নামিয়া সেই দিকে ছুটিলাম—ইচ্ছা, নৌকা ধরিব। গলাজল অবধি নামিলাম। নৌকা পাইলাম না। নৌকা আরও বেশী জলে! নৌকা ধরিতে গেলে ডুবিয়া মরিব। তালের লাঠি তখনও হাতে ছিল। আবার ঠিক করিয়া শব্দানুভব করিয়া বুঝিলাম, হীরালাল এই দিকে এত দূর হইতে কথা কহিতেছে। পিছু হটিয়া কোমরজলে উঠিয়া, শব্দের স্থানানুভব করিয়া সবলে সেই তালের লাঠি নিক্ষেপ করিলাম।

চীৎকার করিয়া হীরালাল নৌকার উপর পড়িয়া গেল।—"খুন হইয়াছে, খু—ন হইয়াছে!" বলিয়া মাঝিরা নৌকা খুলিয়া দিল। বাস্তবিক সেই পাপিষ্ঠ খুন হয় নাই। তখনই তার মধুর কণ্ঠ শুনিতে পাইলাম—নৌকা বাহিয়া চলিল। সে উচ্চৈঃস্বরে আমাকে গালি দিতে দিতে চলিল—অতি কদর্য্য অশ্রাব্য ভাষায় পবিত্র গঙ্গা কলুষিত করিতে করিতে চলিল। আমি স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম যে, সে শাসাইতে লাগিল যে, আবার খবরের কাগজ করিয়া আমার নামে আর্টিকেল লিখিবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সেই জনহীনা রাত্রিতে, আমি অন্ধ যুবতী একা সেই দ্বীপে দাঁড়াইয়া গঙ্গার কলকল জলকল্লোল শুনিতে লাগিলাম।

হায়, মানুষের জীবন! কি অসার তুই! কেন আসিস—কেন থাকিস্—কেন যাস্? এ দুঃখময় জীবন কেন? ভাবিলে জ্ঞান থাকে না। শচীন্দ্র

বাবু একদিন তাঁহার মাতাকে বুঝাইতেছিলেন, সকলই নিয়মাধীন। মানুষের এই জীবন কি কেবল সেই নিয়মের ফল? যে নিয়মে ফুল ফুটে, মেঘ ছুটে, চাঁদ উঠে—যে নিয়মে জলবুদ্‌বুদ্‌ ভাসে, হাসে, মিলায়; যে নিয়মে ধূলা উড়ে, তৃণ পড়ে, পাতা খসে, সেই নিয়মেই কি এই সুখদুঃখময় মনুষ্যজীবন আবদ্ধ, সম্পূর্ণ, বিলীন হয়? যে নিয়মের অধীন হইয়া নদীগর্ভস্থ কুম্ভীর শীকারের সন্ধান করিতেছে—যে নিয়মের অধীন হইয়া এই চরে ক্ষুদ্র কীট সকল অন্য কীটের সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে, সেই নিয়মের অধীন হইয়া আমি শচীন্দ্রের জন্য প্রাণত্যাগ করিতে বসিয়াছি? ধিক্‌ প্রাণত্যাগে! ধিক্‌ প্রণয়ে! ধিক্‌ মনুষ্য জীবনে! কেন এই গঙ্গাজলে ইহা পরিত্যাগ করি না।

জীবন অসার—সুখ নাই বলিয়া, অসার, তাহা নহে। শিমুল-গাছে শিমুল-ফুলই ফুটিবে; তাহা বলিয়া তাহাকে অসার বলিব না। দুঃখময় জীবনে দুঃখ আছে বলিয়া তাহাকে অসার বলিব না। কিন্তু অসার বলি এই জন্যে যে, দুঃখই দুঃখের পরিণাম—তাহার পর আর কিছুই নাই। আমার মর্ম্মের দুঃখ আমি একা ভোগ করিলাম, আর কেহ জানিল না—আর কেহ বুঝিল না—দুঃখ প্রকাশের ভাষা নাই বলিয়া তাহা বলিতে পারিলাম না; শ্রোতা নাই বলিয়া তাহা শুনাইতে পারিলাম না; সহৃদয় বোদ্ধা নাই বলিয়া তাহা বুঝাইতে পারিলাম না। একটি শিমুল-বৃক্ষ হইতে সহস্র শিমুল-বৃক্ষ হইতে পারিবে, কিন্তু তোমাদের দুঃখে আর কয় জনের দুঃখ হইবে? পরের অন্তঃকরণের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে, এমন কয় জন পর পৃথিবীতে জন্মিয়াছে? পৃথিবীতে কে এমন জন্মিয়াছে যে, এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে, প্রতি কথায়, প্রতি শব্দে, প্রতি বর্ণে, কত সুখ-দুঃখের তরঙ্গ উঠে, তাহা বুঝিতে পারে? সুখ-দুঃখ? হাঁ, সুখও আছে। যখন চৈত্রমাসে ফুলের বোঝার সঙ্গে সঙ্গে মৌমাছি ছুটিয়া আমাদের গৃহমধ্যে প্রবেশ করিত, তখন সে শব্দের সঙ্গে আমার কত সুখ উছলিত, কে বুঝিত? যখন গীত-ব্যবসায়িনীর অট্টালিকা হইতে বাদ্যনিক্কণ সান্ধ্য-সমীরণে কর্ণে আসিত, তখন আমার সুখ কে বুঝিয়াছে? যখন বামাচরণের আধ আধ কথা ফুটিয়াছিল, জল বলিতে "ত" বলিত, কাপড় বলিতে "খাব" বলিত, রজনী বলিতে "জুজি" বলিত, তখন আমার মনে কত সুখ উছলিত, তাহা কে বুঝিয়াছিল? আমার দুঃখই বা কে বুঝিবে? অন্ধের রূপোন্মাদ কে বুঝিবে? না দেখায় যে দুঃখ, তাহা কে বুঝিবে? বুঝিলেও বুঝিতে পারে,

কিন্তু দুঃখ যে কখন প্রকাশ করিতে পারিলাম না, এ দুঃখ কে বুঝিবে? পৃথিবীতে যে দুঃখের ভাষা নেই, এ দুঃখ কে বুঝিবে? ছোট মুখে বড় কথা তোমরা ভালবাস না, ছোট ভাষায় বড় দুঃখ কি প্রকাশ করা যায়? এমনই দুঃখ যে, আমার যে কি দুঃখ, তাহাতে হৃদয় ধ্বংস হইলেও সকলটা আপনি মনে ভাবিয়া আনিতে পারি না।

মনুষ্য-ভাষাতে তেমন কথা নাই, মনুষ্যের তেমন চিন্তাশক্তি নাই। দুঃখ ভোগ করি—কিন্তু দুঃখটা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আমার কি দুঃখ? কি তাহা জানি না, কিন্তু হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে। সর্ব্বদা দেখিতে পাইবে, যেন তোমার দেহ শীর্ণ হইতেছে, বল অপহৃত হইতেছে, কিন্তু তোমার শারীরিক রোগ কি, তাহা জানিতে পারিতেছ না। তেমনি অনেক সময় দেখিবে যে, দুঃখে তোমার বক্ষঃ বিদীর্ণ হইতেছে, প্রাণ বাহির করিয়া দিয়া শূন্যমার্গে পাঠাইতে ইচ্ছা করিতেছে—কিন্তু কি দুঃখ, তাহা আপনি বুঝিতে পারিতেছ না। আপনি বুঝিতে পারিতেছ না—পরে বুঝিবে কি? ইহা কি সামান্য দুঃখ? সাধ করিয়া বলি, জীবন অসার!

যে জীবন এমন দুঃখময়, তাহার রক্ষার জন্য এত ভয় পাইতেছিলাম কেন? আমি কেন ইহা ত্যাগ করি না? এই ত কলনাদিনী গঙ্গার তরঙ্গ মধ্যে দাঁড়াইয়া আছি—আর দুই পা অগ্রসর হইলেই মরিতে পারি? না মরি কেন? এ জীবন রাখিয়া কি হইবে? মরিব!

আমি কেন জন্মিলাম? কেন অন্ধ হইলাম? জন্মিলাম ত শচীন্দ্রের যোগ্য হইয়া জন্মিলাম না কেন? শচীন্দ্রের যোগ্য না হইলাম তবে শচীন্দ্রকে ভাল-বাসিলাম কেন? ভালবাসিলাম, তবে তাঁহার কাছে থাকিতে পারিলাম না কেন? কিসের জন্য শচীন্দ্রকে ভাবিয়া গৃহত্যাগ করিতে হইল? নিঃসহায় অন্ধ, গঙ্গার চরে মরিতে আসিলাম কেন? কেন বানের মুখে কুটার মত, সংসারস্রোতে অজ্ঞাতপথে ভাসিয়া চলিলাম? এ সংসারে অনেক দুঃখী আছে, আমি সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখী কেন? এ সকল কাহার খেলা? দেবতার? জীবের এত কষ্ট দেবতার কি সুখ? কষ্ট দিবার জন্য সৃষ্টি করিয়া কি সুখ? মূর্ত্তিমতী নির্দ্দয়তাকে কেন দেবতা বলিব? কেন নিষ্ঠুরতার পূজা করিব? মানুষের এত ভয়ানক দুঃখ কখন দেবকৃত নহে—তাহা হইলে দেবতা রাক্ষসের অপেক্ষা সহস্রগুণে নিকৃষ্ট! তবে কি আমার কর্ম্মফল? কোন্ পাপে আমি জন্মান্ধ?

দুই এক পা অগ্রসর হইতে লাগিলাম—মরিব। গঙ্গার তরঙ্গরব কানে

বাজিতে লাগিল—বুঝি মরা হইল না—আমি মিষ্টশব্দ বড় ভালবাসি। না, মরিব! চিবুক ডুবিল। অধর ডুবিল। আর একটুমাত্র। নাসিকা ডুবিল। চক্ষু ডুবিল! আমি ডুবিলাম!

ডুবিলাম, কিন্তু মরিলাম না। কিন্তু এ যন্ত্রণাময় জীবনচরিত আর বলিতে সাধ করে না। আর একজন বলিবে।

আমি সেই প্রভাতবায়ু তাড়িত গঙ্গাজল-প্রবাহ মধ্যে নিমগ্ন হইয়া ভাসিতে ভাসিতে চলিলাম। ক্রমে শ্বাস নিশ্চেষ্ট, চেতনা বিনষ্ট হইয়া আসিল।

দ্বিতীয় খণ্ড

অমরনাথের কথা

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমার এই অসার জীবনের ক্ষুদ্র কাহিনী লিখিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এ সংসার-সাগরে কোন্ চরে লাগিয়া আমার এ নৌকা ভাঙ্গিয়াছে, তাহা এই বিশ্বচিত্রে আঁকিয়া রাখিব, দেখিয়া নবীন নাবিকেরা সতর্ক হইতে পারিবে।

আমার নিবাস অথবা পিত্রালয় শান্তিপুর—আমার বর্ত্তমান বাসস্থানের কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। আমি সৎ-কায়স্থ কুলোদ্ভূত, কিন্তু আমার পিতৃ-কুলে একটি গুরুতর কলঙ্ক ঘটিয়াছিল। আমার খুল্লতাত-পত্নী কুলত্যাগিনী হইয়াছিলেন। আমার পিতার ভূসম্পত্তি যাহা ছিল—তদ্দ্বারা অন্য উপায় অবলম্বন না করিয়াও সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা যায়। লোকে তাঁহাকে ধনী বলিয়া গণনা করিত। তিনি আমার শিক্ষার্থ অনেক ধন ব্যয় করিয়া-ছিলেন। আমিও কিঞ্চিৎ লেখাপড়া শিখিয়াছিলাম—কিন্তু সে কথায় কাজ নাই। সর্পের মণি থাকে ; আমারও বিদ্যা ছিল।

আমার বিবাহযোগ্য বয়স উপস্থিত হইলে, আমার অনেক সম্বন্ধ আসিল—কিন্তু কোন সম্বন্ধই পিতার মনোমত হইল না ; তাঁহার ইচ্ছা কন্যা পরমাসুন্দরী হইবে, কন্যার পিতা পরম ধনী হইবে এবং কৌলিন্যের নিয়ম সকল বজায় থাকিবে। কিন্তু এরূপ কোন সম্বন্ধ উপস্থিত হইল না। আসল কথা, আমাদিগের কুলকলঙ্ক শুনিয়া কোন বড় লোক আমাকে কন্যাদান করিতে ইচ্ছুক হয়েন নাই। এইরূপ সম্বন্ধ করিতে করিতে আমার পিতার পরলোকপ্রাপ্তি হইল।

পরিশেষে পিতার স্বর্গারোহণের পর আমার এক পিসী এক সম্বন্ধ উপস্থিত করিলেন। গঙ্গাপার, কালিকাপুর নামে এক গ্রাম ছিল। এই ইতিহাসে ভবানীনগর নামে অন্য গ্রামের নাম উত্থাপিত হইবে, এই কালিকাপুর সেই ভবানীনগরের নিকটস্থ গ্রাম। আমার পিসীর শ্বশুরালয় সেই কালিকাপুরে।

সেইখানে লবঙ্গ নামে, কোন ভদ্রলোকের কন্যার সঙ্গে পিসী আমার সম্বন্ধ উপস্থিত করিলেন।

সম্বন্ধের পূর্ব্বে আমি লবঙ্গকে সর্ব্বদাই দেখিতে পাইতাম। আমার পিসীর বাড়ীতে আমি মধ্যে মধ্যে যাইতাম। লবঙ্গকে পিসীর বাড়ীতেও দেখিতাম—তাহার পিত্রালয়েও দেখিতাম। মধ্যে মধ্যে লবঙ্গকে শিশুবোধ হইতে কয়ে করাত, খয়ে খরা শিখাইতাম। যখন তাহার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ হইল, তখন হইতে সে আমার কাছে আসিত না; কিন্তু সেই সময়ে আমিও তাহারে দেখিবার জন্য অধিকতর উৎসুক হইয়া উঠিলাম। তখন লবঙ্গের বিবাহের বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ হইয়াছিল—লবঙ্গকলিকা ফোট-ফোট হইয়াছিল, চক্ষের চাহনী চঞ্চল অথচ ভীত হইয়া আসিয়াছিল—উচ্চহাস্য মৃদু এবং ব্রীড়াযুক্ত হইয়া উঠিয়াছিল—দ্রুত গতি মন্থর হইয়া আসিতেছিল। আমি মনে করিতাম, এমন সৌন্দর্য্য কখন দেখি নাই—এ সৌন্দর্য্য যুবতীর অদৃষ্টে কখন ঘটে না! বস্তুতঃ, অতীত-শৈশব অথচ অপ্রাপ্ত-যৌবনার সৌন্দর্য্য এবং অস্ফুটবাক্ শিশুর সৌন্দর্য্য ইহাই মনোহর; যৌবনের সৌন্দর্য্য তাদৃশ নহে। যৌবনে বসন-ভূষণের ঘটা, হাসি চাহনির ঘটা—বেণীর দোলানি, বাহুর বলনি, গ্রীবার হেলানী, কথার ছলনি—যুবতীর রূপের বিকাশ এক প্রকার দোকানদারি। আর আমরা যে চক্ষে সে সৌন্দর্য্য দেখি, তাহাও বিকৃতি। যে সৌন্দর্য্যের উপভোগে ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত চিত্তভাবের সংস্পর্শমাত্র নাই, সেই সৌন্দর্য্যই সৌন্দর্য্য।

এই সময়ে আমাদের কুলকলঙ্ক কন্যাকর্ত্তার কর্ণে প্রবেশ করিল। সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল। আমার হৃদয়পতত্রী সবে এই লবঙ্গলতায় বসিতেছিল—এমত সময় ভবানীনগরের রামসদয় মিত্র আসিয়া লবঙ্গলতা ছিঁড়িয়া লইয়া গেল। তাহার সঙ্গে লবঙ্গলতার বিবাহ হইল, লবঙ্গলাভে নিরাশ হইয়া আমি বড় ক্ষুণ্ণ হইলাম।

ইহার কয় বৎসর পরে এমন একটি ঘটনা ঘটিল যে, তাহা আমি বলিতে পারিতেছি না। পশ্চাৎ বলিব কি না, তাহাও স্থির করিতে পারিতেছি না। সেই অবধি আমি গৃহত্যাগ করিলাম। সেই পর্য্যন্ত নানা দেশ ভ্রমণ করিয়াই বেড়াই, কোথাও স্থায়ী হইতে পারি না।

কোথাও স্থায়ী হই নাই, কিন্তু মনে করিলেই স্থায়ী হইতে পারিতাম, মনে করিলে কুলীন ব্রাহ্মণের অপেক্ষা অধিক বিবাহ করিতে পারিতাম। আমার

সব ছিল ধন, সম্পদ, বয়স, বিদ্যা, বাহুবল, কিছুরই অভাব ছিল না ; অদৃষ্ট দোষে এক দিনের দুর্ব্বুদ্ধি-দোষে সকল ত্যাগ করিয়া আমি এই সুখময় গৃহ—এই উদ্যানতুল্য পুষ্পময় সংসার ত্যাগ করিয়া, বাত্যাতাড়িত পতঙ্গের মত দেশে দেশে বেড়াইলাম। আমি মনে করিলে আমার সেই জন্মভূমিতে রম্যগৃহ রম্যসজ্জায় সাজাইয়া, রঙ্গের পবনে সুখের নিশান উড়াইয়া দিয়া হাসির বাণে দুঃখ-রাক্ষসকে বধ করিতে পারিতাম। কিন্তু—এখন তাই ভাবি, কেন করিলাম না। সুখ-দুঃখের বিধান পরের হাতে, কিন্তু মন ত আমার। তরঙ্গে নৌকা ডুবিল বলিয়া, কেন ডুবিয়া রহিলাম—সাঁতার দিয়া ত কূল পাওয়া যায়। আর দুখ—দুঃখ কি ? মনের অবস্থা, সে ত নিজের আয়ত্ত। সুখ-দুঃখ পরের হাত, না আমার নিজের হাত ? পর কেবল বহির্জ্জগতের কর্ত্তা—অন্তর্জ্জগতে আমি একা কর্ত্তা। আমার রাজ্য লইয়া আমি সুখী হইতে পারিব না কেন ? জড-জগৎ, জগৎ, অন্তর্জ্জগৎ কি জগৎ নয় ? আপনার মন লইয়া কি থাকা যায় না ? তোমার বাহ্য জগতে যে কয়টি সামগ্রী আছে, আমার অন্তরে কি তাই নাই ? আমার অন্তরে যাহা আছে, তাহা তোমার বাহ্যজগৎ দেখাইবে সাধ্য কি ? যে কুসুম এ মৃত্তিকায় ফুটে, যে বায়ু এ আকাশে বয়, যে চাঁদ এ গগনে ওঠে, যে সাগর এই অন্ধকারে আপনি মাতে, তোমার বাহ্য জগতে তেমন কোথায় ?

তবে কেন এই নিশীথকালে, সুষুপ্তা সুন্দরীর সৌন্দর্য্যপ্রভা—দূর হউক ! এক দিন নিশীথকালে—এই অসীম পৃথিবী সহসা আমার চক্ষে শুষ্কবদরীর মত ক্ষুদ্র হইয়া গেল—আমি লুকাইবার স্থান পাইলাম না। দেশে দেশে ফিরিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কালের শীতল প্রলেপে সেই হৃদয়ক্ষত ক্রমে পূরিয়া উঠিতে লাগিল।

কাশীধামে গোবিন্দকান্ত দত্ত নামে কোন সচ্চরিত্র অতি প্রাচীন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে আমার আলাপ হইল। ইনি বহুকাল হইতে কাশীবাস করিয়া আছেন।

একদা তাঁহার সঙ্গে কথোপকথনকালে পুলিশের অত্যাচারের কথা প্রসঙ্গক্রমে উত্থাপিত হইল। অনেকে পুলিশের অত্যাচারঘটিত অনেকগুলি

গল্প বলিলেন—দুই একটা বা সত্য, দুই একটা বক্তাদিগের কপোলকল্পিত। গোবিন্দকান্ত বাবু একটি গল্প বলিলেন, তাহার সার মর্ম্ম এই ঃ—

"হরেকৃষ্ণ দাস নামে আমাদের গ্রামে এক ঘর দরিদ্র কায়স্থ ছিল। তাহার একটি কন্যা ভিন্ন অন্য সন্তান ছিল না। তাহার গৃহিণীর মৃত্যু হইয়াছিল এবং সে নিজেও রুগ্ন। এজন্য সে কন্যাটি আপন শ্যালীপতিকে প্রতিপালন করিতে দিয়াছিল। তাহার কন্যাটির কতকগুলিন স্বর্ণালঙ্কার ছিল। লোভবশতঃ তাহা সে শ্যালীপতিকে দেয় নাই। কিন্তু যখন মৃত্যু উপস্থিত দেখিল, তখন সেই অলঙ্কারগুলি সে আমাকে ডাকিয়া আমার কাছে রাখিল—বলিল যে, 'আমার কন্যার জ্ঞান হইলে তাহাকে দিবেন, এখন দিলে রাজচন্দ্র ইহা আত্মসাৎ করিবে।' আমি স্বীকৃত হইলাম। পরে হরেকৃষ্ণের মৃত্যু হইলে সে লাওয়ারেশ মরিয়াছে বলিয়া নন্দি-ভৃঙ্গি-সঙ্গে দেবাদিদেব মহাদেব দারোগা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরেকৃষ্ণের ঘটি-বাটি, পাথর-টুকনি, লাওয়াবেশ মাল বলিয়া হস্তগত করিলেন। কেহ কেহ বলিল যে, হরেকৃষ্ণ লাওয়ারেশ নহে, কলিকাতায় তাহার কন্যা আছে, দারোগা মহাশয় তাহাকে কটু বলিয়া আজ্ঞা করিলেন, 'ওয়ারেশ থাকে, হুজুরে হাজির হইবে!' তখন আমার দুই একজন শত্রু সুযোগ মনে করিয়া বলিয়াছিল যে, গোবিন্দ দত্তের কাছে ইহার স্বর্ণালঙ্কার আছে। আমাকে তলব হইল। আমি তখন দেবাদিদেবের কাছে আসিয়া যুক্তকরে দাঁড়াইলাম, কিছু গালি খাইলাম। আসামীর শ্রেণীতে চালান হইবার গতিক দেখিলাম। বলিব কি ঘুষাঘুষির উদ্যোগ দেখিয়া অলঙ্কারগুলি সকল দারোগা মহাশয়ের পাদপদ্মে ঢালিয়া দিলাম, তাহার উপর পঞ্চাশ টাকা নগদ দিয়া নিষ্কৃতি পাইলাম।

বলা বাহুল্য যে, দারোগা মহাশয় অলঙ্কারগুলি আপন কন্যার ব্যবহার্থ নিজালয়ে প্রেরণ করিলেন। সাহেবের কাছে তিনি রিপোর্ট করিলেন যে, 'হরেকৃষ্ণ দাসের এক লোটা আর এক দেরকো ভিন্ন অন্য কোন সম্পত্তি নাই এবং সে লাওয়ারেশ ফৌত করিয়াছে, তাহার কেহ নাই।'

হরেকৃষ্ণ দাসের নাম শুনিয়াছিলাম। আমি গোবিন্দ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে "ঐ হরেকৃষ্ণ দাসের এক ভাইয়ের নাম মনোহর দাস না?"

গোবিন্দকান্ত বাবু বলিলেন, "হাঁ, আপনি কি প্রকারে জানিলেন?"

আমি বিশেষ কিছু বলিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, "হরেকৃষ্ণের শ্যালীপতির নাম কি?"

গোবিন্দ বাবু বলিলেন, "রাজচন্দ্র দাস।"

আমি। তাহার বাড়ী কোথায়?

গোবিন্দ বাবু বলিলেন, "কলিকাতায়, কিন্তু কোন্ স্থানে তাহা আমি ভুলিয়া গিয়াছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে কন্যাটির নাম কি জানেন?"

গোবিন্দ বাবু বলিলেন, "হরেকৃষ্ণ তাহার নাম রজনী রাখিয়াছিলেন।"

ইহার অল্পদিন পরেই আমি কাশী পরিত্যাগ করিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথমে আমাকে বুঝিতে হইতেছে, আমি কি খুঁজি। চিত্ত আমার দুঃখময়, এ সংসার আমার পক্ষে অন্ধকার। আজি আমার মৃত্যু হইলে, আমি কাল চাহি না। যদি দুঃখনিবারণ করিতে না পারিলাম, তবে পুরুষত্ব কি? কিন্তু ব্যাধির শান্তি করিতে গেলে আগে ব্যাধির নির্ণয় চাহি, দুঃখ-নিবারণের আগে আমার দুঃখ কি, তাহা নিরূপণের আবশ্যক।

দুঃখ কি? অভাব। সকল দুঃখই অভাব। রোগ দুঃখ, কারণ, রোগ স্বাস্থ্যের অভাব। অভাব মাত্রই দুঃখ নহে, তাহা জানি। রোগের অভাব দুঃখ নহে। অভাববিশেষই দুঃখ।

আমার কিসের অভাব? আমি চাই কি? মনুষ্যই বা কি চায়? ধন? আমার যথেষ্ট আছে।

যশ? পৃথিবীতে এমন কেহ নাই—যাহার যশ নাই। যে পাকা জুয়াচোর, তাহারও বুদ্ধি সম্বন্ধে যশ আছে। আমি একজন কশাইয়েরও যশ শুনিয়াছি—মাংস সম্বন্ধে সে কাহাকেও প্রবঞ্চনা করিত না। সে কখনও মেষ মাংস বলিয়া কাহাকেও কুক্কুরমাংস দেয় নাই। যশ সকলেরই আছে। আবার কাহারও যশ সম্পূর্ণ নহে। বেকনের ঘুষখোর অপবাদ—সক্রেতিস্ অপযশ হেতু বধদণ্ডার্হ হইয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির দ্রোণবধে মিথ্যাবাদী, অর্জ্জুন বভ্রুবাহন কর্ত্তৃক পরাভূত। কাইসরকে যে বিথীনিয়ার রাণী বলিত, সে কথা অদ্যাপি প্রচলিত;—সেক্সপীয়রকে বল্‌টের ভাঁড় বলিয়াছিলেন। যশ চাহি না।

যশ সাধারণ লোকের মুখে। সাধারণ লোক কোন বিষয়ের বিচারক নহে—কেন না, সাধারণ লোক মূর্খ এবং স্থূলবুদ্ধি। মূর্খ ও স্থূলবুদ্ধির কাছে যশস্বী হইয়া আমার কি সুখ হইবে? আমি যশ চাহি না।

মান ? সংসারে এমন লোক কে আছে যে, সে মানিলে সুখী হই ? যে দুই চারি জন আছে, তাহাদিগের কাছে আমার মান আছে। অন্যের কাছে মান অপমান মাত্র। রাজদরবারে মান—সে কেবল দাসত্বের প্রাধান্য-চিহ্ন বলিয়া আমি অগ্রাহ্য করি। আমি মান চাহি না। মান চাহি কেবল আপনার কাছে।

রূপ ? কতটুকু চাই ? কিছু চাই। লোকে দেখিয়া না নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে। আমাকে দেখিয়া কেহ নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে না। রূপ যাহা আছে, তাহাই আমার যথেষ্ট।

স্বাস্থ্য ? আমার স্বাস্থ্য অদ্যাপি অনন্ত।

বল ? লইয়া কি করিব ? প্রহার করিতে বল আবশ্যক। আমি কাহাকেও প্রহার করিতে চাহি না।

বুদ্ধি ? এ সংসারে কেহ কখন বুদ্ধির অভাব আছে মনে করে নাই—আমিও করি না। সকলেই আপনাকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলিয়া জানে, আমিও জানি।

বিদ্যা ? ইহার অভাব স্বীকার করি, কিন্তু কেহ কখন বিদ্যার অভাবে আপনাকে অসুখী মনে করে নাই। আমিও করি না।

ধর্ম্ম ? লোকে বলে ধর্ম্মের অভাব পরকালের দুঃখের কারণ, ইহকালের নহে। লোকের চরিত্রে দেখতে পাই, অভাবই দুঃখ। জানি আমি সে মিথ্যা, কিন্তু জানিয়াও ধর্ম্মকামনা করি না। আমার সে দুঃখ নহে।

প্রণয় ? স্নেহ ? ভালবাসা ? আমি জানি, ইহার অভাবই সুখ, ভালবাসাই দুঃখ। সাক্ষী লবঙ্গলতা।

তবে আমার দুঃখ কিসের ? আমার অভাব কিসের ? আমার কিসের কামনা যে তাহা লাভে সফল হইয়া দুঃখ নিবারণ করিব ? আমার কাম্য-বস্তু কি ?

বুঝিয়াছি। আমার কাম্যবস্তুর অভাবই আমার দুঃখ। আমি বুঝিয়াছি যে, সকলই অসার, তাই আমার কেবল দুঃখ সার।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কিছু কাম্য কি খুঁজিয়া পাই নাই ? এই অনন্ত সংসার অসংখ্য রত্নরাজিময়, ইহাতে আমার প্রার্থনীয় কি কিছুই নাই ? যে সংসারে এক একটি দুরবেক্ষণীয় ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গ অনন্ত কৌশলের স্থান, অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার, যে জগতে পথিস্থ বালুকার এক এক কণা অনন্ত-রত্নপ্রভব নগাধিরাজের ভগ্নাংশ, সে জগতে কি

আমার কাম্যবস্তু কিছুই নাই? দেখ, আমি কোন্ ছার। টিণ্ডল, হক্‌সলী, ডার্বিন এবং লায়ল এক আসনে বসিয়া যাবজ্জীবন ঐ ক্ষুদ্র নীহারবিন্দুর, ঐ বালুকাকণার বা ঐ শিয়ালকাঁটা ফুলটির গুণ বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারেন না—তবু আমার কাম্যবস্তু নাই? আমি কি?

দেখ, এই পৃথিবীতে কত কোটি মনুষ্য আছে, তাহা কেহ গণিয়া সংখ্যা করে নাই। বহু কোটি মনুষ্য সন্দেহ নাই। উহার একটি মনুষ্য অসংখ্য গুণের আধার। সকলেই ভক্তি, প্রীতি, দয়া, ধর্ম্মাদির আধার—সকলেই পূজ্য, সকলেই অনুসরণীয়। আমার কাম্য কি কেহ নাই? আমি কি?

আমার এক বাঞ্ছনীয় পদার্থ ছিল—আজিও আছে। কিন্তু সে বাসনা পূর্ণ হইবার নহে। পূর্ণ হইবার নহে বলিয়া তাহা হৃদয় হইতে অনেক দিন হইল উন্মূলিত করিয়াছি। আর পুনরুজ্জীবিত করিতে চাহি না। অন্য কোন বাঞ্ছনীয় কি সংসারে নাই?

তাই খুঁজি। কি করিব?

কয় বৎসর হইতে আমি আপনা আপনি এই প্রশ্ন করিতেছিলাম, উত্তর দিতে পারিতেছিলাম না। যে দুই এক জন বন্ধুবান্ধব আছেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "তোমার আপনার কাজ না থাকে, পরের কাজ কর। লোকের যথাসাধ্য উপকার কর।"

সে ত প্রাচীন কথা। লোকের উপকার কিসে হয়! রামের মা'র ছেলের জ্বর হইয়াছে, নাড়ী টিপিয়া একটি কুইনাইন দাও। রঘো পাগলের গাত্রবস্ত্র নাই, কম্বল কিনিয়া দাও। সন্তার মা বিধবা, মাসিক দাও। সুন্দর নাপিতের ছেলে ইস্কুলে পড়িতে পায় না—তাহার বেতনের আনুকূল্য কর। এই কি পরের উপকার?

মানিলাম, এই পরের উপকার। কিন্তু এ সকলে কতক্ষণ যায়? কতটুকু সময় কাটে? কতটুকু পরিশ্রম হয়? মানসিক শক্তি-সকল কতখানি উত্তেজিত হয়? আমি এমত বলি না যে, এই সকল কার্য্য আমার যথাসাধ্য আমি করিয়া থাকি; কিন্তু যতটুকু করি, তাহাতে আমার বোধ হয় না যে, ইহাতে আমার অভাব পূরণ হইবে। আমার যোগ্য কাজ আমি খুঁজি; যাহাতে আমার মন মজিবে, তাই খুঁজি।

আর একপ্রকারে লোকের উপকারের ঢং উঠিয়াছে। তাহার এক কথায় নাম দিতে হইলে বলিতে হয়, "বকাবকি লেখালেখি।" সোসাইটি, ক্লাব,

এ্যাসোসিয়েসন, সভা, সমাজ, বক্তৃতা, রিজলিউশন, আবেদন, নিবেদন, সমবেদন—আমি তাহাতে নহি। আমি একদা কোন বন্ধুকে একটি মহা-সভায় ঐরূপ একখানি আবেদন পড়িতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "কি পড়িতেছ?" তিনি বলিলেন, "এমন কিছু না, কেবল কাণা ফকির ভিক মাঙ্গে।" এ সকল আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাই—কেবল "কাণা ফকির ভিক মাঙ্গে রে বাবা।"

এই রোগের আর একপ্রকার বিকার আছে। বিধবার বিবাহ দাও, কুলীন ব্রাহ্মণের বিবাহ বন্ধ কর, অল্প বয়সে বিবাহ বন্ধ কর, জাতি উঠাইয়া দাও, স্ত্রীলোকগণ এক্ষণে গোরুর মত গোয়ালে বাঁধা থাকে—দড়ি খুলিয়া তাহা-দিগকে ছাড়িয়া দেও, চরিয়া খাক। আমার গোরু নাই। পরের গোয়ালের সঙ্গেও আমার বিশেষ সম্বন্ধ নাই। জাতি উঠাইতে আমি বড় রাজি নহি, আমি ততদূর আজও সুশিক্ষিত হই নাই। আমি এখনও আমার ঝাড়ুদারের সঙ্গে একত্রে বসিয়া খাইতে অনিচ্ছুক। তাহার কন্যা বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক এবং যে গালি, শিরোমণি মহাশয় দিলে নিঃশব্দে সহিব, ঝাড়ুদারের কাছে তাহা সহিতে অনিচ্ছুক। সুতরাং আমার জাতি থাকুক। বিধবা বিবাহ করে করুক, ছেলেপুলেরা আইবুড় থাকে থাকুক, কুলীন ব্রাহ্মণ এক পত্নীর যন্ত্রণায় সুখী হয় হউক, আমার আপত্তি নাই; কিন্তু তাহার পোষকতায় লোকের কি হিত হইবে, তাহা আমার বুদ্ধির অতীত।

সুতরাং এ বঙ্গসমাজে আমার কোন কার্য্য নাই। এখানে আমি কেহ নহি—আমি কোথাও নহি। আমি—আমি, এই পর্য্যন্ত, আর কিছু নহি। আমার সেই দুঃখ। আর কিছু দুঃখ নাই—লবঙ্গলতার হস্তলিপি ভুলিয়া যাইতেছি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আমার এইরূপ মনের অবস্থা, আমি এমত সময়ে—কাশীধামে গোবিন্দ দত্তের কাছে রজনীর নাম শুনিলাম। মনে হইল, ঈশ্বর আমাকে বুঝি একটি গুরুতর কার্য্যের ভার দিলেন। এ সংসারে আমি একটি কার্য্য পাইলাম। রজনীর যথার্থ উপকার চেষ্টা করিলে করা যায়। আমার ত কোন কাজ নাই—এই কাজ কেন করি না? ইহা কি আমার যোগ্য কাজ নহে?

এখানে শচীন্দ্রের বংশাবলীর পরিচয় কিছু দিতে হইল। শচীন্দ্রনাথের

পিতার নাম রামসদয় মিত্র, পিতামহের নাম বাঞ্ছারাম মিত্র; প্রপিতামহের নাম কেবলরাম মিত্র। তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষের বাস কলিকাতায় নহে।—তাহার পিতা প্রথমে কলিকাতায় বাস করেন। তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষের বাস ভবানীনগর গ্রামে। তাহার প্রপিতামহ দরিদ্র নিঃস্ব ব্যক্তি ছিলেন। পিতামহ বুদ্ধিবলে ধনসঞ্চয় করিয়া তাঁহাদিগের ভোগ্য ভূসম্পত্তি সকল ক্রয় করিয়াছিলেন।

বাঞ্ছারামের এক পরম বন্ধু ছিলেন মনোহর দাস। বাঞ্ছারাম মনোহর দাসের সাহায্যেই এই বিভবের অধিপতি হইয়াছিলেন। মনোহর প্রাণপাত করিয়া তাঁহার কার্য্য করিতেন, নিজে কখনও ধনসঞ্চয় করিতেন না; বাঞ্ছারাম তাঁহার এই সকল গুণে অত্যন্ত বাধ্য ছিলেন। মনোহরকে সহোদরের ন্যায় ভালবাসিতেন এবং মনোহর বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় তাঁহাকে মান্য করিতেন। তাঁহার পিতার সঙ্গে পিতামহের তাদৃশ সম্প্রীতি ছিল না। বোধ হয়, উভয় পক্ষেরই কিছু কিছু দোষ ছিল।

একদা রামসদয়ের সঙ্গে মনোহর দাসের ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল। মনোহর দাস বাঞ্ছারামকে বলিলেন যে, রামসদয় তাঁহাকে কোন বিষয়ে সহনাতীত অপমান করিয়াছেন। অপমানের কথা বাঞ্ছারামকে বলিয়া, মনোহর তাঁহার কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে ভবানীনগর হইতে উঠিয়া গেলেন। বাঞ্ছারাম মনোহরকে অনেক অনুনয়-বিনয় করিলেন; মনোহর কিছুই শুনিলেন না। উঠিয়া কোন্ দেশে গিয়া বাস করিলেন, তাহাও কাহাকে জানাইলেন না।

বাঞ্ছারাম রামসদয়ের প্রতি যত স্নেহ করুন বা না করুন, মনোহরকে ততোধিক স্নেহ করিতেন। সুতরাং রামসদয়ের উপর তাঁহার ক্রোধ অপরিসীম হইল। বাঞ্ছারাম অত্যন্ত কটূক্তি করিয়া গালি দিলেন, রামসদয়ও সকল কথা নীরবে সহ্য করিলেন না।

পিতা-পুত্রের বিবাদের ফল এই দাঁড়াইল যে, বাঞ্ছারাম পুত্রকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। পুত্রও গৃহত্যাগ করিয়া শপথ করিলেন, আর কখনও পিতৃ-ভবনে মুখ দেখাইব না। বাঞ্ছারাম রাগ করিয়া এক উইল করিলেন। উইলে লিখিত হইল যে, বাঞ্ছারাম মিত্রের সম্পত্তিতে তস্য পুত্র রামসদয় মিত্র কখন অধিকারী হইবে না। বাঞ্ছারাম মিত্রের অবর্ত্তমানে মনোহর দাস, মনোহর

দাসের অভাবে মনোহরের উত্তরাধিকারিগণ অধিকারী হইবেন। তদভাবে রামসদয়ের পুত্র-পৌত্রাদি যথাক্রমে, কিন্তু রামসদয় নহে।

রামসদয় গৃহত্যাগ করিয়া প্রথমা স্ত্রীকে লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। ঐ স্ত্রীর কিছু পিতৃদত্ত অর্থ ছিল। তদবলম্বনে এবং এক জন সজ্জন বণিক্ সাহেবের আনুকূল্যে তিনি বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইলেন। লক্ষ্মী সুপ্রসন্না হইলেন; সংসার প্রতিপালনের জন্য তাঁহাকে কোন কষ্ট পাইতে হইল না।

যদি কষ্ট পাইতে হইত, তাহা হইলে বোধ হয়, বাঞ্ছারাম সদয় হইতেন। পুত্রের সুখের অবস্থা শুনিয়া বৃদ্ধের যে স্নেহাবশেষ ছিল, তাহাও নিবিয়া গেল। পুত্র অভিমান-প্রযুক্ত পিতা না ডাকিলে আর যাইব না, ইহা স্থির করিয়া আর পিতার কোন সংবাদ লইলেন না। অভক্তি এবং তাচ্ছিল্যবশতঃ পুত্র এরূপ করিতেছে বিবেচনা করিয়া বাঞ্ছারাম তাহাকেও আর ডাকিলেন না।

সুতরাং কাহারও রাগ পড়িল না। উইলও অপরিবর্ত্তিত রহিল। এমত-কালে হঠাৎ বাঞ্ছারামের স্বর্গপ্রাপ্তি হইল।

রামসদয় শোকাকুল হইলেন; তাঁহার পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎলাভ করিয়া যথাকর্ত্তব্য করেন নাই, এই দুঃখে অনেক দিন ধরিয়া রোদন করিলেন। তিনি আর ভবানীনগরে গেলেন না, কলিকাতাতেই পিতৃ-কৃত্য সম্পন্ন করিলেন। কেন না, এক্ষণে ঐ বাটী মনোহর দাসের হইল।

এ দিকে মনোহর দাসের কোন সংবাদ নাই। পশ্চাতে জানিতে পারা গেল যে, বাঞ্ছারামের জীবিত অবস্থাতেও মনোহরের কেহ কোন সংবাদ পায় নাই। মনোহর দাস ভবানীনগর হইতে যে গিয়াছিল, সেই গিয়াছিল, কোথায় গেল বাঞ্ছারাম তাহার অনেক সন্ধান করিলেন; কিছুতেই কোন সংবাদ পাইলেন না। তখন তিনি উইলের এক ক্রোড়পত্র সৃজন করিলেন। তাহাতে বিষ্ণুরাম সরকার নামক একজন কলকাতানিবাসী আত্মীয় কুটুম্বকে উইলের একজিকিউটর নিযুক্ত করিলেন। তাহাতে কথা রহিল যে, তিনি সযত্নে মনোহর দাসের অনুসন্ধান করিবেন। পশ্চাৎ ফলানুসারে সম্পত্তি যাহার প্রাপ্য, তাহাকে দিবেন।

বিষ্ণুরাম বাবু অতি বিচক্ষণ, নিরপেক্ষ এবং কর্ম্মঠ ব্যক্তি। তিনি বাঞ্ছা-রামের মৃত্যুর পরেই মনোহর দাসের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, অনেক পরিশ্রম ও অর্থ-ব্যয় করিয়া, যাহা বাঞ্ছারাম কর্ত্তৃক অনুসন্ধান হয় নাই, তাহার নিগূঢ় কথা পরিজ্ঞাত হইলেন। স্থূল বৃত্তান্ত অনুসন্ধানে এই জানা গেল যে,

মনোহর ভবানীনগর হইতে পলাইয়া কিছুকাল সপরিবারে ঢাকা অঞ্চলে গিয়া বাস করেন। পরে সেখানে জীবিকানির্ব্বাহের জন্য কষ্ট হওয়াতে কলিকাতায় নৌকাযোগে আসিতে ছিলেন। পথিমধ্যে বাত্যায় পতিত হইয়া সপরিবারে জলমগ্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার আর উত্তরাধিকারী ছিল, এমন সন্ধান পাইলেন না।

বিষ্ণুরাম বাবু এ সকল কথার অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া রামসদয়কে দেখাইলেন। তখন বাঞ্ছারামের ভূসম্পত্তি শচীন্দ্রদিগের দুই ভ্রাতার হইল এবং বিষ্ণুরাম বাবুও তাহা তাঁহাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

এক্ষণে এই রজনী যদি জীবিত থাকে, তবে যে সম্পত্তি রামসদয় মিত্র ভোগ করিতেছে, তাহা রজনীর। রজনী হয় ত নিতান্ত দারিদ্রাবস্থাপন্না। সন্ধান করিয়া দেখা যাউক। আমার আর কোন কাজ নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বাঙ্গালায় আসার পর একদা কোন গ্রাম্য কুটুম্বের বাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম। প্রাতঃকালে গ্রাম পর্যটনে গিয়াছিলাম। এক স্থানে অতি মনোহর নিভৃত জঙ্গল; দয়েল সপ্তস্বর মিলাইয়া আশ্চর্য্য ঐক্যতানবাদ্য বাজাইতেছে, চারিদিকে বৃক্ষরাজি ঘনবিন্যস্ত কোমলশ্যামপল্লবদলে আচ্ছন্ন; পাতায় পাতায় ঠেসাঠেসি, মিশামিশি, শ্যামরূপের রাশি রাশি, কোথাও কলিকা, কোথাও স্ফুটিত পুষ্প, কোথাও অপক্ক, কোথাও সুপক্ক ফল। সেই বনমধ্যে আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলাম; বনাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, একজন বিকটমূর্ত্তি পুরুষ এক যুবতীকে বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিতেছে।

দেখিবামাত্র বুঝিলাম, পুরুষ অতি নীচজাতীয়, পাষণ্ড—বোধ হয়, ডোম কি সিউলি—কোমরে দা'। গঠন অত্যন্ত বলবানের মত।

ধীরে ধীরে তাহার পশ্চাদ্ভাগে গেলাম। গিয়া তাহার কক্ষাল হইতে দা'খানি টানিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলাম। দুষ্ট তখন যুবতীকে ছাড়িয়া দিল—আমার সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইল। আমাকে গালি দিল। তাহার দৃষ্টি দেখিয়া আমার শঙ্কা হইল।

বুঝিলাম, এস্থলে বিলম্ব অকর্ত্তব্য। একেবারে তাহার গলদেশে হস্তার্পণ করিলাম। ছাড়াইয়া সেও আমাকে ধরিল। আমিও তাহাকে পুনর্ব্বার ধরিলাম। তাহার বল অধিক; কিন্তু আমি ভীত হই নাই বা অস্থির হই নাই।

অবকাশ পাইয়া আমি যুবতীকে বলিলাম যে, তুই এ সময় পলা—আমি ইহার উপযুক্ত দণ্ড দিতেছি।

যুবতী বলিল, "কোথায় পলাইব? আমি যে অন্ধ! এখানকার পথ চিনি না।"

অন্ধ! আমার বল বাড়িল। আমি রজন নামে একটি অন্ধকন্যাকে খুঁজিতেছিলাম।

দেখিলাম সেই বলবান পুরুষ আমাকে প্রহার করিতে পারিতেছে না বটে, কিন্তু আমাকে বলপূর্ব্বক টানিয়া লইয়া যাইতেছে। তাহার অভিপ্রায় বুঝিলাম, যে দিকে আমি দা ফেলিয়াছিলাম, সেই দিকে আমাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। আমি তখন দুষ্টকে ছাড়িয়া দিয়া আগে গিয়া দা কুড়াইয়া লইলাম। সে এক বৃক্ষের ডাল ভাঙ্গিয়া লইয়া তাহা ফিরাইয়া আমার হস্তে প্রহার করিল, আমার হস্ত হইতে দা পড়িয়া গেল; সে দা তুলিয়া আমাকে তিন চারিস্থানে আঘাত করিয়া পলাইয়া গেল।

আমি গুরুতর পীড়া প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। বহুকষ্টে আমি কুটুম্বের গৃহাভিমুখে চলিলাম। অন্ধ যুবতী আমার পদশব্দানুসরণ করিয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিল; কিছুদূর গিয়া আর আমি চলিতে পারিলাম না। পথিকলোকে আমাকে ধরিয়া আমার কুটুম্বের বাড়ীতে রাখিয়া আসিল।

সেই স্থানে আমি কিছুকাল শয্যাগত রহিলাম—অন্য আশ্রয়াভাবেও বটে, এবং আমার দশা কি হয় তাহা না জানিয়া কোথাও যাইতে পারে না, সে জন্যও বটে, অন্ধযুবতীও সেইখানে রহিল।

বহুদিনে বহুকষ্টে আমি আরোগ্যলাভ করিলাম।

মেয়েটি অন্ধ দেখিয়া অবধিই আমার সন্দেহ হইয়াছিল। যে দিন প্রথম সে আমার রুগ্নশয্যাপার্শ্বে আসিল, সেই দিনই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার নাম কি গা?"

"রজনী।"

আমি চমকিয়া উঠিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি রাজচন্দ্র দাসের কন্যা?"

রজনীও বিস্মিত হইল। বলিল, "আপনি বাবাকে কি চেনেন?"

আমি স্পষ্টতঃ কোন উত্তর দিলাম না।

আমি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিলে রজনীকে কলিকাতায় লইয়া গেলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কলিকাতায় গমনকালে আমি একা রজনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলাম না। কুটুম্বগৃহ হইতে তিনকড়ি নামে একজন প্রাচীনা পরিচারিকা সমভিব্যাহারে লইয়া গেলাম। এ সতর্কতা রজনীর মন প্রসন্ন করিবার জন্য। গমনকালে রজনীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "রজনী, তোমাদের বাড়ি কলিকাতায়—কিন্তু তুমি এখানে আসিলে কি প্রকারে?"

রজনী বলিল, "আমাকে কি সকল কথা বলিতে হইবে?"

আমি বলিলাম, "তোমার যদি ইচ্ছা না হয়, তবে বলিও না।"

বস্তুত এই অন্ধ স্ত্রীলোকের বুদ্ধি, বিবেচনায় এবং সরলতায় আমি বিশেষ প্রীত হইয়াছিলাম। তাহাকে কোনপ্রকার ক্লেশ দিবার ইচ্ছা ছিল না। রজনী বলিল, "যদি অনুমতি করিলেন, তবে কতক কথা গোপন রাখিব। গোপাল বাবু বলিয়া আমার একজন প্রতিবেশী আছেন, তাঁহার স্ত্রী চাঁপা, চাঁপার সঙ্গে আমার হঠাৎ পরিচয় হইয়াছিল। তাহার বাপের বাড়ী হুগলী। সে আমাকে বলিল, 'আমার বাপের বাড়ী যাইবে?' আমি রাজি হইলাম। সে আমাকে একদিন সঙ্গে করিয়া গোপাল বাবুর বাড়ীতে লইয়া আসিল। কিন্তু তার বাপের বাড়ী আমাকে পাঠাইবার সময় আপনি আমার সঙ্গে আসিল না। তাহার ভাই হীরালালকে আমার সঙ্গে দিল, হীরালালও নৌকা করিয়া আমায় হুগলী লইয়া চলিল।"

আমি এইখানে বুঝিতে পারিলাম যে, রজনী হীরালাল সম্বন্ধে কথা গোপন করিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি তাহার সঙ্গে গেলে?"

রজনী বলিল, "ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু যাইতে হইল, কেন যাইতে হইল, তাহা বলিতে পারিব না। পথিমধ্যে হীরালাল আমার উপর অত্যাচার করিতে লাগিল। আমি তাহার বাধ্য নয় দেখিয়া সে আমাকে নিরাশ করিবার জন্য গঙ্গার এক চরে নামাইয়া দিয়া নৌকা লইয়া চলিয়া গেল।"

রজনী চুপ করিল। আমি হীরালালকে ছদ্মবেশী রাক্ষস মনে করিয়া মনে মনে তাহার রূপ ধ্যান করিতে লাগিলাম। তার পর রজনী বলিতে লাগিল, "সে চলিয়া গেলে আমি ডুবিয়া মরিব বলিয়া জলে ডুবিলাম।"

আমি বলিলাম, "কেন? তুমি কি হীরালালকে এত ভালবাসিতে?"

রজনী ভ্রূকুটি করিল। বলিল, "তিলার্দ্ধ না। পৃথিবীতে কাহারও উপর এত বিরক্ত নহি।"

"তবে ডুবিয়া মরিতে গেলে কেন ?"

"আমার যে দুঃখ তাহা আপনাকে বলিতে পারিঁ না।"

"আচ্ছা, বলিয়া যাও।"

"আমি জলে ডুবিয়া ভাসিয়া উঠিলাম। একখানা গহনার নৌকা যাইতেছিল। সেই নৌকার লোক আমাকে ভাসিতে দেখিয়া উঠাইল। যে গ্রামে আপনার সহিত সাক্ষাৎ, সেইখানে একজন আরোহী নামিল। সে নামিবার সময় আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কোথায় নামিবে ?" আমি বলিলাম, 'আমাকে যেখানে নামাইয়া দিবে, আমি সেখানেই নামিব।' সে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার বাড়ী কোথায় ?' আমি বলিলাম, 'কলিকাতায়।' সে বলিল, 'আমি কালি আবার কলিকাতা যাইব। তুমি আজ আমার সঙ্গে আইস। আজি আমার বাড়ী থাকিবে। কালি তোমাকে কলিকাতায় রাখিয়া আসিব।' আমি আনন্দিত হইয়া তাহার সঙ্গে উঠিলাম। সে আমাকে সঙ্গে লইয়া চলিল। তার পর আপনি সব জানেন।

আমি বলিলাম, "যাহার হাত হইতে তোমাকে মুক্ত করিয়াছিলাম, সেকি সেই ?"

"সে সেই।"

আমি রজনীকে কলিকাতায় আনিয়া তাহার কথিত স্থানে অন্বেষণ করিয়া রাজচন্দ্র দাসের বাড়ী পাইলাম। সেইখানে রজনীকে লইয়া গেলাম।

রাজচন্দ্র কন্যা পাইয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিল, তাহার স্ত্রী অনেক রোদন করিল। উহারা আমার কাছে রজনীর বৃত্তান্ত সবিশেষ শুনিয়া বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল।

পরে রাজচন্দ্রকে আমি নিভৃতে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার কন্যা গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছিল কেন ? জান ?"

রাজচন্দ্র বলিল, "না। আমি তাহা সর্ব্বদাই ভাবি, কিন্তু কিছুই ঠিকানা করিতে পারি নাই।"

আমি বলিলাম, "রজনী জলে ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিল কি দুঃখে জান ?"

রাজচন্দ্র বিস্মিত হইল। বলিল, "রজনীর এমন কি দুঃখ, কিছুই ত ভাবিয়া পাই নাই। সে অন্ধ, একটি বড় দুঃখ বটে, কিন্তু তার জন্য এত দিনের পর ডুবিয়া মরিতে যাইবে কেন? তবে এত বড় মেয়ে, আজও তাহার বিবাহ হয় নাই। কিন্তু তাহার জন্যও নয়; তাহার ত সম্বন্ধ করিয়া বিবাহ দিতেছিলুম। বিবাহের আগের রাত্রেই পলাইয়াছিল।"

আমি নূতন কথা পাইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে পলাইয়াছিল?"

রাজ। হাঁ।

আমি। তোমাদিগকে না বলিয়া?

রাজ। কাহাকেও না বলিয়া।

আমি। কাহার সহিত সম্বন্ধ করিয়াছিলে?

রাজ। গোপাল বাবুর সঙ্গে।

আমি। কে গোপাল বাবু? চাঁপার স্বামী?

রাজ। আপনি সবই ত জানেন। সেই বটে।

আমি একটু আলো দেখিলাম, তবে চাঁপা সপত্নীযন্ত্রণাভয়ে রজনীকে প্রবঞ্চনা করিয়া ভ্রাতৃসঙ্গে হুগলী পাঠাইয়াছিল। বোধ হয়, তাহারই পরামর্শে হীরালাল উহার বিনাশে উদ্যোগ পাইয়াছিল।

সে কথা কিছু না বলিয়া রাজচন্দ্রকে বলিলাম, "আমি সবই জানি। আমি আরও যাহা জানি, তোমায় বলিতেছি। তুমি কিছু লুকাইও না।"

রাজ। কি—আজ্ঞা করুন।

আমি। রজনী তোমার কন্যা নহে।

রাজচন্দ্র বিস্মিত হইল। বলিল, "সে কি, আমার মেয়ে নয় ত কাহার?"

"হরেকৃষ্ণ দাসের।"

রাজচন্দ্র কিছুক্ষণ নীরব রহিল। শেষে বলিল. "আপনি কে, তাহা জানি না। কিন্তু আপনার পায়ে পড়ি, এ কথা রজনীকে বলিবেন না।"

আমি। এখন বলিব না, কিন্তু বলিতে হইবে। আমি যাহা জিজ্ঞাসা করি, তাহার সত্য উত্তর দাও। যখন হরেকৃষ্ণ মরিয়া যায়, তখন রজনীর কিছু অলঙ্কার ছিল?

রাজচন্দ্র ভীত হইল। বলিল, "আমি ত তাহার অলঙ্কারের কথা কিছু জানি না। অলঙ্কার কিছুই পাই নাই।"

আমি। হরেকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তুমি তাহার ত্যক্ত সম্পত্তির সন্ধানে সে দেশে আর গিয়াছিলে?

রাজ। হাঁ গিয়াছিলাম। গিয়া শুনিলাম, হরেকৃষ্ণের যাহা কিছু ছিল, তাহা পুলিসে লইয়া গিয়াছে।

আমি। তাহাতে তুমি কি করিলে?

রাজ। আর কি করিব? আমি পুলিশকে বড় ভয় করি। রজনীর

বালাচুরি মোকদ্দমায় বড় ভুগিয়াছিলাম। আমি পুলিসের নাম শুনিয়া আর কিছু বলিলাম না।

আমি। রজনীর বালাচুরি মোকদ্দমা কিরূপ ?

রাজ। রজনীর অন্নপ্রাশনের সময় তাহার বালা চুরি গিয়াছিল। চোর ধরা পড়িয়াছিল। বর্দ্ধমানে তাহার মোকদ্দমা হইয়াছিল। এই কলিকাতা হইতে বর্দ্ধমানে আমাকে সাক্ষ্য দিতে যাইতে হইয়াছিল। বড় ভুগিয়াছিলাম।

আমি পথ দেখিতে পাইলাম।

তৃতীয় খণ্ড

শচীন্দ্র বক্তা

প্রথম পরিচ্ছেদ

এ ভার আমার প্রতি হইয়াছে—রজনীর জীবন-চরিত্রের এ অংশ আমাকে লিখিতে হইবে। লিখিব।

আমি রজনীর বিবাহের সকল উদ্যোগ করিয়াছিলাম—বিবাহের দিন প্রাতে শুনিলাম যে, রজনী পলাইয়াছে, তাহাকে আর পাওয়া যায় না। তাহার অনেক অনুসন্ধান করিলাম, পাইলাম না। কেহ বলিল, সে ভ্রষ্টা। আমি বিশ্বাস করিলাম না। আমি তাহাকে অনেকবার দেখিয়াছিলাম, শপথ করিতে পারি, সে কখন ভ্রষ্টা হইতে পারে না। তবে ইহা হইতে পারে যে, সে কুমারী, কৌমার্য্যাবস্থাতেই কাহারও প্রণয়াসক্ত হইয়া বিবাহাশঙ্কায় গৃহত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু ইহাতেও দুইটি আপত্তি;—প্রথম, যে অন্ধ, সে কি প্রকারে সাহস করিয়া আশ্রয় ত্যাগ করিয়া যাইবে? দ্বিতীয়তঃ, যে অন্ধ, সে কি প্রণয়াসক্ত হইতে পারে? মনে করিলাম, কদাচ না। কেহ হাসিও না, আমার মত গণ্ডমূর্খ অনেক আছে। আমরা খান দুই তিন বহি পড়িয়া মনে করি জগতে চেতনাচেতনের গূঢ়াদপি গূঢ়তত্ত্ব সকলই নখদর্পণ করিয়া ফেলিয়াছি; যাহা আমাদের বুদ্ধিতে ধরে না, তাহা বিশ্বাস করি না। ঈশ্বর মানি না, কেন না, আমাদের ক্ষুদ্র বিচারশক্তিতে সে বৃহতত্ত্বের মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারি না। অন্ধের রূপোন্মাদ কি প্রকারে বুঝিব? সন্ধান করিতে করিতে জানিলাম যে, যে রাত্রি হইতে রজনী অদৃশ্য হইয়াছে, সেই রাত্রি হইতে হীরালালও অদৃশ্য হইয়াছে। সকলে বলিতে লাগিল, হীরালালের সঙ্গে সে কুলত্যাগ করিয়া গিয়াছে। অগত্যা আমি সিদ্ধান্ত করিলাম যে, হীরালাল রজনীকে ফাঁকি দিয়া লইয়া গিয়াছে। রজনী পরমা সুন্দরী, কাণা হউক, এমন লোক নাই যে, তাহার রূপে মুগ্ধ হইবে না। হীরালাল তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বঞ্চনা করিয়া লইয়া গিয়াছে, অন্ধকে বঞ্চনা করা বড় সুসাধ্য।

কিছু দিন পরে হীরালাল দেখা দিল। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "তুমি রজনীর সংবাদ জান?"

সে বলিল, "না।"

কি করিব! নালিশ-ফরিয়াদ হইতে পারে না। আমার জ্যেষ্ঠকে বলিলাম। জ্যেষ্ঠ বলিলেন, "হারামজাদাকে মার।" কিন্তু মারিয়া কি হইবে? আমি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিতে আরম্ভ করিলাম। যে রজনীর সন্ধান দিবে, তাহাকে অর্থ পুরস্কার দিব ঘোষণা করিলাম। কিছু ফল ফলিল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রজনী জন্মান্ধ, কিন্তু তাহার চক্ষু দেখিলে অন্ধ বলিয়া বোধ হয় না। চক্ষে দেখিতে কোন দোষ নাই। চক্ষু বৃহৎ, সুনীল, ভ্রমর কৃষ্ণতারাবিশিষ্ট। অতি সুন্দর চক্ষু—কিন্তু কটাক্ষ নাই। চাক্ষুষ স্নায়ুর দোষে অন্ধ। স্নায়ুর নিশ্চেষ্টতা-বশতঃ রেটিনাস্থিত প্রতিবিম্ব মস্তিষ্কে গৃহীত হয় না। রজনী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, বর্ণ উদ্ভেদপ্রমুখ নিতান্ত নবীন কদলীপত্রের ন্যায় গৌর; গঠন বর্ষাজলপূর্ণ তরঙ্গিণীর ন্যায় সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত, মুখকান্তি গম্ভীর; গতি অঙ্গভঙ্গী সকল মৃদু, স্থির এবং অন্ধতাবশতঃ সর্ব্বদা সঙ্কোচজ্ঞাপক; হাস্য দুঃখময়। সচরাচর এই স্থিরপ্রকৃতি সুন্দর শরীরে সেই কটাক্ষহীন দৃষ্টি দেখিয়া, কোন ভাস্কর্য্যপটু শিল্পকরের যত্ননির্ম্মিত প্রস্তরময়ী স্ত্রী-মূর্ত্তি বলিয়া বোধ হইত।

রজনীকে প্রথম দেখিয়াই আমার বিশ্বাস হইয়াছিল যে, এই সৌন্দর্য্য অনিন্দনীয় হইলেও মুগ্ধকর নহে। রজনী রূপবতী, কিন্তু তাহার রূপ দেখিয়া কেহ কখনও পাগল হইবে না। তাহার চক্ষের সে মোহিনী গতি নাই। সৌন্দর্য্য দেখিয়া লোকে প্রশংসা করিবে, বোধ হয়, সে মূর্ত্তি সহজে ভুলিবেও না। কেন না, সে স্থির গম্ভীর কান্তির একটি অদ্ভুত আকর্ষণী-শক্তি আছে। কিন্তু সেই আকর্ষণ অন্যবিধ; ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। যাহাকে "পঞ্চবাণ" বলে রজনীর রূপের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। নাই কি?

সে যাহাই হউক—আমি মধ্যে মধ্যে চিন্তা করিতাম—রজনীর দশা কি হইবে? সে ইতর লোকের কন্যা, কিন্তু তাহাকে দেখিয়াই বোধ হয় যে, সে ইতরপ্রকৃতিবিশিষ্ট নহে। ইতর লোক ভিন্ন তাহার অন্যত্র বিবাহের সম্ভাবনা নাই। ইতর লোকের সঙ্গেও এতকালে বিবাহ ঘটে নাই। দরিদ্রের

ভার্য্যা গৃহকর্ম্মের জন্য। যে ভার্য্যার অন্ধতানিবন্ধন গৃহকর্ম্মের সাহায্য হইবে না তাহাকে কোন্ দরিদ্র বিবাহ করিবে? কিন্তু ইতর লোক ভিন্ন এই ইতরবৃত্তি-পরায়ণ কায়স্থের কন্যাকে কে বিবাহ করিবে? তাহাতে আবার এ অন্ধ। এরূপ স্বামীর সহবাসে রজনীর দুঃখ ভিন্ন সুখের সম্ভাবনা নাই। দুশ্ছেদ্য কণ্টককাননমধ্যে যত্নপালনীয় উদ্যান-পুষ্পের জন্মের ন্যায় এই রজনীর পুষ্পবিক্রেতার গৃহে জন্ম ঘটিয়াছে। কণ্টকাবৃত হইয়াই ইহাকে মরিতে হইবে। তবে আমি গোপালের সঙ্গে ইহার বিবাহ দিবার জন্য এত ব্যস্ত কেন? ঠিক জানি না। তবে ছোটমার দৌরাত্ম্য বড়; তাঁহার উত্তেজনাতে ইহার বিবাহ দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আর বলিতে কি, যাহাকে স্বয়ং বিবাহ করিতে না পারি তাহার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করে।

এই কথা শুনিয়া অনেক সুন্দরী মধুর হাসি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তোমার মনে মনে রজনীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা আছে কি? না, সে ইচ্ছা নাই। রজনী সুন্দরী হইলেও অন্ধ, রজনী পুষ্পবিক্রেতার কন্যা এবং রজনী অশিক্ষিতা। রজনীকে আমি বিবাহ করিতে পারি না, ইচ্ছাও নাই। আমার বিবাহে অনিচ্ছাও নাই। তবে মনোমত কন্যা পাই না। আমি যাহাকে বিবাহ করিব, সে রজনীর মত সুন্দরী হইবে, অথচ বিদ্যুৎ-কটাক্ষবর্ষিণী হইবে; বংশমর্য্যাদায় শাহ আলমের বা মহ্লাররাও হুক্কারের প্র-পরাপ-সং পৌত্রী হইবে, বিদ্যায় লীলাবতী বা শাপভ্রষ্টা সরস্বতী হইবে এবং পতিভক্তিতে সাবিত্রী হইবে; চরিত্রে লক্ষ্মী, রন্ধনে দ্রৌপদী, আদরে সত্যভামা এবং গৃহকর্ম্মে গদার মা। আমি পান খাইবার সময় পানের লবঙ্গ খুলিয়া দিবে, তামাকু খাইবার সময় হুঁকায় কলিকা আছে কি না, বলিয়া দিবে, আহারের সময় মাছের কাঁটা বাছিয়া দিবে এবং স্নানের পর গা মুছিয়াছি কি না, তদারক করিবে। আমি চা খাইবার সময়ে দোয়াতের ভিতরে চামচে পুরিয়া চার অনুসন্ধান না করি এবং কালির অনুসন্ধানে চার পাত্রমধ্যে কলম না দিই, তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকিবে; পিক্‌দানীতে টাকা রাখিয়া বাক্সের ভিতর ছেপ না ফেলি তাহার খবরদারী করিবে। বন্ধুকে পত্র লিখিয়া আপনার নামে শিরোনামা দিলে, সংশোধন করাইয়া লইবে, পয়সা দিতে টাকা দিতেছি কি না, খবর লইবে; নোটের পিঠে দোকানের চিঠি কাটিতেছি কি না দেখিবে, এবং তামাসা করিবার সময়ে বিয়ানের নামের পরিবর্ত্তে ভক্তিমতী প্রতিবাসিনীর নাম করিলে ভুল সংশোধন করিয়া লইবে। ঔষধ

খাইতে ফুলেল তেল না খাই, চাকরাণীর নাম ডাকিতে হৌসের সাহেবের মেমের নাম না ধরি, এ সকল বিষয়ে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবে। এমন কন্যা পাই, তবে বিবাহ করি। আপনারা যে ইনি ওঁকে টিপিয়া হাসিতেছেন আপনাদের মধ্যে যদি কেহ অবিবাহিতা এবং এই সকল গুণে গুণবতী থাকেন, তবে বলুন, আমি পুরোহিত ডাকি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শেষে রাজচন্দ্র দাসের কাছে শুনিতে পাইলাম যে, রজনীকে পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু রাজচন্দ্র দাস এ বিষয়ে আমাদিগের সঙ্গে বড় চমৎকার ব্যবহার করিতে লাগিল। রজনীকে কোথায় পাওয়া গেল, কি প্রকারে পাওয়া গেল, তাহা কিছুই বলিল না। আমরা অনেক জিজ্ঞাসা করিলাম, কিছুতেই কোন কথা বাহির করিতে পারিলাম না। সে কেনই বা গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, তাহাও জিজ্ঞাসাবাদ করিলাম,—তাহাও বলিল না। তাহার স্ত্রীও ঐরূপ—ছোট মা সূচির ন্যায় লোকের মনের ভিতর প্রবেশ করেন, কিন্তু তাহার কাছ হইতে কোন কথাই বাহির করিতে পারিলেন না। রজনী স্বয়ং আর আমাদের বাড়ীতে আসিত না। কেন আসিত না, তাহাও কিছু জানিতে পারিলাম না। শেষে রাজচন্দ্র ও তাহার স্ত্রীও আমাদিগের বাড়ী আসা পরিত্যাগ করিল। ছোট মা কিছু দুঃখিত হইয়া তাহাদিগের অনুসন্ধানে লোক পাঠাইলেন। লোক ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে, উহারা সপরিবারে অন্যত্র উঠিয়া গিয়াছে, সাবেক বাড়ীতে আর নাই। কোথায় গিয়াছে, তাহার কোন ঠিকানা করিতে পারিলাম না। ইহার এক মাস পরে একজন ভদ্রলোক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তিনি আসিয়াই আপনি আত্ম-পরিচয় দিলেন। "আমার নিবাস কলিকাতায় নহে। আমার নাম অমরনাথ ঘোষ, আমার নিবাস শান্তিপুর।"

তখন আমি তাঁহার সঙ্গে কথোপকথনে নিযুক্ত হইলাম। কি জন্য তিনি আসিয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। তিনিও প্রথমে কিছু বলিলেন না। সুতরাং সামাজিক ও রাজকীয় বিষয়-ঘটিত নানা কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। দেখিলাম, তিনি কথাবার্ত্তায় অত্যন্ত বিচক্ষণ। তাঁহার বুদ্ধি মার্জ্জিত, শিক্ষা সম্পূর্ণ এবং চিন্তা বহুদূরগামিনী।

কথাবার্ত্তায় একটু অবসর পাইয়া তিনি আমার টেবিলের উপরে স্থিত "সিক্ষপিয়র গেলেরির" পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। ততক্ষণ আমি অমরনাথকে দেখিয়া লইতে লাগিলাম। অমরনাথ দেখিতে সুপুরুষ, গৌরবর্ণ, কিঞ্চিৎ খর্ব্ব, স্থূলও নহে, শীর্ণও নহে; বড় বড় চক্ষু, কেশগুলি সূক্ষ্ম, কুঞ্চিত, যত্ন-রঞ্জিত। বেশভূষার পারিপাট্যের বাড়াবাড়ি নাই, কিন্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বটে। তাঁহার কথা কহিবার ভঙ্গী অতি মনোহর; কণ্ঠ অতি সুমধুর। দেখিয়া বুঝিলাম, লোক অতি সুচতুর।

সেক্ষপিয়র গেলেরির পাতা উল্টান শেষ হইলে অমরনাথ নিজ প্রয়োজনের কথা কিছু না বলিয়া ঐ পুস্তকস্থিত চিত্র সকলের সমালোচনা আরম্ভ করিলেন। আমাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, যাহা বাক্য এবং কার্য্য দ্বারা চিত্রিত হইয়াছে, তাহা চিত্রফলকে চিত্রিত করিতে চেষ্টা পাওয়া ধৃষ্টতার কাজ। সে চিত্র কখনই সম্পূর্ণ হইতে পারে না এবং এ সকল চিত্র সম্পূর্ণ নহে। ডেস্‌ডেমনার চিত্র দেখিয়া কহিলেন, "আপনি এই চিত্রে ধৈর্য্য, মাধুর্য্য, নম্রতা পাইতেছেন, কিন্তু ধৈর্য্যের সহিত সে সাহস কৈ? নম্রতার সঙ্গে সে সতীত্বের অহঙ্কার কৈ?" জুলিয়েটের মূর্ত্তি দেখাইয়া কহিলেন, "এ নব যুবতীর মূর্ত্তি বটে, কিন্তু ইহাতে জুলিয়েটের নব-যৌবনের অদমনীয় চাঞ্চল্য কৈ?"

অমরনাথ এইরূপে কত বলিতে লাগিলেন। সেক্ষপিয়রের নায়িকাগণ হইতে শকুন্তলা, সীতা, কাদম্বরী, বাসবদত্তা, রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি আসিয়া পড়িল। অমরনাথ একে একে তাঁহাদিগের চরিত্রের বিশ্লেষণ করিলেন। প্রাচীন সাহিত্যের কথায় ক্রমে প্রাচীন ইতিহাসের কথা আসিয়া পড়িল, তৎপ্রসঙ্গে তাতিতস্, প্লুটার্ক, থুকিদিদিস প্রভৃতির অপূর্ব্ব সমালোচনার অবতারণা হইল। পাচীন ইতিবৃত্ত-লেখকদিগের মত লইয়া অমরনাথ কোম্‌তের ত্রৈকালিক উন্নতি-সম্বন্ধীয় মতের সমর্থন করিলেন। কোম্‌ৎ হইতে তাঁহার সমালোচক মিল ও হক্‌স্‌লীর কথা আসিল। হক্‌স্‌লী হইতে ওয়েস্ ও ডারুইন, ডারুইন হইতে বুকনেয়র, সোপেনহয়র প্রভৃতির সমালোচনা আসিল। অমরনাথ অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্যস্রোত আমার কর্ণরন্ধ্রে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। আমি মুগ্ধ হইয়া আসল কথা ভুলিয়া গেলাম।

বেলা গেল দেখিয়া অমরনাথ বলিলেন, "মহাশয়কে আর বিরক্ত করিব না। যে জন্য আসিয়াছিলাম, তাহা এখনও বলা হয় নাই। রাজচন্দ্র দাস যে আপনাদিগকে ফুল বেচিত, তাহার একটি কন্যা আছে?"

আমি বলিলাম, "আছে বোধ হয়।"

অমরনাথ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "বোধ হয় নয়, সে আছে। আমি তাহাকে বিবাহ করিব স্থির করিয়াছি।"

আমি অবাক্ হইলাম। অমরনাথ বলিতে লাগিলেন, "আমি রাজচন্দ্রের নিকট এই কথা বলিতেই গিয়াছিলাম। তাহাকে বলা হইয়াছে। এক্ষণে আপনাদিগের সঙ্গে একটা কথা আছে। যে কথা বলিব, তাহা মহাশয়ের পিতার কাছে বলাই আমার উচিত। কেন না, তিনি কর্ত্তা, কিন্তু আমি যাহা বলিব, তাহাতে আপনাদিগের রাগ করিবার কথা। আপনি সর্ব্বাপেক্ষা স্থিরস্বভাব এবং ধর্ম্মজ্ঞ, এ জন্য আপনাকে বলিতেছি।"

আমি বলিলাম, "কি কথা মহাশয়?"

অমর। রজনীর কিছু বিষয় আছে।

আমি। সে কি? সে যে রাজচন্দ্রের কন্যা।

অমর। রাজচন্দ্রের পালিত কন্যা মাত্র।

আমি। তবে সে কাহার কন্যা? কোথায় বিষয় পাইল? এ কথা আমরা এতদিন কিছু শুনিলাম না কেন?

অমর। আপনারা যে সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন, ইহাই রজনীর। রজনী মনোহর দাসের ভ্রাতুষ্কন্যা।

একবার চমকিয়া উঠিলাম। তারপর বুঝিলাম যে, কোন জালসাজ জুয়াচোরের হাতে পড়িয়াছে। প্রকাশ্যে উচ্চহাস্য করিয়া বলিলাম, "মহাশয়কে নিষ্কর্ম্মা লোক বলিয়া বোধ হইতেছে। আমার অনেক কর্ম্ম আছে। এক্ষণে আপনার সঙ্গে রহস্যের আমার অবসর নাই। আপনি গৃহে গমন করুন।"

অমরনাথ বলিলেন, "তবে উকীলের মুখে সংবাদ শুনিবেন।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এদিকে বিষ্ণুরাম বাবু সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন যে, মনোহর দাসের উত্তরাধিকারী উপস্থিত হইয়াছে,—বিষয় ছাড়িয়া দিতে হইবে। অমরনাথ তবে জুয়াচোর জালসাজ নহে।

কে উত্তরাধিকারী, তাহা বিষ্ণুরাম বাবু প্রথমে কিছু বলেন নাই। কিন্তু অমরনাথের কথা স্মরণ হইল। বুঝি, রজনীই উত্তরাধিকারিণী। যে ব্যক্তি

দাবিদার, সে যে মনোহর দাসের যথার্থ উত্তরাধিকারী, তদ্বিষয়ে নিশ্চয়তা আছে কিনা, ইহা জানিবার জন্য বিষ্ণুরাম বাবুর কাছে গেলাম। আমি বলিলাম, "মহাশয় পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, মনোহর দাস সপরিবারে জলে ডুবিয়া মরিয়াছে। তাহার প্রমাণও আছে, তবে তাহার আবার ওয়ারিস আসিল কোথা হইতে?"

বিষ্ণুরাম বাবু বলিলেন, "হরেকৃষ্ণ দাস নামে তাহার এক ভাই ছিল, জানেন বোধ হয়?"

আমি। তা ত জানি—কিন্তু সেও ত মরিয়াছে।

বিষ্ণু। বটে, কিন্তু মনোহরের পরে মরিয়াছে; সুতরাং সে বিষয়ের অধিকারী হইয়া মরিয়াছে।

আমি। তা হৌক, কিন্তু হরেকৃষ্ণেরও ত এক্ষণে কেহ নাই।

বিষ্ণু। পূর্ব্বে তাহাই মনে করিয়া আপনাদিগকে বিষয় ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে জানিতেছি যে, তাহার এক কন্যা আছে।

আমি। তবে এত দিন সে কন্যার কোন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় নাই কেন?

বিষ্ণু। হরেকৃষ্ণের স্ত্রী তাহার পূর্ব্বে মরে। স্ত্রীর মৃত্যুর পরে শিশুকন্যাকে পালন করিতে অক্ষম হইয়া হরেকৃষ্ণ কন্যাটিকে তাহার শালীকে দান করে। তাহার শ্যালী ঐ কন্যাটিকে আত্মকন্যাবৎ প্রতিপালন করে এবং আপনার বলিয়া পরিচয় দেয়। হরেকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তাহার সম্পত্তি লাওয়ারেশ বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কর্ত্তৃক গৃহীত হওয়ার প্রমাণ পাইয়া আমি হরেকৃষ্ণকে লাওয়ারেশ মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে হরেকৃষ্ণের একজন প্রতিবাসী আমার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার কন্যার কথা প্রকাশ করিয়াছে। আমি তাহার প্রদত্ত সন্ধানের অনুসরণ করিয়া জানিয়াছি যে, তাহার কন্যা আছে বটে।

আমি বলিলাম, "যে হয় একটা মেয়ে ধরিয়া হরেকৃষ্ণ দাসের কন্যা বলিয়া ধূর্ত্ত লোকে উপস্থিত করিতে পারে। কিন্তু সে যে যথার্থ হরেকৃষ্ণ দাসের কন্যা, তাহার কিছু প্রমাণ আছে কি?

"আছে" বলিয়া বিষ্ণুরামবাবু আমাকে একটা কাগজ দেখিতে দিলেন; বলিলেন, "এ বিষয়ে যে যে প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা উহাতে ইয়াদদাস্ত করিয়া রাখিয়াছি।"

আমি ঐ কাগজ লইয়া পড়িতে লাগিলাম। তাহাতে পাইলাম যে, হরেকৃষ্ণ দাসের শ্যালীপতি রাজচন্দ্র দাস এবং হরেকৃষ্ণের কন্যার নাম রজনী।

যাহা প্রমাণ দেখিলাম, তাহা ভয়ানক বটে। আমরা এতদিন অন্ধ রজনীর ধনে ধনী হইয়া তাহাকে দরিদ্র বলিয়া ঘৃণা করিতেছিলাম।

বিষ্ণুরাম এক জোবানবন্দীর জাবেদা নকল আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "এক্ষণে দেখুন, এই জোবানবন্দী কাহার ?"

আমি পড়িয়া দেখিলাম যে, জোবানবন্দীর বক্তা হরেকৃষ্ণ দাস; ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে তিনি এক বালা চুরির মোকদ্দমায় এই জবানবন্দী দিতেছেন। জোবানবন্দীতে পিতার নাম ও বাসস্থান লেখা থাকে তাহাও পডিয়া দেখিলাম, তাহা মনোহর দাসের পিতার নাম ও বাসস্থানের সঙ্গে মিলিল। বিষ্ণুরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "মনোহর দাসের ভাই হরেকৃষ্ণের এই জোবানবন্দী বলিয়া আপনার বোধ হইতেছে কিনা ?"

আমি। বোধ হইতেছে।

বিষ্ণু। যদি সংশয় থাকে, তবে এখনি তাহা ভঞ্জন হইবে। পডিয়া যাউন।

পড়িতে লাগিলাম যে, সে বলিতেছে, "আমার ছয় মাসের একটি কন্যা আছে। এক সপ্তাহ হইল, তাহার অন্নপ্রাশন দিয়াছি। অন্নপ্রাশনের দিন বৈকালে তাহার বালা চুরি গিয়াছে।"

এই পর্য্যন্ত পডিয়া দেখিলে, বিষ্ণুরাম বলিলেন, "দেখুন কত দিনের জোবানবন্দী ?"

জোবানবন্দীর তারিখ দেখিলাম, জোবানবন্দী উনিশ বৎসরের।

বিষ্ণুরাম বলিলেন, "ঐ কন্যার বয়স এক্ষণে হিসাবে কত হয় ?"

আমি। উনিশ বৎসর কয় মাস—প্রায় কুডি।

বিষ্ণু। রজনীর বয়স কত অনুমান করেন ?

আমি। প্রায় কুড়ি।

বিষ্ণু। পডিয়া যাউন, হরেকৃষ্ণ কিছু পরে বালিকার নামোল্লেখ করিয়াছেন।

আমি পড়িতে লাগিলাম। দেখিলাম, যে, একস্থানে হরেকৃষ্ণ পুনঃপ্রাপ্ত বালা দেখিয়া বলিতেছেন, "এই বালা আমার কন্যা রজনীর বালা বটে।"

আর বড় সংশয়ের কথা রহিল না—তথাপি পড়িতে লাগিলাম। প্রতিবাদীর মোক্তার হরেকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তুমি দরিদ্র লোক। তোমার

কন্যাকে সোণার বালা দিলে কি প্রকারে?" হরেকৃষ্ণ দাস উত্তর দিতেছে, "আমি গরীব, কিন্তু আমার ভাই মনোহর দাস দশ টাকা উপার্জ্জন করেন। তিনি আমার মেয়েকে সোণার গহনাগুলি দিয়াছেন।"

তবে যে এই হরেকৃষ্ণ দাস আমাদিগের মনোহর দাসের ভাই, তদ্বিষয়ে আর সংশয়ের স্থান রহিল না।

পরে মোক্তার আবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তোমার ভাই তোমার পরিবার বা তোমার আর কাহাকে কখন অলঙ্কার দিয়াছে?"

উত্তর। না।

পুনশ্চ প্রশ্ন। সংসার-খরচ দেয়?

উত্তর। না।

প্রশ্ন। তবে তোমার কন্যাকে অন্নপ্রাশনে সোণার গহনা দিবার কারণ কি?

উত্তর। আমার এই মেয়েটি জন্মান্ধ, সে জন্য আমার স্ত্রী সর্ব্বদা কাঁদিয়া থাকে। আমার ভাই ও ভাইজ তাহাতে দুঃখিত হইয়া আমাদিগের মনোদুঃখ যদি কিছু নিবারণ হয়, এই ভাবিয়া অন্নপ্রাশনের সময় মেয়েটিকে এই গহনা-গুলি দিয়াছেন।

জন্মান্ধ। তবে যে সে রজনী, তদ্বিষয়ে আর সংশয় কি?

আমি হতাশ হইয়া জোবানবন্দী রাখিয়া দিলাম। বলিলাম, "আমার আর বড় সন্দেহ নাই।"

বিষ্ণুরাম বলিলেন, "অত অল্প প্রমাণে আপনাকে সন্তুষ্ট হইতে বলি না। আর একটা জোবানবন্দীর নকল দেখুন।"

দ্বিতীয় জোবানবন্দীও দেখিলাম যে, উহাও ঐ কথিত বালা চুরির মোকদ্দমায় গৃহীত হইয়াছিল। সেই জোবানবন্দীতে বক্তা রাজচন্দ্র দাস। তিনি একমাত্র কুটুম্ব বলিয়া ঐ অন্নপ্রাশনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি হরেকৃষ্ণের শ্যালীপতি বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেছেন এবং চুরির বিষয় সকল সপ্রমাণ করিতেছেন।

বিষ্ণুরাম বলিলেন, "উপস্থিত রাজচন্দ্র দাস সেই রাজচন্দ্র দাস। সংশয় থাকে, ডাকিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন।"

আমি বলিলাম, "নিষ্প্রয়োজন।"

বিষ্ণুরাম আরও কতকগুলি দলিল দেখাইলেন, সে সকলের বৃত্তান্ত সবিস্তারে বলিতে গেলে সকলের ভাল লাগিবে না। ইহা বলিলেই যথেষ্ট

হইবে যে, এই রজনীদাসী হরেকৃষ্ণ দাসের কন্যা, তদ্বিষয়ে আমার সংশয় রহিল না। তখন দেখিলাম, বৃদ্ধ পিতামাতা লইয়া অন্নের জন্য কাতর হইয়া বেড়াইব।

বিষ্ণুরামকে বলিলাম, "মোকদ্দমা করা বৃথা। বিষয় রজনী দাসীর, তাহার বিষয় তাহাকে ছাড়িয়া দিব। তবে আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর এ বিষয়ে আমার সঙ্গে তুল্যাধিকারী, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করার অপেক্ষা রহিল মাত্র।"

আমি একবার আদালতে গিয়া আসল জোবানবন্দী দেখিয়া আসিলাম। এখন পুরাণ নথি ছিঁড়িয়া ফেলে, তখন রাখিত; আসল দেখিয়া জানিলাম যে, নকলে কোন কৃত্রিমতা নাই।

বিষয় রজনীকে ছাড়িয়া দিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রজনীকে বিষয় ছাড়িয়া দিলাম, কিন্তু কেহ ত সে বিষয় দখল করিল না।

রাজচন্দ্র দাস একদিন দেখা করতে আসিল। তাহার মুখে শুনিলাম যে, সে সিমলায় একটি বাড়ী কিনিয়া সেইখানে রজনীকে লইয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, "টাকা কোথায় পাইলে?" রাজচন্দ্র বলিল, "অমরনাথ কর্জ্জ দিয়াছেন, পশ্চাৎ বিষয় হইতে শোধ হইবে।" জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "তবে তোমরা বিষয় দখল লইতেছ না কেন?" তাহাতে সে বলিল, "সে সকল কথা অমরনাথ বাবু জানেন।" "অমরনাথ বাবু কি রজনীকে বিবাহ করিয়াছেন? তাহাতে রাজচন্দ্র বলিল, "না।" পরে রাজচন্দ্রের সঙ্গে কথোপকথন করিতে করিতে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "রাজচন্দ্র, তোমায় এতদিন দেখি নাই কেন?"

রাজচন্দ্র বলিল, "একটু গা-ঢাকা হইয়াছিলাম।"

আমি। কার কি চুরি করিয়াছ যে, গা-ঢাকা হইয়াছিলে?

রাজ। চুরি করিব কার? তবে অমরনাথ বাবু বলিয়াছিলেন যে, এখন বিষয় লইয়া গোলযোগ হইতেছে, এখন একটু আড়াল হওয়া ভাল। মানুষের চক্ষুলজ্জা আছে ত?

আমি। অর্থাৎ পাছে আমরা কিছু ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করি। অমরনাথ বাবু বিজ্ঞ লোক দেখিতেছি। তা যাই হউক, এখন যে বড় দেখা দিলে?

রাজ। আপনার ঠাকুর আমাকে ডাকাইয়াছেন।

আমি। আমার ঠাকুর? তিনি তোমার সন্ধান পাইলেন কি প্রকারে?

রাজ। খুঁজিয়া খুঁজিয়া।

আমি। এত খোঁজাখুঁজি কেন? তোমায় বিষয় ছাডিয়া দিতে অনুরোধ করিবার জন্য নয় ত?

রাজ। না না—তা কেন—তা কেন? আর একটা কথার জন্য। এখন রজনীর কিছু বিষয় হইয়াছে শুনিয়া অনেক সম্বন্ধ আসিতেছে। তা কোথায় সম্বন্ধ করি—তাই আপনাদের জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি।

আমি। কেন, অমরনাথ বাবুর সঙ্গে ত সম্বন্ধ হইতেছিল? তিনি এত করিয়া রজনীর বিষয় উদ্ধার করিলেন, তাঁহাকে ছাড়া কাহাকে বিবাহ দিবে?

রাজ। যদি তাঁর অপেক্ষাও ভাল পাত্র পাই?

আমি। অমরনাথের অপেক্ষা ভাল পাত্র কোথায় পাইবে?

রাজ। মনে করুন, আপনি যেমন, এমনই পাত্র যদি পাই?

আমি একটু চমকিলাম। বলিলাম, "তাহা হইলে অমরনাথের অপেক্ষা ভাল পাত্র হইল না। কিন্তু ছেঁদো কথা ছাডিয়া দাও—তুমি আমার সঙ্গে রজনীর সম্বন্ধ করিতে আসিয়াছ?"

রাজচন্দ্র একটু কুণ্ঠিত হইল। বলিল, "হাঁ তাই বটে। এ সম্বন্ধ করিতেই কর্ত্তা আমাকে ডাকাইয়াছিলেন।"

শুনিয়া আকাশ হইতে পডিলাম। সম্মুখে দারিদ্র্য রাক্ষসকে দেখিয়া ভীত হইয়া পিতা যে এই সম্বন্ধ করিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম—রজনীকে আমি বিবাহ করিলে ঘরের বিষয় ঘরে থাকিবে। আমাকে অন্ধ পুষ্পনারীর কাছে বিক্রয় করিয়া, পিতা বিক্রয়মূল্যস্বরূপ হৃতসম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন। শুনিয়া হাড জ্বলিয়া গেল।

রাজচন্দ্রকে বলিলাম, "তুমি এখন যাও। কর্ত্তার সঙ্গে আমার সে কথা হইবে।"

আমার রাগ দেখিয়া রাজচন্দ্র পিতার কাছে গেল, সে কি বলিল, বলিতে পারি না। তাহাকে বিদায় দিয়া আমাকে ডাকাইলেন।

তিনি আমাকে নানাপ্রকার অনুরোধ করিলেন—রজনীকে বিবাহ করিতেই হইবে ; নহিলে সপরিবারে মারা যাইব, খাইব কি ? তাঁহার দুঃখ ও কাতরতা দেখিয়া আমার দুঃখ হইল না। বড় রাগ হইল। আমি রাগ করিয়া চলিয়া গেলাম।

পিতার কাছ হইতে গিয়া আমার মা'র হাতে পড়িলাম। পিতার কাছে রাগ করিলাম, কিন্তু মা'র কাছে রাগ করিতে পারিলাম না—তাঁহার চক্ষের জল অসহ্য হইল। সেখান হইতে পলাইলাম। কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা স্থির রহিল—যে রজনীকে দয়া করিয়া গোপালের সঙ্গে বিবাহিত করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলাম, আজ টাকার লোভে তাহাকে স্বয়ং বিবাহ করিব ?

বিপদে পড়িয়া মনে করিলাম ছোটমা'র সাহায্য লইব। গৃহের মধ্যে ছোটমাই বুদ্ধিমতী। ছোটমা'র কাছে গেলাম—"ছোট-মা আমাকে কি রজনীকে বিবাহ করিতে হইবে ? আমি কি অপরাধ করিয়াছি ?"

ছোট-মা চুপ করিয়া রহিলেন।

আমি। তুমিও কি ঐ পরামর্শে ?

ছোট-মা। বাছা রজনী ত সৎ কায়স্থের মেয়ে।

আমি। হইলই বা।

ছোট-মা। আমি জানি, সে সচ্চরিত্রা।

আমি। তাহাও স্বীকার করি।

ছোট-মা। সে পরম সুন্দরী।

আমি। পদ্মচক্ষু !

ছোট-মা। বাবা, যদি পদ্মচক্ষুই খোঁজ তবে তোমার আর একটা বিবাহ করিতে কতক্ষণ ?

আমি। সে কি মা। রজনীর টাকার জন্য রজনীকে বিবাহ করিয়া তার বিষয় লইয়া, তার পর তাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া আর একজনকে বিবাহ করা কেমন কাজটা হইবে ?

ছোট-মা। ঠেলিয়া ফেলিবে কেন ? তোমার বড়-মা কি ঠেলা আছেন ?

এ কথার উত্তর ছোট-মার কাছে করিতে পারা যায় না। তিনি আমার পিতার দ্বিতীয় পক্ষের বনিতা। বহুবিবাহের দোষের কথা তাঁহার সাক্ষাতে কি প্রকারে বলিব, সে কথা না বলিয়া বলিলাম, "আমি এ বিবাহ করিব না,——তুমি আমায় রক্ষা কর। তুমি সব পার।"

ছোট-মা। আমি না বুঝি, এমন নহে। কিন্তু বিবাহ না করিলে আমরা সপরিবারে অন্নাভাবে মারা যাইব। আমি সকল কষ্ট সহ্য করিতে পারি, কিন্তু তোমাদিগের অন্নকষ্ট আমি চক্ষে দেখিতে পারিব না। তোমার সহস্র বৎসর পরমায়ু হউক, তুমি ইহাতে অমত করিও না।

আমি। টাকাই কি এত বড় ?

ছোট-মা। তোমার আমার কাছে নহে; কিন্তু যাহারা তোমার আমার সর্ব্বস্ব, তাঁহাদের কাছে বটে, সুতরাং তোমার আমার কাছেও বটে। দেখ, তোমার জন্য আমরা তিনজনে প্রাণ দিতেও পারি, তুমি আমাদের জন্য একটি অন্ধকন্যা বিবাহ করিতে পারিবে না ?

বিচারে ছোট-মা'র কাছে হারিলাম। হারিলে রাগ বাড়ে। আমার রাগ বাড়িল, আর মনে বিশ্বাস ছিল যে, টাকার জন্য রজনীকে বিবাহ করা বড় অন্যায়। অতএব আমি দম্ভ করিয়া বলিলাম, "তোমরা যাই বল না কেন, আমি এ বিবাহ করিব না।"

ছোট-মাও দম্ভ করিয়া বলিলেন, "তুমিও যাই-ই বল না কেন, আমি যদি কায়েতের মেয়ে হই, তবে তোমার এ বিবাহ দিবই দিব।"

আমি হাসিলাম, "তবে বোধ হয়, তুমি গোয়ালার মেয়ে। আমার এ বিবাহ দিতে পারিবে না।"

ছোট-মা বলিলেন, "না বাবা, আমি কায়েতের মেয়ে।"

ছোট-মা বড় দুষ্ট। আমাকে বাবা বলিয়া গালি ফিরাইয়া দিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আমাদিগের বাড়ীতে এক সন্ন্যাসী আসিয়া মধ্যে মধ্যে থাকিত। কেহ সন্ন্যাসী বলিত, কেহ ব্রহ্মচারী, কেহ দণ্ডী, কেহ অবধূত। পরিধানে গৈরিক বাস, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা, মস্তকে রুক্ষ কেশ, জটা নহে, রক্ত চন্দনের ছোট রকমের ফোঁটা, বড় একটা ধূলাকাদার ঘটা নাই; সন্ন্যাসীজাতির মধ্যে ইনি একটি বাবু। খড়ম চন্দনকাষ্ঠের, তাহাতে হাতীর দাঁতের বোল। তিনি যাই হউন, বালকেরা তাঁহাকে সন্ন্যাসী মহাশয় বলিত বলিয়া আমিও তাঁহাকে তাহাই বলিব।

পিতা কোথা হইতে তাঁহাকে লইয়া আসিয়াছিলেন। অনুভবে বুঝিলাম পিতার মনে মনে বিশ্বাস ছিল, সন্ন্যাসী নানাবিধ ঔষধ জ্ঞানে এবং তান্ত্রিক যাগযজ্ঞে সুদক্ষ। বিমাতা বন্ধ্যা।

পিতার অনুকম্পায় সন্ন্যাসী উপরের একটি বৈঠকখানা আসিয়া দখল করিয়াছিল। ইহা আমার একটু বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছিল। আবার সন্ধ্যাকালে সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া সারঙ্গ রাগিণীতে আর্য্যাচ্ছন্দে স্তোত্র পাঠ করিত। ভণ্ডামী আর আমার সহ্য হইল না। আমি তাহার অর্দ্ধচন্দ্রের ব্যবস্থা করিবার জন্য তাহার নিকট গেলাম। বলিলাম, "সন্ন্যাসী ঠাকুর, ছাদের উপর মাথা মুণ্ড কি বকিতেছিলে?"

সন্ন্যাসী হিন্দুস্থানী, কিন্তু আমাদিগের সঙ্গে যে ভাষায় কথা কহিত, তাহার চৌদ্দ আনা নিভাজ সংস্কৃত, এক আনা হিন্দী, এক আনা বাঙ্গালা। আমি বাঙ্গালাই রাখিলাম। সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন, "কেন, কি বকি, আপনি কি জানেন না?"

আমি বলিলাম, "বেদমন্ত্র?"

স। হইলে হইতে পারে।

আমি। পড়িয়া কি হয়?

স। কিছু না।

উত্তরটুকু সন্ন্যাসীর জিত—আমি এতটুকু প্রত্যাশা করি নাই। তখন জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে পড়েন কেন?"

স। কেন, শুনিতে কি কষ্টকর?

আমি। না, শুনিতে মন্দ নয়, বিশেষ আপনি সুকণ্ঠ। তবে যদি কিছু ফল নাই, তবে পড়েন কেন?

স। যেখানে ইহাতে কাহারও কোন অনিষ্ট নাই, সেখানে পড়ায় ক্ষতি কি?

আমি জারি করিতে আসিয়াছিলাম; কিন্তু দেখিলাম যে, একটু হটিয়াছি—সুতরাং আমাকে চাপিয়া ধরিতে হইল। বলিলাম, "ক্ষতি নাই, কিন্তু নিষ্ফলে কেহ কোন কাজ করে না—যদি বেদগান নিষ্ফল, তবে আপনি বেদগান করেন কেন?"

স। আপনিও ত পণ্ডিত, আপনি বলুন দেখি, বৃক্ষের উপর কোকিল গান করে কেন?

ফাঁপরে পড়িলাম। ইহার দুইটি উত্তর আছে, এক—"ইহাতে কোকিলের সুখ,"—দ্বিতীয়—"স্ত্রীকোকিলকে মোহিত করিবার জন্য।" কোন্‌টি বলি? প্রথমটি আগে বলিলাম ;—"গাইয়াই কোকিলের সুখ।"

স। গাইয়াই আমার সুখ।

আমি। তবে টপ্পা, খিয়াল প্রভৃতি থাকিতে বেদগান করেন কেন?

স। কোন্ কথাগুলি সুখকর, সামান্য গণিকাগণের কদর্য্য চরিত্রের গুণগান সুখকর, না দেবতাদিগের অসীম মহিমাগান সুখকর?

হারিয়া দ্বিতীয় উত্তরে গেলাম ; বলিলাম, "কোকিল গায় কোকিল-পত্নীকে মোহিত করিবার জন্য। মোহনার্থ যে শারীরিক স্ফূর্ত্তি, তাহাতে জীবের সুখ। কণ্ঠস্বরের স্ফূর্ত্তি সেই শারীরিক স্ফূর্ত্তির অন্তর্গত। আপনি কাহাকে মুগ্ধ করিতে চাহেন?"

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, "আমার আপনার মনকে। মন আত্মার অনুরাগী নহে, আত্মার হিতকারী নহে। তাহাকে বশীভূত করিবার জন্য গাই।"

আমি! আপনারা দর্শনিক, মন এবং আত্মা পৃথক বলিয়া মানেন। কিন্তু মন একটি পৃথক্, আত্মা একটি পৃথক্ পদার্থ, ইহা মানিতে পারি না। মনেরই ক্রিয়াতে দেখিতে পাই—ইচ্ছা, প্রবৃত্ত্যাদি আমার মনে। সুখ আমার মনে, দুঃখ আমার মনে। তবে আবার মনের অতিরিক্ত আত্মা কেন মানিব? যাহার ক্রিয়া দেখি ; তাহাকেই মানিব ; যাহার কোন চিহ্ন দেখি না, তাহাকে মনিব কেন?

স। তবে বল না কেন, মন ও শরীর এক। শরীর ও মনের প্রভেদ কেন মানিব? যে কিছু কার্য্য করিতেছ, সকলই শরীরের কার্য্য—কোন্‌টি মনের কার্য্য?

আমি। চিন্তা-প্রবৃত্তি-ভোগাদি।

স। কিসে জানিলে, সে সকল শারীরিক ক্রিয়া নহে?

আমি। তাহাও সত্য বটে। মন শরীরের ক্রিয়া* মাত্র।

স। ভাল ভাল। তবে আর একটু এসো। বল না কেন যে, শরীরও পঞ্চভূতের ক্রিয়া মাত্র। শুনিয়াছি, তোমরা পঞ্চভূত মান না—তোমরা বহুভূতবাদী। তাই হউক, বল না কেন যে, ক্ষিত্যাদি বা অন্য ভূতগণ, শরীর-রূপ ধারণ করিয়া সকলই করিতেছে? এই যে তুমি আমার সঙ্গে কথা

* Function of the brain.

কহিতেছ—আমি বলি যে কেবল ক্ষিত্যাদি আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া শব্দ করিতেছে, শচীন্দ্রনাথ নহে। মন ও শরীরাদির কল্পনার প্রয়োজন কি? ক্ষিত্যাদি ভিন্ন শচীন্দ্রনাথের অস্তিত্ব মানি না।

হারিয়া ভক্তিভরে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া গেলাম। কিন্তু সেই অবধি সন্ন্যাসীর একটু সম্প্রীতি হইল। সর্ব্বদা তাঁহার কাছে আসিয়া বসিতাম এবং শাস্ত্রীয় আলোচনা করিতাম। দেখিলাম, সন্ন্যাসীর অনেক প্রকার ভণ্ডামী আছে। সন্ন্যাসী ঔষধ বিলায়, সন্ন্যাসী হাত দেখিয়া গণিয়া ভবিষ্যৎ বলে, সন্ন্যাসী যাগ-হোমাদিও মধ্যে মধ্যে করিয়া থাকে—নল চালে, চোর বলিয়া দেয়, আরও কত ভণ্ডামী করে। এক দিন আমার অসহ্য হইয়া উঠিল। এক দিন আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আপনি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত; আপনার এ সকল ভণ্ডামী কেন?"

স। কোন্‌টা ভণ্ডামী?

আমি। এই নলচালা, হাতগণা প্রভৃতি।

স। কতকগুলা অনিশ্চিত বটে, কিন্তু তথাপি কর্ত্তব্য।

আমি। যাহা অনিশ্চিত জানিতেছেন, তদ্দ্বারা লোককে প্রতারণা কেন করেন?

স। তোমরা মড়া কাট কেন?

আমি। শিক্ষার্থ।

স। যাহারা শিক্ষিত, তাহারা কাটে কেন?

আমি। তত্ত্বানুসন্ধান জন্য।

স। আমরাও তত্ত্বানুসন্ধান জন্য এ সকল করিয়া থাকি। শুনিয়াছি, বিলাতী পণ্ডিতের মধ্যে অনেকে বলেন, লোকের মাথার গঠন দেখিয়া তাহার চরিত্রের কথা বলা যায়। যদি মাথার গঠনে চরিত্র বলা যায়, তবে হাতের রেখা দেখিয়াই বা কেন না বলা যাইবে? ইহা মানি যে, হাতের রেখা দেখিয়া কেহ এ পর্য্যন্ত ঠিক বলিতে পারে নাই, ইহার কারণ এই হইতে পারে যে, ইহার প্রকৃত সঙ্কেত অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই, কিন্তু ক্রমে ক্রমে হাত দেখিতে দেখিতে প্রকৃত সঙ্কেত পাওয়া যাইতে পারে। এ জন্য হাত পাইলেই দেখি।

আমি। আর নলচালা?

স। তোমরা লৌহের তারে পৃথিবীময় লিপি চালাইতে পার, আমরা

কি নলটি চালাইতে পারি না? তোমাদের একটি ভ্রম আছে, তোমরা মনে কর যে, যাহা ইংরেজেরা জানে, তাহাই সত্য, যাহা ইংরেজে জানে না, তাহাই অসত্য, তাহা মনুষ্যজ্ঞানের অতীত, তাহা অসাধ্য। বস্তুতঃ তাহা নহে। জ্ঞান অনন্ত। কিছু তুমি জান, কিছু আমি জানি, কিছু অন্যে জানে; কিন্তু কেহই বলিতে পারে না যে, আমি সব জানি, আর কেহ আমার জ্ঞানের অতিরিক্ত কিছু জানে না। কিছু ইংরেজে জানে, কিছু আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা জানিতেন। ইংরেজেরা যাহা জানে, ঋষিরা তাহা জানিতেন না; ঋষিরা যাহা জানিতেন, ইংরেজেরা এ পর্য্যন্ত তাহা জানিতে পারেন নাই। সেই সকল আর্য্যবিদ্যা প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। আমরা কেহ কেহ দুই একটি বিদ্যা জানি। যত্নে গোপন রাখি, কাহাকেও শিখাই না।

আমি হাসিলাম। সন্ন্যাসী বলিলেন, "তুমি বিশ্বাস করিতেছ না, কিছু প্রত্যক্ষ দেখিতে চাও?"

আমি বলিলাম, "দেখিলে বুঝিতে পারি!"

সন্ন্যাসীবলিলেন, "পশ্চাৎ, দেখাইব। এক্ষণে তোমার সঙ্গে আমার একটি বিশেষ কথা আছে। আমার সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠতা আছে। তোমার পিতা আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন যে, তোমাকে বিবাহে প্রবৃত্তি দিই।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "প্রবৃত্তি দিতে হইবে না, আমি বিবাহে প্রস্তুত —কিন্তু—"

স। কিন্তু কি?

আমি। কন্যা কৈ? এক কাণা কন্যা আছে, তাহাকে বিবাহ করিব না।

স। এ বাঙ্গালা দেশে কি তোমার যোগ্য কন্যা নাই?

আমি। হাজার হাজার আছে; কিন্তু বাছিয়া লইব কি প্রকারে? এই শত সহস্র কন্যার মধ্যে কে আমাকে চিরকাল ভালবাসিবে, তাহা কি প্রকারে বুঝিব?

স। আমার একটি বিদ্যা আছে। যদি পৃথিবীতে এমত কেহ থাকে যে, তোমাকে মর্ম্মান্তিক ভালবাসে, তবে তাহাকে স্বপ্নে দেখাইতে পারি। কিন্তু যে তোমাকে এখন ভালবাসে না, ভবিষ্যতে বাসিতে পারে, তাহা আমার বিদ্যার অতীত।

আমি। এ বিদ্যা বড় আবশ্যক বিদ্যা নহে। যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহাকে প্রায় প্রণয়শালী বলিয়া জানে।

স। কে বলিল? অজ্ঞাত প্রণয়ই পৃথিবীতে অধিক. তোমাকে কেহ ভালবাসে? তুমি কি তাহাকে জান?

আমি। আত্মীয়স্বজন ভিন্ন কেহ যে আমাকে বিশেষ ভালবাসে, এমন আমি জানি না।

স। তুমি আমাদের বিদ্যা কিছু প্রত্যক্ষ করিতে চাহিতেছিলে, আজ এইটি প্রত্যক্ষ কর।

আমি। ক্ষতি কি?

স। তবে শয়নকালে আমাকে শয্যাগৃহে ডাকিও।

আমার শয্যাগৃহ বহির্ব্বাটীতে। আমি শয়নকালে সন্ন্যাসীকে ডাকাইলাম। সন্ন্যাসী আসিয়া আমাকে শয়ন করিতে বলিলেন। আমি শয়ন করিলে তিনি বলিলেন, "যতক্ষণ আমি এখানে থাকিব, চক্ষু চাহিও না। আমি গেলে যদি জাগ্রত থাক, চাহিও।" সুতরাং আমি চক্ষু মুদিয়া রহিলাম—সন্ন্যাসী কি কৌশল করিল, কিছুই জানিতে পারিলাম না। সন্ন্যাসী যাইবার পূর্ব্বেই আমি নিদ্রাভিভূত হইলাম।

সন্ন্যাসী বলিয়াছিল, পৃথিবীর মধ্যে যে নায়িকা আমাকে মর্ম্মান্তিক ভালবাসে, অদ্য তাহাকেই আমি স্বপ্নে দেখিব; স্বপ্নে দেখিলাম বটে। কলকল গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে সৈকতভূমি, তাহার প্রান্তভাগে অর্দ্ধজলমগ্ন,—কে?

"রজনী"

পরদিন প্রভাতে সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহাকে স্বপ্ন দেখিয়াছিলে?

আমি। কাণা ফুলওয়ালী।

স। কাণা?

আমি। জন্মান্ধ।

সন্ন্যাসী। আশ্চর্য্য! কিন্তু যেই হউক, তাহার অধিক পৃথিবীতে আর কেহ তোমাকে ভালবাসে না।

আমি নীরব হইয়া রহিলাম।

চতুর্থ খণ্ড

(সকলের কথা)

প্রথম পরিচ্ছেদ

লবঙ্গলতার কথা

বড়ই গোল বাধিল। আমি ত সন্ন্যাসী ঠাকুরের হাতে পায়ে ধরিয়া, কাঁদিয়া কাটিয়া শচীন্দ্রকে রজনীর বশীভূত করিবার উপায় করিতেছি। সন্ন্যাসী তন্ত্রসিদ্ধ ; জগদম্বার কৃপায় যাহা মনে করেন, তাহাই করিতে পারেন ; মিত্র মহাশয় ষষ্টি বৎসর বয়সে যে এ পামরীর এত বশীভূত, তাহা আমার গুণে কি সন্ন্যাসী ঠাকুরের গুণে, তাহা বলিয়া উঠা ভার ; আমিও কায়মনোবাক্যে পতিপদ সেবার ত্রুটি করি না, ব্রহ্মচারীও আমার জন্য যাগ-যজ্ঞ তন্ত্র-মন্ত্র-প্রয়োগে ত্রুটি করেন না। যাহার জন্য যাহা তিনি করিয়াছেন, তাহা ফলিয়াছে। কামার-বৌর পিতলের টুকনি সোণা করিয়া দিয়াছেন। উনি না পারেন কি ? উঁহার মন্ত্রৌষধির গুণে শচীন্দ্র যে রজনীকে ভালবাসিবে—রজনীকে বিবাহ করিতে চাহিবে, তাহাতে আমার কোন সন্দেহই নাই, কিন্তু তবু গোল বাধিয়াছে। গোলমাল অমরনাথ বাধাইয়াছে। এখন শুনিতেছি অমরনাথের সঙ্গেই রজনীর বিবাহ স্থির হইয়াছে।

রজনীর মাসী-মাসুয়া, রাজচন্দ্র এবং তাহার স্ত্রী আমাদিকের দিকে। তাহার কারণ, কর্ত্তা বলিয়াছেন, বিবাহ যদি হয়, তবে তোমাদিগকে ঘটকবিদায়স্বরূপ কিছু দিব। কথাটা ঘটকবিদায়, কিন্তু, আঁচটা দু-হাজার দশ হাজার! কিন্তু তাহারা আমাদের দিকে হইলেও কিছু হইতেছে না। অমরনাথ ছাড়িতেছে না। সে নিশ্চয় রজনীকে বিবাহ করিবে, জিদ করিতেছে।

ভাল, অমরনাথ কে ? মেয়ের বিবাহ দিবার কর্ত্তা হইল তাহার মাসুয়া মাসী—বাপ-মা বলাই উচিত—রাজচন্দ্র ও তাহার স্ত্রী, তাহারা যদি আমাদিকের দিকে, তবে অমরনাথের জিদে কি আসিয়া যায় ? সে তাহা-দিগকে বিষয় দেওয়াইয়া দিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার মেহনতানা দুই চারি হাজার ধরিয়া দিলেই হইবে। আমার ছেলের বৌ করিব বলিয়াই আমি যে

কন্যার সম্বন্ধ করিতেছি, অমরনাথ কি না তাহাকে বিবাহ করিতে চায়? অমরনাথের এত বড় স্পর্দ্ধা! আমি একবার অমরনাথকে কিছু শিক্ষা দিয়াছি—আর একবার না হয় কিছু শিক্ষা দিব। আমি যদি কায়েতের মেয়ে হই, তবে অমরনাথের নিকট হইতে এই রজনীকে কাড়িয়া লইয়া আমার ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিব।

আমি অমরনাথের সকল গুণ জানি। অমরনাথ অত্যন্ত ধূর্ত্ত—তাহার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে বড় সতর্ক হইয়া কাজ করিতে হয়। আমি সতর্ক হইয়াই কার্য্য আরম্ভ করিলাম।

প্রথমে রাজচন্দ্র দাসের স্ত্রীকে ডাকাইয়া পাঠাইলাম। সে আসিলে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন গা! মালী-বৌ?"—রাজচন্দ্রের স্ত্রীকে আমরা আজিও মালী-বৌ বলিতাম, রাগ না হইলে বরং বলিতাম না, রাগ হইলেই মালী-বৌ বলিতাম—মালী-বৌ বলিল, "কি গা?"

আমি। মেয়ের বিয়ে নাকি অমরনাথ বাবুর সঙ্গে দিবে?

মালী-বৌ। সেই কথাই ত এখন হচ্ছে।

আমি। কেন হচ্ছে, আমাদের সঙ্গে কি কথা হইয়াছিল?

মালী-বৌ। কি করব মা—আমি মেয়েমানুষ, অত কি জানি?

মাগীর মোটা বুদ্ধি দেখিয়া আমার বড় রাগ হইল,—আমি বলিলাম, "সে কি মালী-বৌ? মেয়ে মানুষ জানে না ত কি পুরুষমানুষে জানে? পুরুষ-মানুষ আবার সংসার-ধর্ম্ম কুটুম্ব-কুটুম্বিতার কি জানে? পুরুষমানুষ মাথায় মোট করিয়া টাকা বহিয়া আনিয়া দিবে, এই পর্য্যন্ত। পুরুষমানুষ আবার কর্ত্তা না কি?"

বোধ হয়, মাগীর মোটা বুদ্ধিতে আমার কথাগুলো অসঙ্গত বোধ হইল—সে একটু হাসিল। আমি বলিলাম, "তোমার স্বামীর কি মত, অমরনাথের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দেন?"

মালী-বৌ বলিল, "তাঁর মত নয়—তবে অমরনাথ বাবু হইতেই রজনী বিষয় পাইয়াছে, তাঁর বাধ্য হইতেই হয়।"

আমি। তবে অমরনাথ বাবুকে বল গিয়া, বিষয় এখনও রজনী পায় নাই। বিষয় আমাদের; বিষয় আমরা ছাড়িব না। পার, তোমরা বিষয় মোকদ্দমা করিয়া লও গিয়া।

মালী-বৌ। সে কথা আগে বলিলেই হইত। এত দিন মোকদ্দমা উপস্থিত হইত।

আমি। মোকদ্দমা করা মুখের কথা নহে। টাকার শ্রাদ্ধ। রাজচন্দ্র দাস ফুল বেচিয়া কত টাকা করিয়াছে ?

মালী-বৌ রাগে গর্‌গর্‌ করিতে লাগিল। সত্য বলিতেছি, আমার কিছুই রাগ হয় নাই। মালী-বৌ একটু রাগ সামলাইয়া বলিল, "অমর বাবু আমার জামাই হইলেই বিষয় অমর বাবুর হইবে। তিনি টাকা দিয়া মোকদ্দমা করিতে পারেন, তাঁহার এমন শক্তি আছে।"

এই বলিয়া মালী-বৌ উঠিয়া যায়, আমি তাহার আঁচল ধরিয়া বসাইলাম। মালী-বৌ হাসিয়া বসিল। আমি বলিলাম, "অমর বাবু মোকদ্দমা করিয়া বিষয় লইলে তোমার কি উপকার ?"

মালী-বৌ। আমার মেয়ের সুখ হবে।

আমি। আর আমার ছেলের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে হ'লে বুঝি বড় দুঃখ হবে ?

মালী-বৌ। তা কেন? তবে যেখানে থাকে, আমার মেয়ে সুখী হইলেই হইল।

আমি। তোমাদের নিজের কিছু সুখ চাই না ?

মালী-বৌ। আমাদের আবার সুখ ? মেয়ের সুখেই আমাদের সুখ।

আমি। ঘটকালীটা ?

মালী-বৌ মুখ মুচকাইয়া হাসিল। বলিল, "আসল কথাটা বলিব মা-ঠাকুরাণি ? এখানে বিয়ের মেয়ের মত নাই।"

আমি। সে কি ? কি বলে ?

মালী-বৌ। এখানকার কথা হলেই বলে, কাণার আবার বিয়ের কাজ কি ?

আমি। আর অমরনাথের সঙ্গে বিয়ের কথা হইলে ?

মালী-বৌ। বলে, উঁ হতে আমাদের সব। উনি যা বলিবেন, তাহাই করিতে হইবে।

আমি। তা বিয়ের কন্যার আবার মতামত কি ? মা-বাপের মতামত হইলেই হইল।

মালী-বৌ। রজনী ত ক্ষুদে মেয়ে নয়, আর আমার পেটের সন্তানও নয়।

আর বিষয় তার, আমাদের নয়। সে আমাদের হাঁকাইয়া দিলে আমরা কি করিতে পারি? বরং তার মন রাখিয়াই আমাদের এখন চলিতে হইতেছে।

আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"রজনীর সঙ্গে অমরনাথের দেখাশুনা হয় কি?"

মালী-বৌ। না, অমর বাবু দেখা করেন না।

আমি। আমার সঙ্গে রজনীর একবার দেখা হয় না কি?

মালী-বৌ। আমারও ইচ্ছা তাই। আপনি যদি তাকে বুঝাইয়া পড়াইয়া তাহার মত করাইতে পারেন। আপনাকে রজনী বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা করে।

আমি। তা চেষ্টা করিয়া দেখিব; কিন্তু রজনীর দেখা পাই কি প্রকারে? কাল তাহাকে এ বাড়িতে একবার পাঠাইয়া দিতে পার?

মালী-বৌ। তার আটক কি? সে ত এই বাড়ীতেই খাইয়া মানুষ। কিন্তু যার বিয়ের সম্বন্ধ হইতেছে, তাহাকে কি শ্বশুরবাড়ীতে অমন অদিনে অক্ষণে বিয়ের আগে আসিতে আছে?

মর্ মাগী। আবার কাচ! কি করি, আমি অন্য উপায় না দেখিয়া বলিলাম, "আচ্ছা, রজনী না আসিতে পারে, আমি একবার তোমাদের বাড়ী যাইতে পারি কি?"

মালী-বৌ। সে কি! আমাদের কি এমন ভাগ্য হইবে যে, আপনার পায়ের ধূলা আমাদের বাড়ীতে পড়িবে?

আমি। কুটুম্বিতা হইলে আমার কেন, অনেকেরই পড়িবে। তুমি আমাকে আজ নিমন্ত্রণ করিয়া যাও।

মালী-বৌ। তা আমাদের বাড়ীতে আপনাকে পাঠাইতে কর্ত্তার মত হইবে কেন?

আমি। পুরুষমানুষের আবার মতামত কি? মেয়েমানুষের যে মত পুরুষ মানুষেরও সেই মত।

মালী-বৌ যোড়হাত করিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া হাসিতে হাসিতে বিদায় গ্রহণ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অমরনাথের কথা

রজনীর সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য আমার এত কষ্ট সফল হইয়াছে, মিত্রেরাও নির্ব্বিবাদে বিষয় ছাড়িয়া দিয়াছে, তথাপি বিষয় দখল লওয়া হয় নাই, ইহা শুনিয়া অনেকে চমৎকৃত হইতে পারেন। তাহাতে আমিও কিছু বিস্মিত। বিষয় আমার নহে, আমি দখল লইবার কেহ নহি। বিষয় রজনীর, সে দখল না লইলে কে কি করিতে পারে? কিন্তু রজনী কিছুতেই বিষয়ে দখল লইতে সম্মত নহে। বলে—আজ নহে—আর দুই দিন যাক্,—পশ্চাৎ দখল লইবেন ইত্যাদি। দখল না লউক—কিন্তু দরিদ্রকন্যার ঐশ্বর্য্যে এত অনাস্থা কেন, তাহা আমি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। রাজচন্দ্র এবং রামচন্দ্রের স্ত্রী এ বিষয়ে রজনীকে অনুরোধ করিয়াছে, কিন্তু রজনী বিষয় সম্প্রতি দখল লইতে চায় না। ইহার মর্ম্ম কি? কাহার জন্য এত পরিশ্রম করিলাম?

ইহার যা হয় একটা চূড়ান্ত স্থির করিবার জন্য আমি রজনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম, রজনীর সঙ্গে আমার বিবাহের কথা উত্থাপিত হওয়া অবধি আমি আর রজনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে বড় যাইতাম না। কেন না, এখন আমাকে দেখিলে রজনী কিছু লজ্জিত হইত। কিন্তু আজ না গেলে নয় বলিয়া রজনীর কাছে গেলাম। সে বাড়ীতে আমার অবারিতদ্বার। আমি রজনীর সন্ধানে তাহার ঘরে গিয়া তাহাকে দেখিতে পাইলাম না ফিরিয়া আসিতেছি, এমত সময় দেখিতে পাইলাম, রজনী আর একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে উপরে উঠিতেছে। সে স্ত্রীলোককে দেখিয়াই চিনিলাম—অনেক দিন দেখি নাই, কিন্তু দেখিয়াই চিনিলাম যে, ঐ গজেন্দ্রগামিনী ললিতলবঙ্গলতা।

রজনী ইচ্ছাপূর্ব্বক জীর্ণবস্ত্র পরিয়াছিল—লজ্জায় সে লবঙ্গলতার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহিতেছিল না। লবঙ্গলতা হাসিতে উছলিয়া পড়িতেছিল—রাগ বা বিদ্বেষের কিছুমাত্র লক্ষণ দেখা গেল না।

সে হাসি অনেক দিন শুনি নাই। সে হাসি তেমনই ছিল—পূর্ণিমার সমুদ্রে ক্ষুদ্র তরঙ্গের তুল্য, সপুষ্প বসন্তলতার আন্দোলন তুল্য—তাহা হইতে সুখ ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল।

আমি অবাক্ হইয়া নিস্পন্দশরীরে সশঙ্কচিত্তে এই বিচিত্র-চরিত্রা রমণীর মানসিক শক্তির আলোচনা করিতেছিলাম। ললিতলবঙ্গলতা কিছুতেই টলে না। লবঙ্গলতা মহান্ ঐশ্বর্য্য হইতে দারিদ্র্যে পড়িয়াছে—তবু সেই সুখময় হাসি; যে রজনী হইতে এই ঘোর বিপদ ঘটিয়াছে, তাহারই গৃহে উঠিতেছে, তাহার সঙ্গে আলাপ করিতেছে, তবু সেই সুখময় হাসি। অথচ আমি জানি, লবঙ্গ কোন কথাই ভুলে নাই।

আমি সরিয়া পার্শ্বের ঘরে গেলাম। লবঙ্গলতা প্রথমে সেই ঘরে প্রবেশ করিল—নিঃশঙ্কচিত্তে আজ্ঞাদায়িনী রাজরাজেশ্বরীর ন্যায় রজনীকে বলিল,—"রজনী, তুই এখন আর কোথাও যা। তোর বরের সঙ্গে আমার গোপনে কিছু কথা আছে। ভয় নাই। তোর বর সুন্দর হইলেও আমার বৃদ্ধ স্বামীর অপেক্ষা সুন্দর নহে।" রজনী অপ্রতিভ হইয়া কি ভাবিতে ভাবিতে সরিয়া গেল।

ললিতলবঙ্গলতা ভ্রূকুটি কুটিল করিয়া, সেই মধুর হাসি হাসিয়া ইন্দ্রাণীর মত আমার সম্মুখে দাঁড়াইল। একবার বৈ অমরনাথকে কেহ আত্মবিস্মৃত দেখে নাই; আবার আত্মবিস্মৃত হইলাম। সেবারেও ললিতলবঙ্গলতা—এবারেও—ললিতলবঙ্গলতা।

লবঙ্গ হাসিয়া বলিল, "আমার মুখপানে চাহিয়া কি দেখিতেছ? তোমার অর্জ্জিত ঐশ্বর্য্য কাড়িয়া লইতে আসিয়াছি কি না? মনে করিলে তাহা পারি।"

আমি বলিলাম, "তুমি সব পার, কিন্তু ঐটি পার না; পারিলে কখন রজনীকে বিষয় দিয়া এখন স্বহস্তে রাঁধিয়া সতীনকে খাওয়াইবার বন্দোবস্ত করিতে না।"

লবঙ্গ উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিল, "ওটা বুঝি বড় গায় লাগিবে মনে করেছ? সতীনকে রাঁধিয়া দিতে হয়, বড় দুঃখের কথা বটে, কিন্তু একটা পাহারাওয়ালাকে ডাকিয়া তোমাকে ধরাইয়া দিলে এখনই আবার পাঁচটা রাঁধুনী রাখিতে পারি।"

আমি বলিলাম, "বিষয় রজনীর, আমাকে ধরাইয়া দিলে কি হইবে? যাহার বিষয়, সে ভোগ করিতে থাকিবে।"

লবঙ্গ। তুমি কস্মিনকালে স্ত্রীলোক চিন্‌লে না। যাহাকে ভালবাসে, তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য রজনী এখনই বিষয় ছাড়িয়া দিবে।

আমি। অর্থাৎ আমার রক্ষার জন্য বিষয়টা তোমাকে ঘুষ দিবে ?

লবঙ্গ। তাই।

আমি। তবে এত দিন সে ঘুষ চাও নাই, আমাদিগের বিবাহ হয় নাই বলিয়া। বিবাহ হইলে কি সে ঘুষ চাহিবে ?

লবঙ্গ। তোমার মত ছোটলোকে বুঝিব কি প্রকারে ? চোরেরা বুঝিতে পারে না যে, পরের দ্রব্য অস্পৃশ্য ; রজনীর সম্পত্তি রাখিতে পারিলেও আমি রাখিব কেন ?

আমি বলিলাম, "তুমি যদি এমন না হবে, তবে আমার সে মরণ-কুবুদ্ধি ঘটিবে কেন ? যদি আমার এত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়াছ, এত অনুগ্রহ করিয়াছ, তবে আর একটি ভিক্ষা আছে। যাহা জান, তাহা যদি অন্যের কাছে না বলিয়াছ, তবে রজনীর কাছেও বলিও না।"

দর্পিতা লবঙ্গলতা ভ্রূভঙ্গী করিল,—কি সুন্দর ভ্রূভঙ্গী, বলিল, "আমি কি ঠক ? যে তোমার স্ত্রী হইবে, তাহার কাছে তোমার নামে ঠকাম করিবার জন্য তাহার বাড়ীতে আসিয়াছি ?"

এই বলিয়া লবঙ্গলতা হাসিল। তাহার হাসির মর্ম্ম আমি কিছু কখন বুঝিতে পারি না। লবঙ্গ বিলক্ষণ রাগিয়া উঠিয়াছিল—কিন্তু হাসিতে সব রাগ ভাসিয়া গেল। যেন জলের উপর হইতে মেঘের ছায়া সরিয়া গেল। তাহার উপর মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় জ্বলিতে লাগিল। আমি লবঙ্গলতার মর্ম্ম কখনও বুঝিতে পারিলাম না।

হাসিয়া লবঙ্গ বলিল, "তবে আমি রজনীর কাছে যাই ?"

"যাও।"

ললিতলবঙ্গলতা ললিতলবঙ্গলতার মত দুলিতে দুলিতে চলিল। ক্ষণেক পরে আমাকে ডাকিয়া পাঠাইল। গিয়া দেখিলাম, লবঙ্গলতা দাঁড়াইয়া আছে। রজনী তাহার পায়ে হাত দিয়া কাঁদিতেছে। আমি গেলে, লবঙ্গলতা বলিল, "শুন তোমার ভবিষ্যৎ ভার্য্যা কি বলিতেছে। তোমার সম্মুখে নহিলে এমন কথা আমি কাণে শুনিব না।"

আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি ?"

লবঙ্গলতা রজনীকে বলিল, "বল। তোমার বর আসিয়াছে—"

রজনী সকাতরে অশ্রুপূর্ণলোচনে ললিতলবঙ্গলতার চরণস্পর্শ করিয়া বলিল, "আমার এই ভিক্ষা, আমার যে কিছু সম্পত্তি আছে, এই বাবুর যত্নে আমার

যে সম্পত্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, আমি লেখাপড়া করিয়া আপনাকে দান করিব, আপনি গ্রহণ করিবেন না কি ?"

আহ্লাদে আমার সর্ব্বান্তঃকরণ প্লাবিত হইল—আমি রজনীর জন্য যে যত্ন করিয়াছিলাম—যে ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলাম, তাহা সার্থক বোধ হইল। আমি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম, এখন আরও পরিষ্কার বুঝিলাম যে, রমণীকুলে অন্ধ রজনী অদ্বিতীয় রত্ন। লবঙ্গলতার প্রোজ্জ্বল জ্যোতিও তাহার কাছে ম্লান হইল। আমি ইতিপূর্ব্বেই রজনীর অন্ধনয়নে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম—আজি তাহার কাছে বিনা মূল্যে বিক্রীত হইলাম। এই অমূল্য রত্নে আমার অন্ধকার পুরী প্রসারিত করিয়া এ জীবন সুখে কাটাইব। বিধাতা আমার কি সে দিন করিবেন না ?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

লবঙ্গলতার কথা

আমি মনে করিয়াছিলাম, রজনীর এই বিস্ময়কর কথা শুনিয়া অমরনাথ আগুনে সেঁকা কলাপাতের মত শুকাইয়া উঠিবে। কৈ তা ত কিছু দেখিলাম না। তাহার মুখ না শুকাইয়া বরং প্রফুল্ল হইল। বিস্মিত হতবুদ্ধি যা হইবার, তাহা আমি হইলাম।

আমি প্রথমে তামাসা মনে করিলাম, কিন্তু রজনীর কাতরতা, অশ্রুপাত এবং দার্ঢ্য দেখিয়া আমার নিশ্চয়ই প্রতীতি জন্মিল যে, রজনী আন্তরিক বলিতেছে। আমি বলিলাম, "রজনী, কায়েতের কুলে তুমিই ধন্য। তোমার মত কেহ নাই। কিন্তু আমি তোমার দান গ্রহণ করিব না।"

রজনী বলিল, "না গ্রহণ করেন, আমি ইহা বিলাইয়া দিব।"

আমি। অমরনাথ বাবুকে ?

রজনী। আপনি উঁহাকে সবিশেষ চিনেন না, আমি দিলেও উনি লইবেন না। লইবার অন্য লোক আছে।

আমি। অমরনাথ বাবু কি বল ?

অমর। আমার সঙ্গে কোন কথা হইতেছে না, আমি কি বলিব ?

আমি বড় ফাঁপরে পড়িলাম, রজনী যে বিষয় ছাড়িয়া দিতেছে, তাহাতে

বিস্মিত আবার অমরনাথ যে বিষয় উদ্ধারের জন্য এত করিয়াছিল, তাহার লোভে রজনীকে বিবাহ করিবার জন্য উদ্যোগ করিতেছে, সে বিষয় হাতছাড়া হইতেছে দেখিয়াও সে প্রফুল্ল। কাণ্ডখানা কি?

আমি অমরনাথকে বলিলাম যে, "যদি স্থানান্তরে যাও, তবে আমি রজনীর সঙ্গে সকল কথা মুখ ফুটিয়া কই।" অমরনাথ অমনি সরিয়া গেল। আমি তখন রজনীকে বলিলাম, "সত্য সত্যই কি তুমি বিষয় বিলাইয়া দিবে?"

"সত্য সত্যই। আমি গঙ্গাজল নিয়া শপথ করিয়া বলিতেছি।"

আমি। আমি তোমার দান লই, তুমি যদি আমার কিছু দান লও।

রজনী। অনেক লইয়াছি।

আমি। আরও কিছু লইতে হইবে।

রজনী। একখানি প্রসাদি কাপড় দিবেন।

আমি। তা না। আমি যা দিই, তাই নিতে হইবে।

রজনী। কি দিবেন?

আমি। শচীন্দ্র বলিয়া আমার একটি পুত্র আছে। আমি তোমাকে শচীন্দ্র দান করিব। স্বামিস্বরূপ তুমি তাহাকে গ্রহণ করিবে। তুমি যদি তাহাকে গ্রহণ কর, তোমার বিষয় গ্রহণ করিব।

রজনী দাঁড়াইয়া ছিল, ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িয়া অন্ধ নয়ন মুদিল। তার পর তাহার মুদিত নয়ন হইতে অবিরল জলধারা পড়িতে লাগিল—চক্ষের জল আর ফুরায় না। আমি বিষম বিপদে পড়িলাম। রজনী কথা কহে না—কেবল কাঁদে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি রজনী! অত কাঁদ কেন?"

রজনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "যে দিন গঙ্গার জলে আমি ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিলাম—ডুবিয়াছিলাম, লোকে ধরিয়া তুলিল। সে শচীন্দ্রের জন্য, তুমি যদি বলিতে, তুমি অন্ধ, তোমার চক্ষু ফুটাইয়া দিব, আমি তাহা চাহিতাম না —আমি শচীন্দ্র চাহিতাম। শচীন্দ্রের অপেক্ষা এ জগতে আর কিছুই নাই— —আমার প্রাণ তাঁহার কাছে, দেবতার কাছে ফুলের কলিমাত্র—শ্রীচরণে স্থান পাইলেই সার্থক। অন্ধের দুঃখে কথা শুনিবে কি?"

আমি রজনীর কাতরতা দেখিয়া কাতর হইয়া বলিলাম, "শুনিব।"

তখন রজনী কাঁদিতে কাঁদিতে হৃদয় খুলিয়া আমার কাছে সকল কথা বলিল। শচীন্দ্রের কণ্ঠ, শচীন্দ্রের স্পর্শ, অন্ধের রূপোন্মাদ। তাহার পলায়ন,

নিমজ্জন, উদ্ধার সকল বলিল। বলিয়া বলিল, "ঠাকুরাণি, তোমাদের চক্ষু আছে—চক্ষু থাকিলে এত ভালবাসা বাসিতে পার কি ?"

মনে মনে বলিলাম, "কাণি! তুই ভালবাসার কি জানিস্! তুমি লবঙ্গলতার অপেক্ষা সহস্র গুণে সুখী!" প্রকাশ্যে বলিলাম, "না রজনী! আমার বুড়া স্বামী—আমি অতশত জানি না। তুমি শচীন্দ্রকে তবে বিবাহ করিবে, ইহা স্থির ?"

রজনী বলিল, "না!"

আমি। সে কি ? তবে এত কথা কি বলিতেছিলে—এত কাঁদিলে কেন ?

রজনী। আমার সে সুখ কপালে নাই বলিয়াই এত কাঁদিলাম।

আমি। সে কি? আমি বিবাহ দিব।

রজনী। দিতে পারিবেন না। অমরনাথ হইতে আমার সর্ব্বস্ব। অমরনাথ আমার বিষয় উদ্ধারের জন্য যাহা করিয়াছেন, পরের জন্য পরে কি তত করে ? তাও ধরি না, তিনি আপনার প্রাণ দিয়া আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন।

রজনী সে বৃত্তান্ত বলিল। পরে কহিল, "যাহার কাছে আমি এত ঋণী, তিনি আমার যাহা করিবেন, তাহাই হইবে। তিনি যখন অনুগ্রহ করিয়া আমাকে দাসী করিতে চহিয়াছেন, তখন আমি তাঁহারই দাসী হইব, আর কাহারও নহে!"

হরি! হরি! কেন বাছাকে সন্ন্যাসী দিয়া ঔষধ করিলাম? বিবাহ ব্যতীতও বিষয় থাকে—রজনী ত এখনই বিষয় দিতে চাহিতেছে। কিন্তু ছি! রজনীর দান লইব ? ভিক্ষা মাগিয়া খাইব—সেও ভাল। আমি বলিয়াছি—আমি যদি এই বিবাহ না দিই ত আমি কায়েতের মেয়ে নই। আমি এ বিবাহ দিবই দিব। আমি রজনীকে বলিলাম, "তবে আমি তোমার দান লইব না। তুমি যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে দান করিও। আমি উঠিলাম।"

রজনী বলিল, "আর একবার বসুন। আমি অমরনাথ বাবুর দ্বারা একবার অনুরোধ করাইব। তাঁহাকে ডাকিতেছি।"

অমরনাথের সঙ্গে আর একবার সাক্ষাৎ আমার ইচ্ছা। আমি আবার বসিলাম, রজনী অমরনাথকে ডাকিল।

অমরনাথ আসিল; আমি রজনীকে বলিলাম, "অমরনাথ বাবু এ বিষয়ে

যদি অনুরোধ করিতে চাহেন, তবে সকল কথা কি তোমার সাক্ষাতে খুলিয়া বলিতে পারিবেন ? আপনার প্রশংসা আপনি দাঁড়াইয়া শুনিও না।"

রজনী সরিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

লবঙ্গলতার কথা

আমি অমরনাথকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি রজনীকে বিবাহ করিবে ?"

অ। করিব—স্থির।

আমি। এখনও স্থির ? রজনীর বিষয় ত রজনী আমাকে দিতেছে।

অ। আমি রজনীকে বিবাহ করিব—বিষয় বিবাহ করিব না।

আমি। বিষয়ের জন্যই ত রজনীকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলে ?

অ। স্ত্রীলোকের মন এমনই কদর্য্য।

আমি। আমাদের উপর এত অভক্তি কত দিন ?

অ। অভক্তি নাই—তাহা হইলে বিবাহ করিতে চাহিতাম না।

আমি। কিন্তু বাছিয়া বাছিয়া অন্ধ কন্যাতে এত অনুরাগ কেন ? তাই বিষয়ের কথা বলিতেছিলাম !

অ। তুমি বৃদ্ধতে এত অনুরক্ত কেন ? বিষয়ের জন্য কি ?

আমি। কাহারও সাক্ষাতে তাহার স্বামীকে বুড়া বলিতে নাই। আমার সঙ্গে রাগারাগি কেন ? তুমি কি মুখরা স্ত্রীলোকের মুখকে ভয় কর না ? (কিন্তু রাগারাগি আমার আন্তরিক বাসনা)

অমরনাথ বলিল, "ভয় করি বৈকি ? রাগের কথা কিছু বলি নাই। তুমি যেমন মিত্রজাকে ভালবাস, আমিও রজনীকে তেমনি ভালবাসি।"

আমি। কটাক্ষের গুণে না কি ?

অ। না। কটাক্ষ নাই বলিয়া। তুমিও কাণা হইলে আরও সুন্দর হইতে।

আমি। সে কথা মিত্রজাকে জিজ্ঞাসা করিব, তোমাকে নহে। সম্প্রতি তুমিও যেমন রজনীকে ভালবাস, আমিও রজনীকে তেমনই ভালবাসি।

অ। তুমি রজনীকে বিবাহ করিতে চাও না কি ?

আমি। প্রায়। আমি নিজে তাহাকে বিবাহ না করি, তাহার ভাল বিবাহ দিতে চাই। তোমার সঙ্গে তাহার বিবাহ হইতে দিব না।

অ। আমি সুপাত্র। রজনীর এরূপ আর জুটিতেছে না।

আমি। তুমি কুপাত্র। আমি সুপাত্র জুটাইয়া দিব।

অ। আমি কুপাত্র কিসে?

আমি। কামিজটা খুলিয়া পিঠ বাহির কর দেখি।

অমরনাথের মুখ শুকাইয়া কাল হইয়া গেল। অতি দুঃখিতভাবে বলিল, "ছি! লবঙ্গ!"

আমার দুঃখ হইল, কিন্তু দুঃখ দেখিয়া ভুলিলাম না। বলিলাম, "একটি গল্প বলিব, শুনিবে?"

আমি কথা চাপা দিতেছি মনে করিয়া অমরনাথ বলিল, "শুনিব।"

আমি তখন বলিতে লাগিলাম, প্রথম যৌবন কালে লোকে আমাকে রূপবতী বলিত।"

অ। এটা যদি গল্প, তবে সত্য কোন্ কথা?

আমি। পরে শোন। সেই রূপ দেখিয়া এক চোর মুগ্ধ হইয়া, আমার পিত্রালয়ে যে ঘরে আমি এক পরিচারিকার সঙ্গে শয়ন করিয়া ছিলাম, সেই ঘরে সিঁধ দিল।

এই কথা বলিতে আরম্ভ করায় অমরনাথ গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উঠিল। বলিল, "ক্ষমা কর।"

আমি বলিতে লাগিলাম, "সেই চোর সিঁধপথে আমার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। ঘরে আলো জ্বলিতেছিল—আমি চোরকে চিনিলাম, ভীতা হইয়া পরিচারিকাকে উঠাইলাম। সে চোরকে চিনিত না। আমি তখন অগত্যা চোরকে আদর করিয়া আশ্বস্ত করিয়া পালঙ্কে বসাইলাম।"

অমর। ক্ষমা কর, সে ত সকলই জানি।

আমি। তবু একবার স্মরণ করাইয়া দেওয়া ভাল। ক্ষণেক পরে চোখের অলক্ষ্যে আমার সঙ্কেতানুসারে পরিচারিকা বাহিরে গিয়া দ্বারবান্‌কে ডাকিয়া লইয়া সিঁধমুখে দাঁড়াইয়া রইল। আমিও সময় বুঝিয়া বাহিরে প্রয়োজন ছলনা করিয়া নির্গত হইয়া, বাহির হইতে একমাত্র দ্বারের শৃঙ্খল বন্ধ করিলাম। মন্দ করিয়াছিলাম?

অমরনাথ বলিল, "এ সকল কথা কেন?"

আমি। পরে চোর নির্গত হইল কি প্রকারে, বল দেখি? ডাকিয়া পাড়ার লোক জমা করিলাম। বড় বড় বলবান্ আসিয়া চোরকে ধরিল। চোর লজ্জায় মুখে কাপড় দিয়া রহিল। আমি দয়া করিয়া তাহার মুখের কাপড় খুলাইলাম না, কিন্তু স্বহস্তে লোহার শলা তপ্ত করিয়া তাহার পিঠে লিখিয়া দিলাম—

"চোর"

অমরবাবু অতি গ্রীষ্মেও কি আপনি গায়ের জামা খুলিয়া শয়ন করেন না?

আ। না।

আমি। লবঙ্গলতার হস্তাক্ষর মুছিবার নহে। আমি রজনীকে ডাকিয়া এই গল্প শুনাইয়া যাই, ইচ্ছা ছিল কিন্তু শুনাইব না, তুমি রজনীর যোগ্য নহ, রজনীকে বিবাহ করিতে চেষ্টা পাইও না। যদি ক্ষান্ত না হও, তবে সুতরাং শুনাইতে বাধ্য হইব।

অমরনাথ কিছুক্ষণ ভাবিল। পরে দুঃখিতভাবে বলিল, "শুনাইতে হয়, শুনাইও, তুমি শুনাও বা না শুনাও, আমি স্বয়ং আজি তাহাকে সকল শুনাইব। আমার দোষ-গুণ সকল শুনিয়া রজনী আমাকে গ্রহণ করিতে হয়, গ্রহণ করিবে, না করিতে হয়, না করিবে। আমি তাহাকে প্রবঞ্চনা করিব না।"

আমি হাসিয়া মনে মনে অমরনাথকে শত শত ধন্যবাদ করিতে করিতে, হর্ষ-বিষাদে ঘরে আসিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শচীন্দ্রনাথের কথা

ঐশ্বর্য্য হারাইয়া কিছু দিন পরে আমি পীড়িত হইলাম। ঐশ্বর্য্য হইতে দারিদ্র্যে পতনের আশঙ্কায় মনে কোন বিকার উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া কি, কি জন্য এই পীড়ার উৎপত্তি, তাহা আমি বলিবার কোন চেষ্টা পাইব না। কেবল পীড়ার লক্ষণ বলিব।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে রৌদ্রের তাপ অপনীত হইলে পর প্রাসাদের উপর বসিয়া অধ্যয়ন করিতেছিলাম, সমস্ত দিবস অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। জগতের দুরূহ

গূঢ়তত্ত্ব সকলের আলোচনা করিতেছিলাম। কিছুরই মর্ম্ম বুঝিতে পারি না, কিন্তু কিছুতেই আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি পায় না। যত পড়ি, তত পড়িতে সাধ করে। শেষে শ্রান্তিবোধ হইল। পুস্তক বন্ধ করিয়া হস্তে লইয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম। একটু নিদ্রা আসিল—অথচ নিদ্রা নহে। সে মোহ নিদ্রার ন্যায় সুখকর বা তৃপ্তিজনক নহে। ক্লান্ত হস্ত হইতে পুস্তক খসিয়া পড়িল। চক্ষু চাহিয়া আছি—বাহ্যবস্তু সকলই দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু কি দেখিতেছি তাহা বলিতে পারি না। অকস্মাৎ সেইখানে প্রভাতবীচিবিক্ষেপ-চপলা কলকলনাদিনী নদী বিস্তৃত দেখিলাম। যেন তথা উষার উজ্জ্বলবর্ণে পূর্ব্বদিক প্রভাসিত হইতেছে —দেখি, সেই গঙ্গা-প্রবাহমধ্যে, সৈকতমূলে রজনী। রজনী জলে নামিতেছে। ধীরে, ধীরে, ধীরে! অন্ধ অথচ কুঞ্চিত ভ্রূ; বিকলা অথচ স্থিরা; সেই প্রভাত শান্তিশীতলা ভাগীরথীর ন্যায় গম্ভীরা, ধীরা সেই ভাগীরথীর ন্যায় অন্তরে দুর্জ্জয় বেগশালিনী! ধীরে ধীরে, ধীরে,—জলে নামিতেছে। দেখিলাম, কি সুন্দর। রজনী কি সুন্দরী! বৃক্ষ হইতে নবমঞ্জরীর সুগন্ধের ন্যায়, দূরশ্রুত সঙ্গীতের শেষ ভাগের ন্যায়, রজনী জলে, ধীরে—ধীরে—ধীরে নামিতেছে। ধীরে রজনী। ধীরে। আমি দেখি তোমায়। তখন অনাদর করিয়া দেখি নাই, এখন একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লই। ধীরে রজনী, ধীরে!

আমার মূর্চ্ছা হইল। মূর্চ্ছার লক্ষণ সকল আমি অবগত নহি। যাহা পশ্চাৎ শুনিয়াছি, তাহা বলিয়া কোন ফল নাই। আমি যখন পুনর্ব্বার চেতনা প্রাপ্ত হইলাম, তখন আমার নিকটে অনেক লোক। কিন্তু আমি সে সকল কিছুই দেখিলাম না। আমি দেখিলাম—কেবল সেই মৃদুনাদিনী গঙ্গা, আর সেই মৃদুগামিনী রজনী ধীরে, ধীরে, ধীরে জলে নামিতেছে। চক্ষু মুদিলাম, তবু দেখিলাম, সেই গঙ্গা আর সেই রজনী! আবার চাহিলাম, আবার দেখিলাম, সেই গঙ্গা, আর সেই রজনী! দিগন্তরে চাহিলাম, আবার সেই রজনী, ধীরে ধীরে ধীরে জল নামিতেছে। উর্দ্ধে চাহিলাম, উর্দ্ধেও আকাশ-বিহারিণী গঙ্গা ধীরে ধীরে ধীরে বহিতেছে, আকাশবিহারিণী রজনী ধীরে, ধীরে, নামিতেছে। অন্য দিকে মন ফিরাইলাম, তথাপি সেই গঙ্গা আর সেই রজনী। আমি নিরস্ত হইলাম। চিকিৎসকেরা আমার চিকিৎসা করিতে লাগিল।

অনেক দিন ধরিয়া আমার চিকিৎসা হইতে লাগিল, কিন্তু আমার নয়নাগ্র হইতে রজনীরূপ তিলেক জন্য অন্তর্হিত হইল না। আমি জানি না আমার

কি রোগ বলিয়া চিকিৎসকেরা চিকিৎসা করিতেছিল। আমার নয়নাগ্রে যে রূপ অহরহঃ নাচিতেছিল, তাহার কথা কাহাকেও বলি নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শচীন্দ্রের কথা

ওহে ধীরে, রজনী, ধীরে! ধীরে, ধীরে আমার এই হৃদয়-মন্দিরে প্রবেশ কর! এত দ্রুতগামিনী কেন? তুমি, অন্ধ, পথ চেন না, ধীরে রজনী, ধীরে! ক্ষুদ্র এই পুরী, আঁধার, আঁধার, আঁধার! চিরান্ধকার! দীপশলাকার ন্যায় ইহাতে প্রবেশ করিয়া আলো কর,—দীপশলাকার ন্যায় আপনি পুড়িবে, কিন্তু এ আঁধার পুরী আলো করিবে।

ওহে ধীরে, রজনী, ধীরে! এ পুরী আলো কর, কিন্তু দাহ কর কেন? কে জানে যে শীতল প্রস্তরেও দাহ করিবে—তোমায় ত পাষাণগঠিতা পাষাণময়ী জানিতাম, কে জানে যে, পাষাণেও দাহ করিবে? অথবা কে জানে, পাষাণে ও লৌহে সংঘর্ষণেই অগ্ন্যুৎপাত হয়। তোমার প্রস্তরধবল, প্রস্তর-স্নিগ্ধদর্শন, প্রস্তরগঠিতবৎ মূর্ত্তি যত দেখি, ততই দেখিতে ইচ্ছা হয়। অন্যদিন পলকে পলকে দেখিয়াও মনে হয়, দেখিলাম কৈ? আবার দেখি। আবার দেখি, কিন্তু দেখিয়াও ত সাধ মিটিল না।

পীড়িতাবস্থায় আমি প্রায় কাহারও সঙ্গে কথা কহিতাম না। কেহ কথা কহিতে আসিলে ভাল লাগিত না। রজনীর কথা মুখে আনিতাম না—কিন্তু প্রলাপকালে কি বলিতাম না বলিতাম, তাহা স্মরণ করিয়া বলিতে পারি না। প্রলাপ সচরাচরই ঘটিত।

শয্যা প্রায় ত্যাগ করিতাম না। শুইয়া শুইয়া কত কি দেখিতাম, তাহা বলিতে পারি না। কখন দেখিতাম, সমরক্ষেত্রে যবনিকাপাত হইতেছে; রক্তের নদী বহিতেছে; কখন দেখিতাম সুবর্ণপ্রান্তরে হীরকবৃক্ষে স্তবকে স্তবকে নক্ষত্র ফুটিয়া আছে। কখন দেখিতাম, আকাশমার্গে অষ্টশশী-সমন্বিত শনৈশ্চর মহাগ্রহ চতুশ্চক্রবাহী বৃহস্পতির উপর মহাবেগে পতিত হইল—গ্রহ উপগ্রহ সকল খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল—আঘাতোৎপন্ন বহ্নিতে সে সকল জ্বলিয়া উঠিয়া দাহ্যমানাবস্থাতে মহাবেগে বিশ্বমণ্ডলের

চতুর্দ্দিকে প্রধাবিত হইতেছে। কখন দেখিতাম, এই জগৎ জ্যোতির্ম্ময় কান্তরূপধর দেবযোনির মূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ; তাহারা অবিরত অম্বর পথ প্রভাসিত করিয়া বিচরণ করিতেছে। তাহাদিগের অঙ্গের সৌরভে আমার নাসারন্ধ্র পরিপূর্ণ হইতেছে, কিন্তু যাহাই দেখি না, সকলের মধ্যস্থলে রজনীর সেই প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি দেখিতে পাইতাম। হায়! রজনী! পাথরে এত আগুন?

ধীরে রজনি, ধীরে, ধীরে, ধীরে রজনী, ঐ অন্ধ নয়ন উন্মিলিত কর! দেখ, আমায় দেখ, আমি তোমায় দেখি! ঐ দেখিতেছি—তোমার নয়নপদ্ম ক্রমে প্রস্ফুটিত হইতেছে—ক্রমে, ক্রমে, ক্রমে, ধীরে, ধীরে, ধীরে, ধীরে নয়নরাজীব ফুটিতেছে, এঁ সংসারে কাহার না নয়ন আছে? গো, মেষ, কুক্কুর, মার্জ্জার ইহাদেরও নয়ন আছে—তোমার নাই? নাই, নাই, তবে আমারও নাই। আমিও আর চক্ষু চাহিব না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

লবঙ্গলতার কথা

আমি জানিতাম, শচীন্দ্র একটা কাণ্ড করিবে—ছেলেবয়সে অত ভাবিতে আছে! দিদি ত একবার চেয়েও দেখেন না—আমি বলিলে বিমাতা বলিয়া আমার কথা গ্রাহ্য করে না। ও সব ছেলেকে আঁটিয়া উঠা ভার। এখন দায় দেখিতেছি আমার। ডাক্তার বৈদ্য কিছু করিতে পারিল না, পারিবেও না। তারা রোগই নির্ণয় করিতে জানে না—রোগ হলো মনে—হাত দেখিলে, চোখ দেখিলে, জিভ দেখিলে তারা কি বুঝিবে? যদি তারা আমার মত আড়ালে লুকাইয়া বসিয়া আড়ি পেতে ছেলের কাণ্ড দেখিত, তবে এক দিন রোগের ঠিকানা করিলে করিতে পারিত।

কথাটা কি? "ধীরে রজনী!" ছেলে ত একেলা থাকিলে এই কথাই বলে। সন্ন্যাসী ঠাকুরের ঔষধে কি এই ফল ফলিল? আমার মাথা খাইতে কেন আমি এমন কাজ করিলাম? ভাল, রজনীকে একবার রোগীর কাছে বসাইয়া রাখিলে হয় না? কৈ, আমি রজনীর বাড়ী গিয়াছিলাম,

সেত সেই অবধি আমার বাড়ী একবারও আসে নাই। ডাকিয়া পাঠাইলে না আসিয়া থাকিত পারিবে না। এই ভাবিয়া রজনীর গৃহে লোক পাঠাইলাম—বলিয়া পাঠাইলাম যে, আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, একবার আসিতে বলিও।

মনে করিলাম, আগে একবার শচীন্দ্রের কাছে রজনীব কথা পাড়িয়া দেখি। তাহা হইলে বুঝিতে পারিব, রজনীর সঙ্গে শচীন্দ্রের পীডার কোন সম্বন্ধ আছে কি না ?

অতএব প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার জন্য শচীন্দ্রের কাছে গিয়া বসিলাম। এ-কথা ও-কথার পর রজনীর প্রসঙ্গ ছলে পাডিলাম। আর কেহ সেখানে ছিল না। রজনীর নাম শুনিবামাত্র বাছা অমনি চমকিত হংসীর ন্যায় গ্রীবা তুলিয়া আমার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল। আমি যত রজনীর কথা বলিতে লাগিলাম, শচীন্দ্র কিছুই উত্তর করিল না, কিন্তু ব্যাকুলিত চক্ষে আমার প্রতি চাহিয়া রহিল। ছেলে বড় অস্থির হইয়া উঠিল—এটা পাড়ে, সেটা ভাঙ্গে, এইরূপ আরম্ভ করিল। আমি পরিশেষে রজনীকে তিরস্কার করিতে লাগিলাম ; সে অত্যন্ত ধনলুব্ধা, আমাদের পূর্ব্বকৃত উপকার কিছুমাত্র স্মরণ করিল না। এইরূপ কথাবার্ত্তা শুনিয়া শচীন্দ্র অপ্রসন্ন ভাবাপন্ন, হইলেন, এমন আমার বোধ হইল, কিন্তু কথায় কিছু প্রকাশ পাইল না।

নিশ্চয় বুঝিলাম, এটি সন্ন্যাসীর কীর্ত্তি। তিনি এক্ষণে স্থানান্তরে গিযাছেন, অল্প দিনে আসিবার কথা ছিল ; তাঁহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। কিন্তু তাহাও মনে ভাবিতে লাগিলাম যে, তিনিই বা কি করিবেন ? আমি নির্ব্বোধ দুরাকাঙ্ক্ষাপরবশ স্ত্রীলোক—ধনের লোভে অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া আপনিই এই বিপত্তি উপস্থিত করিয়াছি। তখন মনে জানিতাম যে, রজনীকে নিশ্চয়ই পুত্রবধূ করিব। তখন কে জানে যে, কাণা ফুলওয়ালীও দুর্ল্লভ হইবে ? কে জানে যে, সন্ন্যাসীর মন্ত্রৌষধে হিতে বিপরীত হইবে ? স্ত্রীলোকের বুদ্ধি অতি ক্ষুদ্র, তাহা জানিতাম না ; আপনার বুদ্ধির অহঙ্কারে আপনি মজিলাম। আমার এমন বুদ্ধি হইবার আগে আমি মরিলাম না কেন ? এখন ইচ্ছা হইতেছে মরি, কিন্তু শচীন্দ্র বাবুর আরোগ্য না দেখিয়া মরিতে পারিতেছি না।

কিছু দিন পরে কোথা হইতে সেই পূর্ব্ব-পরিচিত সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন, তিনি শচীন্দ্রের পীড়া শুনিয়া দেখিতে

আসিয়াছেন, কে তাঁহাকে শচীন্দ্রের পীড়ার সংবাদ দিল, তাহা কিছুই বলিলেন না।

শচীন্দ্রের পীড়ার বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শুনিলেন, পরে শচীন্দ্রের কাছে বসিয়া নানা প্রকার কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তৎপরে প্রণাম করিবার জন্য আমি তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। প্রণাম করিয়া মঙ্গল-জিজ্ঞাসার পর বলিলাম, "মহাশয় সর্ব্বজ্ঞ; না জানেন, এমন তত্ত্বই নাই। শচীন্দ্রের কি রোগ আপনি অবশ্য জানেন।"

তিনি বলিলেন, "উহা বায়ুরোগ। অতি দুশ্চিকিৎস্য?"

আমি বলিলাম, "তবে শচীন্দ্র সর্ব্বদা রজনী নাম করে কেন?"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "তুমি বালিকা, বুঝিবে কি?"

(কি সর্ব্বনাশ, আমি বালিকা, আমি শচীর মা!)

"এই রোগের এক গতি এই যে, হৃদয়স্থ লুক্কায়িত এবং অপরিচিত ভাব বা প্রবৃত্তি সকল প্রকাশিত হইয়া পড়ে এবং অত্যন্ত বলবান্ হইয়া উঠে। শচীন্দ্র কদাচিৎ আমাদিগের দৈববিদ্যা সকলের পরীক্ষার্থী হইলে আমি কোন তান্ত্রিক অনুষ্ঠান করিলাম। তাহাতে যে তাঁহাকে আন্তরিক ভালবাসে, তিনি তাহাকে স্বপ্নে দেখিবেন। শচীন্দ্র রাত্রিযোগে রজনীকে স্বপ্নে দেখিলেন। স্বাভাবিক নিয়ম এই যে, যে আমাদিগকে ভালবাসে বুঝিতে পারি, আমরা তাহার প্রতি অনুরক্ত হই। অতএব সেই রাত্রে শচীন্দ্রের মনে রজনীর প্রতি অনুরাগের বীজ গোপনে সমারোপিত হইল। কিন্তু রজনী অন্ধ এবং ইতর লোকের কন্যা ইত্যাদি কারণে সে অনুরাগ প্রস্ফুট হইতে পারে নাই। অনুরাগের লক্ষণ স্বহৃদয়ে কিছু দেখিতে পাইলেও শচীন্দ্র তৎপ্রতি বিশ্বাস করেন নাই। ক্রমে ঘোরতর দারিদ্র্যদুঃখের আশঙ্কা তোমাদিগকে পীড়িত করিতে লাগিল। সর্ব্বাপেক্ষা শচীন্দ্রই তাহাতে গুরুতর ব্যথা পাইলেন। অন্যমনে দারিদ্র্যদুঃখ ভুলিবার জন্য শচীন্দ্র অধ্যয়নে মন দিলেন। অন্যমনা হইয়া বিদ্যালোচনা করিতে লাগিলেন। সেই বিদ্যালোচনার আধিক্যহেতু চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিল। তাহাতেই এই মানসিক রোগের সৃষ্টি। সেই মানসিক রোগকে অবলম্বন করিয়া রজনীর প্রতি সেই বিলুপ্তপ্রায় অনুরাগ পুনঃ প্রস্ফুটিত হইল। এখন আর শচীন্দ্রের সে মানসিক শক্তি ছিল না যে, তদ্দ্বারা তিনি সেই অবহিত অনুরাগকে প্রশমিত করেন। বিশেষ পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই সকল মানসিক পীড়ার কারণ যে, গুপ্ত মানসিক ভাব

বিকসিত হয়, তাহা অপ্রাকৃত হইয়া উঠে। তখন তাহা বিকারের স্বরূপ প্রতীয়মান হয়। শচীন্দ্রের সেইরূপ এ বিকার।"

আমি তখন কাতর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "ইহার প্রতিকারের কি হইবে?" সন্ন্যাসী বলিলেন, "আমি ডাক্তারী শাস্ত্রের কিছুই জানি না। ডাক্তারদিগের দ্বারা এ রোগ উপশম হইতে পারে কি না, তাহা বিশেষ বলিতে পারি না. কিন্তু ডাক্তারেরা কখনও এ সকল রোগের প্রতিকার করিয়াছে, এমন আমি শুনি নাই।"

আমি বলিলাম যে, "অনেক ডাক্তার দেখান হইয়াছে, কোন উপকার হয় নাই।"

স। সচরাচর বৈদ্যচিকিৎসকেব দ্বারাও কোন উপকার হইবে না।

আমি। তবে কি কোন উপায় নাই?

স। যদি বল, তবে আমি ঔষধ দিই।

আমি। আপনার ঔষধের অপেক্ষা কাহার ঔষধ? আপনি আমাদের রক্ষাকর্ত্তা আপনিই ঔষধ দিন।

স। তুমি বাড়ীর গৃহিণী। তুমি বলিলেই ঔষধ দিতে পারি। শচীন্দ্রও তোমার বাধ্য। তুমি বলিলেই সে আমার ঔষধ সেবন করিবে। কিন্তু কেবল ঔষধে আরোগ্য হইবে না। মানসিক পীড়ার মানসিক চিকিৎসা চাই। রজনীকে চাই।

আমি। রজনী আসিবে। ডাকিয়া পাঠাইয়াছি।

স। কিন্তু রজনীর আগমনে ভাল হইবে কি মন্দ হইবে, তাহাও বিবেচ্য। এমন হইতে পারে যে, রজনীর প্রতি এই অপ্রাকৃত অনুরাগ রুগ্নাবস্থায় দেখা সাক্ষাৎ হইলে বদ্ধমূল হইয়া স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হইবে। যদি রজনীর সঙ্গে বিবাহ না হয়, তবে রজনীর না আসাই ভাল।

আমি। রজনীর আসা ভাল হউক, মন্দ হউক, তাহা বিচার করিবার সময় নাই। ঐ দেখুন, রজনী আসিতেছে।

সেই সময় একজন পরিচারিকার সঙ্গে রজনী আসিয়া উপস্থিত হইল। অমরনাথও শচীন্দ্রের পীড়া শুনিয়া স্বয়ং শচীন্দ্রকে দেখিতে আসিয়াছিলেন এবং রজনীকে সঙ্গে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছিলেন। আপনি বহির্ব্বাটিতে থাকিয়া, পরিচারিকার সঙ্গে তাহাকে অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

পঞ্চম খণ্ড

অমরনাথের কথা

প্রথম পরিচ্ছেদ

এই অন্ধ পুষ্পনারী কি মোহিনী জানে, তাহা বলিতে পারি না। চক্ষে কটাক্ষ নাই, অথচ আমার মত সন্ন্যাসীকেও মোহিত করিল। আমি মনে করিয়াছিলাম, লবঙ্গলতার পর আর কখন কাহাকে ভালবাসিব না। মনুষ্যের সকলই অনর্থক দম্ভ। অন্য দূরে থাক্, সহজেই এই অন্ধ পুষ্পনারী কর্ত্তৃক মোহিত হইলাম।

মনে করিয়াছিলাম—এ জীবন অমাবস্যার রাত্রিস্বরূপ—অন্ধকারেই কাটিবে—সহসা চন্দ্রোদয় হইল। মনে করিয়াছিলাম—এ জীবনসিন্ধু সাঁতরাইয়াই আমাকে পার হইতে হইবে—সহসা সম্মুখে সুবর্ণ সেতু দেখিলাম। মনে করিয়াছিলাম, এ মরুভূমি এমনই চিরকাল দগ্ধক্ষেত্র থাকিবে, রজনী সহসা সেখানে নন্দন-কানন আনিয়া বসাইল। আমার এ সুখের আর সীমা নাই। চিরকাল যে অন্ধকার গুহামধ্যে বাস করিয়াছে, সহসা যে যদি এই সূর্য্যকিরণ-সমুজ্জ্বল তরুপল্লব-কুসুম-সুশোভিত মনুষ্য-লোকে স্থাপিত হয়, তাহার যে আনন্দ, আমার সেই আনন্দ। যে চিরকাল পরাধীন, পরপীড়িত, দাসানুদাস ছিল, সে যদি হঠাৎ সর্ব্বেশ্বর সার্ব্বভৌম হয়, তাহার যে আনন্দ, আমার সেই আনন্দ! রজনীর মত যে জন্মান্ধ, হঠাৎ তাহার চক্ষু ফুটিলে যে আনন্দ, রজনীকে ভালবাসিয়া আমার সে আনন্দ!

কিন্তু এ আনন্দ পরিণামে কি হইবে, তাহা বলিতে পারি না। আমি চোর। আমার পিঠে আগুনের অক্ষরে আছে যে, আমি চোর। যে দিন রজনী সেই অক্ষরে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, এ কিসের দাগ—আমি তাহাকে কি বলিব? বলিব কি যে, ও কিছু নহে? সে অন্ধ, কিন্তু যাহাকে অবলম্বন করিয়া আমি সংসারে সুখী হইতে চাহিতেছি—তাহাকে আবার প্রতারণা করিব? যে পারে, সে করুক। আমি যখন পারিয়াছি, তখন ইহার অপেক্ষাও গুরুতর দুষ্কার্য্য করিয়াছি—করিয়া ফলভোগ করিয়াছি—

আর কেন? আমি লবঙ্গলতার কাছে বলিয়াছিলাম, সকল কথা রজনীকে বলিব, কিন্তু বলিতে মুখ ফুটে নাই। এখন বলিব।

সে দিন রজনী শচীন্দ্রকে দেখিয়া আসিয়াছিল, সেই দিন অপরাহ্নে আমি রজনীকে এই কথা বলিতে গেলাম। গিয়া দেখিলাম যে, সে একা বসিয়া কাঁদিতেছে। আমি তখন তাহাকে কিছু না বলিয়া রজনীর মাসীকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, রজনী কাঁদিতেছে কেন? তাহার মাসী বলিল যে, কি জানি? মিত্রদিগের বাড়ী হইতে আসিয়া অবধি রজনী কাঁদিতেছে। আমি স্বয়ং শচীন্দ্রের নিকট যাই নাই—আমার প্রতি শচীন্দ্র বিরক্ত, যদি আমাকে দেখিয়া তাহার পীড়াবৃদ্ধি হয়, এই আশঙ্কায় যাই নাই—সুতরাং সেখানে কি হইয়াছিল, তাহা জানিতাম না। রজনীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন কাঁদিতেছে?" রজনী চক্ষু মুছিয়া চুপ করিয়া রহিল।

আমি বড় কাতর হইলাম। বলিলাম, "দেখ রজনী। তোমার যাহা কিছু দুঃখ তাহা জানিতে পারিলে আমি প্রাণপাত করিয়া তাহা নিবারণ করিব—তুমি কি দুঃখে কাঁদিতেছ, আমায় বলিবে না?"

রজনী আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিল। বহুকষ্টে আবার রোদন সংবরণ করিয়া বলিল, "আপনি এত অনুগ্রহ করেন, কিন্তু আমি তাহার যোগ্য নহি।"

আমি। সে কি রজনী। আমি মনে জানি, আমিই তোমার যোগ্য নহি। আমি তোমাকে সেই কথাই বলিতে আসিয়াছি।

রজনী। আমি আপনার অনুগৃহীত দাসী, আমাকে অমন কথা কেন বলেন?

আমি। শুন রজনী! আমি তোমাকে বিবাহ করিয়া ইহজন্ম সুখে কাটাইব, এই আমার একান্ত ভরসা। এ আশা আমার ভগ্ন হইলে বুঝি আমি মরিব, কিন্তু সে আশাতেও যে বিঘ্ন, তাহা তোমাকে বলিতে আসিয়াছি। শুনিয়া উত্তর দিও, না শুনিয়া উত্তর দিও না। প্রথম-যৌবনে একদিন আমি রূপান্ধ হইয়া উন্মত্ত হইয়াছিলাম—জ্ঞান হারাইয়া চোরের কাজ করিয়াছিলাম। অঙ্গে আজিও তাহার চিহ্ন আছে। সেই কথাই তোমাকে বলিতে আসিয়াছি।

তখন ধীরে, ধীরে, নিতান্ত ধৈর্য্যমাত্র সহায় করিয়া সেই অকথনীয় কথা

রজনীকে বলিলাম। রজনী অন্ধ, তাই বলিতে পারিলাম, চক্ষে চক্ষে সন্দর্শন হইলে বলিতে পারিতাম না।

রজনী নীরব হইয়া রহিল। আমি তখন বলিলাম, "রজনী! রূপোন্মাদে উন্মত্ত হইয়া প্রথম-যৌবনে একদিন এই অজ্ঞানের কার্য্য করিয়াছিলাম। আর কখনও কোন অপরাধ করি নাই। চিরজীবন সেই একদিনের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছি। আমাকে কি তুমি গ্রহণ করিবে?"

রজনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আপনি যদি চিরকাল দস্যুবৃত্তি করিয়া থাকেন, আপনি যদি সহস্র ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, স্ত্রীহত্যা করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও আপনি আমার কাছে দেবতা। আপনি আমাকে চরণে স্থান দিলেই আমি আপনার দাসী হইব। কিন্তু আমি আপনার যোগ্যা নহি। সেই কথাটি আপনার শুনিতে বাকী আছে।

আমি। সে কি রজনী!

রজনী। আমার এই পাপ মন পরের কাছে বিক্রীত।

আমি চমকিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে কি রজনী!"

রজনী বলিল,—আমি স্ত্রীলোক—আপনার কাছে ইহার অধিক আর কি প্রকারে বলিব? কিন্তু লবঙ্গ ঠাকুরাণী সকল জানেন। যদি আপনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, তবে সকল শুনিতে পাইবেন। বলিবেন, "আমি সকল কথা বলিতে বলিয়াছি।"

আমি তখনই মিত্রদিগের গৃহের দিকে গেলাম; যে প্রকারে লবঙ্গের সাক্ষাৎ পাইলাম, তাহা লিখিয়া ক্ষুদ্র বিষয়ে কালক্ষেপ করিব না। দেখিলাম, লবঙ্গলতা ধূল্যবলুণ্ঠিতা হইয়া শচীন্দ্রের জন্য কাঁদিতেছে। যাইবামাত্র লবঙ্গলতা আমার পা জড়াইয়া আরও কাঁদিতে লাগিল—বলিল, "ক্ষমা কর! তোমার উপর আমি এত অত্যাচার করিয়াছিলাম বলিয়া বিধাতা আমাকে দণ্ডিত করিয়াছেন। আমার গর্ভজ পুত্রের অধিক প্রিয় পুত্র শচীন্দ্র বুঝি আমারই দোষে প্রাণ হারায়। আমি বিষ খাইয়া মরিব। আমি তোমার সম্মুখে বিষ খাইয়া মরিব।"

আমার বুক ভাঙ্গিয়া গেল। রজনী কাঁদিতেছে, লবঙ্গ কাঁদিতেছে। ইহারা স্ত্রীলোক, চক্ষের জল ফেলে, আমার চক্ষের জল পড়িতেছিল না—কি রজনীর কথায় আমার হৃদয়ের ভিতর হইতে রোদনধ্বনি উঠিতেছিল। লবঙ্গ

কাঁদিতেছে, রজনী কাঁদিতেছে, আমি কাঁদিতেছি—আর শচীন্দ্রের এই দশা। কে বলে সংসার সুখের? সংসার অন্ধকার!

আপনার দুঃখ রাখিয়া আগে লবঙ্গের দুঃখের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। লবঙ্গ তখন কাঁদিতে কাঁদিতে শচীন্দ্রের পীড়ার বৃত্তান্ত সমুদয় বলিল। সন্ন্যাসীর বিদ্যাপরীক্ষা হইতে রুগ্নশয্যায় রজনীর সঙ্গে সাক্ষা, র্যন্ত লবঙ্গ সকল বলিল।

তারপর রজনীর কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। বলিলাম, "রজনী সকল কথা বলিতে বলিয়াছে, বল।"

লবঙ্গ তখন রজনীর কাছে যাহা শুনিয়াছিল, অকপটে সকল বলিল।

রজনী শচীন্দ্রের, শচীন্দ্র রজনীর, মাঝখানে আমি কে?

এবারে বস্ত্রে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আমি ঘরে ফিরিয়া আসিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এ ভবের হাট হইতে আমার দোকানপাট উঠাইতে হইল। আমার অদৃষ্টে সুখ বিধাতা লেখেন নাই—পরের সুখ কাড়িয়া লইব কেন? শচীন্দ্রের রজনী শচীন্দ্রকে দিয়া আমি এ সংসার ত্যাগ করিব। এ হাট ভাঙ্গিব, এ হৃদয়কে শাসিত করিব—যিনি সুখ-দুঃখের অতীত, তাঁহারই চরণে সকল সমর্পণ করিব।

প্রভো, তোমার অনেক সন্ধান করিয়াছি, কৈ তুমি? দর্শনে-বিজ্ঞানে তুমি নাই। জ্ঞানীর জ্ঞানে—ধ্যানীর ধ্যানে তুমি নাই। তুমি অপ্রমেয়, এজন্য তোমার পক্ষে প্রমাণ নাই। এই স্ফুটিতোন্মুখ হৃৎপদ্মেই তোমার প্রমাণ—ইহাতে তুমি আরোহণ কর। আমি অন্ধ পুষ্পনারীকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার ছায়া সেখানে স্থাপন করি।

তুমি নাই? না থাক, তোমার নামে আমি সকল উৎসর্গ করিব। "অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং তস্মৈ নমঃ" বলিয়া এ কলঙ্কলাঞ্ছিত দেহ উৎসর্গ করিব। তুমি যাহা দিয়াছ, তুমি কি লইবে না? তুমি লইবে, নহিলে এ কলঙ্কের ভার আজ কে পবিত্র করিবে?

প্রভো! আপনার কাছে একটা নিবেদন আছে। এ দেহ কলঙ্কিত করাইল

কে, তুমি না আমি? আমি যে অসৎ, অসার, দোষ আমার না তোমার? আমার এ মণিহারীর দোকান সাজাইল কে, তুমি না আমি? যাহা তুমি সাজাইয়াছ, তাহা তোমাকেই দিব। আমি এ ব্যবসা আর রাখিব না।

সুখ! তোমাকে সর্ব্বত্র খুঁজিলাম—পাইলাম না। সুখ নাই—তবে আশায় কাজ কি? যে দেশে অগ্নি নাই, সে দেশে ইন্ধন আহরণ করিয়া কি হইবে? প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, সব বিসর্জ্জন দিব।

* * * *

আমি পরদিন শচীন্দ্রকে দেখিতে গেলাম। দেখিলাম, শচীন্দ্র অধিকতর স্থির—অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল। তাহার সহিত অনেকক্ষণ কথোপকথন করিতে লাগিলাম। বুঝিলাম, আমার উপর যে বিরক্তি, শচীন্দ্রের মন হইতে তাহা যায় নাই।

পরদিন পুনরপি তাহাকে দেখিতে গেলাম। প্রত্যহ তাহাকে দেখিতে যাইতে লাগিলাম। শচীন্দ্রের দুর্ব্বলতা ও ক্লিষ্টভাব কমিল না, কিন্তু ক্রমে স্থৈর্য্য জন্মিতে লাগিল। প্রলাপ দূর হইল। ক্রমে শচীন্দ্র প্রকৃতিস্থ হইল।

রজনীর কথা এক দিনও শচীন্দ্রের মুখে শুনি নাই। কিন্তু ইহা দেখিয়াছি যে, যে দিন হইতে রজনী আসিয়াছিল, সেই দিন হইতে তাঁহার পীড়া উপশম হইয়া আসিতেছিল।

এক দিন যখন আর কেহ শচীন্দ্রের কাছে ছিল না, তখন আমি ধীরে ধীরে বিনা আড়ম্বরে রজনীর কথা পাড়িলাম। ক্রমে তাহার অন্ধতার কথা পাড়িলাম। অন্ধের দুঃখের কথা বলিতে লাগিলাম, এই জগৎসংসার-শোভা-দর্শনে সে যে বঞ্চিত,—প্রিয়জন-দর্শন-সুখে সে যে আজন্ম-মৃত্যু পর্য্যন্ত বঞ্চিত, এই সকল কথা তাঁহার সাক্ষাতে বলিতে লাগিলাম। দেখিলাম শচীন্দ্র মুখ ফিরাইলেন, তাঁহার চক্ষু জলপূর্ণ হইল।

অনুরাগ বটে?

তখন বলিলাম, "আপনি রজনীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। আমি সেই জন্য একটি কথার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে চাই। রজনী একে বিধাতাকর্ত্তৃক পীড়িতা, আবার আমা কর্ত্তৃক আরও গুরুতর পীড়িতা হইয়াছে।"

শচীন্দ্র আমার প্রতি বিকট কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন।

আমি বলিলাম, "আপনি যদি সমুদয় মনোযোগপূর্ব্বক শুনেন, তবেই আমি বলিতে প্রবৃত্ত হই।"

শচীন্দ্র বলিলেন, "বলুন।"

আমি বলিলাম, "আমি অত্যন্ত লোভী এবং স্বার্থপর। আমি তাহার চরিত্রে মোহিত হইয়া তাহাকে বিবাহ করিতে উদ্যোগী হইয়াছি। সে আমার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ ছিল, সেই জন্য আমার অভিপ্রায়ে সম্মত হইয়াছে।"

শচীন্দ্র বলিলেন, "মহাশয়, এ সকল কথা আমাকে বলিতেছেন কেন?"

আমি বলিলাম, "আমি ভাবিয়া দেখিলাম, আমি সন্ন্যাসী, আমি নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াই, অন্ধ রজনী কি প্রকারে আমার সঙ্গে দেশে দেশে বেড়াইবে? আমি এখন ভাবিতেছি, অন্য কোন ভদ্রলোক তাহাকে বিবাহ করে, তবে সুখের হয়। আমি তাহাকে অন্য পাত্রস্থ করিতে চাই। যদি কেহ আপনার সন্ধানে থাকে. সেই জন্য আপনাকে এত কথা বলিতেছি।"

শচীন্দ্র একটু বেগের সহিত বলিলেন, "রজনীব পাত্রের অভাব নাই।" আমি বুঝিলাম, রজনীর ববপাত্র কে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন আবার মিত্রদিগের আলয়ে গিয়া দেখা দিলাম। লবঙ্গলতাকে বলিয়া পাঠাইলাম যে, আমি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যাইব, এক্ষণে সম্প্রতি প্রত্যাগমন করিব না—তিনি আমার শিষ্যা আমি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিব।

লবঙ্গলতা আমার সহিত পুনশ্চ সাক্ষাৎ করিল, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম. "আমি কালি যাহা শচীন্দ্রকে বলিযা গিয়াছি, তাহা শুনিয়াছ কি?"

ল। শুনিয়াছি, তুমি অদ্বিতীয়। আমাকে ক্ষমা করিও. আমি তোমার গুণ জানিতাম না।

আমি নীরব হইয়া রহিলাম। তখন অবসর পাইয়া লবঙ্গলতা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাতেব ইচ্ছা করিয়াছ কেন? তুমি না কি কলিকাতা হইতে উঠিয়া যাইতেছ?"

আমি। যাইব।

ল। কেন?

আমি। যাইব না কেন? আমাকে যাইতে বারণ করিবার ত কেহ নাই।

ল। যদি আমি বারণ করি?

আমি। আমি তোমার কে যে বারণ করিবে?

ল। তুমি আমার কে? তা ত জানি না। এ পৃথিবীতে তুমি আমার কেহ নও। কিন্তু যদি লোকান্তর থাকে—

লবঙ্গলতা আর কিছুই বলিল না। আমি ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া বলিলাম, "যদি লোকান্তর থাকে, তবে?"

লবঙ্গলতা বলিল, "আমি স্ত্রীলোক—সহজে দুর্ব্বলা। আমার কত বল, দেখিয়া তোমার কি হইবে? আমি ইহাই বলিতে পারি, আমি তোমার পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।"

আমি বড় বিচলিত হইলাম, বলিলাম, "আমি সে কথায় বিশ্বাস করি। কিন্তু একটি কথা আমি কখন বুঝিতে পারিলাম না। তুমি যদি আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তবে আমার গায়ে চিরদিনের জন্য এ কলঙ্ক লিখিয়া দিলে কেন? এ যে মুছিলে যায় না—কখন মুছিলে যাইবে না।"

লবঙ্গ অধোবদনে রহিল। ক্ষণেক ভাবিল, "তুমি কুকাজ করিয়াছিলে, আমিও বালিকাবুদ্ধিতেই কুকাজ করিয়াছিলাম। যাহার যে দণ্ড, বিধাতা তাহার বিচার করিবেন, আমি বিচারের কে? এখন সে অনুতাপ আমার—কিন্তু সে সকল কথা না বলাই ভাল। তুমি আমার সে অপরাধ ক্ষমা করিবে?"

আমি। তুমি না বলিতেই আমি ক্ষমা করিয়াছি। ক্ষমাই বা কি? উচিত দণ্ড করিয়াছিলে—তোমার অপরাধ নাই। আমি আর আসিব না—আর কখন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে না। কিন্তু যদি কখনও ইহার পরে শোন যে, অমরনাথ কুচরিত্র নহে, তবে তুমি আমার প্রতি একটু—অণুমাত্র—স্নেহ করিবে?

ল। তোমাকে স্নেহ করিলে আমি অধর্ম্মে পতিত হইব।

আমি। না, আমি সে স্নেহের ভিখারী আর নহি। তোমার এই সমুদ্রতুল্য হৃদয়ে কি আমার জন্য একটুকু স্থান নাই?

ল। না,—যে আমার স্বামী না হইয়া একবার আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়াছিল, স্বয়ং তিনি মহাদেব হইলেও তাহার জন্য আমার হৃদয়ে এতটুকু স্থান নাই। লোকে পাখী পুষিলে যে স্নেহ করে, ইহলোকে তোমার প্রতি আমার সে স্নেহও কখন হইবে না।

আবার "ইহলোকে।" যাক্—আমি লবঙ্গের কথা বুঝিলাম কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু লবঙ্গ আমার কথা বুঝিল না, কিন্তু দেখিলাম, লবঙ্গ ঈষৎ কাঁদিতেছে।

আমি বলিলাম, "আমার যাহা বলিবার অবশিষ্ট আছে, তাহা বলিয়া যাই। আমার কিছু ভূ-সম্পত্তি আছে, আমার তাহাতে প্রয়োজন নাই। তাহা আমি দান করিয়া যাইতেছি।"

ল। কাহাকে?

আমি। যে রজনীকে বিবাহ করিবে, তাহাকে।

ল। তোমার সমুদয় স্থাবর সম্পত্তি?

আমি। হাঁ, তুমি এই দানপত্র এক্ষণে তোমার কাছে অতি গোপনে রাখিবে; যতদিন না রজনীর বিবাহ হয়, ততদিন ইহার কথা প্রকাশ করিও না। বিবাহ হইয়া গেলে রজনীর স্বামীকে দানপত্র দিও।

এই কথা বলিয়া ললিতলবঙ্গলতার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া দানপত্র আমি তাহার নিকট ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেলাম। আমি সকল বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া আসিয়াছিলাম—আমি আর বাড়ী গেলাম না। একেবারে ষ্টেশনে গিয়া বাষ্পীয় শকটারোহণে কাশ্মীরযাত্রা করিলাম।

দোকানপাট উঠিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইহার দুই বৎসর পরে, একদা ভ্রমণ করিতে করিতে আমি ভবানীনগর গেলাম। শুনিলাম, যে, মিত্রবংশীয় কেহ তথায় বাস করিতেছেন। কৌতূহল-প্রবৃত্ত আমি দেখিতে গেলাম। দ্বারদেশে শচীন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল।

শচীন্দ্র আমাকে চিনিতে পারিয়া নমস্কার আলিঙ্গন পূর্ব্বক আমার হস্ত ধারণ করিয়া লইয়া উত্তমাসনে বসাইলেন। অনেকক্ষণ তাঁহার সঙ্গে নানাবিধ কথোপকথন হইল। তাঁহার নিকট শুনিলাম যে, তিনি রজনীকে বিবাহ করিয়াছেন। কিন্তু রজনী ফুলওয়ালী ছিল, পাছে কলিকাতায় ইহাতে লোকে ঘৃণা করে, এই ভাবিয়া, তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া ভবানীনগরে বাস করিতেছেন। তাঁহার পিতা ও ভ্রাতা কলিকাতাতেই বাস করিতেছেন।

আমার নিজ সম্পত্তি প্রতিগ্রহণ করিবার জন্য শচীন্দ্র আমাকে বিস্তর অনুরোধ করিলেন। কিন্তু বলা বাহুল্য যে, আমি তাহাতে স্বীকৃত হইলাম

না, শেষে শচীন্দ্র রজনীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমারও সে ইচ্ছা ছিল। শচীন্দ্র আমাকে অন্তঃপুরে রজনীর নিকট লইয়া গেলেন।

রজনীর নিকট গেলে, সে আমাকে প্রণাম পূর্ব্বক পদধূলি গ্রহণ করিল। আমি দেখিলাম যে, ধূলি গ্রহণকালে পাদস্পর্শ জন্য অন্ধগণের স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী সে ইতস্ততঃ হস্তসঞ্চালন করিল না, এককালেই আমার পাদস্পর্শ করিল। কিছু বিস্মিত হইলাম।

সে আমাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু মুখ অবনত করিয়া রহিল। আমার বিস্ময় বাড়িল। অন্ধদিগের লজ্জা চক্ষুগত নহে। চক্ষে চক্ষে মিলন-জনিত যে লজ্জা, তাহা তাহাদিগের ঘটিতে পারে না বলিয়া তাহারা দৃষ্টি লুকাইবার জন্য মুখ নত করে না। একটা কি কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, রজনী মুখ তুলিয়া আবার নত করিল, দেখিলাম—নিশ্চিত দেখিলাম, সে চক্ষে কটাক্ষ।

জন্মান্ধ রজনী কি এখন তবে দেখিতে পায়? আমি শচীন্দ্রকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলাম, এমত সময় শচীন্দ্র আমাকে বসিবার আসন দিবার জন্য রজনীকে আজ্ঞা করিলেন। রজনী একখানা কার্পেট লইয়া পাতিতেছিল—যেখানে পাতিতেছিল, সেখানে অল্প এক বিন্দু জল পড়িয়াছিল, রজনী আসন রাখিয়া, অগ্রে অঞ্চলের দ্বারা জল মুছিয়া লইয়া আসন পাতিল। আমি বিলক্ষণ দেখিয়াছিলাম যে, রজনী সেই জল স্পর্শ না করিয়াই আসন পাতা বন্ধ করিয়া জল মুছিয়া লইয়াছিল। অতএব স্পর্শের দ্বারা কখন সে জানিতে পারে নাই যে, সেখানে জল আছে, অবশ্য সে জল দেখিতে পাইয়াছিল।

আমি আর থাকিতে পারিলাম না, জিজ্ঞাসা করিলাম, "রজনী, এখন তুমি কি দেখিতে পাও?"

রজনী মুখ নত করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "হাঁ।"

আমি বিস্মিত হইয়া শচীন্দ্রের মুখপানে চাহিলাম। শচীন্দ্র বলিলেন, "আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু ঈশ্বর-কৃপায় না হইতে পারে এমন কি আছে? আমাদিগের ভারতবর্ষে চিকিৎসা সম্বন্ধে কতকগুলি অতি আশ্চর্য্য প্রকরণ ছিল,—সে সকল তত্ত্ব ইউরোপীয়েরা বহুকাল পরিশ্রম করিলেও আবিষ্কৃত করিতে পারিবেন না। চিকিৎসাবিদ্যা কেন, সকল বিদ্যাতেই এইরূপ। কিন্তু

সে সকল এক্ষণে লোপ পাইয়াছে, কেবল দুই এক জন সন্ন্যাসী, উদাসীন প্রভৃতির কাছে সে সকল লুপ্ত বিদ্যার কিয়দংশ অতি গুহ্যভাবে অবস্থিতি করিতেছে। আমাদিগের বাড়ীতে একজন সন্ন্যাসী কখন কখন যাতায়াত করিয়া থাকেন, তিনি আমাকে ভালবাসিতেন। তিনি যখন শুনিলেন আমি রজনীকে বিবাহ করিব, তখন বলিলেন, 'শুভদৃষ্টি হইবে কি প্রকারে? কন্যা যে অন্ধ?' আমি রহস্য করিয়া বলিলাম, 'আপনি অন্ধত্ব আরোগ্য করুন।' তিনি বলিলেন, 'করিব—এক মাসে।' ঔষধ দিয়া তিনি এক মাসে রজনীর চক্ষে দৃষ্টির সৃজন করিলেন।

আমি আরও বিস্মিত হইলাম, বলিলাম, "না দেখিলে আমি ইহা বিশ্বাস করিতাম না। ইউরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্রানুসারে ইহা অসাধ্য!"

এই কথা হইতেছিল, এমত সময়ে এক বৎসরের একটি শিশু টলিতে টলিতে, চলিতে চলিতে, পড়িতে পড়িতে, উঠিতে উঠিতে, সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। শিশু আসিয়া রজনীর পায়ের কাছে দুই একটা আছাড় খাইয়া, তাহার বস্ত্রের একাংশ ধৃত করিয়া, টানাটানি করিয়া উঠিয়া, রজনীর হাঁটু ধরিয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া উচ্চ হাসি হাসিয়া উঠিল। তাহার পরে ক্ষণেক আমার মুখপানে চাহিয়া হস্ত উত্তোলন করিয়া আমাকে বলিল, "দা!" (যা)

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে এটি?"

শচীন্দ্র বলিলেন, "আমার ছেলে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইহার নাম কি রাখিয়াছেন?"

শচীন্দ্র বলিলেন, "অমরপ্রসাদ।"

আমি আর সেখানে দাঁড়াইলাম না।

সম্পূর্ণ

॥ পর্যালোচনা ॥

উপন্যাস-সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র :

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে নৈহাটীর কাঁঠালপাড়ায় জন্মগ্রহণ ক'রে, ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। এই ছাপ্পান্ন বছরের মধ্যে তিনি প্রায় বিয়াল্লিশ বছর সাহিত্য-সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন। কবিযশঃপ্রার্থী তরুণ রূপে বাঙ্‌লা সাহিত্যের আসরে তাঁর আবির্ভাব, এবং সে আসর থেকে যখন বিদায় নিলেন তখন তিনি সাহিত্যসম্রাট। বিচিত্রমুখী ও বিপুল-প্রসারী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। যে যুগে তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হলেন সে যুগে বাঙ্‌লা ভাষার এক সীমায় তারাশঙ্করের কাদম্বরীর অনুবাদ, অন্য সীমায় টেকচাঁদের আলালী ঢঙ্‌। এ দু'য়ের সমন্বয় ঘটিয়ে, একের অল্পতা ও অপরের প্রবলতা যথাযোগ্যরূপে সাধন ক'রে আদর্শ বাঙ্‌লা গদ্যের সৃষ্টি তিনিই করেছেন; নির্মল, সংযত হাস্যরসের প্রবাহমুখ বাঙ্‌লা সাহিত্যে তিনিই উন্মুক্ত করেছেন; যুক্তিনিষ্ঠ সাহিত্য-সমালোচনার ধারাও তিনিই প্রবাহিত করেছেন, এবং সর্বোপরি, বাঙ্‌লা উপন্যাসের বিবিধ ও বিচিত্র রূপের পরিকল্পনা ক'রে রোমান্সের বর্ণালী বৈচিত্র্য, ইতিহাসের রোমান্টিক রূপ ও বাস্তব জীবন-সমস্যার বিচিত্র ছবি সৃজন করে তিনি বাংলা সাহিত্যকে য়ুরোপীয় সাহিত্যের সমপর্যায়ে তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'সব্যসাচী বঙ্কিম এক হস্ত গঠনকার্যে, এক হস্ত নিবারণকার্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। একদিকে অগ্নি জ্বালাইয়া রাখিতেছিলেন, আর একদিকে ধূম ও ভস্মরাশি দূর করিবার ভার নিজেই লইয়াছিলেন।' উপন্যাসের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি অবলীলায় বিচরণ করেছেন। ইতিহাস ও রোমান্স জাতীয় উপন্যাস যেমন লিখেছেন, তেমনি তত্ত্ব ও দেশাত্মবোধক কাহিনীও রচনা করেছেন, এবং সেই সঙ্গে সমাজ ও গার্হস্থ্যজীবনও তাঁর উপন্যাসে উপজীব্য বিষয় হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' যখন ১৮৬৫-তে প্রকাশিত হ'লো তখনকার বাঙ্‌লা সাহিত্যের অবস্থা পর্যালোচনা করে শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন—'দুর্গেশনন্দিনীতে আমরা যাহা দেখিলাম তাহা অগ্রে দেখি

নাই।......কি বর্ণনার রীতি, কি ভাষার নবীনতা, সকল বিষয়ে বোধ হইল যেন বঙ্কিমবাবু দেশের লোকের রুচি ও প্রবৃত্তির স্রোত পরিবর্তিত করিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছেন।' একই প্রসঙ্গে আমরা মনীষী রমেশচন্দ্র দত্তের মন্তব্য স্মরণ করতে পারি—'যখন দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হইল তখন যেন বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে সহসা একটি নূতন আলোকের বিকাশ হইল। দেশের লোক সে আলোকছটায় চমকিত হইল।'

গল্পশোনার বাসনা মানুষের মজ্জাগত। 'দুর্গেশনন্দিনী'র আগে বাঙালী হাতেমতাই, গুলেবকাওলী, বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী কিংবা নববাবুবিলাস পড়ে তাদের গল্পের পিপাসা মেটাতেন। বঙ্কিমের উপন্যাসে বাঙালীর প্রাত্যহিক জীবনের পরিচিত মানুষ অপূর্বভাবে রূপায়িত হ'য়ে রোমান্টিক স্বপ্নালোকের মধ্যে দেখা দিল। সেদিন থেকেই বাঙালী-পাঠকের হৃদয়-সিংহাসনে বঙ্কিমচন্দ্র সম্রাট হয়ে প্রতিষ্ঠিত হলেন।

১৮৬৫ তে 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হ'লো। গড়মান্দারণের তিলোত্তমা-জগৎসিংহ, ওসমান-আয়েষার কাহিনী আরব্য-উপন্যাস, বিদ্যাসুন্দর কিংবা ক'লকাতার বাবু সম্প্রদায়ের কেচ্ছা-কাহিনীর জগৎ থেকে বাঙালী-চিত্তকে উদ্ধার করে নূতন দিগন্তের সন্ধান দিল। পরের বছরেই বনচারিণী কপাল কুণ্ডলার সপ্তগ্রামের নবকুমারের গৃহাংগনে স্থাপিত হওয়ার এবং সেই সঙ্গে মোগল বাদশাহের রঙ্‌মহল-চারিণী পদ্মাবতীর কাহিনী পাঠ করলো বাঙালী বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপাল কুণ্ডলা' উপন্যাসে। বিস্ময়ে অভিভূত বাঙালী-হৃদয়কে অতঃপর বঙ্কিম নিয়ে গেলেন দূর অতীতের হিন্দুরাজা লক্ষ্মণসেনের রাজত্ব-কালে। হেমচন্দ্র-মৃণালিনী, পশুপতি-মনোরমার কাহিনী উপহার দিলেন 'মৃণালিনী' (১৮৭২) উপন্যাস লিখে। এই সাতটি বছরে বঙ্কিমের প্রতিভাস্পর্শে বাঙালীর চিত্তলোক উন্মথিত হ'লো। বাঙালীর রুচি-পছন্দের সম্পূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়ে গেল। 'মৃণালিনী' প্রকাশের পর 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা সম্পাদন করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র শুধু যে একটার পর একটা উপন্যাস লিখে গেলেন তাই নয়, নানা সমালোচনা-মূলক প্রবন্ধ লিখে বাঙ্‌লা সাহিত্যের উন্নতি-সাধনে তৎপর হলেন, অযোগ্য লেখকদের কঠোর সমালোচনা ক'রে তাদের নিবৃত্ত করলেন এবং সেই সঙ্গে গড়ে তুললেন এক বলিষ্ঠ লেখকগোষ্ঠি। 'বঙ্গদর্শন'-এ বঙ্কিমচন্দ্র যথাক্রমে 'বিষবৃক্ষ', 'ইন্দিরা', 'যুগলাঙ্গুরীয়', চন্দ্রশেখর, 'রজনী', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' 'রাজসিংহ', 'আনন্দমঠ' এবং

'দেবীচৌধুরাণী' লিখেছেন। তাঁর শেষ উপন্যাস 'সীতারাম' অন্য এক সাময়িক পত্র 'প্রচার'-এ প্রকাশিত হয়েছিলো।

বাঙ্‌লা উপন্যাস বলতে আজ আমরা যা বুঝি তার গঠন ও প্রকৃতির প্রথম রূপকার বঙ্কিমচন্দ্র। যথার্থ উপন্যাস বলতে কি বোঝায়, তার আদর্শ কি হওয়া উচিত তা বঙ্কিমই প্রথম বাঙালীকে বুঝিয়েছেন। ১৮৭৩ থেকে ১৮৭৮-এর মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র বাস্তব জীবনের কাহিনীকে নূতন পরিস্থিতিতে স্থাপন ক'রে তিনটি উপন্যাস রচনা করেন—'বিষবৃক্ষ', 'রজনী' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের উচ্চমধ্যবিত্ত বাঙালীর জীবনের কয়েকটি পারিবারিক সমস্যাকে কেন্দ্র ক'রে লেখা এই উপন্যাস তিনটি পাঠকচিত্তকে রোমান্সের স্বর্গলোক থেকে কঠিন মাটির বুকে টেনে নামিয়েছে। একদিকে পরিণীতা স্ত্রী ও অন্যদিকে অবৈধ প্রণয়িনী—এ দু'য়ের মাঝখানে পড়ে পুরুষ চিত্তের অস্থিরতা, দুর্ভোগ ও অধঃপতনের সমস্যা প্রাধান্য পেয়েছে রজনীর পূর্ববর্তী 'বিষবৃক্ষ' ও রজনার পরবর্তী 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ। 'রজনীর বিষয়বস্তু স্বতন্ত্র। পিতৃবন্ধুর প্রতি অন্যায় আচরণের ফলে পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত রামসদয় মিত্রকে দিয়ে কাহিনী সুরু হয়েছে বটে, কিন্তু প্রাধান্য পেয়েছে তার পিতৃবন্ধুর ভ্রাতুষ্পুত্রী অন্ধ বালিকা রজনীর জীবন-কথা। রামসদয়-তনয় শচীন্দ্রর প্রতি অন্ধ বালিকার অন্তরে প্রেমের জাগরণ, সেই প্রেমের ঘটনাক্রমে পারস্পরিক প্রেমে পরিণত হওয়ার এবং সেই সঙ্গে লবঙ্গলতা ও অমরনাথের তীব্র তীক্ষ্ণ প্রেমের বিষামৃত পরিবেশন ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র অসাধারণ লিপিকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম গ্রন্থাকারে 'রজনী' প্রকাশিত হয়। পরের বছরেই (১৮৭৮) প্রকাশিত হয় 'কৃষ্ণকান্তের উইল'।

'রজনী' উপন্যাসের উৎস ও প্রেরণা :

'রজনী' উপন্যাসের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং এই উপন্যাস-রচনার উৎস ও প্রেরণা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তিনি লিখেছেন—'লর্ড লিটন প্রণীত 'Last Days of Pompeii' নামক উৎকৃষ্ট উপন্যাসে নিদিয়া নামে একটি 'কাণা ফুলওয়ালী' আছে; রজনী তৎস্মরণে সূচিত হয়'। রজনী-চরিত্র

সৃজন করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র এই নিদিয়া-চরিত্র কতটুকু অনুসরণ করেছেন তা বিচার ক'রে দেখলে বঙ্কিমের শিল্প-প্রতিভার মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে। প্রথমে লিটনের লেখা উপন্যাসটির প্রসংগে আসা যাক।

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ৩১ বছর বয়সে লিটন এই উপন্যাসটি রচনা করেন। উপন্যাসের পটভূমিকায় রয়েছে ভয়াল আগ্নেয়গিরি ভিসুভিয়সের অগ্নি-উদ্গারে পম্পাই-নগরীর সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার দিনগুলি। পম্পাই নগরীর পথে পথে ফুল বিক্রয় ক'রে বেড়ায় অন্ধযুবতী নিদিয়া, সে মনে প্রাণে ভালবাসে এক গ্রীক যুবককে, নাম তার গ্লকার্স। গ্লকার্স সে কথা জানে না। সে ভালবাসে আইয়োন নামে অন্য একটি মেয়েকে। নিদিয়া তা বুঝতে পেরে ক্ষোভে ও আইয়োনের প্রতি ঈর্ষায় জর্জরিত, কিন্তু সেকথা প্রকাশ করতে পারে না। এদিকে গ্লকার্স ও আইয়োনের প্রেমে প্রবল বাধা। এক মিশরীয় যুবক আইয়োনকে বিয়ে করতে বদ্ধপরিকর। নাম তার আর্টেসিস। সে আইয়োনের ভাইকে হত্যা করে গ্লকার্সকে হত্যাকারী ব'লে অভিযুক্ত করে। অন্ধ ফুলওয়ালী নিদিয়ার জন্যই গ্লকার্স রক্ষা পায়। এ দিকে তখন ভিসুভিয়সের অগ্নিস্রাব সুরু হয়ে গেছে। ধোঁয়ায় চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। সেই ধোঁয়ায় পথঘাট কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু নিদিয়া অন্ধ হ'লেও ফুল বিক্রয়ের সূত্রে পম্পাই নগরীর পথঘাট সে চেনে। অন্ধের কাছে দিনের আলো আর ধোঁয়ার আচ্ছন্নতায় কোনও প্রভেদ নেই। সে হাত ধ'রে গ্লকার্স ও আইয়োনকে সমুদ্রতীরে নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসে। গ্লকার্সের জন্য বুকভরা ভালবাসা নিয়ে নিদিয়া সমুদ্রজলে আত্মবিসর্জন করে। মিলনে পূর্ণতা পায় গ্লকার্স ও আইয়োনের প্রেম।

ঔপন্যাসিক লিটনের সৃষ্ট এই নিদিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী' চরিত্র সৃষ্টির প্রেরণা। কিন্তু তা' শুধুই প্রেরণা, অনুকৃতি নয়। লিটনের নিদিয়ার সঙ্গে বঙ্কিমের রজনীর মিল শুধু অন্ধত্বের, অ-মিল অনেক। নিদিয়া এবং রজনী দু'জনেই জন্মান্ধ। কিন্তু নিদিয়া পথে পথে ঘুরে ফুল বিক্রয় করে, রজনী করে না। রজনী ঘরে বসে ফুলের মালা গেঁথে পালকপিতা রাজচন্দ্রকে সাহায্য করে, মায়ের হ'য়ে প্রতিবেশী রামসদয় মিত্রের গৃহে যায় মাত্র। রজনীর কমনীয়তা নিদিয়ায় নেই। নিদিয়া ক্রীতদাসী, রজনী কিন্তু স্বাধীন। রজনীর প্রেম মিলনে সার্থক, নিদিয়ার প্রেম হতাশায় নিমজ্জিত।

গ্লকার্স তার জন্য নিদিয়ার বুকভরা প্রেমকে কোনদিনই বুঝতে পারেনি,

শচীন্দ্র কিন্তু সন্ন্যাসী-প্রভাবে স্বপ্নে রজনীকে দেখে বুঝতে পেরেছে রজনী তাকে এ জগতে সবচেয়ে বেশি ভালবাসে। পরিণামে শচীন্দ্র রজনীর ও রজনী শচীন্দ্রর হয়ে গেছে। বঙ্কিমচন্দ্র যে ভাবে উপন্যাসের বিষয়-বস্তুর পরিবর্তন ঘটিয়েছেন এবং রজনী চরিত্রটি যে ভাবে পুনর্গঠিত করেছেন, তাতে লর্ড লিটনের Last Days of Pompeii-র দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েও 'রজনী' একটি সম্পূর্ণ মৌলিক উপন্যাস হ'য়ে উঠেছে। লিটনের উপন্যাসটিতে বাহিরের ঘটনার প্রাধান্য, বঙ্কিমের 'রজনী'তে অন্তরের দ্বন্দ্বই প্রধান।

'রজনী'ব কাহিনী-সংক্ষেপ:

ভবানীনগরের প্রভূত ধনসম্পদের অধিকারী বাঞ্ছারাম মিত্রের পুত্র রামসদয় মিত্র একদিন তাঁর পিতৃবন্ধু মনোহর দাসকে অপমান করেছিলেন। এই মনোহর দাসেরই অমানুষিক পরিশ্রমের ফলে বাঞ্ছারামের যা কিছু শ্রীবৃদ্ধি। এ-হেন বন্ধুকে অপমান করায় বাঞ্ছারাম তাঁর পুত্র রামসদয়কে গৃহ থেকে বিতাড়িত করেন। শুধু তাই নয়, তিনি এমন একটি উইল ক'রে যান যাতে বলা থাকে যে বাঞ্ছারামের মৃত্যুর পর তাঁর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে পুত্র রামসদয় নয়, বন্ধু মনোহর দাস কিংবা তাঁর উত্তরাধিকারী। যদি মনোহর দাসের কোন উত্তরাধিকারী না থাকে তবেই বাঞ্ছারামের সম্পত্তি ভোগ-দখল করবে রামসদয়-এর পুত্র-পৌত্রাদি। বন্ধুপুত্র রামসদয়ের হাতে অপমানিত মনোহর দাস ক্ষুব্ধ চিত্তে বাঞ্ছারামকে ছেড়ে যান। বাঞ্ছারাম শত চেষ্টা করেও মনোহর দাসের আর সন্ধান পাননি। উইলের কথা জেনে বিতাড়িত রামসদয় অভিমানে ভবানীনগর ছেড়ে কলকাতায় এসে বসবাস শুরু করলেন। বিবাহ ক'রে কিছু অর্থ-সম্পদ পেয়েছিলেন, সেই অর্থ খাটিয়ে তাঁরও কিছু উপার্জন হ'তো। পিতা বাঞ্ছারামের সঙ্গে রামসদয়-এর আর কখনও সাক্ষাৎ হয়নি। পিতার মৃত্যুর পরে তিনি পিতৃবন্ধু মনোহর দাসের অনেক সন্ধান করেন। এই অনুসন্ধানের ফলে রামসদয় জানতে পারেন যে ঢাকা থেকে কলকাতায় আসার পথে নৌকাডুবির ফলে মনোহর দাস সপরিবারে জলমগ্ন হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন। এই সংবাদের ভিত্তিতে উইলের শর্ত অনুসারে রামসদয়ের দুই পুত্র বাঞ্ছারামের সমুদয় সম্পত্তির অধিকারী হয়েছে।

সেই রামসদয় মিত্র এখন বৃদ্ধ হয়েছেন। তাঁর দুইটি স্ত্রী, প্রথমা স্ত্রী ভুবনেশ্বরী রুগ্না ও বৃদ্ধা, কিন্তু কনিষ্ঠা স্ত্রী যুবতী, সুন্দরী ও প্রত্যুৎপন্নমতি—নাম তাঁর লবঙ্গলতা। তিনিই রামসদয় মিত্রের সংসারে সর্বময় কর্ত্রী। রামসদয় মিত্রের কনিষ্ঠপুত্র শচীন্দ্রনাথ এই কাহিনীর অন্যতম প্রধান পুরুষ চরিত্র। তিনি যৌবনে বিপত্নীক।

কলকাতায় রামসদয় মিত্রের বৃহৎ অট্টালিকার সন্নিকটে এক জীর্ণ কুটিরে বাস করেন রাজচন্দ্র দাস। বালিগঞ্জে তাঁর একটি ছোট ফুলের বাগান আছে, সেই বাগানের ফুল তাঁর জীবিকার একমাত্র উপায়। রাজচন্দ্র বাগান থেকে ফুল আনেন, সেই ফুলের মালা গাঁথেন রাজচন্দ্রের স্ত্রী ও তাঁর পালিতা কন্যা রজনী। রজনী জন্মান্ধ, তাকে নিয়েই এই কাহিনী। বাজচন্দ্র পাড়ায় পাড়ায় ফুলের [মালা বিক্রয় করেন। বড়লোকের বাড়িতে ফুলের যোগান দেন। রাজচন্দ্রের প্রতিবেশী ধনাঢ্য রামসদয় মিত্রের বাড়িতেও ফুলের যোগান দিতেন রাজচন্দ্রের স্ত্রী। জন্মান্ধ বজনীকেও মাঝে মধ্যে রামসদয়ের গৃহে ফুলের যোগান দিতে যেতে হ'তো। গৃহকর্ত্রী লবঙ্গলতা ফুলের দাম দিতেন অনেক বেশি, পরোক্ষে তিনি দুস্থ রাজচন্দ্রের সংসারকে সাহায্য করতেন ফুলের দাম অনেক বেশি দিয়ে।

সেদিন রজনীর মায়ের জ্বর। রজনী গেছে রামসদয়ের গৃহে ফুলের যোগান দিতে। সেখানেই এই কাহিনীর সূত্রপাত। লবঙ্গলতা জন্মান্ধ রজনীকে 'কানী' বলায় রজনী যখন ক্ষুব্ধ তখনই সেখানে অকস্মাৎ তৃতীয় ব্যক্তির পদধ্বনি শোনা গেল এবং তিনি লবঙ্গলতাকে 'ছোট মা' সম্বোধন করায় রজনী বুঝলেন যে যিনি এলেন তিনি রামসদয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শচীন্দ্রনাথ। রজনী চোখে কিছু দেখতে পেতনা বটে, কিন্তু তার অন্য সব ইন্দ্রিয় অত্যন্ত সজাগ ছিল, শব্দ-স্পর্শ-গন্ধের অনুভূতি ছিল খুব তীক্ষ্ণ। শচীন্দ্রনাথের কণ্ঠোচ্চারিত শব্দ রজনীর মর্মে মধুর হয়ে বাজলো। ছোট-মা লবঙ্গলতার কাছে শচীন্দ্র শুনলেন যে রজনী চোখে দেখতে পায় না। চিকিৎসা-শাস্ত্রে অনুরাগী শচীন্দ্র সাগ্রহে এগিয়ে এসে রজনীর চিবুক স্পর্শ করে, মুখখানি তুলে ধ'রে যে মুহূর্তে চোখ পরীক্ষা করতে গেলেন সেই মুহূর্তে জন্মান্ধ রজনীর কুমারী-চিত্ত উন্মোচিত হ'লো। রজনী মনে মনে বললো— 'সে চিবুক স্পর্শে আমি মরিলাম'। সেদিন থেকে শচীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর শোনবার আগ্রহে, বা তার সামান্য স্পর্শলাভের প্রলোভনে রজনী নিয়মিত

রামসদয় মিত্রের অন্দরমহলে ফুলের যোগান দিতে শুরু করলো। রজনীর হৃদয়ের সংবাদ শচীন্দ্র বা অন্য কেউ কিছু জানলো না।

রজনীর প্রতি অনুকম্পায় ও রাজচন্দ্রের দারিদ্র্যপীড়িত সংসারে পরোক্ষে সাহায্য করার আগ্রহে লবঙ্গলতা রজনীর বিবাহের জন্য ব্যস্ত হলেন। শচীন্দ্রনাথেরও রজনীর প্রতি সহানুভূতি জাগ্রত হয়েছে। তিনিও ছোট মা লবঙ্গলতার সঙ্গে যোগ দিলেন। লবঙ্গলতা রামসদয় মিত্রের কর্মচারীর ছেলে গোপালের সঙ্গে রজনীর বিবাহ স্থির করলেন। শুনে আনন্দ হ'লো রাজচন্দ্র ও তার স্ত্রীর, কিন্তু রজনী মোটেই উল্লসিত হ'লো না। মনে মনে সে যে শচীন্দ্রের অনুরাগিনী। গোপালের এক স্ত্রী বর্তমান। তার নাম চাঁপা। সে কেন স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ সহ্য করবে? কি ভাবে এই বিয়ে বন্ধ করা যায় সেই চিন্তায় চাঁপা তৎপর হ'লো। রজনীও একদিন এই বিবাহে তার আপত্তির কথা জানাতে গিয়ে লবঙ্গলতার তিরস্কারে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে আসছিলো। ক্রন্দনরতা রজনীকে হাত ধরে সিঁড়ি দিয়ে নামতে সাহায্য করলেন শচীন্দ্রনাথ। রজনী সেই পাণিগ্রহণকে শচীন্দ্রের অনুরাগ ভেবে ভুল করলো। শচীন্দ্র রজনীর মনের কথা কিছুই বুঝলেন না।

চাঁপা চায় তার স্বামী গোপালের সঙ্গে রজনীর এই বিয়ে যে-ভাবে হোক বন্ধ করতে। রজনী নিজেও এই বিয়ে বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর। চাঁপার ভাই হীরালাল নেশাখোর, অপদার্থ, অর্থলোভী ও অশিক্ষিত। তারই সঙ্গে রজনীর বিয়ের ব্যবস্থা করতে গিয়ে চাঁপা ব্যর্থ হ'লো। অবশেষে সে স্থির করলো যে রজনী যদি গৃহ থেকে পালিয়ে কয়েকদিন চাঁপার পিত্রালয় হুগলীতে গিয়ে লুকিয়ে থাকে তবে এ বিয়ে বন্ধ হয়। বেপরোয়া রজনী তাতেই সম্মত হ'লো। গভীর রাতে হীরালালের সঙ্গে চাঁপা রজনীকে চুপি চুপি রওনা ক'রে দিল। রজনী প্রথমে হীরালালের সঙ্গে যেতে সম্মত হয়নি, কিন্তু উপায়ান্তর না দেখে অবশেষে যেতে হলো। হীরালালের হাতের লাঠিখানা চেয়ে নিয়ে তা' অনায়াসে দু'খণ্ড ক'রে নিজের দৈহিক শক্তি সম্পর্কে হীরালালকে সতর্ক ক'রে দিলো রজনী, এবং লাঠির অর্ধাংশ হীরালালকে ফিরিয়ে দিয়ে অপরার্ধ নিজের কাছেই রাখলো।

নদীপথে হুগলী যাবার জন্য নৌকা ভাড়া করলো হীরালাল। নৌকোয় যেতে যেতে রজনীকে অনেক পীড়াপীড়ি করলো, কিন্তু, রজনী কিছুতেই হীরালালকে বিয়ে করতে সম্মত হ'লো না। শেষরাতে একজায়গায় নৌকা

থামিয়ে হীরালাল অন্ধ রজনীকে নামতে বললো। গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেছে ভেবে রজনী যেই নামলো, হীরালাল অমনি নৌকা খুলে দিতে বললো। রজনী বারবার তাকে তুলে নিতে অনুনয় করলো, কিন্তু হীরালাল তাকে বিয়ে করতে রাজী না হলে রজনীকে তুলে নেবে না। নৌকা যখন বেশ খানিকটা এগিয়েছে তখন হীরালালের কণ্ঠস্বর অনুসরণ করে রজনী তার হাতের সেই আধখানা লাঠি ছুঁড়ে মেরে হীরালালকে আঘাত করলো। হীরালাল কুৎসিত গালাগাল দিতে দিতে সেই অপরিচিত স্থানে রজনীকে ফেলে চলে গেল।

শচীন্দ্রের প্রতি প্রেমে ব্যর্থতায় সেই নিঃসঙ্গ নির্জন নদীতটে রজনী জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়লো। চাইলো গঙ্গার জলে প্রাণবিসর্জন দিতে। সে ঝাঁপ দিলো গঙ্গায়, কিন্তু মরলো না, ভেসে চললো গঙ্গার স্রোতে। সেই সময় নদীপথে চলমান একটি গহনার নৌকা তাকে উদ্ধার করলো।

সেই নৌকোর এক আরোহী রজনীকে কলকাতায় পৌঁছে দেবার প্রলোভন দেখিয়ে তাকে নিয়ে মাঝপথে একজায়গায় নেমে পড়লো। তারপরে, সন্নিকটে এক বনের মধ্যে নিয়ে গিয়ে গিয়ে রজনীর উপরে অত্যাচারে উদ্যত হ'লো। রজনী সে আক্রমণ প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়ে চিৎকার করতে থাকলো। সেই চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে সেখানে এসে পড়লেন এক যুবক। তিনি নিকটবর্তী গ্রামে বেড়াতে এসে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। যুবকটি রজনীকে উদ্ধার করতে গিয়ে নিজে খুবই আহত হ'লেন এবং আহত-অবস্থায় রজনীকে নিয়ে তাঁর আত্মীয়ের বাড়িতে পৌঁছুলেন। সেখানে কয়েকদিন থেকে সুস্থ হয়ে রজনীকে কলকাতায় রাজচন্দ্র দাসের কাছে পৌঁছে দিলেন। এই রাজচন্দ্র দাসের যুবকটি নাম আগেই জানতেন। কেমন করে জানতেন তা' জানতে গেলে যুবকটির পূর্বকাহিনী জানতে হবে।

যুবকটির নাম অমরনাথ। ধনীবংশের সন্তান তিনি, শচীন্দ্রের বিমাতা লবঙ্গলতাকে একদিন তিনি ভালবাসতেন। ঠিক হয়েছিলো তাঁদের বিবাহ হবে। কিন্তু, অমরনাথের বংশে একটি কলঙ্ক-কাহিনী থাকায় সে বিয়ে হয়নি। লবঙ্গলতার বিবাহ হয়েছে বৃদ্ধ রামসদয় মিত্রের সঙ্গে। যৌবনের প্রগল্ভ উচ্ছ্বাসে একদিন গভীর রাতে অমরনাথ গিয়েছিলেন নিভৃতে লবঙ্গলতার সঙ্গে মিলিত হতে। কিন্তু, অমরনাথের সেদিনের সেই উচ্ছ্বাস জীবনব্যাপী দীর্ঘশ্বাসে

পরিণত হ'লো। লবঙ্গর হাতে সেদিন অমরনাথের লাঞ্ছনার অবধি রইলো না। লোকজন ডাকিয়ে অমরনাথের পিঠে তপ্তলৌহশলাকা দিয়ে 'চোর' শব্দটি লিখিয়ে দিলো লবঙ্গলতা। ব্যর্থপ্রেমের এই বিষযন্ত্রণা ভুলতে অমরনাথ ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়লেন। পরোপকার করা তাঁর জীবনের ব্রত হ'লো।

দেশভ্রমণে বেরিয়ে বারানসীতে এসে গোবিন্দ দত্ত নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে অমরনাথের পরিচয় হ'লো। এই গোবিন্দ দত্তর কাছ থেকে স্থানীয় পুলিশের অত্যাচার ও অবিচারের বর্ণনা শুনতে শুনতে অমরনাথ জানলেন হরেকৃষ্ণ দাসের মৃত্যুর পর তার একমাত্র কন্যার কোনও সন্ধান না ক'রে পুলিশ কীভাবে হরেকৃষ্ণর সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে। হরেকৃষ্ণ জীবিত থাকতে তাঁর শ্যালীপতি রাজচন্দ্র দাসের হাতে একমাত্র কন্যা রজনীর লালন-পালনের ভার দিয়েছিলেন। এই সময়েই অমরনাথ রাজচন্দ্র দাসের নাম শোনেন। পরে, ঘটনাচক্রে পরোপকার করতে গিয়ে যে মেয়েটিকে তিনি উদ্ধার করলেন সে সেই হরেকৃষ্ণ দাসের কন্যা রজনী। কলকাতায় রজনীকে রাজচন্দ্র দাসের কাছে পোঁছে দিতে গিয়ে অমরনাথ আরও সুনিশ্চয় হ'লেন যে রজনী হরেকৃষ্ণ দাসের কন্যা এবং হরেকৃষ্ণ দাস বাঞ্ছারাম মিত্রের বন্ধু মনোহর দাসের ভ্রাতা। সুতরাং, বাঞ্ছারামের উইলের শর্ত অনুসারে মনোহর দাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী রজনীই সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী, শচীন্দ্র নয়, রামসদয় নয়।

রজনী সুন্দরী, অন্ধ হ'লেও তার রূপে মুগ্ধ হয়না এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। পরোপকার-বৃত্তির বশে অমরনাথ একদিকে যেমন এতদিন যে প্রাপ্য সম্পত্তি থেকে রজনী বঞ্চিত থেকেছে তা' রজনীকে ফিরিয়ে দেওয়ার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন, অন্যদিকে এই মেয়েটিকে বিবাহ করে সুখী করার জন্য আগ্রহী হ'লেন। প্রস্তাবমাত্রে রাজচন্দ্র দাস এই বিবাহে সম্মতি দিলো। রজনীও অমরনাথের কাছে কৃতজ্ঞ; অমরনাথ তার জীবন ও সম্ভ্রম রক্ষা করেছে—সে আপত্তি করলো না। লবঙ্গলতা যে গৃহের সর্বময় কর্ত্রী সেই গৃহ রজনীর হয়ে দখল নেবার জন্য আজ অমরনাথ কৃত-সংকল্প। প্রথম যৌবনের যে দগ্ধ-প্রেম পৃষ্ঠদেশে 'চোর' শব্দ বহন করে দেশে দেশে ঘুরে যন্ত্রণা ভুলতে ব্যস্ত ছিল আজ তা' প্রতিশোধের পথ খুঁজে পেয়ে দাম্পত্য-জীবনের শান্তির নীড়ে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলো।

লবঙ্গলতা গোপালের সঙ্গে রজনীর বিবাহ স্থির ক'রে সমস্ত উদ্যোগ-আয়োজনের ভার দিয়েছিলো শচীন্দ্রকে। শচীন্দ্রও সাগ্রহে সব ব্যবস্থাদি করে বিয়ের দিন শুনলেন—রজনী গৃহত্যাগিনী হয়েছে। গুজব শুনলেন যে রজনী হীরালালের সঙ্গে গৃহত্যাগ করেছে। শচীন্দ্র বিশ্বাস করলেন না, হীরালালও সব অস্বীকার করলো। শচীন্দ্র নানাভাবে রজনীর সন্ধানের প্রয়াস পেলেন। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে রজনীর সন্ধান দিতে পারলে আর্থিক পুরস্কার দেবার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করলেন। কোনও ফল হ'লো না।

রজনী যেমন অকস্মাৎ নিরুদ্দেশ হয়েছিলো তেমনি অকস্মাৎ আবার ফিরে এসেছে শুনে বিস্মিত হ'লেন শচীন্দ্র। আরও বিস্মিত হলেন রজনীর ফিরে আসার পর থেকে দরিদ্র অনুগ্রহভাজন রাজচন্দ্র দাসের ব্যবহারের পরিবর্তনে। অবশেষে একদিন অমরনাথ এসে শচীন্দ্রের সঙ্গে দেখা ক'রে নিজেকে রজনীর ভাবীস্বামী রূপে পরিচয় দিয়ে জানালেন যে রজনী মনোহর দাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং বাঞ্ছারাম মিত্রের উইল-অনুসারে রজনীই তাঁর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। শচীন্দ্র যে বিপুলবৈভব পিতামাতাসহ এতদিন ভোগ-দখল করছেন তা' রজনীর। শচীন্দ্র একথা শুনে স্তম্ভিত হ'লেন এবং পরিশেষে সম্পত্তি রজনীকে প্রত্যর্পণ করতে সম্মত হলেন।

যত সহজে শচীন্দ্র তাঁদের এতদিনের ভোগদখল করা সম্পত্তি রজনীকে প্রত্যর্পণ করতে সম্মত হলেন কাজটা তত সহজ রইলো না রামসদয় এবং সর্বোপরি লবঙ্গলতা অত সহজে সম্পত্তি ছেড়ে দিতে প্রস্তুত নন। লবঙ্গলতা স্থির করলেন শচীন্দ্রর সঙ্গে রজনীর বিবাহ দিয়ে সম্পত্তির দখল রাখবেন। চতুরা লবঙ্গলতার স্ত্রী-বুদ্ধির সঙ্গে সত্যকাম উদার-হৃদয় অমরনাথের বিষয়-বুদ্ধির দ্বন্দ্ব সুরু হলো।

লবঙ্গলতা যত সহজে শচীন্দ্রর সঙ্গে রজনীর বিবাহ দিতে পারবেন ভেবেছিলেন কাজটা তত সহজ হ'লো না। বিষয়-সম্পত্তির লোভে রজনীকে বিবাহ করতে মার্জিত-রুচি শচীন্দ্র কিছুতেই সম্মত হলেন না। পিতামাতার অনুরোধ-উপরোধ ব্যর্থ হ'লো। লবঙ্গলতা তখন এক সন্ন্যাসীর দ্বারস্থা হলেন।

সেই সন্ন্যাসীর রামসদয় মিত্রের বাড়িতে আনাগোনা ছিল। তাঁর অলৌকিক শক্তিতে বাড়ির সকলের বিশ্বাস ছিল গভীর। শচীন্দ্রর নিজেরও সন্ন্যাসীর প্রতি গভীর সম্ভ্রম ছিল। শচীন্দ্র সন্ন্যাসীর অলৌকিক শক্তি প্রত্যক্ষ

করতে চাইলে সন্ন্যাসী বল্‌লেন যে, সেদিন রাত্রে শচীন্দ্র যাকে স্বপ্নে দেখবে, সে এই পৃথিবীতে শচীন্দ্রকেই সবচেয়ে বেশি ভালবাসে।

স্বপ্ন দেখলেন শচীন্দ্র, দেখলেন রজনীকে। সচকিত, শিহরিত, বিস্মিত হলেন তিনি। রজনী তাঁকেই সবচেয়ে বেশি ভালবাসে—একথা ভেবে আকুল হ'য়ে উঠলেন শচীন্দ্র। প্রেম এলো তাঁর জীবনে, রজনীর প্রতি প্রেম। কিন্তু রজনী যে এখন অপ্রাপণীয়া, সে অমরনাথের ভাবী-স্ত্রী। ভাবতে ভাবতে মানসিক রোগ দেখা দিল শচীন্দ্রর, অসুস্থ হয়ে পড়লেন তিনি।

শচীন্দ্রর সঙ্গে রজনীর বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে লবঙ্গলতা এলেন রাজচন্দ্রের গৃহে। অমরনাথের তুলনায় শচীন্দ্রকেই যোগ্যতর পাত্র বিবেচনা করে রাজচন্দ্র তো সম্মত হ'লো, কিন্তু বাধা এলো এবার রজনীর কাছ থেকে। হৃদয়ের শচীন্দ্রর প্রতি অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও সে শচীন্দ্রকে বিয়ে করতে আজ আর সম্মত নয়। যিনি তার জীবন রক্ষা করেছেন, সম্ভ্রম রক্ষা করেছেন সেই অমরনাথ যখন রজনীকে বিয়ে করতে চান তখন তাঁকে ছাড়া আর কাউকে সে বিয়ে করতে পারবে না। বরং, সমস্ত সম্পত্তি সে লবঙ্গকে দানপত্র করে দিতে প্রস্তুত। অমরনাথের সাক্ষাতেই সে একথা ঘোষণা করলো। কিন্তু লবঙ্গ তাতে সম্মত নয়।

লবঙ্গ এবার এলো গোপনে অমরনাথের কাছে। তাকে ভয় দেখালো, শাসালো—যদি অমরনাথ নিজেকে রজনীর কাছ থেকে সরিয়ে না নেয় তবে লবঙ্গ অমরনাথের প্রথম যৌবনের সেই কুকীর্তির কথা রজনীকে সোচ্চারে জানিয়ে দেবে। উত্তরে অকম্পিত-হৃদয়ে অমরনাথ বললেন যে তিনি নিজেই সে কথা রজনীকে জানিয়ে দেবেন। ব্যর্থকামা পরাভূতা লবঙ্গলতা ফিরে গেলেন আপন গৃহে।

তার পরে একদিন রজনীকে অমরনাথ তার প্রথম যৌবনের কথা সবই জানিয়ে দিলেন। লবঙ্গলতার প্রতি অনুরাগের কথা, লবঙ্গর হাতে তাঁর লাঞ্ছনার কথা—সবই অকপটে জানালেন। সে সব কথা শুনে রজনী কাঁদতে কাঁদতে বল্‌লো—'আমার এ পাপ মন পরের কাছে বিক্রীত'। রজনীর এ-কথার বিশদ ব্যাখ্যা পরে অমরনাথ লবঙ্গলতার কাছে জেনে মনে মনে ভাবলো—'রজনী শচীন্দ্রের, শচীন্দ্র রজনীর। মাঝখানে আমি কে?'

অবশেষে অমরনাথ একদিন শচীন্দ্রকে জানালেন যে তিনি বিরাগী মানুষ, তাঁর রজনীকে বিয়ে করা শোভা পায় না। শচীন্দ্র যেন রজনীর

জন্য অন্য পাত্রের সন্ধান করেন। শচীন্দ্র মনে মনে উল্লসিত হয়ে বললেন, 'রজনীর পাত্রের অভাব নাই'। অমরনাথ আবার পথে বেরিয়ে পড়লেন। যাবার আগে নিজের স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি রজনীর ভাবী-স্বামীর নামে দানপত্র করে তা' রেখে গেলেন লবঙ্গলতার কাছে। শুনে গেলেন লবঙ্গলতার মুখে—'তুমি আমার কে? তা ত জানি না এ পৃথিবীতে তুমি আমার কেহ নও। কিন্তু যদি লোকান্তর থাকে—।' সে কথা সম্পূর্ণ হ'লো না।

তারপর ছয় বছর পার হয়ে গেছে। পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একদিন অমরনাথ ভবানীনগরে এলেন। শচীন্দ্র তখন কলকাতা ছেড়ে ভবানীনগরে বসবাস করছেন। সেখানে রজনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লো অমরনাথের। রজনী আর অন্ধ নয়, সন্ন্যাসী-প্রদত্ত ঔষধে রজনী দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে। বিস্ময়ের উপর বিস্ময় অভিভূত করলো অমরনাথকে। শচীন্দ্র-রজনীর শিশুপুত্রকে দেখে তার নাম জানতে চাইলেন অমরনাথ। উত্তরে জানলেন—রজনী-শচীন্দ্র তাদের পুত্রের নাম রেখেছে অমরপ্রসাদ। কৃতজ্ঞ এই দম্পতির সান্নিধ্যে আর কালক্ষয় না করে পথে বেরিয়ে পড়লেন অমরনাথ। রজনী উপন্যাসের কাহিনী সমাপ্ত হ'লো।

'রজনী' উপন্যাসের নাম :

জীবনে ও সাহিত্যে নামের মূল্য অপরিসীম। নামের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ তাৎপর্য সর্বদাই প্রত্যাশিত। বাঘের মত তেজ দেখে আমরা কুকুরের নাম 'বাঘা দিতে পারি, কিন্তু তা' সত্ত্বেও সে কুকুরই থেকে যায়। তাকে বাঘ বলা যায় না। বাঘের সঙ্গে বিড়ালের কিছু কিছু সাদৃশ্য থাকলেও বিড়াল খুব বেশী হ'লে 'বাঘের মাসি' বলে চিহ্নিত হ'তে পারে, বাঘ ব'লে নয়। কালো মেয়ের নাম 'কৃষ্ণা' বা 'শ্যামলী' বললে কিছু সঙ্গতিপূর্ণ তাৎপর্য পাওয়া যাবে, কিন্তু সেই মেয়েটির নাম যদি রাখা হয় পূর্ণিমা' তা' হলে তা' নিতান্তই অসঙ্গত হবে। যে ছেলেকে সহজে বোঝা যায় না তার নাম যদি হয় 'সুবোধ' তবে তার নামকরণ যে যথার্থ হয়নি তা' অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। সব নামেরই পিছনে একটি তাৎপর্য থাকা সঙ্গত।

এই যুক্তি সাহিত্যের ক্ষেত্রে আরও গভীরভাবে প্রত্যাশিত। সাহিত্যে নামকরণের তাৎপর্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণতঃ যে চরিত্র বা ঘটনার প্রতি লেখক তাঁর গ্রন্থের পাঠক-পাঠিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান সেই চরিত্র বা ঘটনাকে তিনি তাঁর গ্রন্থের নামাঙ্কনে প্রাধান্য দেন। কোন কোন লেখক তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে যে ভাবটিকে তুলে ধরতে চান সেই ভাবের ইংগিত গ্রন্থের নামের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেন। মোট কথা, প্রধান চরিত্রের নামানুসারে উপন্যাসের নামকরণ করা, প্রধান ঘটনার অনুসরণে নামাঙ্কন করা এবং প্রধান আইডিয়া বা ভাবকে নামের মধ্য দিয়ে সঙ্কেতিত করা—উপন্যাসের নামকরণের স্বীকৃত রীতি। গ্রন্থকার এ ছাড়াও আরও নানাবিধ উদ্দেশ্য সাধন করতে পারেন নামকরণের মধ্য দিয়ে।

বঙ্কিমচন্দ্র 'রজনী' উপন্যাসের নাম 'রজনী' না দিয়ে যদি অন্য কোনও নাম দিতেন তবে তা' উপন্যাসের পূর্ণ-পরিচয় বহন করতে পারতো কিনা তা' পরীক্ষা করে দেখা যাক। প্রথমেই অন্য কোন চরিত্রের নামে নাম দিলে তা' সঙ্গত হ'তো কিনা সে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যেতে পারে। অমরনাথ বা লবঙ্গলতার নামে নাম দিলে কি ক্ষতি হতো? অমরনাম খুবই ক্রিয়াশীল চরিত্র, মহৎপ্রাণ এবং কাহিনীর ঘটনাবর্তে তার অবদান প্রভূত। স্ত্রী-চরিত্র হিসাবে লবঙ্গলতা রজনীর চেয়ে অনেক বেশি সক্রিয়, অনেক বেশি উজ্জ্বল, এ কাহিনীতে তার ভূমিকাও অনেকখানি। তবু মনে হয়, এদের কারুর নামে নাম দিলে বঙ্কিমচন্দ্র অন্ধ যুবতীর সাহায্যে যে সব মানসিক ও নৈতিক তত্ত্ব প্রতিপাদন করতে চেয়েছিলেন তা' হ'তো না। অমরনাথ লবঙ্গলতার যে কাহিনী একদিন 'চোর' দাগানোর মধ্য দিয়ে শেষ হয়ে গিয়েছিলো তা' পুণর্বার বিস্তার লাভ করেছে রজনী-উদ্ধারের সূত্র ধ'রে। রজনী না থাকলে হয়তো তাদের দু'জনের আর কখনও সাক্ষাৎই হ'তো না। কাহিনীও পল্লবিত হ'তো না। সুতরাং, তাদের কারুর নামে নামকরণ করলে তা' অধিকতর সঙ্গত হ'তো না।

চরিত্রের নামে নাম না দিয়ে প্রতিপাদ্য তত্ত্বের বা বিশেষ ভাবের ইঙ্গিতবহ নাম দিতে পারতেন বঙ্কিমচন্দ্র। 'রজনী' রচনার অব্যবহিত পূর্বে তিনি যে উপন্যাসটি লিখেছিলেন তার নাম দিয়েছেন 'বিষবৃক্ষ'। নগেন্দ্র নয়, সূর্যমুখী নয়, কুন্দনন্দিনীও নয়—বিষবৃক্ষ। তেমন একটি ভাবের ইঙ্গিতবহ নাম এই কাহিনীরও দিতে পারতেন। ধরা যাক, তিনি যদি রজনীর এই

কাহিনীর নাম দিতেন 'বাঞ্ছারামের উইল', তবে কি সে নাম খুব অসংগত হ'তো? হয়তো অসংগত হ'তো না। পুত্র রামসদয়ের আচরণে ক্ষুব্ধ হ'য়ে বাঞ্ছারাম যে উইল করে গেলেন সেই উইল এই উপন্যাসের সবগুলি চরিত্রের ও সব ঘটনার উপরে ছায়া বিস্তার করেছে। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে একথা প্রতিপন্ন করা যায় যে এই উইল ছিল বলেই রজনী শচীন্দ্রকে পেয়েছে, অমরনাথ পুণর্বার লবঙ্গলতার সম্মুখীন হ'তে পেরেছে এবং উপন্যাসের যাবতীয় ঘটনার উপরে এই উইলের প্রতিক্রিয়া কাজ করেছে। কিন্তু, তথাপি বঙ্কিমচন্দ্র কেন 'বাঞ্ছারামের উইল' নাম না দিয়ে 'রজনী' নাম দেওয়া অধিকতর সঙ্গত মনে করেছেন তা' সন্ধান ক'রে দেখতে হ'বে।

একেকটি উপন্যাসের মধ্য দিয়ে প্রতিপাদ্য বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন বৈচিত্র্য সম্পাদন করার লক্ষ্য ঔপন্যাসিকের থাকা স্বাভাবিক। যদি বিভিন্ন উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয় একই রকম হয় তবে তা' বর্ণহীন হ'য়ে পড়ে। 'রজনী'র ঠিক পরেই বঙ্কিমচন্দ্র যে তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক উপন্যাসটি লিখেছিলেন তার নাম দিয়েছেন 'কৃষ্ণকান্তের উইল'। সেখানে উপন্যাসের যাবতীয় ঘটনা ও চরিত্র কিভাবে একটি উইলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে তা' বঙ্কিম দেখিয়েছেন। যদি তিনি রজনীর কাহিনীর নামকরণ করতে গিয়ে বাঞ্ছারামের উইলকে অগ্রাধিকার দিতেন তবে পরপর দু'টি উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয় অভিন্ন হয়ে যেতো এবং তা' লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির বৈচিত্র্যহীনতার নিদর্শন হয়ে উঠতো।

তার চেয়ে রজনীর নামে উপন্যাসের নামকরণ করা অধিকতর সঙ্গত হয়েছে। তাতে বিষয় বৈচিত্র্যও সৃষ্টি হয়েছে। উপন্যাস মানবজীবনের আপাত-বিন্যাস। মানুষের জীবনকে নানা বিচিত্র দৃষ্টি দিয়ে দেখা এবং তাকে কাহিনীতে স্থাপন করা ঔপন্যাসিকের ধর্ম। বঙ্কিমচন্দ্র এক অন্ধ-যুবতীর অনুভবের মধ্য দিয়ে এই রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-অনুভূতিময় জগৎকে আস্বাদন করার এক বিচিত্র পথ বেছে নিয়েছেন এই উপন্যাসের নামকরণ করতে গিয়ে। উপন্যাসের ভূমিকায় তিনি বলেছেন—'যে সকল মানসিক বা নৈতিক তত্ত্ব প্রতিপাদন করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য তাহা অন্ধ যুবতীর সাহায্যে বিশেষ স্পষ্টতা লাভ করিতে পারিবে।' রজনী নিজের শক্তিতে কোন ঘটনাকে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে না পারলেও উপন্যাসের সমস্ত ঘটনার উপরে তার পরোক্ষ প্রভাব অনুভব করা যায়। উপন্যাসের

বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর কার্যকলাপ এবং বক্তব্য রজনীকেন্দ্রিক। রজনীর প্রতি লবঙ্গলতার সহানুভূতি, তার বিবাহের চেষ্টা, রজনীর হৃদয়ে শচীন্দ্রের জন্য অনুরাগের আবির্ভাব, রজনীর গৃহত্যাগ, রজনী-উদ্ধারের সূত্রে কাহিনীতে অমরনাথের অভ্যাগম, অমরনাথের চেষ্টায় রজনীর উত্তরাধিকারত্ব প্রতিষ্ঠা, রজনীকে কেন্দ্র করে লবঙ্গলতা ও অমরনাথের বুদ্ধির দ্বন্দ্ব, শচীন্দ্র-রজনীর বিবাহ ও শিশু অমরপ্রসাদের জন্ম এবং সর্বোপরি রজনীর দৃষ্টিলাভ—উপন্যাসের সব কিছুই রজনীকে ঘিরে। তাই 'রজনীর নামে' উপন্যাসের নামকরণ অধিকতর সঙ্গত।

রজনীর অন্ধকার মানবহৃদয়ের গভীর অন্ধকারেরই দ্যোতক। সেই অন্ধকারে কল্পনার আলোকরশ্মি প্রেরণ করে তার গভীর-গোপন সম্পদটুকু বাহিরের আলোকিত জগতে প্রকট করে দেওয়া ঔপন্যাসিকের কাজ। সে কাজ সম্পন্ন করেছেন বঙ্কিম এই উপন্যাসে। শুধু অন্ধ-রজনীর চোখে দৃষ্টির আলো ফুটিয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি। লবঙ্গলতার—শচীন্দ্রের-অমরনাথের হৃদয়ে যা কিছু লুকিয়েছিলো তা' তিনি আলোকিত করেছেন 'রজনী' উপন্যাসে। 'রজনী' নাম নানা কারণে সঙ্গত হয়েছে।

উপন্যাস হিসাবে 'রজনী'র শ্রেণী-বিচার :

কাহিনী, চরিত্র, মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব, সংলাপ ও লেখকের বিশিষ্ট জীবন-বোধের প্রতিষ্ঠা এই পাঁচটি উপকরণের যোগে উপন্যাস যথার্থ শিল্পরূপ লাভ করে। উপন্যাস মানুষের বাস্তবজীবনের আপাত-বিন্যাস। এই বাস্তবতার সূত্রেই রোমান্সের সঙ্গে উপন্যাসের পার্থক্য ধরা পড়ে। রোমান্সও কাহিনী বটে, কিন্তু সে কাহিনী বাস্তবজীবনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে না। যদিও বাস্তব জীবনকে উপাদান ক'রেও রোমান্স রচিত হতে পারে। তবে, যে কাহিনীতে কল্পনার প্রাধান্য এবং বাস্তবতা সঙ্কুচিত তাকে সাধারণভাবে রোমান্স বলে, উপন্যাস বলে না। উপন্যাসের প্রথম আবির্ভাব রোমান্স থেকেই। তবে, রোমান্সের কাহিনী-সর্বস্বতাকে পিছনে ফেলে দিনে দিনে চরিত্রের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে চরিত্রের বিকাশ উপন্যাসের অবলম্বন হ'য়ে ওঠে। মানবজীবন কেন্দ্রিক কাহিনীর

মধ্য দিয়ে কাহিনীকারের জীবন-সম্পর্কিত বিশ্বাস প্রতিফলিত হওয়া উপন্যাসের ধর্ম। বাঙ্‌লা সাহিত্যে উপন্যাসের এই যথার্থ রূপ বঙ্কিমচন্দ্রেরই সৃষ্টি।

উপন্যাসের এই বৈশিষ্ট্য 'রজনী'তে আছে কিনা সে বিষয়ে সমালোচক-মহলে মতান্তর আছে। এই বৈশিষ্ট্য পরিপূর্ণভাবে 'রজনী'তে আছে—একথা অবশ্যই বলা যায় না। নিতান্ত দেশীয় ভেষজ প্রয়োগে সন্ন্যাসী জন্মান্ধ রজনীর অন্ধত্ব বিমোচন করলেন, শচীন্দ্রেব স্বপ্নে রজনীকে দেখিয়ে শচীন্দ্রের মনে রজনীব প্রতি তীব্র অনুরাগের সৃষ্টি ক'বে দিলেন—এ সব বাস্তবজীবনে সচরাচর-দৃষ্ট ঘটনা নয়। তা' ছাডা এখানে পটভূমিকার আয়তন ক্ষুদ্র, সমস্যা প্রায় অনুপস্থিত; এখানে মুখ্যবিষয় হচ্ছে একটি অন্ধ বালিকার প্রেম ও তার মনস্তত্ত্ব। চরিত্রেব অনুভূতিগুলি এখানে মুখ্যস্থান গ্রহণ করায় ঘটনা গৌণ হয়ে গেছে। এই সব কারণে একদল সমালোচক 'রজনী'কে পরিপূর্ণ উপন্যাস বলতে অনিচ্ছুক। একটি অন্ধ বালিকা লেখকের সমস্ত মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। রজনীর প্রেম ব্যতীত অন্য বিষয়ের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের ঔদাসীন্য এখানে অত্যন্ত স্পষ্ট, তাই, সমালোচকরা অনেকেই 'রজনী'কে একটি বড গল্প ব'লে নির্দেশ করতে চান। তাঁরা মনে করেন যে এত সংকীর্ণ পরিধিতে গল্পই হ'তে পারে, উপন্যাস হয় না।

যাঁরা 'রজনী'কে যথার্থ উপন্যাস বলে অভিহিত করতে চান তাঁরা মনে করেন যে বঙ্কিমচন্দ্রের আমলে উপন্যাসে যে সব উপাদান আবশ্যিক-রূপে গৃহীত হ'তো তা' আর এখন হয় না। উপন্যাসের সংজ্ঞা এখন পরিবর্তিত হয়েছে। মানুষের কর্মমুখর জীবনে তখন ঘটনাই ছিল প্রধান, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে তখন চরিত্র বিকশিত হ'তো। তখনও আমাদের সমাজে ব্যক্তির প্রাধান্য জাগেনি। এখন যুগের পরিবর্তন হয়েছে, এখন চরিত্র মুখ্য হয়ে ঘটনা হয়ে গেছে গৌণ। বঙ্কিম প্রতিভাধর শিল্পী। তিনি তাঁর যুগকে আপন প্রতিভাবলেই অতিক্রম করেছেন, ভবিষ্যৎকে দেখেছেন প্রতিভার পূর্বগামিতার বলে। তিনি সেই যুগকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে যুগে মানুষ বহির্জগৎ-এর চেয়ে অন্তর্জগৎকেই মূল্য দেবে বেশি। ফলে, উপন্যাসে চরিত্রের চেয়ে মনস্তত্ত্ব প্রাধান্য পাবে। বঙ্কিমের 'রজনী' উপন্যাসে রজনীর প্রেম ও সে প্রেমের মহিমাকে প্রকাশ করা লেখকের প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। রজনী, অমরনাথ, শচীন্দ্র ও লবঙ্গলতাকে

কেন্দ্র ক'রে যে দ্বন্দ্ব চিত্রিত হয়েছে তা' বাহিরের ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ না করলেও অন্তরের ঘটনার বিচিত্র চিত্রে পরিণত হয়েছে। তা' যে জীবন চিত্রকে অতি গভীরভাবে ব্যক্ত করেছে তা' বাইরের ঘটনাবহুল জীবন নয়। অন্তরের অনুভূতিময় জীবন। সেখানে মানুষের অন্তরলোকে যে সব ঘটনা ও দুর্ঘটনার আবর্ত সৃষ্টি হয়েছে তা' বাহিরের ঘটনার চেয়ে কম চিত্তাকর্ষক নয়। তাদের আকর্ষণ ও বিকর্ষণ অতি প্রবল হ'য়ে পাঠকচিত্তকে অভিভূত করে। অমরনাথের ব্যর্থ প্রেমের যন্ত্রণা থেকে মহৎ বৈরাগ্যের অভ্যুদয়, লবঙ্গলতার গৃহিণীপনার অন্তরাল থেকে. অকস্মাৎ পূর্বপ্রেমের আপাত-স্বীকৃতি, অন্ধ-রজনীর কর্ণেন্দ্রিয় ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের সজাগ অভ্যর্থনায় গোপন প্রেমের পদসঞ্চার—সবই মানব-হৃদয়ের কৌতূহলোদ্দীপক ক্রিয়াকর্মের পরিচয়বহ। মানুষের চরিত্র সৃষ্টি করা যদি উপন্যাসের কাজ হয় তবে, 'রজনী' অবশ্যই একটি পরিপূর্ণ উপন্যাস। তবে, সে সাধারণ-অর্থের উপন্যাস নয়। বাঙ্‌লা সাহিত্যে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের প্রথম নিদর্শন। প্রাচীনকালের শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অসাধারণ প্রতিভার বলে নিজের যুগকে অতিক্রম ক'রে আধুনিককালের মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস লিখে গেছেন এই 'রজনী' রচনা ক'রে।

'রজনী' উপন্যাসে কাহিনী বর্ণনার বিশিষ্টভঙ্গি :

'রজনী' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র এক অভিনব ভঙ্গীর আশ্রয় নিয়েছেন, সাধারণতঃ ঔপন্যাসিক উপন্যাসের কাহিনী নিজের জবানীতেই ব্যক্ত করেন। কিন্তু বঙ্কিম 'রজনী'তে নিজে কাহিনী বর্ণনা করেননি, চারটি প্রধান চরিত্রের মুখ দিয়ে তিনি ঘটনা বিবৃত করিয়েছেন। নাট্যকার যেমন নিজে অন্তরালে অদৃশ্য থেকে নাটকের পাত্র-পাত্রীর উক্তি-প্রত্যুক্তি, ক্রিয়াকর্মের মধ্য দিয়ে নাট্যকাহিনী বিবৃত করেন, উপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র অনেকটা সেই পদ্ধতির প্রয়োগ করেছেন। এখানে ঔপন্যাসিক নিজে কিছুই বলেননি, যা 'কিছু বলার কথা তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব দিয়েছেন চারটি চরিত্রের উপরে। রজনীর কথা, শচীন্দ্রের কথা, অমরনাথের কথা ও লবঙ্গলতার কথা—চারজনের বলা কথার মধ্য দিয়ে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র 'রজনী' উপন্যাসের ভূমিকায় বলেছেন—'এ প্রথার গুণ এই যে, যে কথা যাহার মুখে শুনিতে ভাল লাগে,

সেই কথা তাহার মুখে ব্যক্ত করা যায়।' 'রজনী' উপন্যাস লেখার চার বছর আগে বঙ্কিমচন্দ্র 'ইন্দিরা' গ্রন্থে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিলেন, কিন্তু সেখানে কাহিনীর কথক একজনই, সে শুধু ইন্দিরা নিজে।

বঙ্কিম-প্রদর্শিত এই পথে পরবর্তীকালে অনেক ঔপন্যাসিক বিচরণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' ও 'চার-অধ্যায়' এবং শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' তার নিদর্শন। 'রজনী'তে এই বিশিস্ট ভঙ্গীর আশ্রয় নেওয়া যে সবদিক দিয়ে সফল হয়েছে তা' বলা যায় না। প্রথমতঃ বঙ্কিমচন্দ্র এই পদ্ধতির যে গুণের কথা বলেছেন—'যে কথা যাহার মুখে শুনিতে ভাল লাগে'—সেই গুণটি সর্বত্র রক্ষিত হয়নি। যদিও রজনী, লবঙ্গলতা, অমরনাথ ও শচীন্দ্র—প্রত্যেকেই আপন আপন অভিজ্ঞতার কথা বলায় পুনরুক্তিদোষ ঘটেনি, ঘটনার পারম্পর্যও রক্ষিত হযেছে, তবু চরিত্র-অনুযায়ী ভাষা-প্রয়োগে পরিমিতিবোধের অভাব ঘটেছে। যেমন চরিত্র তেমন বর্ণনা সবক্ষেত্রে হয়নি। শিক্ষিত শচীন্দ্র বা অমরনাথের মুখে যে ভাষা বসানো হয়েছে, অন্ধ রজনীর মুখে ঠিক একই ভাষা বসানো সঙ্গত হয়নি। চক্ষুষ্মান শচীন্দ্র, অমরনাথ বা লবঙ্গর পক্ষে যে ধরণের দর্শনজাত অভিজ্ঞতা সম্ভব, অন্ধ রজনীর কখনও তেমন অভিজ্ঞতা হ'তে পারে না। অথচ, রজনীকে দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র এমন অনেক কথা বলিয়েছেন যা একজন অন্ধের পক্ষে বলা সঙ্গত নয়। অন্ধ রজনী যখন বলে যে 'হীরালাল তৎকালে ভগ্নমনোরথ হইয়া ঘরের এদিক সেদিক দেখিতে লাগিল' তখনই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে যে চক্ষুহীনা রজনী কেমন ক'রে হীরালালের এদিক-সেদিক দেখার কথা জানতে পারে? অমরনাথের মুখ দিযে বঙ্কিম বলিয়েছেন—'আমাকে দেখিলে রজনী কিছু লজ্জিতা হইত'—রজনী কেমন ক'রে অমরনাথকে দেখবে?

কলাকৌশলের দিক থেকে উপন্যাসের চরিত্রসমূহকে কাহিনী বর্ণনের ভার দেওয়ার রীতি আবার অনেকাংশে সার্থক হয়েছে। এই রীতির জন্যই এক চরিত্রের বক্তব্য শেষ হ'লে অপরচরিত্রের বক্তব্য শোনবার জন্য পাঠকের কৌতূহল উদ্দীপ্ত হয। চরিত্রগুলি পাঠকের অন্তরঙ্গ হ'য়ে ওঠে। তারা পাঠকের কাছে নিঃসঙ্কোচে নিজ নিজ হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত ক'রে দেয়। তাদের সুখ, তাদের দুঃখে পাঠক অংশীদার হয়ে ওঠেন। অন্ধ-যুবতী রজনীর হৃদয়ের গভীরে যে জ্বালা তা' পাঠকের কাছে সহজেই ধরা দিয়েছে। কোন্ মানসিকতার জন্য অমরনাথ বিবাগী হয়ে পথে বেরিয়ে পড়েছে

তা' বুঝতে পাঠকের কোনও অসুবিধা হয়নি। লবঙ্গলতার হৃদয়জোড়া সংস্কার ও গুপ্তপ্রেমের যে লীলা তা' পাঠকের কাছে দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়েছে এই পদ্ধতি প্রয়োগের ফলেই।

অন্যদিকে এই রীতি প্রয়োগের ফলে একটি বড় অসংগতি এই উপন্যাসে দেখা দিয়েছে। এই রীতি প্রয়োগ না ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র যদি সরাসরি লেখকের জবানীতে কাহিনী বর্ণনা করতেন তবে এই অসংগতি ঘটতো না। উপন্যাসের চরিত্রগুলি ঠিক কখন কাহিনী বর্ণনা সুরু করেছেন—সব ঘটনা ঘটে যাবার পরে, না, ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে? সাহিত্যে কালানৌচিত্য দোষ একটি বড় ত্রুটি। বিদগ্ধ সমালোচক ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত 'রজনী' উপন্যাস সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন—'উপন্যাস-বর্ণিত চরিত্রেরা কখন কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং একে অপরের আখ্যায়িকা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ ছিল কি না?' যদি ধ'রে নেওয়া যায় যে সমস্ত ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে রজনী-শচীন্দ্র-অমরনাথ-লবঙ্গলতা পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়া ক'রে নিয়ে কাহিনী বলতে সুরু করেছেন তবে রজনী বলতে পারে যে 'এ যন্ত্রণাময় জীবনচরিত আর বলিতে সাধ করে না, আর একজন বলিবে'। কিন্তু তখন প্রশ্ন জাগে যে ঘটনার শেষে রজনীর যন্ত্রণা আর নেই, সে তো সবই পেয়েছে! তার মুখে এই সকরুণ উক্তি কি তখন আর শোভা পায়? শচীন্দ্রনাথ তার বক্তব্য সুরু করতে গিয়ে বলেছেন—'এ ভার আমার প্রতি হইয়াছে', অমরনাথ বলেছেন—'এই ইতিহাসে ভবানী-নগর নামে অন্য গ্রামের নাম উত্থাপিত হইবে'। বিভিন্ন চরিত্রের এই ধরণের উক্তি থেকে একথাই মনে আসে যে ঘটনা ঘটে যাবার পরে পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়া ক'রে নিয়ে চরিত্রগুলি নিজ নিজ বক্তব্য সুরু করেছে। ফলে, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অজ্ঞতাজনিত স্থিরতার মধ্যে বাহিরের ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে চরিত্রের বিকাশ যে বিস্ময় উৎপাদন করে তার পথ রুদ্ধ হয়েছে; উপন্যাস তার সধর্ম হারিয়ে ইতিহাস-এ পর্যবসিত হয়েছে। এক কথায়, উপন্যাস তার সজীবতা হারিয়েছে। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র চরিত্রসমূহের মুখ দিয়ে কাহিনী-বর্ণনার যে রীতি 'রজনী' উপন্যাসে অবলম্বন করেছেন তা' সম্পূর্ণ সার্থক হয়নি।

'রজনী' উপন্যাসের নায়ক নায়িকা :

বঙ্কিমচন্দ্র রজনীর নামে উপন্যাসের নামকরণ করেছেন, ভূমিকায় বলেছেন যে তাঁর অভিপ্রেত 'মানসিক বা নৈতিকতত্ত্ব' প্রতিপাদন করতে সুবিধা হবে বলেই তিনি অন্ধ যুবতী 'রজনী'র চরিত্র নির্মাণ করেছেন। সুতরাং, বঙ্কিম-রচিত এই উপন্যাসের কেন্দ্রে যে 'রজনী' বিদ্যমান, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। যে চরিত্র বহিরঙ্গ-বিচারে গৌণ হ'য়েও, আপাত-দৃষ্টিতে অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় হয়েও, সমগ্র কাহিনী বিস্তারে অলক্ষ্যে প্রভাব বিস্তার করে তাকে অনেক সময়েই কেন্দ্রীয় চরিত্রের মর্যাদা দেওয়া হয়। সেদিক থেকে বিচার করলে আমরা রজনীকেই এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্রের মর্যাদা দিতে পারি। সেই কারণে রজনী উপন্যাসের নায়ক-বিচারের আগে নায়িকা-বিচার করাই সঙ্গত হবে। প্রথমেই দেখা যাক, রজনী এই উপন্যাসের নায়িকা কি না ?

উপন্যাসে বর্ণিত কাহিনী আদ্যোপান্ত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে রজনীর তুলনায় লবঙ্গলতা অনেক বেশি সক্রিয়। অনেক বেশি উজ্জ্বল। লবঙ্গলতা বঙ্কিমচন্দ্রের এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। 'রজনী' উপন্যাসের অধিকাংশ ঘটনার উৎসমুখে লবঙ্গলতা বিদ্যমানা। লবঙ্গর কক্ষেই রজনীর সংযোগ শচীন্দ্রর সঙ্গে। লবঙ্গর ইচ্ছায় রজনীর বিবাহের উদ্যোগ, লবঙ্গর আদেশেই শচীন্দ্রর রজনীর জন্য পাত্র-সন্ধান ও গোপালের সঙ্গে বিবাহের অনুবন্ধ। লবঙ্গর অভিপ্রেত বিবাহ বন্ধ করতে অক্ষম রজনীর চাঁপার সহায়তায় গৃহত্যাগ, পথিমধ্যে নিগৃহীতা রজনীর উদ্ধারে অমরনাথের আবির্ভাব। রজনীর প্রাপ্য সম্পত্তির উদ্ধারের জন্য উদ্যোগী অমরনাথের সঙ্গে লবঙ্গলতার দ্বন্দ্ব, লবঙ্গলতার পূর্বপ্রণয় ও সংস্কারের আভাষ, লবঙ্গলতার গভীর গোপন হৃদয়ভাবের আকস্মিক প্রকাশ, লবঙ্গলতার উপরোধেই সন্ন্যাসীর শচীন্দ্রর হৃদয়ে রজনীর জন্য অনুরাগের সঞ্চার, লবঙ্গলতার ব্যবস্থাপনায় রজনীর হৃদয়ের গোপনব্যথা অমরনাথের গোচরীভূত হওয়া, এবং অবশেষে লবঙ্গলতার হাতে উইল সমর্পণ ক'রে অমরনাথের প্রস্থান ও শচীন্দ্র-রজনীর বিবাহ—সমস্ত কাহিনীতে লবঙ্গলতার এই সক্রিয় ভূমিকা অবশ্যই তাকে নায়িকার মর্যাদা পাবার অধিকার দিয়েছে। উপন্যাস-পাঠ শেষ হ'য়ে যাবার পরে 'রজনী' উপন্যাসের যে চরিত্রটি পাঠকের মনের আকাশে শুকতারার মত জেগে থাকে তা' লবঙ্গলতার। বাহিরে ৬৩ বছরের বৃদ্ধ রামসদয়ের সহধর্মিনী মিত্রবাড়ির সর্বময় কর্ত্রী উনিশ বছরের লবঙ্গলতা অন্তরের অভ্যন্তরে যে গভীর বেদনাকে বহন

করছে তার পরিচয় অকস্মাৎ আভাষিত হয়ে লবঙ্গলতার চরিত্রকে উপন্যাসোচিত বিচিত্রতা দান করেছে। তাই, 'রজনী' উপন্যাসের নায়িকার সন্ধান করতে গেলে প্রথমেই লবঙ্গলতার কথা মনে পড়ে।

নায়িকা তাকেই বলা যায়, যে কাহিনীর কেন্দ্রে বিরাজিত থাকে, যাকে ঘিরে কাহিনীর অন্যান্য চরিত্র আবর্তিত হয়, এবং যার মধ্য দিয়ে লেখকের মনোগত অভিপ্রায় কিংবা বিশেষ কাঙ্ক্ষিত তত্ত্ব প্রতিপাদিত হয়। লবঙ্গলতার নির্দেশে এই কাহিনীর অনেক ঘটনাই সংঘটিত হয়েছে, লবঙ্গলতা এই কাহিনীর উপরে খুবই প্রভাব বিস্তার করেছে, কিন্তু লবঙ্গর মধ্য দিয়ে যে তত্ত্ব প্রতিপন্ন হয়েছে তা' হচ্ছে 'বাহিরে যার হাসির ছটা, ভিতরে তার চোখের জল'। সে তত্ত্ব প্রতিপাদন করা বঙ্কিমচন্দ্রের অভিপ্রেত নয়। তিনি স্বয়ং বলেছেন 'যে সকল মানসিক বা নৈতিক তত্ত্ব প্রতিপাদন করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য, তাহা অন্ধ-যুবতীর সাহায্যে বিশেষ স্পষ্টতালাভ করিতে পারিবে—'। অন্ধ রজনীর হৃদয়ে প্রেমের জাগরণ, সেই প্রেমের দায়ে রজনীর গৃহত্যাগ, গৃহত্যাগিনী রজনীর উদ্ধারে অমরনাথের আবির্ভাব, রজনীর উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠায় অমরনাথের তৎপরতা, রজনীর প্রেমের চরিতার্থতা ও শচীন্দ্রের সঙ্গে বিবাহ, রজনীর পুত্রলাভ ও চক্ষুহীনতা থেকে চক্ষুষ্মতী হয়ে ওঠার কাহিনীই এই উপন্যাসের মূল কাহিনী। লবঙ্গলতার প্রণয় ও তার পরবর্তী প্রতিক্রিয়া বর্ণনা বঙ্কিমচন্দ্রের অভিপ্রেত বিষয় নয়। চরিত্র হিসাবে লবঙ্গলতা যতই সক্রিয় হোক না কেন এবং রজনী যতই কম সক্রিয় হোক না কেন, উপন্যাসের সব ঘটনাই রজনী-কেন্দ্রিক। অমরনাথের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শচীন্দ্রের প্রতি অনুরাগ—এই দুইএর দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত-হৃদয় রজনীই এই উপন্যাসের নায়িকা। অন্যান্য চরিত্রের যা কিছু সক্রিয়তা তা' রজনীর জন্যই।

'রজনী' যদি এই উপন্যাসের নায়িকা হয়, তবে, প্রথমেই আমাদের ভাবতে হয়—শচীন্দ্র এই উপন্যাসের নায়ক কিনা। নায়ক যে একজন থাকতেই হবে তার কোনও বাঁধাধরা নিয়ম নেই। নায়কহীন নায়িকা-প্রধান উপন্যাস হ'তেই পারে। তা' ছাড়া বিপত্নীক শচীন্দ্র বিদ্বান, বুদ্ধিমান, বিনয়ী, হৃদয়বান, —যাই হোক না কেন, তিনি এই উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনার মধ্যে নায়কোচিত কর্মতৎপরতার কোনও পরিচয় দেননি। তিনি অন্ধ রজনীর সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে বলেছেন—'যাহাকে স্বয়ং বিবাহ করিতে না পারি, তাহাকে বিবাহ দিতে ইচ্ছা করে। ঐ ইচ্ছাই তাকে উদ্বুদ্ধ করেছে মাত্র, রজনীকে লাভ করার জন্য

তার কোনও সক্রিয়তার পরিচয় এই কাহিনীতে নেই। স্বপ্নে রজনী-মূর্তি দর্শনে তাঁর হৃদয়ে যে প্রণয় জাগ্রত হয়েছে তা'তে তিনি অসুস্থ হয়েছেন; তার বিমাতা লবঙ্গলতা তাঁর এই প্রণয়কে চরিতার্থ করার জন্য যতটুকু উদ্যম নিয়েছেন তা' শচীন্দ্র নিতে পারেন নি। অনুকূল ভাগ্য ও অমরনাথের মহত্ত্বের জন্যই শচীন্দ্র রজনীকে লাভ করেছেন, নিজের কোনও কর্মকৃতিত্বের জন্য নয়। তাই, নায়কের মহিমা-গৌরব শচীন্দ্রকে দেওয়া যায় না।

নায়কের মর্যাদা যদি কাউকে দিতেই হয় তবে তা' অমরনাথের প্রাপ্য। অমরনাথ রজনীর জন্য যে পরিমাণ তৎপর হয়েছেন এবং ত্যাগ স্বীকারের মধ্য দিয়ে যে দুর্লভ মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা' তাকে পাঠকহৃদয়ে শ্রদ্ধা সম্ভ্রমপূর্ণ আসনে বসিয়েছে। এক হীনচরিত্র পুরুষের লালসার হাত থেকে বিপন্না রজনীকে অমরনাথ উদ্ধার করেছেন, উদ্ধার করেছেন রজনীর প্রাপ্য সম্পত্তিকে, রজনীকে জীবনসঙ্গিনী করে তিনি নিজে কৃতার্থ হয়ে রজনীকে নারীত্বের পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু, ফেলে আসা অতীত বর্তমানে ফিরে এসে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ-দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়েছে। লবঙ্গলতার সঙ্গে দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়ে, নিজে পরাভূত হ'য়েও তিনি জয়ী হয়েছেন শুধু হৃদয়ের মহত্ত্বের জন্য। তিনি যখনই জানলেন যে 'রজনী শচীন্দ্রর, শচীন্দ্র রজনীর' তখনই তিনি ভাঙ্গাভাগ্য নিয়ে বৈরাগ্যের উত্তরীয় উড়িয়ে পথে বেরিয়ে পড়েছেন। বুঝেছেন, ঘরের মঙ্গলশঙ্খ তাঁর জন্য নয়। নিষ্ক্রিয় শচীন্দ্র যে ভাগ্যের বলে রজনীকে লাভ করেছেন সেই ভাগ্যই চূড়ান্ত-সক্রিয় অমরনাথকে বৈরাগ্যের পথে ঠেলে দিয়েছে। অমরনাথের এই মহত্ত্ব ও কর্মতৎপরতা তাঁকে 'রজনী' উপন্যাসের নায়ক-পদের দাবিদার করেছে। নায়ক যদি কাউকে করতেই হয় তবে অমরনাথই প্রধান বিবেচ্য, শচীন্দ্র নয়। তবে, 'রজনী'কে নায়কহীন নায়িকাপ্রধান উপন্যাসরূপে নির্দিষ্ট করা বোধকরি বেশি সমীচীন হবে।

'রজনী' উপন্যাসে অতি-প্রাকৃত বা অ-লৌকিক উপাদান ঃ

আমাদের প্রতিদিনের প্রাকৃত-জীবনে সচরাচর যা ঘটে বা ঘটা সম্ভবপর তার চেয়ে অতিরিক্ত কোন অসাধারণ বা অসম্ভব ঘটনাকেই বলা যেতে পারে অতি-প্রাকৃত ঘটনা। মানুষের এই লৌকিক জীবন কতকগুলি সম্ভবপরতার

সীমায় নিবদ্ধ, লৌকিক জীবনের সেই সম্ভবপরতার সীমারেখা যখন অতিক্রান্ত হয় তখন তাকে আমরা বলি অ-লৌকিক, অর্থাৎ যা লৌকিক নয়। উপন্যাস মানব জীবনের আপাতবিন্যাস। মানুষের জীবনে যা প্রকৃত ঘটে, বা যা ঘটা সম্ভবপর, তারই বিন্যস্ত রূপটিকেই উপন্যাস বলা চলে। মানুষের জীবনের একটি নিজস্ব গতি আছে, তা' নিজের ধর্মে চলে। অন্যকেউ ইচ্ছা-মতন একজনের জীবনের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। মানুষের জীবন তো যন্ত্র নয়, তাকে ইচ্ছামতন হাতল ঘুরিয়ে অন্যমুখে চালিত করা যায় না। যখন কোনও ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাসের বিশেষ চরিত্রের বিকাশ ঘটাতে গিয়ে বাস্তব জীবনধর্মকে উপেক্ষা ক'রে তাঁর ইচ্ছামতন অবিশ্বাস্য অসম্ভবের প্রয়োগ ঘটান তখনই আমরা সেই উপন্যাসে অতি-প্রাকৃত বা অলৌকিকের অস্তিত্ব অনুভব করি।

বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক উপন্যাসেই আমরা এই অতি-প্রাকৃত বা অলৌকিকের সাক্ষাৎ পাই। অনেকক্ষেত্রেই তা' বাস্তব জীবনের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে সম্ভবপরতার সীমায় এসে পৌঁছেছে। কপালকুণ্ডলা স্বপ্ন দেখেন, কুন্দনন্দিনী স্বপ্ন দেখেন, স্বপ্ন সব মানুষই দেখেন—স্বপ্ন দেখা কিছু অসম্ভব বা অবাস্তব ঘটনা নয়। কিন্তু সেই স্বপ্ন যদি কেউ পূর্ব থেকে নির্দিষ্ট করে দিয়ে বলে যে আজ তুমি যাকে স্বপ্নে দেখবে সে তোমার প্রণয়িনী, তখনই পাঠকের অবিশ্বাস জাগ্রত হয়। সে স্বপ্ন স্বভাবধর্মে সহজভাবে দৃষ্ট স্বপ্ন নয়, তা' ফরমায়েসী স্বপ্ন। রজনী উপন্যাসে সন্ন্যাসী লবঙ্গলতার উপরোধে রজনীর প্রতি শচীন্দ্রর মনে অনুরাগ সঞ্চার করাতে ইচ্ছামতন স্বপ্ন দেখিয়েছেন। শচীন্দ্রর কণ্ঠস্বর শুনে, শচীন্দ্রর স্পর্শে অন্ধ রজনীর চিত্তে যে তীব্র আকর্ষণ ও গভীর অনুরাগের সঞ্চার হয়েছে তা' একদিক থেকে স্বপ্নই, সামাজিক সম্ভাব্যতার বিচার সেখানে ছিল না। সে স্বপ্ন বাস্তব। কিন্তু রজনীর ভাগ্য পরিবর্তনের ফলে শুধু সম্পত্তি বাঁচানোর তাগিদে রজনীকে পুত্রবধূ করার প্রয়োজন যখন লবঙ্গলতা ও রামসদয় তীব্রভাবে অনুভব করলো তখনই সন্ন্যাসীর অলৌকিকশক্তির সাহায্যে শচীন্দ্রকে স্বপ্ন দেখিয়ে রজনীর প্রতি অনুরাগী ক'রে তোলা নিতান্তই অবাস্তব বা অতি-প্রাকৃত। ফলে, উপন্যাসের বাস্তবানুগ রূপায়ণ বিঘ্নিত। সেদিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের এই উপন্যাসে অতি-প্রাকৃতের প্রয়োগ একটি মস্ত বড় ত্রুটি। বাঙ্‌লা উপন্যাসের সমালোচক-চূড়ামণি ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত এখানে স্মরণ করা যেতে পারে—"শচীন্দ্রের

মনোভাব পরিবর্তনের যাহা মূল কারণ, তাহা অতি-প্রাকৃতের রাজ্য হইতে আসিয়াছে, বাস্তব-জগতের বিশ্লেষণ-প্রণালী তাহার উপর প্রযোজ্য নহে। উপন্যাসের দিক হইতে ইহাকে একটি অপরিহার্য ত্রুটি বলিয়াই ধরিতে হইবে।”

অ-লৌকিকের বিশেষত্বই হচ্ছে সমস্ত লৌকিক প্রথা-পদ্ধতি, নিয়ম-ধর্মকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করা। যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগে জন্মান্ধকে দৃষ্টি দেওয়া লৌকিক জীবনে সম্ভবপর, শল্যচিকিৎসার সাহায্যে অন্ধের অক্ষিকোটরে অপরের চক্ষু স্থাপন করার যে প্রয়াস করা যায় তার প্রতি বিন্দুমাত্র গুরুত্ব না দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সন্ন্যাসী-প্রদত্ত ঔষধে একমাসে রজনীর অন্ধত্ব বিমোচন করিয়েছেন, ‘যা ইউরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্রানুসারে’, তখন পর্যন্ত অসাধ্য ছিল। বিদগ্ধ সমালোচক ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত বলেছেন—‘সন্ন্যাসী যে শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা একেবারে অনৈসর্গিক।’ এরপরে আমাদের মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। অতি-প্রাকৃত ও অলৌকিকত্বের প্রয়োগে বঙ্কিমচন্দ্র যে ‘রজনী’ উপন্যাসে সিদ্ধকাম হননি তা’ সহজেই মনে করা যেতে পারে।

চরিত্র-বিশ্লেষণ : রজনী :

সমস্ত জগৎ যার কাছে রজনীর অন্ধকারে আবৃত, বঙ্কিমচন্দ্র তার নাম দিয়েছেন রজনী। মনোহর দাসের ভ্রাতা হরেকৃষ্ণ দাস রজনীর পিতা, দারিদ্রের নিদারুণ আঘাতে ক্লিষ্ট হরেকৃষ্ণ তার জন্মান্ধ কন্যা রজনীকে আপন শ্যালীপতি রাজচন্দ্র দাসের হাতে সমর্পন করেছিলেন লালন-পালনের জন্য। সেদিক থেকে রাজচন্দ্র রজনীর পালক-পিতা, রজনী তাকেই পিতা ব’লে জানে।

রাজচন্দ্র নিজেও দরিদ্র। বালীগঞ্জের সন্নিকটে তার ফুলের বাগান, সেই বাগানের ফুলই রাজচন্দ্রের জীবিকার অবলম্বন। জন্মান্ধ রজনী সেই ফুলের মালা গেঁথে পিতামাতাকে সাহায্য করে। রাজচন্দ্রের স্ত্রী পাড়ার সম্পন্ন গৃহস্থদের বাড়িতে সেই ফুল ও ফুলের মালা দিয়ে আসে। ক্বচিৎ কখনও অন্ধ রজনীকে যেতে হয় মায়ের হয়ে। রামচন্দ্রের প্রতিবেশী ধনাঢ্য রামসদয় মিত্রের গৃহে ফুলের যোগান দেওয়া রাজচন্দ্রের স্ত্রীর নিত্যদিনের কাজ।

মায়ের হ'য়ে রজনী একদিন গিয়েছে রামসদয়-গৃহিনী লবঙ্গলতার কক্ষে ফুল পৌঁছে দিতে। সেদিনই রজনীর হৃদয়ে অকস্মাৎ ফুল ফুটলো, দক্ষিণ সমীরণের হিল্লোল জাগলো, তার এতদিনের অনাস্বাদিত-যৌবন আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ হ'য়ে উঠলো। রামসদয়-পুত্র শচীন্দ্রর কণ্ঠস্বর রজনীর কর্ণকুহর পরিপূরিত ক'রে সমস্ত চেতনায় নূতন কাঁপন জাগালো, এবং অবশেষে, শচীন্দ্র যখন রজনীর অন্ধত্ব পরীক্ষার জন্য এগিয়ে এসে চিবুক স্পর্শ করলো তখন রজনী মনে মনে বললো—'সেই চিবুকস্পর্শে আমি মরিলাম'। রজনীর মনে জাগলো অসম্ভবের স্বপ্ন; শচীন্দ্রর কণ্ঠস্বর শোনার লোভে, শচীন্দ্রর আরেকটু স্পর্শের আশায় রজনী যেতে সুরু করলো রামসদয়ের গৃহে। জন্মান্ধ রজনীর মনে তখন প্রশ্ন জাগলো—'বহুমূর্তিময়ী বসুন্ধরে, তুমি দেখিতে কেমন, শচীন্দ্র দেখিতে কেমন।' শচীন্দ্র এসবের কিছুই জানলো না। তার মনে এই অভাগিনী জন্মান্ধ যুবতীর জন্য রইলো শুধুই অনুকম্পা।

অনুকম্পাবশেই লবঙ্গলতা রজনীর বিয়ে দিতে চায়, তার নির্দেশে অনুকম্পাবশেই শচীন্দ্র রজনীর বিয়ের বন্দোবস্ত করে গোপালের সঙ্গে। কিন্তু রজনী যে নিজের হৃদয় বিকিয়ে দিয়েছে শচীন্দ্রের উদ্দেশে! সে অন্ধ বটে, সে জানে যে তার এই প্রেম চরিতার্থ হবার নয়! সে মনে মনে বলে 'বোবার কবিত্ব যেমন কেবল যন্ত্রণার জন্য, আমাব হৃদয়ের প্রণয়সঞ্চার তেমনি যন্ত্রণার জন্য'। তাই বলে তার আত্মবিশ্বাস, ধৈর্য, তিতিক্ষা, তেজস্বিতা ও সম্ভ্রমবোধ যে কোন চক্ষুষ্মতী রমণীর চেয়ে কম নয়। সে গোপালের স্ত্রী চাঁপার পরামর্শে হীরালালের সঙ্গে গৃহত্যাগ করেছে হুগলীতে গিয়ে কয়েকদিন আত্মগোপন ক'রে থাকার জন্য, গোপালের সঙ্গে বিয়ে বন্ধ করার জন্য। সে হীরালালের হাতের লাঠি দু'খণ্ড করে এক খণ্ড নিজের হাতে রেখেছে, নির্জন নদীতটে পরিত্যক্তা হয়ে সেই অর্ধখণ্ড লাঠি দিয়ে অব্যর্থ নিশানায় হীরালালকে আঘাত করেছে, দৈহিক শক্তি ও মানসিক বল—দুয়েরই প্রমাণ দিয়েছে সে। অন্যদিকে, শচীন্দ্রকে না পাওয়ার বেদনা ও নির্জন নদীতটে পরিত্যক্তার অসহায়তা তাকে প্রণোদিত করেছে আত্মবিসর্জনে। সে ভেবেছে—'আমি কেন জন্মিলাম? কেন অন্ধ হইলাম? জন্মিলাম ত শচীন্দ্রের যোগ্য হইয়া জন্মিলাম না কেন?'

বাইরের পৃথিবী যার কাছে নিরন্ধ্র-অন্ধকারে আচ্ছন্ন, অন্তরের পৃথিবী তার অনেক ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ। ত্যাগের মহিমায় রজনী-চরিত্র মহিয়সী।

দরিদ্র বলে রজনীকে অনুকম্পা দেখিয়ে 'কানী' বলে উপহাস করে যে লবঙ্গলতা আত্মপ্রসাদ লাভ করতো তার সব গর্ব চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেলে রজনী সব সম্পত্তি তাদের হাতে দান করতে দ্বিধা করেনি। পূর্ব-অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা তার মনে জাগেনি। প্রেমের প্রসাদে যে মহিমায় অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, রজনীর সেই মহিমা এই উদারতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। একদিকে শচীন্দ্রের জন্য বুকভরা প্রেম, অন্যদিকে অমরনাথের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতাবোধ—দুই-এর দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে রজনীর হৃদয়। শচীন্দ্রর কাছ থেকে প্রেমের প্রতিদান সে পায়নি, কিন্তু অমরনাথের কাছ থেকে পেয়েছে অযাচিত প্রেম। যে তার জীবন ও সম্ভ্রম রক্ষা করতে নিজে পাশবিক আক্রমণের শিকার হয়েছিলো তাকে প্রত্যাখ্যান করেনি রজনী। সে অমরনাথকে বিবাহ করতে সহজেই সম্মত হয়েছে, শচীন্দ্রকে ভালবেসেও সে তাকে বিবাহ করতে চায়নি। অমরনাথ শচীন্দ্রর প্রতি রজনীর ভালবাসার কথা জানতে পেরে নিজে থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। অমরনাথের এই ত্যাগের মহিমাকে স্বীকৃতি দিয়ে রজনীর পুত্রের নামকরণ হয়েছে 'অমরপ্রসাদ'। সারল্য, সততা, একাগ্রতা, নম্রতা, ধৈর্য ও তিতিক্ষার মূর্তিমতী চরিত্র রজনী। গভীর ভালবাসার অন্য নাম রজনী। সমুচিত কৃতজ্ঞতার অন্য নাম রজনী। অমরনাথের সঙ্গে ঐকামত হয়ে সকলেই বলবেন—'অন্ধ রজনী রমণীকুলে ধন্য।'

লবঙ্গলতা :

দম্ভের গগনচুম্বী প্রাসাদ ভাগ্যের পরিহাসে কেমন ক'রে ভূলুণ্ঠিত হয় তা' দেখতে চাইলে রজনী উপন্যাসের লবঙ্গলতাকে দেখতে হয়। চলনে-বলনে উচ্ছ্বসিত হাসি কেমন করে গভীর বেদনার অশ্রুকে অন্তরের অভ্যন্তরে লালন করে তা' দেখতে চাইলে লবঙ্গলতাকে দেখতে হবে। সমাজধর্মের জয়পতাকা উড্ডীন করতে গিয়ে হৃদয়ধর্মকে নস্যাৎ করা আত্মপ্রতারণার প্রতিমূর্তিকে দেখতে চাইলে লবঙ্গলতাকে দেখতে হবে। বঙ্কিমসাহিত্যে এক অবিস্মরণীয় চরিত্র লবঙ্গলতা।

কিশোরী লবঙ্গলতা ভালবেসেছিলো অমরনাথকে। বিয়েও হতে যাচ্ছিল দু'জনের। কিন্তু অমরনাথের পরিবারে একটি কলঙ্কচিহ্ন অন্তরায়

হ'লো সে বিবাহের। প্রথম যৌবনের উচ্ছ্বসিত আবেগে অমরনাথ গিয়েছিলো গোপনে রাত্রির অন্ধকারে লবঙ্গলতার শয়নকক্ষে। লবঙ্গলতা চায়নি যে তার প্রেমাস্পদ চোরের মত আসুক, শিহরিত বিচলিত হয়েছিলো সে। কৈশোরের প্রগল্‌ভতায় সেদিন অমরনাথকে তার এই দুষ্কর্মের জন্য যে শাস্তি লবঙ্গলতা দিয়েছিলো তা' নিষ্ঠুরতারই নামান্তর। তপ্ত লৌহশলাকা দিয়ে অমরনাথের পিঠে দাগিয়ে দিয়েছিলো 'চোর' শব্দটি। একদিকে সমাজধর্মের প্রতি আনুগত্য, অন্যদিকে দম্ভ ও অভিমান প্রণোদিত করেছিলো তাকে এই নির্মম কাজে।

লবঙ্গলতার বিয়ে হয়েছে বৃদ্ধ রামসদয় মিত্রের সঙ্গে। উনিশ বসন্তের লাবণ্যপ্রতিমা লবঙ্গলতা ষাট বছরের রামসদয়ের দ্বিতীয়া স্ত্রী বিপত্নীক যুবক শচীন্দ্রর বিমাতা, মিত্রবাড়ীর সর্বময়কর্ত্রী। তার সহৃদয়তা, স্নেহপ্রবণতা ও সুমধুর ব্যবহারে পরিবারের সকলেই তার অনুগত। স্বামীর শুভ্রকেশে কলপ লাগিয়ে তাঁকে যুবক বানাবার খেলায় লবঙ্গলতা মেতে থাকে। পরিহাস-তরল বাক্যপ্রয়োগে সে বৃদ্ধ স্বামীর চিত্ত-বিনোদনে ব্যাপৃতা, সে রামসদয়ের কাছে 'আদরের আদরিণী, গৌরবের গৌরবিনী, মানের মানিনী, নয়নের মণি, ষোলআনা গৃহিণী'। উনিশ বছরের এমন পাকা গৃহিণী সংসারে বিরল। তার যে যৌবন আছে, তার যে মন ব'লে কিছু আছে, তার যে অতীত-ভালবাসার ইতিহাস আছে, এবং বর্তমানের এই পাকা গৃহিণীর জীবনের নেপথ্যে একটি তরুণী হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাস আছে তা' তার প্রতিদিনের আচরণে কখনই বোঝা যায় না। কানা ফুলওয়ালী রজনীর বিবাহ দিতে অর্থব্যয়ে অকুণ্ঠ লবঙ্গলতা বিবোধিতাকে বরদাস্ত করে না। প্রবল আত্মপ্রত্যয়ের বলে সে শুধু জানে যে তার ইচ্ছাপূরণ করতে সবাই বাধ্য। অনিচ্ছুক শচীন্দ্রকে বিবাহে ইচ্ছুক করতে সে বদ্ধপরিকর। সেই একই প্রবণতায় সে শচীন্দ্র-রজনীর বিবাহে অন্তরায় অমরনাথকে শাসায় পূর্বকথা প্রকাশ ক'রে দেবার ভয় দেখিয়ে। সে শুধু সাফল্যকেই চেনে। পরাভবকে জানে না। সন্ন্যাসীর সাহায্যে শচীন্দ্রর হৃদয়ভাব পরিবতনেও সফল হয়েছে লবঙ্গলতা, পরিণামে রজনীর সঙ্গে শচীন্দ্রর বিবাহ দিয়ে সম্পত্তি-রক্ষার কাজেও এসেছে তার সফলতা।

কিন্তু এ সাফল্য বাইরের। অন্তরের অভ্যন্তরে সে পরাভূতা। যে লবঙ্গলতা রজনীর মুখে ভালবাসার কথা শুনে ঝংকার দিয়ে ব'লে ওঠে—

'কানী, তুই ভালবাসার কি জানিস! তুমি লবঙ্গলতার অপেক্ষা সহস্রগুণে সুখী।' যে লবঙ্গলতা অমরনাথকে বলে 'এ পৃথিবীতে তুমি আমার কেহ নও। কিন্তু যদি লোকান্তর থাকে—' সেই লবঙ্গলতা অন্তরে অন্তরে পরাভূতা। নিজের হৃদয়কে যে প্রতারণা করেছে অপরের হৃদয়ের কথা তার ভাববার প্রয়োজন হয় না। লবঙ্গলতা একদিন ভুবনাথের হৃদয়ের কথা ভাবেনি, রজনীর হৃদয়ের কথা ভাবেনি, শচীন্দ্রর হৃদয় অবলীলায় নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে। লবঙ্গর রূপবহ্নিতে অমরনাথ দগ্ধ হয়েছে, কিন্তু তার উদারমহিমা লবঙ্গলতার দম্ভের প্রাসাদ ধূলিসাৎ করে দিয়ে গেছে। লবঙ্গলতার রূপ অপরকে মুগ্ধ করে, লবঙ্গলতার বুদ্ধি অপরকে অভিভূত করে, লবঙ্গলতার গৃহিণীপনায় সংসারের সবাই বশীভূত হয়; কিন্তু লবঙ্গলতার হৃদয়ের কথা শুধায় না কেউ, তা' কান পেতে শুনতে হয়। নারী-চরিত্রের বিচিত্রতার এমন বিস্ময়কর সৃষ্টি বঙ্গসাহিত্যে বিরল।

শচীন্দ্র :

রামসদয় মিত্রের কনিষ্ঠ পুত্র শচীন্দ্রনাথ যৌবনে বিপত্নীক। বিদ্বান্, বুদ্ধিমান, স্থিতপ্রজ্ঞ, সবিনয়ী এই যুবক তার প্রায় সমবয়সী বিমাতা লবঙ্গলতাকে মায়ের মতই জ্ঞান করেন। বিদ্যোৎসাহী শচীন্দ্রর মন বড কোমল, ব্যথিতের বেদনায় সহজেই বিচলিত হয় সে মন। তাই রজনীর অন্ধত্ব পরীক্ষার জন্য তার চিবুকটি তিনি তুলে ধ'রেছিলেন, কিন্তু সেই সহানুভূতি-ভরা স্পর্শ যে অন্ধযুবতীর হৃদয়জগতে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি ক'রে দিলো তার খবর তিনি রাখেননি। চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের ফলে যে অনুসন্ধিৎসা শচীন্দ্রর মনে বিরাজিত ছিল তারই বশে তিনি রজনীর চিবুকস্পর্শ করেছিলেন। পরোপকারের মহত্ত্ব প্রকাশের আগ্রহ দেখা দিয়েছিলো শচীন্দ্রর মনে, তাই তিনি বিমাতা লবঙ্গলতার নির্দেশে গোপালের সঙ্গে রজনীর বিবাহের ব্যবস্থা করেছিলেন। শচীন্দ্র মনে করেন—'রজনী রূপবতী, কিন্তু তাহার রূপ দেখিয়া কেহ কখনও পাগল হইবে না'। শচীন্দ্র পাগল হননি, কিন্তু মনে মনে ভেবেছেন—'যাহাকে স্বয়ং বিবাহ করিতে না পারি তাহাকে বিবাহ দিতে ইচ্ছা করে'। সে ইচ্ছাও কার্যকররূপে প্রকাশ পেয়েছে বিমাতার আদেশে। শচীন্দ্রনাথ স্বয়ং রজনীকে বিয়ে করার

কথা ভাবতেও পারেন না, কারণ তাঁর আভিজাত্যবোধ। তাঁর মত সম্ভ্রান্ত যুবকের পক্ষে দরিদ্র রাজচন্দ্রের কন্যাকে বিবাহ করা অসম্ভব। তাই তাঁদের কর্মচারীর বিবাহিত পুত্রকে টাকার লোভ দেখিয়ে শচীন্দ্র সম্মত করিয়েছেন বিবাহে। কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্রকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করার মধ্যে যে আত্মগরিমাবোধ থাকার কথা, শচীন্দ্রর তা' পূর্ণমাত্রায় ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র শচীন্দ্রকে রজনীর বিপরীতে স্থাপন ক'রে তাঁকে কাহিনীর নায়কত্বে প্রতিষ্ঠা করার ব্যর্থপ্রয়াস পেয়েছেন। চরিত্রের যে সজীবতা, যে ক্রিয়াশীলতা ও যে ব্যক্তিত্ব থাকলে নায়কের মর্যাদা লাভ করা যায় তা' শচীন্দ্রর মধ্যে আদৌ ছিল না। কাহিনীর প্রথমভাগে তিনি বিমাতা লবঙ্গলতার হাতে ক্রীড়নক। মধ্যভাগে সন্ন্যাসীর হাতের পুতুল এবং কাহিনীর শেষভাগে তিনি অনকূল ভাগ্যের আশীর্বাদে ধন্য।

গোপালের সঙ্গে বিবাহের নির্দিষ্ট দিনে রজনী নিরুদ্দেশ হওয়ায় শচীন্দ্র তার অনুসন্ধানের কিছু চেষ্টা করেছেন বটে, কিন্তু সমগ্র কাহিনীতে লেখক তাঁকে যতবড় ভূমিকা অর্পণ করেছেন, শচীন্দ্র স্বয়ং তত বড় ভূমিকায় নিজের যোগ্যতা সপ্রমাণ করতে পারেননি। রজনীর জন্য শচীন্দ্রর মনে যে প্রেমের অভ্যুদয় হয়েছে, যে আবেগ-উচ্ছ্বাস তার মুখ দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে, তার সবটুকু সন্ন্যাসীর যোগবলের দ্বারা সাধিত। শুধু একবার শচীন্দ্র তাঁর ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েছেন সম্পত্তির লোভে রজনীকে বিবাহ করতে অস্বীকার ক'রে। কিন্তু সে ব্যক্তিত্ব সন্ন্যাসী-প্রযোজিত স্বপ্নের ফলে সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়েছে। এক দরিদ্র জন্মান্ধ যুবতীর প্রতি সামান্য কৌতূহল এবং যৎসামান্য সহানুভূতির ক্ষণিক অভিব্যক্তি ছাড়া শচীন্দ্রর চরিত্রে প্রবল সক্রিয়তা, সংগ্রাম, দুঃখভোগ, ত্যাগ বা অন্য কোন অনন্যসাধারণতা খুঁজে পাওয়া যায় না। অমরনাথ রজনীর জন্য যা' করেছেন, যে পরিমাণ দুঃখ ভোগ করেছেন, যত ত্যাগস্বীকার করেছেন তার ক্ষীণতম আভাষও শচীন্দ্রের মধ্যে পাওয়া যায় না। শচীন্দ্রনাথ রজনীর মত নারীরত্নকে লাভ করেছেন স্রষ্টার আশীর্বাদে, আপন কৃতিত্বে নয়।

অমরনাথ :

শান্তিপুর নিবাসী, সৎ কায়স্থবংশ-জাত স্বাস্থ্যবান, ও বিদ্বান অমরনাথ তখন নবীন যুবক। পিতার মৃত্যুর পর পিসীমার শ্বশুরবাড়ি সম্পর্কের গ্রাম

কালিকাপুরে গিয়ে জীবনের চরমতম আঘাত পৃষ্ঠে বহন করে একদিন সে পালিয়ে এসেছিলো। সেখানেই তার জীবনে লবঙ্গলতার সান্নিধ্যলাভ। লবঙ্গ-কলিকা তখন প্রস্ফুটনমুখী, চোখের চাহনি চঞ্চল অথচ ভীত, উচ্চহাসি তখন মৃদু ও ব্রীড়াযুক্ত, দ্রুতগতি তখন মন্থর হয়ে আসছে। কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণের সেই অপরূপা সৌন্দর্যপ্রতিমা লবঙ্গলতিকা অমরনাথের চিত্তহরণ করেছিলো। চিত্তে দোলা জেগেছিলো লবঙ্গরও। উভয়ের বিবাহ যখন স্থির হওয়ার মুখে তখনই অমরনাথের খুল্লতাত পত্নীর কলঙ্ককথা প্রকাশ পেয়ে যাওয়ায় দুটি তরুণ-তরুণীর সেই প্রেম পরিণয়ে চরিতার্থ হ'তে পারলো না। লবঙ্গর বিবাহ হ'লো বৃদ্ধ রামসদয় মিত্রের সঙ্গে। যৌবনের প্রগল্‌ভ উচ্ছ্বাসে অমরনাথ একদিন গিয়েছিলো রাত্রির অন্ধকারে গোপনে লবঙ্গলতার শয়নকক্ষে। লবঙ্গলতা অমরনাথের সেই গোপন অভিসার অত্যন্ত গর্হিত কাজ মনে ক'রে ঘৃণায় ও ক্ষোভে ক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠে। দম্ভের বশে সেদিন লোকজন ডাকিয়ে আবৃতমুখ অমরনাথের পিঠে তপ্ত লৌহশলাকা দিয়ে 'চোর' শব্দটি দাগিয়ে দেয়। অমরনাথের প্রেমিক হৃদয় প্রেয়সীর এই আচরণে চূড়ান্ত আঘাত পায়। অপমানে লাঞ্ছনায় ও আত্মধিক্কারে জর্জরিত অমরনাথ সেই থেকে বিরাগী চিত্তে পথে বেরিয়ে পড়ে। দেশে দেশে ঘুরে তার দিন কাটে।

ঘুরতে ঘুরতে অমরনাথ একদিন কাশীধামে উপস্থিত হ'লো। সেখানে পরিচয় হ'লো দেবেন্দ্র দত্ত নামে এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে। তিনি কথা প্রসঙ্গে কাশীধামে পুলিশের অন্যায় আচরণ সম্পর্কে খেদ প্রকাশ করে বললেন যে হরেকৃষ্ণ দাস নামে এক ব্যক্তি তাঁর একমাত্র জন্মান্ধ কন্যাকে শ্যালীপতি রাজচন্দ্র দাসের হাতে সমর্পণ করেছিলেন লালন-পালনের জন্য। সেই হরেকৃষ্ণ দাস যখন মারা গেলেন তখন কাশীর পুলিশ তাঁর উত্তরাধিকারিণী ঐ জন্মান্ধ কন্যাটির কোনও সন্ধান না ক'রে মৃত হরেকৃষ্ণ দাসের সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ক'রে নিয়েছে। পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিতা জন্মান্ধ কন্যাটি না জানি কত দুঃখে কত দারিদ্র্যে দিন কাটাচ্ছে—এই কথা আক্ষেপের সঙ্গে বললেন দেবেন্দ্র দত্ত। বিরাগীচিত্ত অমরনাথ একথা শুনে মনে মনে সঙ্কল্প করলো এই মেয়েটির সন্ধান ক'রে তার সম্পত্তি উদ্ধার ক'রে দিয়ে পরোপকারের পুণ্য অর্জন করবে।

অপ্রত্যাশিতভাবে সে সুযোগ এসে গেল। বাঙ্‌লা দেশে ফিরে এক আত্মীয়ের বাড়িতে থাকাকালীন একদিন পদচারণায় বেরিয়ে নারীর আর্তকণ্ঠের

চিৎকার অমরনাথের কানে এলো। দুঃসাহসী যুবক অমরনাথ দুর্বৃত্তের হাত থেকে সেই নারীর সম্ভ্রম রক্ষায় ঝাঁপিয়ে পড়লো। নিজে আহত হয়ে উদ্ধার করলো মেয়েটিকে। নিয়ে এলো আত্মীয়ের বাড়িতে। সেখানে আহত-অবস্থায় শয্যাশায়ী থাকাকালেই অমরনাথ জানলো যে মেয়েটি জন্মান্ধ, নাম তার রজনী, পিতার নাম রাজচন্দ্র দাস। অমরনাথ হাতে স্বর্গ পেলো, পরোপকারের সঙ্কল্প সফল করার উদ্দেশ্যে রজনীকে ক'লকাতায় এনে রাজচন্দ্রের হাতে সমর্পণ করলো। তখনই অমরনাথ জানলো যে রজনীর আসল পিতা হরেকৃষ্ণ দাস, রাজচন্দ্র নয়। রজনীর কাছ থেকেই অমরনাথ তার গৃহত্যাগের কারণ, গোপালের সঙ্গে বিবাহের উদ্যোগ ইত্যাদি সবই জানলো।

বাঞ্ছারাম মিত্রের উইলের সর্তানুসারে মনোহর দাসের ভ্রাতা হরেকৃষ্ণ দাস বা তার উত্তরাধিকারিণী জন্মান্ধ রজনীর যে সম্পত্তি রামসদয় লবঙ্গলতা-শচীন্দ্র এতদিন ভোগদখল করেছে, তা' উদ্ধার করার পুণ্যকর্মে আত্মনিয়োগ করলো অমরনাথ। এই সম্পত্তি-উদ্ধারের সূত্রে আবার সেই লবঙ্গলতার মুখোমুখি হ'লো অমরনাথ, যার হাতে নির্মম লাঞ্ছনার চিহ্ন আজও অমরনাথ সর্বক্ষণ পৃষ্ঠে বহন ক'রে চলেছে। রজনীর স্নিগ্ধ-সরল আচরণে মুগ্ধ অমরনাথ রজনীকে বিয়ে করে প্রতিষ্ঠা দিতে চায়, রজনীও সম্মতা। কিন্তু সে বিয়েতেও অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ালো লবঙ্গলতার সম্পত্তি রক্ষার প্রয়াস। দেখা দিল কাহিনীর জটিল দ্বন্দ্ব-বহুল রূপ। বুদ্ধির খেলায় লবঙ্গলতা অমরনাথকে আরেকবার পরাভূত করতে চায়। কিন্তু ব্যর্থকামা হয় সে ; যতক্ষণ অমরনাথ রজনীকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক ততক্ষণ রজনীও সে বিবাহে সম্মতা।

লবঙ্গলতা একদিন অমরনাথকে দণ্ড দিয়েছিলো, আজ সময়ের চাকা ঘুরেছে। অমরনাথ আজ লবঙ্গলতার সদম্ভ-শাসানির উত্তরে বলতে পারে যে পূর্বকৃত কলঙ্কের কথা সে নিজেই রজনীকে জানিয়ে দেবে। জানিয়ে দিতে গিয়ে যা অমবনাথ জানলো তাতে তার জীবনেব গতি আবার পরিবর্তিত হ'লো। রজনী শচীন্দ্রর, শচীন্দ্র রজনীর—অমরনাথ কে? উদার, মহৎ, বিবাগী অমরনাথ আবাব বেরিয়ে পড়লো পথে। তার সেই মহৎ-উদারতার কাছে লবঙ্গলতার শাণিত বুদ্ধি, সুনিপুণ ছলনা ও সুবিপুল দম্ভ ধূলোয় লুটিয়ে পড়লো। অমরনাথ মহাপুরুষ নয়, রক্ত-মাংসের সজীব মানুষ। তার আকাঙ্ক্ষা আছে, আগ্রহ আছে, বুকভরা ভালবাসা আছে—কিন্তু ভাগ্যে

তার প্রাপ্তি নেই। রজনীর সুখের জন্য সে রজনীকে ত্যাগ করে বৈরাগীর উত্তরীয় কাঁধে তুলে নিয়েছে, বরণ করেছে পরিব্রাজকের ভূমিকা। বুঝেছে যে ঘরের মঙ্গলশঙ্খ তার জন্য নয়। রজনীর সকৃতজ্ঞ ভালবাসা ও লবঙ্গলতার অ-প্রেমের অন্তরালে গোপন প্রেমের অস্তিত্ব তাকে বেঁধে রাখেনি। সুমহান হৃদয়বত্তার প্রতীক অমরনাথ তার সদা-সক্রিয় ব্যক্তিত্বে সর্বজনকে অভিভূত ক'রে সংসারের রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিয়েছে। যে স্মৃতি পিছনে ফেলে গেছে তা' রজনী-শচীন্দ্রর সন্তানের নামকরণের মধ্যে প্রোজ্জ্বল হ'য়ে থেকেছে। এক পরাজিত মানবাত্মার করুণ প্রতিমূর্তি অমরনাথ ত্যাগের বিভূতি মণ্ডিত হ'য়ে যখন বিদায় নিলো তখন পাঠকের হৃদয় তাব প্রতি শ্রদ্ধায় ও সহানুভূতিতে আছন্ন।

বজনীব কাহিনীতে চাঁপা ও হীরালালেব ভূমিকা :

মিত্রবাড়ীর সর্বময় কর্ত্রী লবঙ্গলতা অনুকম্পার বশে জন্মান্ধ রজনীর বিয়ে দিতে চায়। সপত্নীপুত্র শচীন্দ্রনাথকে সে নির্দেশ দিয়েছে রজনীর জন্য পাত্র-সন্ধান করতে। কিন্তু অন্ধ মেয়েকে কে স্বেচ্ছায় বিয়ে করবে? শচীন্দ্র অনেক চেষ্টায় মিত্রবাড়ির সরকার হরনাথ বসুকে প্রচুর অর্থের লোভ দেখিয়ে সম্মত করিয়েছে তার পুত্র গোপালের সঙ্গে রজনীর বিয়ে দিতে। গোপালের এক স্ত্রী বর্তমান. নাম তার চাঁপা। গোপাল রজনীকে বিয়ে করতে সম্মত হ'লেও চাঁপা এ বিয়ে কিছুতেই হ'তে দিতে প্রস্তুত নয়। যদিও সমাজে তখন পুরুষের একাধিক বিবাহ প্রচলিত ছিল। স্বয়ং লবঙ্গলতার স্বামী রামসদয় মিত্রেরও দুই স্ত্রী বর্তমান। প্রথমা স্ত্রী রুগ্না, রজনীর ভাষায় রামসদয়ের 'দেড়খানা গৃহিণী', তথাপি চাঁপা এ বিয়ে হ'তে দেবে না, যে কোন উপায়ে এ বিয়ে বন্ধ করতে সে উদ্যোগী হয়েছে। এই চাঁপা সামান্য সময়ের জন্য এই কাহিনীতে দেখা দিয়েছে বটে, কিন্তু সেই অল্পসময়ের উপস্থিতির দ্বারাই সে রজনী উপন্যাসের জটিল কাহিনীর সূত্রপাত ঘটিয়েছে। চাঁপার সম্পর্কে রজনী একসময় বলেছে—'চাঁপা আমার সর্বনাশিনী, কুপ্রবৃত্তি মূর্তিমতী হইয়া আসিয়াছিল'।

চাঁপা চতুরা এবং বেপরোয়া। তার পিত্রালয় হুগলীতে। চাঁপার ভাই হীরালাল লম্পট, লোভী এবং অপদার্থ। নানাবিধ প্রবঞ্চনার দ্বারা

জীবিকার্জনে ব্যর্থ হয়ে সে আপাততঃ চাঁপার ঘাড়ে বসে খায়। চাঁপা প্রথমে এই হীরালালকে প্ররোচিত করলো রজনীকে বিয়ে করার জন্য। অর্থের লোভে হীরালাল সম্মত, কিন্তু রজনী সম্মত নয়। ভাই-এর সঙ্গে রজনীর বিয়ে দিয়ে চাঁপার সপত্নী-সম্ভাবনা থেকে অব্যহতি পাওয়ার প্রয়াস যখন ব্যর্থ হ'লো তখন চাঁপা অন্য এক ফন্দি করলো। রজনীকে সে বোঝালো যে কয়দিনের জন্য গৃহত্যাগ ক'রে আত্মগোপন ক'রে থাকতে পারলে গোপালের সঙ্গে বিয়ে বন্ধ হয়। রজনী সম্মতা হ'লো। চাঁপার প্রস্তাব—রজনী চাঁপার ভাই হীরালালের সঙ্গে চাঁপার পিত্রালয় হুগলীতে গিয়ে কয়েকদিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকুক। হীরালালের সঙ্গে যেতে রজনী প্রথমে দ্বিধাগ্রস্ত হ'লেও শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে সম্মতি জানালো। ঘরের কোণের অন্ধ মেয়ে অজানা-ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তায় ঝাঁপ দিল।

চাঁপা শক্ত মেয়ে। সে কিছুতেই ঘরে সতীন আসতে দেবে না। তাই, মরিয়া হয়ে যে চাতুরীর আশ্রয় সে নিলো তা' রজনীর জীবনে ঘটনার ঘনঘটার সৃষ্টি করলো। চাঁপা যদি না থাকতো তবে রজনী সেদিন ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়তো না। শচীন্দ্রর জন্য বুকভরা ভালবাসা বুকে চেপে সেই অসহায় অন্ধ মেয়ে ভাগ্যের পায়ে আপনাকে সমর্পন করতে বাধ্য হতো। চাঁপা এই কাহিনীতে এসে রজনীকে বাত্যা-বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমুখর জীবনসমুদ্রে নিক্ষেপ যেমন করেছে তেমনি তা' করেছিলো বলেই রজনীর প্রেম পরিণামে শচীন্দ্রকে পেয়ে চরিতার্থতা লাভ করেছে।

রজনীর জীবনে চাঁপার যা অবদান, চাঁপার ভাই দুশ্চরিত্র হীরালালের অবদানও তাই। হীরালাল কোনও বিশেষ যুগের বিশেষ পরিবেশের নয়, হীরালাল চিরকালের অযোগ্য, অপদার্থ, লোভী, লম্পটের, প্রতিনিধি। সে মদ খায়, গাঁজা টানে, বিদ্যা তার শুধু নাম সই করাতেই সীমাবদ্ধ। রামসদয়ের সুপারিশে পাওয়া চাকরী সে রাখতে পারেনি, চাঁপার শ্বশুরের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত দোকান সে রাখতে পারেনি, শিক্ষকতা করার সুযোগ এলেও কর্মস্থলে মদের অভাব তাকে সেখানে থাকতে দেয়নি। নানা ঘাটের জল খেয়ে সে এসে ভগ্নিপতির গলগ্রহ হয়ে আছে। এমন সময়ে চাঁপার সতীন-সম্ভাবনা তার সামনে অর্থলাভের সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিল। টাকার লোভে সে রজনীকে বিয়ে করতে সম্মত। কিন্তু তা' যখন হ'লো না তখন সে ভাবলো নদীপথে রজনীকে হুগলীতে নিয়ে যেতে যেতে

পথে তাঁকে রাজী করাবে বিয়েতে। সেখানেও সে ব্যর্থকাম হ'লো। মুখে যারা বড় বড় কথা বলে, আস্ফালন করে আসলে তারা ভীরু, হীরালালও তাই। রজনী তার হাতের লাঠি দ্বিখণ্ডিত করায় সে রজনীর উপরে জোর-জবরদস্তির পথ পরিত্যাগ করলো। হৃদয় ব'লে হীরালালের কিছু ছিল না। তাই একটি অন্ধ মেয়েকে জনহীন অপরিচিত স্থানে নৌকা থেকে নামিয়ে দিতে তার দ্বিধা হয়নি।

অ-মানুষ হীরালাল সেদিন যদি রজনীকে ঐভাবে পরিত্যাগ না করতো তবে রজনী জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা ও হতাশায় নদীতে ডুবতে যেতো না, গহনার নৌকার লোকেরা তাকে উদ্ধার করতো না, ভদ্রবেশী নরপিশাচের হাতে তাকে পড়তে হ'তো না এবং বনমধ্যে কামোন্মত্ত নরপিশাচের আক্রমণে ভীতা রজনীর আর্ত-চীৎকারে আকৃষ্ট হয়ে মহানুভব অমরনাথের আবির্ভাব ঘটতো না। রজনীর সম্ভ্রমরক্ষাকারী, রজনীর সম্পত্তি উদ্ধারকারী এবং পরোক্ষে রজনী-শচীন্দ্রর পরিণয় সম্ভবকারী অমরনাথ এ কাহিনীতে আসতো না যদি হীরালালের মতো হৃদয়হীন অ-মানুষ সেদিন নির্জন নদীতটে এই অন্ধ-যুবতীকে পরিত্যাগ করে চ'লে না যেত।

'রজনী' উপন্যাসের দ্বন্দ্ববহুল বিচিত্র কাহিনীর সংগঠনে চাঁপা ও হীরালাল আপাতদৃষ্টিতে যতই সামান্য অথবা নগণ্য হোক, এই অ-প্রধান চরিত্র দুইটি বস্তুতঃ অত্যন্ত অপরিহার্য চরিত্র।

লবঙ্গলতা ও অমরনাথ : উপকাহিনী ?

উপন্যাসের মূল কাহিনীর মধ্যে যদি কোনও আপাত-পৃথক পার্শ্বকাহিনী গড়ে ওঠে তবে তাকে উপকাহিনী বলা হয়। এমনতরো উপকাহিনীর কাজ হচ্ছে মূল কাহিনীকে পরিপুষ্ট করা। বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক উপন্যাসেই এমনতরো উপকাহিনীর সন্ধান পাওয়া যায়। 'রাজসিংহ' উপন্যাসের মাণিকলাল-নির্মলকুমারীর কাহিনী, 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের কমলমণি-শ্রীশচন্দ্রের কাহিনী যথার্থ উপকাহিনী, তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, কিন্তু তারা আসলে মূল কাহিনীর কোনও একটি দিককে পুষ্টি দেওয়ার জন্যই সৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু, 'রাজসিংহ' উপন্যাসের মবারক-জেবউন্নিসার কাহিনী কিংবা 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের দেবেন্দ্র-হীরার কাহিনী উপকাহিনী নয়। তারা

মূল কাহিনীরই অঙ্গ। উপগ্রহ যেমন নিজস্ব স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে গ্রহকে ঘিরে আবর্তিত হয়, উপকাহিনী তেমনি মূল কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত থেকেও তার নিজস্ব পরিপূর্ণতা বজায় রাখে।

লবঙ্গলতা ও অমরনাথকে ঘিরে যে একটি কাহিনী 'রজনী' উপন্যাসে বিদ্যমান আছে তাকে উপকাহিনী বলা চলে কিনা তা' বিচারের অপেক্ষা রাখে। প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে—রজনীর শচীন্দ্রের প্রতি প্রণয়বিকাশের ও পরিণতির যে আখ্যান 'রজনী' উপন্যাসের মূল কথাবস্তু, তার পাশাপাশি লবঙ্গলতা-অমরনাথের কাহিনীর কোনও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে কিনা!

লবঙ্গলতা শচীন্দ্র-রজনীর কাহিনীর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। লবঙ্গর কক্ষেই শচীন্দ্রর কণ্ঠস্বর ও শচীন্দ্রর প্রথম স্পর্শ রজনীর যুবতী-চিত্তে প্রণয়ের জন্ম দিয়েছে। লবঙ্গলতার কর্ত্রীত্বে রজনীর বিবাহ দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে শচীন্দ্র। লবঙ্গলতার ব্যক্তিত্বের প্রভাবেই রামসদয় মিত্রের পরিবারের সকলে পরিচালিত হয়। লবঙ্গলতার নির্দেশেই শচীন্দ্রর হৃদয়ে রজনীর প্রতি অনুরাগ সন্ন্যাসীর দ্বারা সৃজিত হয়েছে। মিত্র পরিবারের এতকালের সম্পত্তি যাতে মিত্র পরিবারের থাকে তার জন্য সব উদ্যোগ উদ্যম লবঙ্গই নিয়েছে এবং অবশেষে শচীন্দ্র-রজনীর বিবাহে তা' রক্ষিত হয়েছে। সুতরাং, 'রজনী'র কাহিনীতে লবঙ্গলতা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত, লবঙ্গলতা মূল কাহিনীর অঙ্গ।

অমরনাথ না থাকলে রজনীর সম্ভ্রম রক্ষা হ'তো না। রজনীর জীবনের পরিণতি একেবারে অন্যরকম হ'তো। অমরনাথই রজনীর যথার্থ পরিচয় উদ্ঘাটন করে রজনীই যে রামসদয় মিত্রের দখলীকৃত সম্পত্তির আসল অধিকারিণী—তা' সপ্রমাণ করেছে। রজনীর জীবনে একদিকে শচীন্দ্র ও অন্যদিকে অমরনাথ যে প্রবল দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে তা' অমরনাথেরই বিবাহ-প্রস্তাবের ফলে। মূলকাহিনীর যা কিছু ক্রিয়া-কাণ্ড, যা কিছু দ্বন্দ্ব-জটিলতা—সব কিছুরই কেন্দ্রে অমরনাথের সক্রিয়তা, তার মহত্ত্ব ও ত্যাগ। অমরনাথ মূলকাহিনীর কেন্দ্র থেকে বিদায় নিয়েও রজনীর জীবনে স্থায়ী স্বাক্ষর রেখে গেছে। অমরনাথই মূল কাহিনীর নায়ক, উপকাহিনীর চরিত্র নয়।

অথচ, লবঙ্গলতা ও অমরনাথের একটি আপাত-পৃথক কাহিনী 'রজনী' উপন্যাসে আছে। পিতৃহীন যুবক অমরনাথ পিসীমার শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে এক সুন্দরী স্ফুটোজ্জ্বল কিশোরীর সান্নিধ্যে এসেছিলো। সেই কিশোরী লবঙ্গলতাকে

নবীনযুবা অমরনাথ ভালবেসেছিলো। পারিবারিক কলঙ্কের জন্য দু'জনের বিবাহ হতে পারেনি। নিশীথের অন্ধকারে গোপনে লবঙ্গলতার শয়নকক্ষে গিয়ে অমরনাথ জীবনের চরমতম লাঞ্ছনার স্বাক্ষর পিঠে নিয়ে ফিরে এসেছিলো। সমাজের ভয়, তাৎক্ষণিক দম্ভ ও প্রেমিকের তস্কর-বৃত্তির প্রতি বীতশ্রদ্ধ লবঙ্গলতিকা যে নির্মম দণ্ড সেদিন অমরনাথকে দিয়েছিলো তা' তুলনারহিত। সেই লবঙ্গলতার সঙ্গে অমরনাথের আবার মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটলো রজনীর সম্পত্তি উদ্ধারের ব্যাপারে। এবারে লবঙ্গলতার সদম্ভ-আচরণ, সকরুণ মিনতি, সজলদৃষ্টি ব্যর্থ হ'লো অমরনাথের মহিমান্বিত ত্যাগ মূর্তির কাছে। লবঙ্গলতা সকাতরে অমরনাথের কাছে স্বীকারোক্তি করলো যে সে স্ত্রীলোক, তার শক্তির পরিমাপ করতে চাওয়া অমরনাথের সঙ্গত কাজ নয়। ইহলোকে যদিও অমরনাথ লবঙ্গলতার কেউ নয়, কিন্তু যদি অন্যলোক থাকে তবে অমরনাথকে লবঙ্গলতা যে দণ্ড দিয়েছিলো সে দণ্ডের চেয়ে অনেক বেশি দণ্ড সে নিজে সংগোপনে বুকে বহন করেছে। রজনীকে সে বলেছে— 'তুমি লবঙ্গলতা অপেক্ষা সহস্রগুণে সুখী'।

এই কাহিনী মূলকাহিনীর পূর্ব-প্রসঙ্গ মাত্র, উপকাহিনী নয়। কারণ, মূলকাহিনী থেকে এই কাহিনীর কোনও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। রামসদয় মিত্র পিতৃবন্ধু মনোহর দাসকে অপমান করায় কিভাবে পৈতৃকসম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে ভবানীনগর ছেড়ে কলকাতায় এসে বসবাস করেন তা' যেমন মূলকাহিনীর পূর্বকথা, লবঙ্গলতা-অমরনাথের কাহিনীও তেমনি পূর্বপ্রসঙ্গ মাত্র।— উপকাহিনী নয়। তারা উভয়েই মূল কাহিনীর অপরিহার্য অঙ্গ।

রজনী ও লবঙ্গলতা : রসগ্রাহী আপেক্ষিক বিচার :

'রজনী' উপন্যাসের দুইটি নারীচরিত্র তাদের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। একজন কাহিনীর কেন্দ্রীয় চরিত্র অন্ধ যুবতী রজনী, অন্যজন রজনীর প্রণয়ী শচীন্দ্রর বিমাতা বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা লবঙ্গলতা। বাঙ্‌লা উপন্যাস-সাহিত্যে দু'জনেই অনন্যা, অনুপমা। লবঙ্গলতার তবু কিছু সাদৃশ্য পরবর্তীকালের সৃষ্টি শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' উপন্যাসের নায়িকা পার্বতীর মধ্যে সন্ধান করা যায়। কিন্তু রজনী তুলনারহিত, একক এবং অদ্বিতীয়া। দুইটি চরিত্র সৃষ্টিতেই লেখক বঙ্কিমচন্দ্র যে সুনিপুণ শিল্প-সুষমার পরিচয় দিয়েছেন তাতে এই দুইটি চরিত্রের আপেক্ষিক বিচারের প্রলোভন জাগে।

ফুলের মালা গাঁথে রজনী, ফুলের সুগন্ধ তার সমস্ত সত্তায়, ফুলের পেলবতার স্পর্শে অভ্যস্ত সে, কিন্তু ফুলের রূপ সে দেখতে পায় না। সে নিজে বিশ্বজগতের কিছুই দেখে না। কিন্তু বিশ্বজগৎ তার অন্তরজগৎকে সহজেই দেখতে পায়। শচীন্দ্রর করস্পর্শে তার সমস্ত হৃদয় যখন আলোড়িত হয়, সে যখন মনে মনে ভাবে —'সেই চিবুকস্পর্শে আমি মরিলাম' তখন তার সেই প্রথম পুরুষ-পরশ-ধন্যা হৃদয়ের আনন্দধ্বনি সর্বজনের গোচরীভূত হ'য়ে যায়। লবঙ্গ সর্বজগৎকে দেখে, কিন্তু তার অন্তরজগতে দৃষ্টিপাত করা বিশ্বজগতের প্রায় সকলেরই অসাধ্য।

বৃদ্ধ স্বামীর চুলে কলপ মাথায় লবঙ্গলতা, নিদ্রিত স্বামীর অঙ্গে অঙ্গে সিঞ্চন করে সুগন্ধ, হাস্যে-পরিহাসে পূর্ণ করে রাখে মিত্র বাড়ির অন্দরমহল। ফুল কেনে, ফুলের মূল্য বেশি দিয়ে ফুল-ব্যবসায়ীকেও কিনে নিতে চায়। সংসার উদ্যানে সে সৌন্দর্যে, সৌরভে পূর্ণপ্রস্ফুটিতা গোলাপ, তার বৃন্তে বৃন্তে কাঁটা। কিন্তু রজনী সরল বৃন্তে ফুটে ওঠা রজনীগন্ধার গন্ধ ছড়ায়, তার বৃন্তে কোনও কন্টকের অভ্যর্থনা নেই। লবঙ্গের অঙ্গে অঙ্গে তীব্রতা, রজনীর সর্বাঙ্গে স্নিগ্ধতা।

প্রেমকে প্রত্যাখ্যান ক'রেছে লবঙ্গলতা, প্রেমের প্রত্যুদগমন করেছে রজনী। লবঙ্গলতা চক্ষুষ্মতী, প্রত্যক্ষ জগতের অনিবার্য ঘটনার নির্মম আঘাতে জর্জরিতা হয়েও সে আপনদম্ভে উচ্চশির; রজনী চক্ষুহীনা, অপ্রত্যক্ষ জগতের উপেক্ষা অবহেলায় বিমণ্ডিত হয়ে সে নম্রশির। লবঙ্গলতা দারিদ্র্যকে দেখেনি, সম্পন্ন গৃহস্থের কন্যা হ'য়ে জন্মেছে এবং পরে হয়েছে ধনাঢ্য স্বামীর সংসারে সর্বময় কর্ত্রী; রজনী সুতীব্র দারিদ্র্যের দুঃখকে সহজ সত্য ব'লে জানে, অভাব-অনটন তার নিত্যসঙ্গী। সামাজিক অনুশাসনকে সর্বোচ্চ মূল্য দিয়ে লবঙ্গলতা প্রেমকে প্রত্যাখ্যান ক'রেছে, দম্ভবশে প্রেমিকের প্রতি চরম নির্দয়তা দেখিয়েছে। ঐ একই প্রেমের দায়ে, প্রতিদানের প্রত্যাশা না করেই রজনী সমাজ-সংসারকে উপেক্ষা ক'রে হীরালালের সঙ্গে পথে বেরিয়েছে।

হৃদয়ের শূন্যতাকে বাইরে প্রকটিত হ'তে দেয়নি লবঙ্গলতা, দান-ধ্যান, পরোপকার, হাসি-ঠাট্টা-গল্প দিয়ে সে চেপে রেখেছে হৃদয়ের হাহাকারকে। হৃদয়ের পূর্ণতাকে বাইরে প্রকটিত হতে দেয়নি রজনী, জীবনে সর্ববিধ সার্থকতা যখন এসেছে তখনও হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত আবেগে উত্তাল হ'য়ে ওঠেনি, তখনও সে ধীর-স্থির, স্নিগ্ধ-শান্ত।

লবঙ্গলতা হৃদয়ের কথা ভাবে না। নিজের হৃদয়কে উপবাসী রেখে সে পরের হৃদয়কে শাসন করতে চায়। অমরনাথ, শচীন্দ্র, রজনী—কারুর হৃদয়কেই তাদের প্রাপ্যমূল্য লবঙ্গলতা দিতে চায়নি, নিজের হৃদকেও করেছে বঞ্চনা। রজনী হৃদয়সর্বস্ব, মূল্য পাবে না জেনেও সে তার হৃদয়কে উৎসর্গ করেছে শচীন্দ্রর উদ্দেশে। হৃদয়ের নির্দেশেই সে সকৃতজ্ঞচিত্তে অমরনাথকে বিয়ে করতে সম্মতা হয়েছে। হৃদয়ভরা কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত হয়েছে তার পুত্রের নামকরণের মধ্য দিয়ে।

দারিদ্র্যভয়ে শঙ্কিতা লবঙ্গলতা তৎপর হয়েছে অমরনাথকে প্রতিহত করতে। তার সুচতুর বুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সক্রিয়তা, সাহসিকতা তাকে যতটুকু সজীবতায় মণ্ডিত করেছে তা' পাঠকের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। দারিদ্র্যের দুঃসহ রাত্রি পার হ'য়ে বিপুল-বৈভবের অধিকার অর্জন করেছে রজনী, কিন্তু সেই বৈভব সে অকাতরে দান করতে চেয়েছে লবঙ্গলতাকে, কোনও দ্বিধাই তার হয়নি। লবঙ্গলতায় আছে নাটকীয়তা, রজনী যেন এক গীতিকবিতা। লবঙ্গলতার দম্ভ রজনীর নম্রতাকে স্পষ্টতা দিয়েছে, লবঙ্গলতার হৃদয়হীনতা রজনীর হৃদয়বত্তাকে উজ্জ্বল করেছে, লবঙ্গলতার স্পর্ধিত ব্যক্তিত্বের সকরুণ পরাভব রজনীর বিজয়িনী-মূর্তিকে প্রোজ্জ্বল করেছে। মনে হয়, 'রজনী' উপন্যাসের এই দুইটি নারীচরিত্র পরস্পরের সম্পূরক।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

সং ক ল ন

নির্বাচিত প্রবন্ধ সমূহ

পঠনীয়—(১) শিক্ষার হেরফের

(২) শকুন্তলা

(৩) উৎসবের দিন

সংকলন

প্রবন্ধ : রবীন্দ্রনাথ :

যুক্তি ও বুদ্ধি, তথ্য ও তত্ত্ব প্রকৃষ্ট বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যখন রসরূপতা লাভ করে তখন আমরা তাকে প্রবন্ধ বলি। এই 'প্রবন্ধ' শব্দটি আগে 'প্রসংগ' অর্থে ব্যবহার হ'তো এবং তা' গদ্যে রচিত না হ'য়ে পদ্যেও রচিত হ'তো। বাঙ্‌লা গদ্যভাষার প্রচলনের পর রামমোহন—বিদ্যাসাগরের আমল থেকে যুক্তি-বুদ্ধি, তথ্য-তত্ত্ব প্রকৃষ্ট বন্ধনের শৃংখলা লাভ ক'রে প্রবন্ধ হ'য়ে উঠতে থাকে। সমাজ-সংস্কার কিংবা বিশেষ বিশেষ ধর্মমতের প্রচার কিংবা সতীদাহ, বিধবা-বিবাহ ইত্যাদি নিয়ে বিতর্ক বাঙ্‌লা প্রবন্ধের প্রথম যুগে প্রাধান্য পেয়েছিলো। এই যুক্তি-বুদ্ধি-শৃংখলার বন্ধন যথার্থ রসরূপতা লাভ করেছে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের পর বাঙ্‌লা প্রবন্ধসাহিত্য ও মননশীল রচনার বিশেষ উৎকর্ষ লক্ষিত হয়। তথ্যানুসন্ধিৎসার সঙ্গে সাহিত্যরসও বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর কোন কোন শিষ্যের রচনায় প্রকাশ পেয়েছিলো। এঁদের মধ্যে চন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রমুখর নাম করা যেতে পারে। কিন্তু যথার্থ Personal Essay, যাকে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বলা যেতে পারে তার জন্ম রবীন্দ্রনাথের হাতে। প্রবন্ধকে দুই জাতে ভাগ করা যায়—একটি থিসিস, অন্যটি ফেসিস, প্রথমটি 'শাঁসালো', পরেরটি 'রসালো'। শাঁস ও রসের যুগপৎ পরিবেশনে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। বাঙ্‌লা প্রবন্ধকে তিনিই যথার্থ শিল্পবস্তু ক'রে তুলেছেন। কিন্তু তথ্য ও তত্ত্বমণ্ডিত চিন্তাশীল প্রবন্ধ রচনাতেও তিনি সমান পারদর্শী ছিলেন। কাব্যে, নাট্যে, উপন্যাসে, গল্পে, গীতি-রচনায় যেমন বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় তিনি দিয়েছেন, তেমনি বিস্ময়কর বৈদগ্ধ্যের পরিচয় দিয়েছেন একদিকে চিন্তাশীল, অন্যদিকে সরস ভাবাবেগ-মণ্ডিত প্রবন্ধ রচনায়। দেশের শিক্ষাব্যবস্থার গোড়ায় গলদ নির্দেশ ও বিশ্বসাহিত্যের মানদণ্ডে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের (কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ নাটকের) মূল্যায়ন যেমন তিনি গভীর মণীষা সহযোগে করেছেন, তেমনি হৃদয়ে হৃদয়ে মিলনের মধ্য দিয়ে মানুষের ধর্ম কেমন উৎসবের অনুভব সৃষ্টি করে তার রসতত্ত্বটিও তিনি সহজ ক'রে ব্যক্ত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের

প্রবন্ধসাহিত্যে যেমন বিষয়-বৈচিত্র্যের অভিনবত্ব আছে, তেমনি আছে গহনগম্ভীর চিন্তাশীলতা।

মাত্র পনেরো বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকায় প্রথমে প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর প্রথম সমালোচনা-মূলক প্রবন্ধ 'ভুবনমোহিনী-প্রতিভা, 'অবসর সরোজিনী' ও 'দুঃখসঙ্গিনী' ১৮৭৬-এ প্রকাশিত হয়। পরের বছরেই ১৮৭৭ সালে 'ভারতী' পত্রিকায় মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র সমালোচনা-মূলক প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিলো। অপরিণত বয়সের এই রচনায় বিতৃষ্ণা ও বিরূপতা প্রাধান্য পেয়েছিলো ব'লেই দশ বছর পরে ঐ একই পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষাকৃত পরিপক্ক মনন ও বিচার-বুদ্ধির পরিচয় দিলেন 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র পূর্ণমূল্যায়ণ ক'রে। সারাজীবন তিনি বহুবিধ বিষয়ে বহু বিচিত্র প্রবন্ধ রচনা করেছেন। পনেরো বছর বয়স থেকে সুরু ক'রে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত (সভ্যতার সংকট, ১৯৪১) তিনি প্রবন্ধ রচনা করেছেন। যুক্তি ও তথ্যের প্রকৃষ্ট বন্ধন শুধু নয়, রসের আবেগ ও ভাষার সাবলীলতার যোগে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সর্বদাই সুখপাঠ্য হ'য়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ কবি, তাঁর কবিমনের স্পর্শ সব রচনার মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করেছে, কিন্তু যখন তিনি কোনও গভীর-গম্ভীর বিষয়ে বা বিতর্কমূলক বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন তখন তাঁর যুক্তি হয়েছে অকাট্য, নিরস তথ্যের সমাবেশ কবিসুলভ উপমা-উদাহরণের সহযোগে হয়েছে রসালো। সাবলীল ভাষার প্রয়োগে তা' হয়ে উঠেছে সহজবোধ্য। তাঁর প্রবন্ধগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়; শিক্ষা-সমাজ-রাজনীতি; ধর্ম, দর্শন, আধ্যাত্মিকতা; সাহিত্য-সমালোচনা, ব্যক্তিগত প্রবন্ধ, রম্যরচনা, ভ্রমণকথা। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে গভীর চিন্তা, অভ্রান্ত বিচারবোধ, জীবন সম্পর্কিত বিশালতাবোধ ও আশ্চর্য বিস্ময়ভরা মননশীলতা আধুনিক যুগের মানবসমাজকে সচকিত, আলোকিত, আন্দোলিত করেছে। যুগজীবনের যন্ত্রণার দিনে তা' সঠিক পথের নির্দেশ দিয়েছে, নিপীড়নের বিরুদ্ধে দেশবাসীর মূকমুখে ফুটিয়েছে ভাষা।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দ। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে ছিলেন একা, পদ্মায় বোটে থাকেন। কখনও নিসর্গপ্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য অন্তরে জাগায় গভীর আবেগ, কখনও পরিবারবর্গকে দূরে রেখে অন্তরে জাগে নিঃসঙ্গতা। জন্ম নেয় 'সোনারতরী' কাব্যের 'যেতে নাহি দিব' 'কবিতা', 'জয়পরাজয়'

ছোটগল্প। সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথের বন্ধু লোকেন পালিত রাজসাহীতে জেলা জজ। শিলাইদহের নিঃসঙ্গ জীবন থেকে বন্ধুসমাগমে সন্নিকটে রাজসাহীতে এলেন রবীন্দ্রনাথ। সঙ্গে তরুণ সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী। রাজসাহী তখন উত্তরবঙ্গের শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি। ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্র তখন সেখানে আছেন, আছেন নাটোরের বিদ্যোৎসাহী মহারাজা জগদীন্দ্রনারায়ণ। জেলা জজ লোকেন পালিতের বাসগৃহ রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগীদের সমাবেশে তখন মুখর। রাজসাহীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'রাজসাহী এ্যাসোসিয়েশন' থেকে রবীন্দ্রনাথের কাছে আহ্বান এলো শিক্ষা-সম্পর্কে ভাষণ দেবার। সে আহ্বানে সাড়া দিলেন রবীন্দ্রনাথ, লিখলেন 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধ, পাঠ করলেন সাবস্বতবর্গের সমাবেশে। প্রায় একশো বছর আগে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাশীল মন আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় যে ক্রটি নির্দেশ করেছিলো তা' তখন যেমন সময়োচিত ছিল, আজও তার গুরুত্ব হ্রাস পায়নি। ক্ষণকালের বিষয় চিরকালের সম্পদ হ'য়ে ওঠা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য।

॥ শিক্ষার হেরফের ॥

প্রবন্ধের বিষয়বস্তু :

শুধু মাত্র আবশ্যকের গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকা মানুষের জীবনের ধর্ম নয়। মানুষ কিছুটা আবশ্যকের সীমায় আবদ্ধ, কিছুটা আবশ্যকের অতিরিক্ত স্বাধীনতায় অভ্যস্ত। আমাদেব দেহ আমাদের সাড়ে তিন হাতের মাপে গড়া হলেও, আমাদেব বাসগৃহের পরিমাপ সাড়ে তিন হাত হলে চলে না; স্বাধীনভাবে চলাফেবার জন্য সেখানে আবশ্যকের অতিরিক্ত কিছু জায়গা রাখতে হয়। নইলে স্বাস্থ্যের এবং আনন্দের ব্যাঘাত ঘটে। শিক্ষা সম্বন্ধেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। শিক্ষা শিশুর পক্ষে অত্যাবশ্যক বটে, কিন্তু শিশুর শিক্ষা যদি শুধু অত্যাবশ্যকের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকে তবে তার মন যথেষ্ঠ পরিমাণে বাড়তে পায় না। তার শিক্ষার সঙ্গে কিছুটা স্বাধীনতা, কিছুটা তার মনের খুশির যোগ থাকা চাই, নইলে, সে বয়সে বড় হ'লেও তার বুদ্ধিবৃত্তি বড় হবে না। মনের দিক থেকে অপরিণত থেকে যাবে।

এদেশে শিশুর শিক্ষার জন্য বেশি সময় আমরা দিতে পারি না। 'যত শীঘ্র পারি বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া পাস দিয়া কাজে প্রবিষ্ট হইতে হইবে'। ইংরেজ শাসনে প্রচলিত শিক্ষায় এ দেশের শিশুদের ঊর্দ্ধশ্বাসে, দ্রুতবেগে, ডাইনে-বাঁয়ে না তাকিয়ে শুধু পাঠ্যবিষয় মুখস্ত করা ছাড়া অন্য-কিছুর দিকে মন দেওয়ার উপায় নাই। শখের কিছু পড়া তাদের পক্ষে অত্যন্ত গর্হিত কাজ।

বাঙালী ছেলের ভাগ্যে তাই ব্যাকরণ, অভিধান এবং ভূগোল-বিবরণ পড়া ছাড়া আর কিছু থাকে না। যে বয়সে অন্য দেশের ছেলেরা আপন খুশি মতো চলে ফিরে দিন কাটায়, বাঙালী ছেলে তখন অপুষ্ট দেহ নিয়ে পড়া মুখস্ত বলতে না পেরে শিক্ষকের বেত্রাঘাত ও ভর্ৎসনায় তাড়িত হচ্ছে। ফলে, তাদের হজমের শক্তিও ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। যথেষ্ট খেলাধূলা এবং উপযুক্ত আহার্যের অভাবে এদেশের ছেলের দেহ যেমন অপুষ্ট থেকে যায়, তেমনি তাদের গ্রহণশক্তিও বাড়তে পায় না। এদেশের ছেলে বি-এ, এম্-এ পাশ ক'রে ডিগ্রিই শুধু অর্জন করে, রাশি রাশি পুঁথিগত বিদ্যা গলাধঃকরণ করে, কিন্তু তাদের বুদ্ধিবৃত্তি বলিষ্ঠ, বিদ্যা পরিপক্ক হয় না। তারা কোন জ্ঞানই ঠিকমত আয়ত্ত করতে পারে না, সম্পূর্ণ ক'রে কিছু গড়তেও পারে না। এই অসম্পূর্ণতাকে ঢাকা দেবার জন্য অত্যুক্তি, আড়ম্বর ও অত্যধিক আস্ফালন তাদের মতামত, কথাবার্তা ও আচার-অনুষ্ঠানকে ঘিরে রাখে। এটা তাদের নিছক মনের দৈন্য ঢাকবার কৌশল ছাড়া আর কিছু নয়।

এর প্রধান কারণই হচ্ছে, শিক্ষার সঙ্গে আনন্দের যোগ নেই। এরা আনন্দে শেখে না, বাধ্য হয়ে শেখে। শিক্ষা এদের জীবিকার উপায় মাত্র। নিতান্ত আবশ্যক বলেই শিক্ষাকে কণ্ঠস্থ করতে হয়, হৃদয়স্থ করার কোনও আগ্রহ সেখানে জড়িত নেই। হাওয়া খেলে পেট ভরে না, আহারে পেট ভরে। কিন্তু সেই আহারকে উপযুক্তরূপে হজম করতে সহায় হয় হাওয়া খাওয়া। তেমনি, শিক্ষাকে রীতিমত হজম করতে হলে শুধু নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক পড়লে চলবে না, তার সঙ্গে অন্য পুস্তক পড়তে হবে যা আনন্দ দেবে। আনন্দের সঙ্গে স্বাধীনভাবে পড়তে পড়তে পড়ার শক্তি নিজে থেকেই বাড়ে, শিক্ষার্থীর গ্রহণশক্তি, ধারণশক্তি, চিন্তাশক্তি স্বাভাবিকভাবেই বর্ধিত হয়।

মানসিক শক্তি কমিয়ে দেওয়ার এই আনন্দহীন শিক্ষার হাত থেকে বাঙালী অব্যাহতি পাবে কেমন ক'রে? তাকে যে পাশ করতে হবে জীবিকার

জন্য, পাস করতে হ'লে মুখস্ত করতে হবে। কারণ, যে ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা নিতে হয় সেটা ইংরাজি ভাষা, এদেশের নয়, বিদেশের অপরিচিত ভাষা। তার শব্দবিন্যাস, পদবিন্যাস, ভাববিন্যাস—কোনওটির সঙ্গে বাঙালির ভাষার কোনও মিল নেই। আগাগোড়া কিছুই পরিণত নয় বলেই তাকে অনায়াসে মনের মতন করে নেওয়া যায় না, অগত্যা মুখস্ত করতে হয় অবস্থা হয় না চিবিয়ে গিলে ফেলার মতন। উপরন্তু এদেশে যারা নীচের ক্লাশে শিক্ষা দেন তাঁরা নিজেরাই এই বিদেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে সম্যক পরিচিত নন। ফলে ইংরাজি থেকে বাঙলায় তর্জমা করতে গিয়ে অনেক গোঁজামিল দিতে হয়। প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি শিক্ষায় অসংখ্য গোঁজামিল ঢুকে শিক্ষাটা হয়ে পড়ে যেমন সামান্য তেমনি ভুলে ভরা, সেই শিক্ষা থেকে কোনও রস আহরণ করা বা আনন্দ আস্বাদন করা অসম্ভব হ'য়ে ওঠে। তাই, রসের বা আনন্দের আশা ছেড়ে দিয়ে যেমন-তেমন একটা অর্থ খাড়া করে ইংরেজি শিক্ষা শুধু কণ্ঠস্থ করে কোনও রকমে পাস করাটাই লক্ষ্য হ'য়ে ওঠে।

তার চেয়ে বাঙলার বালকেরা যদি ইংরেজি না শিখে শুধু বাঙলা শিখতো তবে রামায়ণ-মহাভারতের মতন বৃহৎ ও মহৎ গ্রন্থ পড়ে বহু বিচিত্র বিষয় ও অনাবিল রসের আস্বাদ পেতে পারতো। যদি কিছুই না শিখতো তবে গাছে চড়ে, নদীতে ঝাঁপিয়ে, ফল ছিঁড়ে, ফল পেড়ে শরীরের পুষ্টি মনের উল্লাস এবং বালক বয়সের কাঙ্ক্ষিত আনন্দের আস্বাদ পেতো। ইংরেজি শিখতে গিয়ে না হ'লো শেখা না হ'লো খেলা। শরীরের পুষ্টিও হলো না মনের বিকাশও ঘটলো না।

যদি মানুষের মত মানুষ হ'তে হয় তবে চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তি দুই ই জীবনে অত্যাবশ্যক। এই কল্পনা ও চিন্তার চর্চা যদি বাল্যকাল থেকে করা না যায় তবে তার বিকাশ হয় না, বড় হয়ে তাকে প্রয়োজনে পাওয়া যায় না।

যে শিক্ষা বর্তমানে এদেশে প্রচলিত তাতে কল্পনা ও চিন্তাশক্তির চর্চার পথ বন্ধ। অনেক বয়স পর্যন্ত এখানকার ছেলেদের ভাষাশিক্ষায় ব্যাপৃত থাকতে হয়, ভাষার সঙ্গে সঙ্গে ভাব তাদের হৃদয়ে সহজে প্রবেশ করতে পারে না। তার জন্য প্রয়োজন ইংরেজি ভাবের সঙ্গে কিছুটা পরিচয়। কিন্তু সে পরিচয় লাভ করতে এত বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয় যে ততদিনে এদেশের ছেলেদের চিন্তাশক্তি চর্চার অভাবে নিতান্ত নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

পড়তে পড়তে ভাবতে না পারলে উপকরণ সংগৃহীত হ'য়ে স্তূপাকার হয় কিন্তু নির্মাণ হয় না। মনের অট্টালিকা নির্মাণের মালমশলা জমে, কিন্তু, অট্টালিকা গড়ার শক্তি জেগে ওঠে না। সংগ্রহ করতে শেখা আর নির্মাণ করতে শেখা এক কথা নয়। সংগ্রহ এবং নির্মাণ যদি একই সঙ্গে যুগপৎ চলতে থাকে তবেই কাজটা পাকা হয়।

ছেলে মানুষ করতে হলে ছেলেবেলা থেকেই তাকে মানুষ করা শুরু করতে হবে, নইলে সে ছেলেই থেকে যাবে—মানুষ হবে না। তার স্মৃতিশক্তির উপরে সব চাপ না দিয়ে, তার কল্পনাশক্তি ও চিন্তাশক্তির স্বাধীন পরিচালনায় তাকে প্রণোদিত করতে হবে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শুকনো মাটিতে লাঙ্গল দিয়ে তার ঢেলা ভেঙ্গে কাটালে যেমন উপযুক্ত চাষ হয় না, তাতে জলের যোগান চাই; তেমনি, শৈশব থেকে অবিরাম মুখস্ত ক'রে যথার্থ শিক্ষা হয় না, তার সঙ্গে রস থাকা চাই। চাষের যেমন বিশেষ একটি সময় আছে, বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সম্পর্ক আছে, সে সময় পার হয়ে গেলে শত কর্ষণেও মাটিতে ফসল ফলে না: শিক্ষায়ও তেমনি। একটি বিশেষ বয়সে জীবন্ত ভাব ও নবীন কল্পনা আপনা থেকেই মনে জাগে, তখনই শিক্ষার উপযুক্ত সময়। তখন যদি কল্পনার আকাশ থেকে মনের ভূমিতে এক পশলা রসের বৃষ্টি হয় তবে হৃদয়ের নতুন-জাগা ভাবের অঙ্কুরগুলি মনের অন্ধকার ভেদ করে জীবনের প্রকাশ্যলোকে আত্মপ্রকাশ করে। যে বয়সে নবীন বিস্ময়, নবীন প্রীতি, নবীন কৌতূহল চারদিকে আপনাকে ছড়িয়ে দিতে আগ্রহী তখন যদি ভাবের সমীরণ প্রবাহিত হয়ে আসে মনের মধ্যে, আনন্দের আলো এসে পড়ে হৃদয়ের অভ্যন্তরে তবেই মানুষের জীবন ভবিষ্যতে সফল, সরস ও পরিণত হবার প্রেরণা পায়। কিন্তু সেই বয়সে যদি নীরস ব্যাকরণ ও বিদেশী-ভাষার অভিধান সমস্ত চিত্তকে আচ্ছন্ন ক'রে থাকে, তবে, পরে শত চেষ্টাতেও মনের গাছে চিন্তা ও কল্পনার ফুল পরিপূর্ণ প্রস্ফুটিত হয় না। নীরস শিক্ষায় জীবনের শুভলগ্ন পার হ'য়ে যায়।

বিশ-বাইশ বছর বয়স পর্যন্ত বাঙালীর ছেলে যে সব ভাব শিক্ষা করে সেগুলি তাদের মনের সঙ্গে মিলেমিশে যায় না; তার কিছুটা কালক্রমে ঝরে যায়, কিছু কিছু কৃত্রিমভাবে লেগে থাকে। স্বাস্থ্যের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা ও লাবণ্যকে আচ্ছন্ন ক'রে গায়ে রঙ্ মেখে উল্‌কি প'রে অসভ্যরা যেমন

গর্ববোধ করে এদেশীয় ছেলেরাও যেমনি বিলাতি-বিদ্যা গায়ে লেপে দম্ভ বোধ করে, মনোজীবনের সঙ্গে সে বিদ্যার যোগ খুব কমই থাকে।

"বাল্যকাল হইতে যদি ভাষাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভাবশিক্ষা হয় এবং ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জীবনযাত্রা নিয়মিত হইতে থাকে, তবেই আমাদের সমস্ত জীবনের মধ্যে একটা যথার্থ সামঞ্জস্য স্থাপিত হইতে পারে—আমরা বেশ সহজ মানুষের মত হইতে পারি এবং সকল বিষয়ের একটা যথাযথ পরিমাণ ধরিতে পারি।"

এদেশের মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে প্রচলিত শিক্ষার সামঞ্জস্য নেই। যে গৃহে তাদের সমস্ত জীবন কাটাতে হবে সেই গৃহের উন্নত চিত্র তাদের পাঠ্যপুস্তকে নেই, প্রতিদিনের জীবনযাত্রার কোনও বর্ণনা সেখানে পাওয়া যায় না, এদেশের আকাশ ও পৃথিবী, এ দেশের নির্মল প্রভাত ও সুন্দর সন্ধ্যা, এ দেশের পরিপূর্ণ শস্যক্ষেত্র, প্রবাহিত স্রোতস্বিনীর কলধ্বনি পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত বিষয়ের মধ্যে ধ্বনিত হয় না। তা' থেকেই বোঝা যায় যে বাঙালীর শিক্ষার সঙ্গে বঙ্গবাসীর জীবনের তেমন নিবিড় মিলনের কোনও সম্ভাবনাই নেই। এ শিক্ষা থেকে বাঙালী-জীবনের অত্যাবশ্যক উপকরণ পাওয়া যাবে না। এ শিক্ষা এদেশীয়দের কেবলমাত্র কেরাণী অথবা কোন একটা ব্যবসায়ের উপযোগী ক'রে দেয়। ফলে, এই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে একই ব্যক্তি একদিকে য়ুরোপীয় দর্শন-বিজ্ঞান-ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হ'য়েও বহুকাল পোষিত কুসংস্কারগুলিকে সযত্নে আঁকড়ে থাকে। বিদ্যা এবং ব্যবহারের মধ্যে একটা সত্যকার দুর্ভেদ্য ব্যবধান থেকে যায়, উভয়ে কখনো সামঞ্জস্যপূর্ণ-ভাবে মিলিত হ'তে পারে না। তাই, শিক্ষার সঙ্গে জীবনের সামঞ্জস্যসাধনই বর্তমানে সর্বপ্রধান মনোযোগের বিষয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

এই সামঞ্জস্যসাধন করতে পারে একমাত্র বাঙ্‌লাভাষা ও বাঙ্‌লা সাহিত্য। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' নূতন প্রভাতের আলোর মত আবির্ভূত হয়েছিলো বঙ্গদেশে। শিক্ষিত বাঙালীর হৃদয়-জগৎ এক অপূর্ব আনন্দে জেগে উঠেছিলো। কিন্তু কেন? য়ুরোপীয় দর্শন-বিজ্ঞান-ইতিহাস পাঠে যা পাওয়া যায়নি এমন কোন নূতন তত্ত্ব বা নূতন আবিষ্কারের সন্ধান তো 'বঙ্গদর্শন'-এ ছিল না। তবে কি ছিল? ছিল এমন কিছু যা বাঙালীর ইংরাজি শিক্ষার সঙ্গে বাঙালীর অন্তঃকরণের মধ্যবর্তী ব্যবধানকে ভেঙ্গে দিয়েছিল। প্রাণের সঙ্গে ঘটেছিল ভাবের আনন্দসম্মিলন। দূরবর্তীকে এনে দিয়েছিল বাঙ্গালীর

হৃদয়ের অভ্যন্তরে। যেন কৃষ্ণ ছিলেন এতদিন মথুরায় রাজা হয়ে, তাঁর সাক্ষাৎ পেতে হ'লে দ্বাররক্ষককে তোয়াজ করতে হ'তো। আজ তিনি বাঙালীর মনের বৃন্দাবনে এসে গেলেন, এনে দিল বঙ্গদর্শন। রসের মূর্তি কৃষ্ণ ছিলেন দূরে। এলেন অন্তরের অভ্যন্তরে। বাঙালী তার ঘরের মেয়েকে পেয়ে গেল সূর্যমুখী, কমলমণির মধ্যে; অন্তরে নূতন ভাবাদর্শের প্রেরণা পেলো চন্দ্রশেখর-প্রতাপের মধ্যে। বাঙালীর জাতীয় জীবনে নূতন যুগের প্রবর্তনা ঘটলো।

ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ফলে বাঙালীর জীবনের সঙ্গে তার ভাব ও ভাষার সামঞ্জস্য হয়নি। সামঞ্জস্য হয়নি বলেই শিক্ষার প্রসাদে যখন যেটি পাওয়ার কথা তখন সেটি না পেয়ে বাঙালী-সন্তান বলিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। পুরো শীতকাল শীতবস্ত্রের জন্য চেষ্টা ক'রে যখন সেটি আয়ত্ত হ'লো তখন আর শীত নেই, গ্রীষ্ম এসে গেছে;—আবার সারা গ্রীষ্মকাল প্রয়াস চালিয়ে যখন হাল্কা বস্ত্রের ব্যবস্থা হ'লো তখন শীত এসে গেছে; সময়ের জিনিস সময়ে না-পাওয়ার এই দুরবস্থা থেকে বাঙালীর শিক্ষার মুক্তি প্রয়োজন। যে বয়সে যে পরিবেশে যে শিক্ষা পেলে মনের প্রসার, জ্ঞানের পরিধি, ভাবের আবেগ বিস্তৃত হ'তে পারে তা' হচ্ছে না। মূল কারণ, শিক্ষা ও জীবনে সামঞ্জস্যের অভাব। শিক্ষার এই হেরফের, এই সামঞ্জস্যহীনতা দূর করাই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষাশাস্ত্রী রবীন্দ্রনাথ:

'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ যখন রচনা করেন (১৮৯২) তখন তাঁর বয়স মাত্র একত্রিশ বছর। ঐ বয়সে শিক্ষা সম্পর্কে কিছু বলার মতন পরিপক্কতা সাধারণতঃ কারুর কাছ থেকে প্রত্যাশা করা যায় না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিতান্তই রবীন্দ্রনাথ, তিনি সাধারণের মধ্যে ব্যতিক্রম। তাঁর মণীষা দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির যে কোন দিককে স্পর্শ করেছে তা' উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠেছে। তরুণ রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধ বঙ্গভূমির তৎকালীন প্রবীণ ও প্রাজ্ঞব্যক্তিদের অকুণ্ঠ প্রশংসায় ভূষিত হয়েছিল। তাঁরা সবাই একবাক্যে এই প্রবন্ধটির সুখ্যাতি করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের আগে দেশে প্রচলিত শিক্ষার ত্রুটির এমন পুংখ্যানুপুংখ বিচার ও বিশ্লেষণ তেমন

গভীরভাবে কেউ করেননি। সেকালের প্রতিভাধর সাহিত্যিক ও তীক্ষ্ণধী সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধটি দুইবার পাঠ ক'রে লেখকের সঙ্গে ঐক্যমত হয়েছিলেন এবং প্রবন্ধটির ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। প্রচলিত শিক্ষার গলদ যে কোন্‌খানে তার সঠিক নির্দেশ রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে দিয়েছেন ব'লে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রথিতযশা শিক্ষাব্রতী স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম র‍্যাংলার আনন্দমোহন বসু এবং আরও অনেকে। পরবর্তীকালে শিক্ষা-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অনুধ্যান দেশে-বিদেশে সর্বত্র বিদিত হয়ে পড়ায় শিক্ষিত সমাজ তাঁকে একজন 'শিক্ষাশাস্ত্রী' রূপে আখ্যায়িত করেন।

'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধের মূল বক্তব্যের সূত্র ধ'রে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'দেশের অধিকাংশ লোকের শিক্ষার উপর যদি দেশের উন্নতি নির্ভর করে, এবং সেই শিক্ষার গভীরতা ও স্থায়িত্বের উপর যদি উন্নতির স্থায়িত্ব নির্ভর করে' তবে মাতৃভাষা ছাড়া আর কোন গতি নাই। বিজাতীয় ভাষায় শিক্ষার ফলে বাঙালীর মন যে প্রয়োজন মত এবং যথেষ্ঠ পরিমাণে জ্ঞানের পিপাসা নিবারণে আগ্রহ বোধ করে না, একথা রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছেন, তেমনি একথাও বলেছেন প্রাচীন স্বজাতীয় শাস্ত্রের শিক্ষায় ও আচারের অত্যাচারে বাঙালীর মন স্বতঃস্ফূর্তভাবে জেগে উঠতে পারছে না। নূতনের অন্ধ-অনুকরণ ও প্রাচীনের মূঢ়-অনুসরণ দুই-ই সমানভাবে বাঙালী-চিত্তের বিকাশকে চেপে রাখছে। তিনি বার বার বলেছেন যে শিক্ষার সঙ্গে বিশ্বাসের, মতের সঙ্গে ব্যবহারের সামঞ্জস্যসাধন করতে না পারলে জাতির উন্নতি সম্ভব নয়। জাতির উন্নতির জন্য চাই যথোপযুক্ত শিক্ষা এবং সেই শিক্ষা যদি নিজের ভাষার মাধ্যমে অর্জন করা না যায় তবে শিক্ষার সঙ্গে শিক্ষার্থীর মনের সামঞ্জস্য আসবে না, শিক্ষা ব্যর্থ হবে।

রবীন্দ্রনাথ যথার্থই শিক্ষাশাস্ত্রী। আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে প্রচলিত শিক্ষার ত্রুটি নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি যে সব কথা ব'লে গেছেন আজও তার সত্যতা ও উজ্জ্বলতা বিন্দুমাত্র কমেনি। দেশের ইতিহাসে অনেক বড বড় ঘটনা ঘটে গেছে! দুইটি বিশ্বযুদ্ধ, একটি দুর্ভিক্ষ, একটি বিশাল জন-জাগরণ, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম ও ইংরেজের ভারত-ত্যাগ, দেশবিভাগ, লক্ষ লক্ষ নরনারীর উদ্বাস্তু হওয়ার তীব্রব্যথা—বলা যেতে পারে, 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধ রচনার পরে বিগত শতাব্দী-প্রায় কালের ব্যবধানেও ঐ প্রবন্ধের মূল্যহ্রাস

ঘটেনি। রবীন্দ্রনাথ সেদিন বাঙালীর শিক্ষার পঙ্গুত্ব ও বাঙালীর মনের তমসার যে কারণ নির্দেশ করেছিলেন তা' আজ এতদিন পরেও অপরিবর্তিত আছে। এতকালের মধ্যে এদেশে শিক্ষার পদ্ধতি ও শিক্ষণীয় বিষয়ের অনেক পবিবর্তন হয়েছে বটে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্যটি আজও দেশের প্রধান মনোযোগের বিষয় হ'য়ে আছে। দেশীয় ভাষার মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচাব ব্যতীত শিক্ষা যে সর্বব্যাপী হ'তে পারে না তা' আজও শিক্ষাব্রতীরা সমভাবে উপলব্ধি করছেন এবং অনেকেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঐক্যমত হ'য়ে আজও মনে করছেন যে ইংরেজি না শিখলে কারও জ্ঞানের বিকাশ হবে না— একথা স্বীকার্য নয়। শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন যিনি তিনিই তো শাস্ত্রী, শিক্ষাশাস্ত্রে তাঁর চেয়ে ব্যুৎপন্ন যে এদেশে কেউ নেই—সেকথা আজ প্রতিপন্ন হয়ে গেছে ব'লেই তাঁকে 'শিক্ষাশাস্ত্রী' বলা যেতে পারে।

'শিক্ষার হেবফেব' প্রবন্ধেব সংক্ষিপ্তসাব ঃ

অত্যাবশ্যককে ছাড়িয়ে যাওয়াই মানবজীবনের ধর্ম। জীবনে যা অত্যাবশ্যক তাকে যেমন চাই, যা অত্যাবশ্যক নয় তাকেও কিছুটা চাই। শিক্ষা সম্বন্ধেও একই কথা। যে শিক্ষা নিতান্তই আবশ্যক তাকে আয়ত্ত করতে হ'লে সঙ্গে সঙ্গে আবশ্যকের অতীত কিছু আনন্দের বিষয়ও যুক্ত করতে হবে। পাঠ্য-বিষয়ের সঙ্গে পাঠ্যবহির্ভূত বিষয়, যা শিক্ষার্থীর মনকে আকৃষ্ট কবে, যদি যোগ করা না যায় তবে শিক্ষার্থীর মন বিকশিত হয় না। শিক্ষিত হ'যেও তার বুদ্ধিবৃত্তির সম্যক বিকাশ ঘটে না।

আমাদের দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের সে সুযোগ ঘটে না, কারণ, তাদের হাতে সময় কম। যত তাডাতাডি সম্ভব, বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করে পবীক্ষায পাশ ক'বে তাকে অর্থোপার্জনে এগোতে হবে। সুতরাং, যে বয়সে অন্যদেশেব ছেলেরা পরমানন্দে এটা-ওটা করে, ইচ্ছামতন পড়ে, আমাদের দেশের ছেলেরা তখন বিদেশীয ভাষা শিক্ষা করতে গিয়ে মুখস্ত করে, শিক্ষকের হাতে নিপীডিত হয। মনেব খুশির অভাবে তাদের শিক্ষা থাকে অসম্পূর্ণ, বুদ্ধির বিকাশ ঘটে না এবং মনের আনন্দ না থাকায় দেহেরও পুষ্টি ঘটে না। ফলে, এ দেশের ছেলে-মেয়ে শিক্ষায় ডিগ্রি-ডিপ্লোমা অর্জন করলেও পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করে না। উপাদান সংগ্রহ করে ঠিকই, কিন্তু

সেই উপাদানের সহযোগে নতুন জ্ঞান, নতুন তত্ত্ব সৃষ্টি করতে পারে না। মালমশলা সংগ্রহের কাজ তাদের দিয়ে হলেও নির্মাণ করতে তারা সক্ষম হয় না।

এর প্রধান কারণ, শিক্ষার সঙ্গে আনন্দের অভাব। আনন্দের সঙ্গে পড়তে পড়তে পড়বার শক্তি অলক্ষিতে বাড়ে; গ্রহণশক্তি, ধারণশক্তি ও চিন্তাশক্তি সহজে স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পায়। ইংরাজি ভাষা বিজাতীয়, তার সঙ্গে আমাদের ভাষার কোন মিল নেই। সেই ভাষায় পাঠ গ্রহণ করতে গিয়ে মুখস্ত করা ছাড়া উপায় থাকে না, ফলে বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোনও ধারণা হবার আগেই না চিবিয়ে গিলিয়ে ফেলার মত মুখস্ত করতে হয়। ইংরাজি ভাষায় রচিত বাক্যকে বাঙ্‌লায় আনতে গেলে—যেহেতু দুইটি ভাষার পদবিন্যাস, শব্দবিন্যাস একরকম নয়—কিছু গোঁজামিল এসে পড়ে। ফলে, তার মধ্য থেকে কোনও রস আকর্ষণ করা অসম্ভব হয়। কোনও রকমে পরীক্ষায় পাস হওয়া চলে, উপার্জনের উপায় হয়, কিন্তু যথার্থ শিক্ষা হয় না। আমাদের দেশের ছেলেরা ইংরাজির দ্বারস্থ না হয়ে যদি শুধু বাঙ্‌লা শিখতো তবে রামায়ণ-মহাভারতের বিপুলজ্ঞান ও বিশাল রস কিছু আয়ত্ত করতে পারতো। অথবা, কিছুই না শিখলে খুশিমতন খেলতে পারতো। ইংরাজি শিখতে গিয়ে না হলো শেখা, না হ'লো খেলা।

যথার্থ শিক্ষার প্রসাদে মানুষের চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তির বিকাশ ঘটে। চিন্তা ও কল্পনার পথ প্রচলিত ইংরাজি শিক্ষায় একেবারে রুদ্ধ। ভাষার সঙ্গে সঙ্গে ভাব আমাদের মনে সহজে প্রবেশ করতে পায় না। শিক্ষা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ভাবতে শিখতে হয়। ভাবতে না পারলে শিক্ষা শুধু সংগ্রহ হয়, কিন্তু, তা' দিয়ে নতুন কিছু গড়া যায় না। সংগ্রহ এবং গড়া যদি একই সঙ্গে অল্পে অল্পে অগ্রসর হ'তে পারে তবেই শিক্ষা পাকা হয়। প্রথম থেকে শুধু শিশুর স্মরণশক্তির উপর চাপ না দিয়ে তার কল্পনাশক্তি ও চিন্তাশক্তির চর্চার সুযোগ তাকে দিতে হবে। আনন্দের সঙ্গে যদি সে পড়তে পায় তবেই পড়ার ফলটুকু সে পূর্ণমাত্রায় পাবে। সমস্ত বড় কাজের পিছনেই অনেকখানি কল্পনার জোর থাকে। সাহসিক কল্পনা ও আন্তরিক চিন্তা ছাড়া জীবনে কোনও বড় কাজ হয় না।

যে বয়সে মন সরস থাকে, বাইরের সবকিছুকে আত্মস্থ করার জন্য উৎসুক থাকে সেই বয়সেই তাকে কল্পনা ও চিন্তার সুযোগ দিতে হবে।

আমাদের দেশের শিক্ষায় তা' হয় না, শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে একাত্ম না হয়ে শুধু পাঠ মুখস্ত ক'রেই শৈশব যৌবন অতিক্রান্ত হ'য়ে যায়। ফলে, শিক্ষার সঙ্গে চিন্তার ও কল্পনার সমীকরণ ঘটে না। সময়ের হেরফের শিক্ষাকে অসম্পূর্ণ ক'রে রাখে। এই হেরফের ঘুঁচিয়ে শিক্ষার সঙ্গে মননের ও কল্পনার সামঞ্জস্য ঘটাতে না পারলে যথার্থ শিক্ষা লাভ সম্ভব হবে না।

'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধের নামকরণ :

শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ ব্যাপারে আমাদের দেশে প্রচলিত ব্যবস্থায় যে গলদ রয়েছে তা' নির্দেশ করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে।

প্রথমতঃ, আনন্দের যোগে শিক্ষাকে গ্রহণ করার সুযোগ এদেশের ছাত্রদের নেই। রসহীন শিক্ষাকে তারা চাপে পড়ে গলাধঃকরণ করে; দ্রুত শিক্ষা সমাপ্ত ক'রে নিজেদের উপার্জনের উপযোগী ক'রে তোলাই তাদের লক্ষ্য।

দ্বিতীয়তঃ, বিজাতীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয় ব'লে শিক্ষার সঙ্গে অন্তরের যোগ ঘটে না। মনের খুশিতে পড়ে না, বাধ্য হয়ে পড়ে। যদি মনের খুশিতে পড়তো তা'হলে পড়তে পড়তে পড়ার শক্তি বাড়তো, গ্রহণশক্তি, ধারণশক্তি, চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি পেতো।

বাল্যকাল থেকেই চিন্তা ও কল্পনা—এই দুই বৃত্তির চর্চা শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। সমস্ত বৃহৎকর্মের পিছনে অনেকখানি কল্পনার জোর প্রয়োজন। সাহসিক কল্পনা ও গভীর চিন্তা ছাড়া জগতে কোনও বৃহৎ কাজ হয় না। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এদেশের ছাত্ররা বিদেশীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করতে গিয়ে দ্রুত পাঠ সমাপ্ত করার তাগিদে, এবং ভাষার ব্যবধানের জন্য, চিন্তা করার বা কল্পনা করার সুযোগ পায় না। এই শিক্ষা হয়তো জ্ঞানের উপাদান-উপকরণ ঠিকই শিক্ষার্থীর সম্মুখে উপস্থাপিত করে। কিন্তু তখন তার সদ্ব্যবহারের সময় ছাত্রদের থাকে না। তারা শুধু তা' গলাধঃকরণ করে। পাঠ সমাপ্ত হবার পর যখন তাদের স্বাধীনভাবে সানন্দে পড়ার সময় আসে তখন চর্চার অভাবে চিন্তা ও কল্পনার শক্তি কমে গেছে। যে বয়সে মন সতেজ থাকে সেই বয়সে অন্ধের মতন পাঠ মুখস্ত করতে তারা ব্যাপৃত থাকে। বাল্যকাল থেকেই যদি ভাষাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভাবশিক্ষার

সুযোগ না ঘটে এবং ভাবের সঙ্গে জীবনের সামঞ্জস্য না সাধিত হয় তবে শিক্ষা ব্যর্থ হয়। জ্ঞানের উপকরণ সংগ্রহ ক'রেও নূতন কিছু নির্মাণ করা সম্ভব হয় না। আমরা যে ভাবে জীবন নির্বাহ করি, আমাদের শিক্ষা তার আনুপাতিক নয়। আমাদের শিক্ষায় কালগত ঔচিত্য ও পরিমিতি-বোধের অভাব। আমাদের ভাব, ভাষা ও জীবনের মধ্যে সামঞ্জস্য হারিয়ে গেছে এই শিক্ষাব্যবস্থার ফলে। যেন সবই আছে, কিন্তু সামঞ্জস্যের অভাবে কিছুই নেই। এই সামঞ্জস্যের অভাবকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'হেরফের'। যে সময়ে যা প্রয়োজন, প্রচলিত শিক্ষার ফলে, সে সময়ে তা' হচ্ছে না। আমাদের ভাবের সঙ্গে ভাষা, শিক্ষার সঙ্গে জীবন—সংহতি ও সামঞ্জস্য লাভ করছে না। আমাদের শিক্ষায় সংহতি ও সামঞ্জস্যের অভাবকে নানা যুক্তি-তর্কের প্রকৃষ্ট বন্ধনে গ্রথিত করে রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত করেছেন, সেদিক থেকে প্রবন্ধটির শিরোনাম 'শিক্ষার হেরফের' সুযুক্তিসম্মত হয়েছে।

'সংগ্রহ' ও 'নির্মাণ':

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে বলেছেন—'আমরা যতই বি-এ, এম্-এ পাস করিতেছি, রাশি রাশি বই গিলিতেছি, বুদ্ধিবৃত্তিটা তেমন বলিষ্ঠ এবং পরিপক্ক হইতেছে না'। বই যে কম পড়া হচ্ছে তা' নয়, জ্ঞান যে আহরণ করা না হচ্ছে তা নয়,—জ্ঞান আমরা সংগ্রহ করছি ঠিকই, কিন্তু সেই জ্ঞানকে ঠিক মতন কাজে লাগাতে পারছি না। য়ুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে ইংরাজী শিক্ষার মাধ্যমে অনেক উপকরণ আমরা সংগ্রহ করছি। কিন্তু সেই উপকরণগুলিকে কাজে লাগিয়ে নতুন কিছু নির্মাণ করতে পারছি না। কারণ, আমাদের আহৃত জ্ঞান আমাদের চিত্তের মধ্যে মিলে-মিশে যাচ্ছে না।

কারণ, 'আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। কেবল যাহা-কিছু নিতান্ত আবশ্যক তাহাই কণ্ঠস্থ করিতেছি'। আনন্দের সঙ্গে পড়তে পড়তে পড়ার শক্তি আপনার অগোচরে বাড়তে থাকে। গ্রহণশক্তি, ধারণশক্তি ও চিন্তার শক্তি সহজে স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে ওঠে। একে তো যে ভাষার মাধ্যমে আমাদের শিক্ষালাভ করতে হয় সেই ভাষা বিজাতীয়; তার শব্দবিন্যাস,

পদবিন্যাস আমাদের ভাষার মতন নয়। তার উপরে তার বিষয় বিদেশী, ভাবও আমাদের পরিচিত পরিমণ্ডলের নয়। আগাগোড়া সবই অপরিচিত, কাজেই বোঝবার আগেই পাঠ্যবিষয় মুখস্ত করতে বাধ্য হ'তে হয়। কোনও রকমে মুখস্ত ক'রে পরীক্ষায় পাস করাটাই লক্ষ্য হ'য়ে ওঠে, আনন্দের সঙ্গে রসগ্রহণের কথা তখন মনেই আসে না।

মুখস্ত করার দিকে লক্ষ্য নিবদ্ধ থাকায় যে বিষয় মুখস্ত আমরা করি তাকে ঘিরে কোনও কিছু চিন্তা করি না, কিছু কল্পনাও করি না। ফলে, আমাদের চিন্তার শক্তি ও কল্পনার শক্তি বাল্যকাল থেকেই ভোঁতা হয়ে যায়। জীবনযাত্রা নির্বাহে এই দুইটি শক্তিই অতীব প্রয়োজনীয়। বাল্যকাল থেকে এই দুই শক্তির চর্চা না করলে পরিণত বয়সে তথাকথিত বিদ্যা সংগৃহীত থাকলেও তা' দিয়ে, জীবনের প্রয়োজনে, কিছু নির্মাণ করা যায় না।

সংগ্রহ করা আর নির্মাণ করায় অনেক ব্যবধান। আমরা ইংরাজি শিক্ষার মধ্য দিয়ে য়ুরোপীয় জ্ঞানভাণ্ডার থেকে অনেক উপকরণ সংগ্রহ করতে পারি। কিন্তু সেই উপকরণের সঙ্গে আপন চিন্তা ও কল্পনা যুক্ত করতে না পেরে কোনও নূতন কিছু নির্মাণ করতে পারি না। শুধু শিক্ষা নিলেই হয় না, সেই শিক্ষাকে নিজের মতন ক'রে নিয়ে তাকে জীবনের কাজে লাগানো চাই। ইঁট-কাঠ-বালি-সিমেণ্ট সংগ্রহ করা এক কথা, কিন্তু, অট্টালিকা-নির্মাণ অন্যকথা। স্থপতিবিদ্যা ও সৌন্দর্যবোধ যুক্ত ক'রে তবেই সংগৃহীত উপকরণের সাহায্যে ইমারত গড়া সম্ভব হয়। সংগ্রহ ও নির্মাণ যখন একই সঙ্গে অল্পে অল্পে অগ্রসর হ'তে পারে তখনই কাজ পাকা হয়। বিদ্যা সংগ্রহ ও কল্পনা এবং চিন্তার চর্চা সমভাবে যদি চলতে পায় তবেই বিদ্যার সংগ্রহ সার্থক হয়, নূতন কিছু নির্মাণ করার শক্তি আসে।

মাতৃভাষাব মাধ্যমে শিক্ষা :

প্রচলিত শিক্ষায় যে গলদ ও অপূর্ণতার সন্ধান রবীন্দ্রনাথ করেছেন তার প্রতিকারের যে একটি মাত্র পথ তিনি দেখেছেন, তা' হচ্ছে, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দান করা। প্রথমতঃ তিনি বলেছেন যে বিদেশী ভাষার মাধ্যমে যে শিক্ষা দান করা হয় তার সঙ্গে আনন্দের যোগ নেই। দ্রুত পাঠ-সমাপনের বাধ্যবাধকতার চাপে নিরানন্দ মন নিয়ে বাঙালী ছাত্ররা

বাল্যকাল থেকেই শিক্ষা গলাধঃকরণ করে। শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে তাদের মনের ব্যবধান থেকে যায়, শিক্ষা হয়ে পড়ে কৃত্রিম। শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে যদি তাদের মনের যোগ ঘটতো তবে আনন্দ থাকতো শিক্ষায়, এবং সেই আনন্দে তারা শিক্ষণীয় বিষয়কে ঘিরে চিন্তা করতো, কল্পনা করতো—সেই চিন্তা ও কল্পনার যোগে তার বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ হ'তো।

কিন্তু তা' হয় না। কারণ, শিক্ষার মাধ্যম তখন ইংরাজি। ইংরাজি বাঙ্‌লা দেশের বালক-কিশোর যুবকদের কাছে বিজাতীয় ভাষা। মাতৃভাষা বাঙ্‌লার সঙ্গে তার কোন ভাবেই কোন সাদৃশ্য নেই। ইংরাজি শব্দবিন্যাস, পদবিন্যাস বাংলার মত নয়। তার উপরে সেই ভাষায় রচিত বিষয়বস্তু বাঙালী ছাত্রের কাছে বিজাতীয়। তার ভাববিন্যাসও বাঙালীর মনের মতন নয়। আগাগোড়া সব কিছুই অপরিচিত, তাই পাশ করার জন্য বাঙালী ছাত্রের মুখস্ত করা ছাড়া উপায় থাকে না। গিলে খেতে হয়, চিবিয়ে খাওয়া হয় না—পরিপাক হয় না। পরিপাক হ'লে তার থেকে যে রসটুকু বাঙালী ছাত্রের মনের দেহে যোগ হ'য়ে মনের পুষ্টি সাধন করতে পারতো, তা' হয় না।

ইংরাজি ভাষার মাধ্যমে বাঙালী ছাত্রের ভাবগ্রহণে অন্তরায় কেমনতরো তার উদাহরণ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। 'Noble' শব্দটির বাঙ্‌লা হ'তে পারে 'মহৎ', 'ভাল', কিংবা উচুঁদরের। Horse is a noble animal—এই বাক্যের তর্জমা যখন নীচু ক্লাশের শিক্ষকমশাই অল্পবয়সী ছাত্রের কাছে করবেন, তখন তিনি কি ব'লে ঐ ইংরাজি বাক্যটির অন্তর্নিহিত ভাব ছাত্রের মনে অনুপ্রবেশ করাবেন—ঘোড়া একটি 'মহৎ' জন্তু। ঘোড়া একটি 'ভাল' জন্তু? না, ঘোড়া একটি 'উঁচুদরের' জন্তু? ইংরাজি বাক্যের ভাব বাঙ্‌লায় ব্যক্ত করতে গিয়ে অনেকক্ষেত্রেই গোঁজামিলের আশ্রয় নিতে হয়। ফলে, এদেশের ছেলেরা যা ইংরাজি শেখে তা' খুবই কম এবং অনেক গোঁজামিলে ভরা। তাতেই কাজ চালাতে হয়। শেখার চেয়ে পাস করাটাই আসল লক্ষ্য, মুখস্ত করাই সেখানে সহজতম পথ।

তার চেয়ে বাঙ্‌লা দেশের ছেলে যদি শুধু বাঙ্‌লাই শিখতো তবে রামায়ণ-মহাভারতের মত মহান কাব্য পাঠ ক'রে তারা রস পেতো, জ্ঞান লাভ করতো, শিক্ষা এবং আনন্দ দুই-য়েই অধিকার জন্মাতো। কিছুই না শিখলে খেলা করতো, গাছে চড়তো, জলে ঝাঁপ দিতো—মনের উল্লাসে

প্রকৃতির সান্নিধ্যে শরীরকে পুষ্ট করতো। ইংরাজি শিখতে গিয়ে তারা মনের উল্লাস থেকে বঞ্চিত হয়, শরীরও তাদের পুষ্ট হয় না। বাল্যকাল থেকে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তারা চিন্তার চর্চা করতে পারে না, কল্পনা তাদের মুক্তি পায় না। সব পথ রুদ্ধ ক'রে শুধু ভাষাশিক্ষায় তাদের ব্যাপৃত থাকতে হয়। ভাষার সঙ্গে সঙ্গে ভাব তাদের মনে প্রবেশের পথ পায় না। অল্প বয়সে মন যখন বিকাশোন্মুখ, নানা উচ্ছ্বাস-আবেগে আন্দোলিত, তখন নীরস ব্যাকরণ ও বিদেশী অভিধান তাদের মনকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখে। ইংরাজির মাধ্যমে যে সব উন্নতভাব তারা শিক্ষা করে তা' তাদের জীবনের সঙ্গে রাসায়নিক মিশ্রণ লাভ করে না। শিক্ষার সঙ্গে জীবনের সামঞ্জস্যসাধন হয় না। এই সামঞ্জস্যসাধনই বর্তমানকালে শিক্ষার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা।

এই সমস্যার সমাধানের একতম ও একমাত্র পথ হচ্ছে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা। বাঙালী জীবনের সঙ্গে শিক্ষার সামঞ্জস্যসাধন করতে পারে বাঙ্‌লা ভাষা ও বাঙ্‌লা সাহিত্য। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রথম আবির্ভাবের কালে সে কথা খুব সহজেই প্রতিপন্ন হয়েছিলো। ইংরাজি শিক্ষার সঙ্গে বাঙালীর মনের যে ব্যবধান তা' ভেঙ্গে দিয়েছিলো 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা। ইংরাজি সাহিত্যের সমুন্নত ভাবরাশি বাঙ্‌লা ভাষার মাধ্যমে বাঙালীর প্রাণের বিষয় হ'য়ে দেখা দিয়েছিলো। প্রাণের সঙ্গে ঘটেছিলো ভাবের আনন্দ-সম্মিলন। বাঙালী তার চিরপরিচিতা কন্যা ও বধূকে সূর্যমুখী-কমলমণি রূপে দেখতে পেলো, দেখতে পেলো আপন প্রাণের মহৎ আদর্শকে চন্দ্রশেখর ও প্রতাপের মধ্যে। ইংরাজি সাহিত্যের সমুন্নতভাব বাঙালী সাহিত্যিক যদি বাঙালীর মতন ক'রে বাঙ্‌লার আকাশ-বাতাস-নদীনালার প্রেক্ষাপটে স্থাপন ক'রে বাঙালীর মাতৃভাষায় উপস্থাপিত করেন তবে তা' কত সহজে এদেশের মানুষের চিত্তলোকে আনন্দের সমীরণ প্রবাহিত ক'রে দেয় তা' প্রমাণিত হ'লো 'বঙ্গদর্শন'-এর মাধ্যমে।

জ্ঞানলাভের জন্য শিক্ষা, জীবনের মান উন্নত করার জন্য শিক্ষা, জীবনে মহৎ কিছু সৃজন করার জন্য শিক্ষা,—সেই শিক্ষা যদি সম্পূর্ণ না হয়, তা যদি জীবনের কাজে না লাগে তবে সে শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ। শিক্ষার মধ্য দিয়ে জ্ঞান যদি পেতে হয় তবে সে শিক্ষা ও জীবনের মধ্যে ভাষার অন্তরাল থাকলে হবে না। নিজের ভাষায় সহজ-শিক্ষার পথ ধ'রেই মহৎ

জ্ঞান অন্তরে প্রবেশ করবে, সেই জ্ঞান সমুন্নত ভাবরাজির বিকাশে সহায়ক হবে। তাই, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, শিক্ষার সঙ্গে জীবনের সামঞ্জস্য বিধান করতে হ'লে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাই একমাত্র এবং প্রকৃষ্টতম পথ।

॥ শকুন্তলা ॥

রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ কবি এবং তাঁর সর্বাত্মক কবি-প্রকৃতি প্রবন্ধ রচনাকালেও স্বাভাবিকভাবেই আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রথম জীবনে বঙ্কিম-প্রদর্শিত পথের পথিক তিনি ছিলেন। সাহিত্যসমালোচনায় তুলনামূলক বিচারের রীতিকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু, দিনে দিনে সে পথ থেকে আপন কবি-স্বভাবের তাগিদেই তিনি সরে এসে বলেছেন—'পূজার আবেগ মিশ্রিত ব্যাখ্যার' নাম সমালোচনা। শুধু তথ্য নয়, তত্ত্ব নয় রসের যোগে প্রবন্ধকে এক বিশিষ্ট মূর্তিতে প্রকটিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে রসের আস্বাদ জাগিয়েছেন।

তখন উনিশ শতাব্দী শেষ হয়েছে, বিংশ শতকের সুরু। রবীন্দ্রনাথের কবিমন প্রাচীন ভারতীয় জীবনে পদচারণা সুরু করেছে। প্রাচীন ভারতের দ্বিবিধ রূপ—ত্যাগের মহিমময় বৈরাগ্যমূর্তি ও ভোগের আনন্দভরা সৌন্দর্য-মূর্তি—কবির মানসদৃষ্টির সম্মুখে একযোগে ধরা দিয়েছে। কবি একদিকে 'কল্পনা' কাব্য রচনা করছেন, অন্যদিকে 'প্রাচীনসাহিত্য'-এর প্রবন্ধগুলি রচনা করেছেন। প্রাচীন ভারতকে আবিস্কার করতে গিয়ে প্রাচীন ভারতীয় কাব্য-মহাকাব্য-নাটকের মূল্যায়ণ করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন তিনি। প্রাচীন ভারতের মহাকবি কালিদাসের মহান নাটক 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্-এর মূল্যায়ণ করতে গিয়ে তিনি আলোচ্য 'শকুন্তলা' প্রবন্ধ রচনা করেন। 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থের এই 'শকুন্তলা' প্রবন্ধটিই রবীন্দ্রনাথের 'সংকলন' গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

পাশ্চাত্ত্য রীতিতে তুলনামূলক সমালোচনার ধারাটিকে পূর্ণতর রূপ দিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে বঙ্কিম-প্রদর্শিত সেই ধারাকেই অনুসরণ করেছিলেন বটে, কিন্তু পরে তিনি সাহিত্যচিন্তায় সম্পূর্ণ ভিন্নধরণের দৃষ্টিকোণের পরিচয় দিয়েছেন। প্রথম জীবনের সেই বঙ্কিম-প্রভাব এবং পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ—দুই-এরই সম্মিলন

ঘটেছে 'শকুন্তলা' প্রবন্ধে। তিনি জার্মান কবি. গ্যেটের একটি শ্লোকের আলোকে 'শকুন্তলা' নাটকে প্রতিফলিত প্রাচীন ভারতের পরিপূর্ণ রূপের যেমন সন্ধান করেছেন, তেমনি, শেকস্‌পীয়রের 'টেম্পেষ্ট' নাটকের সঙ্গে তুলনা করে কালিদাসের 'শকুন্তলা' নাটকের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র ভারতীয় সাহিত্য অপেক্ষা য়ুরোপীয় সাহিত্যের অধিকতর গৌরব স্বীকার করতেন, রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের মূল রহস্যের উৎস সন্ধান ক'রে তার অধিকতর পূর্ণতা ও শ্রেষ্ঠতা প্রতিষ্ঠা করেছেন।

বিষয়বস্তু :

শেক্‌সপীয়ারের টেম্পেস্ট নাটকটির সঙ্গে কালিদাসের শকুন্তলার বহির্গত সাদৃশ্য ও আভ্যন্তরিক বৈসাদৃশ্য লক্ষণীয়।

জনশূন্য দ্বীপে মিরন্দার সঙ্গে রাজকুমার ফার্দিনান্দের প্রণয় তপোবনাশ্রিত শকুন্তলার সঙ্গে দুষ্মন্তের প্রণয়কাহিনীর কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু আখ্যানে মিল থাকলেও কাব্যদুইটির আস্বাদে যে কত বিভিন্নতা তা কাব্যপাঠ করলেই বুঝা যায়। (অনুচ্ছেদ ১-৩)

'শকুন্তলা'কে সমালোচনার আঘাতে খণ্ড-বিখণ্ড না করে য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ কবি গ্যেটে শকুন্তলা সম্পর্কে যে অভিমতটি প্রকাশ করেছেন, তা দীপশিখার মত মুহূর্তের মধ্যে শকুন্তলার পূর্ণ পরিচয়-রহস্য উদ্‌ঘাটন করে। তিনি বলেছেন, তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল এবং মর্ত ও স্বর্গকে একত্র করে দেখলে চাইলে, শকুন্তলায় তার সন্ধান মিলবে। (অনুচ্ছেদ ৪)

অনেকেই কবির এই অভিমতটিকে কেবলমাত্র কাব্যিক উচ্ছ্বাস বলে মনে করেন। কিন্তু সত্যসত্যই গ্যেটের এই উক্তিটির বিশেষত্ব আছে। শকুন্তলার মধ্যে একটি গভীর পরিণতির ভাব লক্ষ্য করা যায়। সে পরিণতি ফুল থেকে ফলে পরিণতি, মর্ত থেকে স্বর্গে পরিণতি এবং স্বভাব থেকে ধর্মে পরিণতি। মেঘদূত কাব্যটিতে যেমন পূর্বমেঘে পৃথিবীর বিচিত্র সৌন্দর্য দর্শন ও উত্তরমেঘে সৌন্দর্যের অলকাপুরীতে যাত্রার কথা বর্ণিত হয়েছে তেমনি শকুন্তলা নাটকেও একটি পূর্বমিলন ও উত্তরমিলন রয়েছে। শকুন্তলা কোনো ভাবমুখী বা চরিত্রমুখী নাটক নয়। এতে শাশ্বত প্রেম স্বভাবসৌন্দর্যের পূর্বমিলন থেকে চিরমঙ্গলের উত্তরমিলনে যাত্রা করেছে। (অনুচ্ছেদ ৫)

ফুল থেকে ফলে রূপান্তর ও স্বর্গ-মর্তের পারস্পরিক মিলনকে কালিদাস অতি সহজভাবে দেখিয়েছেন। দুষ্মন্ত-শকুন্তলার কামনা ও শকুন্তলার পতনের বীজটি তিনটি প্রথম অঙ্কেই অঙ্কুরিত করেছেন। শকুন্তলার যৌবনের আচার-আচরণ ও আপনাকে প্রকাশ করবার প্রবল ইচ্ছার মধ্যেই সরলতা প্রকাশ পেয়েছে। ভয়শূন্যা হরিণীর মতোই সে ব্যাধরূপী কন্দর্প ও দুষ্মন্তের প্রতি আস্থা স্থাপন করেছে। তপোবনের হরিণী বালিকা শকুন্তলার এই অনভিজ্ঞতার সুযোগটি নিয়ে মীনকেতু অতি সহজে আপন কার্যটি সম্পাদন করেছে।

(অনুচ্ছেদ ৬)

কিন্তু পরাভবসত্ত্বেও তার চারিত্রিক পবিত্রতা ও সতীত্বের মধ্যে সরলতাই পরিস্ফুট। অরণ্যের পুষ্পের মতোই সে পবিত্র ও সুন্দর। বনহরিণী শকুন্তলার মলিনতার স্পর্শটুকু পর্যন্ত নির্ঝরের জলধারার মতো নির্মল।

(অনুচ্ছেদ ৭)

কালিদাস-সৃষ্ট শকুন্তলা চরিত্রটি যেমন একদিকে দ্বিধাহীন স্বভাবের পথে বিকশিত হয়ে উঠেছে, তেমনি অপরদিকে কঠিন নিয়মের দ্বারা আদর্শ সতীরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাই সে তরুলতার ফুল-ফলের ন্যায় আত্মবিস্মৃত ও ধর্মানুগত হয়েও সংযমী নারীর মত কল্যাণধর্মে দীক্ষিতা। শকুন্তলা চরিত্রে ভিন্নমুখিতা লক্ষণীয়। তার মাতা অপ্সরা হলেও পিতা ঋষি এবং ব্রতভঙ্গে জন্ম হলেও সে তপোবনে পালিতা। সামাজিক কৃত্রিমতাশূন্য কঠোর নিয়মাধীন তপোবনের ক্ষেত্রটিও সৌন্দর্য ও সংযমের লীলাভূমি। শকুন্তলার গান্ধর্ব বিবাহে যেমন স্বভাবের উদ্দামতা আছে, তেমনি অপরদিকে সামাজিক নিয়মের কঠিন শৃঙ্খলও আছে! বন্ধন ও অবন্ধনে সুখদুঃখের মিলন বিচ্ছেদে শকুন্তলা নাটকটি বিশেষত্ব লাভ করেছে। এই দুই বিসদৃশের অপূর্ব সমাবেশ দর্শনেই মহাকবি গোটে শকুন্তলা প্রসঙ্গে তাঁর অমূল্য মন্তব্যটি প্রকাশ করেছিলেন।

(অনুচ্ছেদ ৮)

টেম্পেস্টে এই বিসদৃশের সমাবেশ নেই। শকুন্তলা ও মিরন্দা সুন্দরী হলেও উভয়ের মধ্যে অবস্থার, ঘটনার ও প্রকৃতির সম্পূর্ণ পার্থক্য লক্ষণীয়। নির্জন-লালিতা মিরন্দা একমাত্র পিতার সাহচর্যে মানুষ, তাই তার প্রকৃতি সুষ্ঠুরূপে বিকশিত হবার সুযোগ লাভ করেনি। অন্যদিকে, সমবয়সী সখীদের সাহচর্যে বর্ধিত শকুন্তলা পরস্পরের সান্নিধ্যে স্বাভাবিকভাবে বিকশিত। তবে শকুন্তলা যদি কেবলমাত্র কণ্বমুনির নিকটেই থাকত তবে তার সরলতাকে অজ্ঞতা বলা

হতো। সুতরাং শকুন্তলা ও মিরন্দার সরলতাটির পার্থক্য হচ্ছে স্বভাবগত সরলতা ও বাহিরের ঘটনাগত সরলতার প্রভেদ। মিরন্দার মত শকুন্তলার চতুর্দিকে অজ্ঞানতার বেড়া ছিল না। কারণ সদ্যযৌবন-বিকশিত শকুন্তলা সখীদের সাহচর্যেই লজ্জা করতে শিখেছিল। কিন্তু এ সমস্তই তার বাইরের জিনিস। তার যথার্থ সরলতা ছিল অন্তরের অন্তরতম স্থলে; বাইরের কোন কিছুই তাকে স্পর্শ করতে পারে নি। কিন্তু সে যে নিতান্তই সংসার অনভিজ্ঞা, তা নয়; কারণ তখন তপোবনেও গৃহধর্ম পালন করা হতো। অন্তরের গভীরতম সরলতাই তাকে ক্ষণিকের জন্য ধৈর্য্যচ্যুত ক'রে আবার তাকে চিরকালের আসনে ধৈর্য, ক্ষমা ও কল্যাণে আদর্শ নারীরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে। কিন্তু মিরন্দার সরলতা কখনও সাংসারিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে কঠোর সংঘাতে চরম অগ্নিপরীক্ষার পথে যাত্রা করেনি। কাজেই শকুন্তলার পূর্ণতা মিরন্দা চরিত্রে অপ্রাপ্য। (অনুচ্ছেদ ৯)

সুতরাং এইভাবে নাটক দুইটির সমালোচনা বৃথা। অবশ্য বিচার করলে কাব্যদুইটির বৈসাদৃশ্য অধিকমাত্রায় দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ বৈসাদৃশ্য আলোচনাতেই নাটক দুটিকে উত্তমরূপে বুঝা যেতে পারে। (অনুচ্ছেদ ১০)

মিরন্দা তরঙ্গাঘাতমুখর নির্জন দ্বীপের মধ্যে মানুষ, তথাপি সেই দ্বীপপ্রকৃতি তার চরিত্রে বিন্দুমাত্র প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। সেই আশৈশব লীলাভূমি দ্বীপ থেকে মিরন্দাকে বিচ্ছিন্ন করলে কেবলমাত্র মানুষের সঙ্গ না পাবার অভাবটুকু ব্যতীত তার চরিত্রে আর কোনো অভাব দৃষ্ট হবে না। সুতরাং কবির বর্ণনীয় ঐ নির্জন দ্বীপটি কেবলমাত্র কাব্যের বহির্গত সৌন্দর্যই বর্ধন করেছে, কখনই চরিত্রটির অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে ওঠেনি। (অনুচ্ছেদ ১১)

শকুন্তলার সঙ্গে সমগ্র তপোবনের আত্মার সম্পর্ক। নাটকের আখ্যান ভাগ থেকে তপোবনকে দূরে রাখলে নাটকের সঙ্গে শকুন্তলা চরিত্রটিকেও অসম্পূর্ণ বলে মনে হবে। শকুন্তলা আশ্রম প্রকৃতির তরুলতা, ফলপুষ্প ও পশু-পক্ষীর সঙ্গে নিবিড়ভাবে আত্মার বন্ধনে বিজড়িত। এখানেই মিরন্দার সঙ্গে তার প্রধান প্রভেদ। কালিদাস বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে শকুন্তলাকে এমন ভাবে সৃষ্টি করেছেন যে তাকে ঐ পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আনা আদৌ সহজসাধ্য নয়। (অনুচ্ছেদ ১২)

প্রণয় ব্যাপারেই মিরন্দার সঙ্গে ফার্দিনন্দের পরিচয়। ঝড়ের সময় অসহায় মানুষের কষ্টে কেবলমাত্র মিরন্দার কোমল হৃদয়ের করুণাধারাই

প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু শকুন্তলার চরিত্রমাধুর্য আরও ব্যাপকভাবে বর্ণিত। দুষ্মন্তের আবির্ভাব না ঘটলে শকুন্তলা চরিত্র বিচিত্ররূপে বিকশিত হয়ে উঠতো। তপোবনের তরুলতাকে জলসেচন করে ও নবযৌবনা বনজ্যোৎস্নাকে স্নিগ্ধদৃষ্টি দিয়ে সে একেবারে আপন করে নিয়েছে। তপোবনের চেতন অচেতন সকলের সঙ্গেই তার আত্মার সম্পর্ক। বনপ্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদ যে কি মর্মান্তিক হতে পারে, তার দৃষ্টান্ত অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকের চতুর্থ অঙ্কে স্তব্ধীভূত। মানুষ ও প্রকৃতির এই মিলন ভারতবর্ষ ব্যতীত অপর কোনো দেশের সাহিত্যে সম্ভব নয়। (অনুচ্ছেদ ১৩)

টেম্পেস্টে বহিঃপ্রকৃতি মানুষের আকার ধারণ করলেও আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করত পারেনি। উপরন্তু সে মানুষের কাছে অনিচ্ছুক ভৃত্যের মত আবদ্ধ। মিরন্দার নারী হৃদয়ও তার সঙ্গে স্নেহ-সম্পর্ক স্থাপনে অসমর্থ। এমনকি, বিদায়কালে প্রস্পেরো ও মিরন্দার সঙ্গে এরিয়েলের কোনোরূপ হৃদয়গ্রাহী বিদায়দৃশ্য পর্যন্ত নেই। সুতরাং টেম্পেস্টের মূলকথা যেখানে পীড়ন, শাসন, দমন, সেখানে শকুন্তলার প্রধান সুর প্রীতি, শান্তি, সদ্ভাব। টেম্পেস্টে প্রকৃতি মনুষ্য-আকার ধারণ ক'রেও হৃদয়-সম্পর্কশূন্য আর শকুন্তলায় বনপ্রকৃতি আত্মভাব রক্ষা করেও হৃদয়ের সম্পর্কে সম্পর্কিত। (অনুচ্ছেদ ১৪)

শকুন্তলার আরম্ভে ধনুর্বাণধারী দুষ্মন্তের প্রতি উচ্চারিত নিষেধ বাণীটিতেই সমগ্র কাব্যের মূলসুর অনুরণিত। 'ভো ভো রাজন্ আশ্রমমৃগোঽয়ং ন হন্তব্যো ন হন্তব্যঃ'—এই উক্তিটি আশ্রমমৃগ শকুন্তলার সম্পর্কেও সমানভাবে প্রযোজ্য। আশ্রমপালিতা বনহরিণী শকুন্তলার প্রতি দুষ্মন্তের প্রণয়শর নিক্ষেপ বড়ই নিদারুণ। কারণ শকুন্তলার কাতরতা আশ্রমমৃগের ন্যায়ই সুকুমার ও সকরুণ। (অনুচ্ছেদ ১৫)

সখীদের সঙ্গে জল-সিঞ্চনরতা বল্কলবসনা শকুন্তলার ভাব-ভঙ্গীও তরুলতার স্মারক। তাই দুষ্মন্ত, শকুন্তলার রাঙা অধরকে কিশলয়ের সঙ্গে, বাহুদ্বয়কে কোমল বৃক্ষশাখার সঙ্গে ও হৃদয়কে পরম লোভনীয় পুষ্পের সঙ্গে তুলনা করেছেন। নাটকের প্রারম্ভেই পুষ্প-পল্লবের মধ্যমণি, আশ্রমধর্ম অতিথিসেবা সখীস্নেহ ও বিশ্ববাৎসল্যের প্রতীক শকুন্তলাকে দেখে আমাদের মনে হয় যে এই অখণ্ড সৌন্দর্য-সত্তাটি যেন দুষ্মন্তের প্রণয়শর নিক্ষেপে বিদ্ধ না হয়। (অনুচ্ছেদ ১৬)

যখন দুষ্মন্ত-শকুন্তলার প্রণয় প্রগাঢ় হয়ে উঠলো, তখন নেপথ্যে তপোবন-বাসীদের রক্ষার জন্য এক করুণ সতর্কতার বাণী ধ্বনিত হ'লো। কিন্তু তপোবন-ভূমির এই করুণ ক্রন্দন আশ্রমকন্যা শকুন্তলাকে রক্ষা করতে পারল না।

(অনুচ্ছেদ ১৭)

শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রাকালে কণ্বমুণি তপোবন-তরুদের উদ্দেশ ক'রে বলেছেন, যে তাদের জলপানের পূর্বে কখনও জলগ্রহণ করতো না, যার সাজবার ইচ্ছা থাকলেও স্নেহবশতঃ তাদের পল্লবকে বিচ্ছিন্ন করতো না এবং যে শকুন্তলা তাদের ফুল ফুটলে আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে উঠত, সে আজ পতিগৃহে যাত্রা করছে। সুতরাং তারাও যেন শকুন্তলাকে বিদায় জানায়। অনুমান করা যায় যে, চেতন-অচেতন সকল পদার্থের প্রতিই শকুন্তলার কী নিবিড় আত্মীয়তা ছিল।

আর্যপুত্রকে দেখবার জন্য শকুন্তলার প্রাণ আকুল ; কিন্তু তবু আশ্রম ত্যাগ করতে তার পা উঠছে না। আবার তপোবন বিরহে কাতর শকুন্তলার মতো তপোবনও আসন্ন বিয়োগ-ব্যথায় ব্যথিত। আশ্রম-মৃগের মুখ থেকে গলিত তৃণ স্খলিত হচ্ছে, ময়ূর তার নৃত্য ভুলে গেছে। বৃক্ষ থেকে অশ্রুবিন্দুর মতো এক-একটি পাতা খসে পড়ছে। এক পূর্ণগর্ভা হরিণীর প্রতি দৃষ্টি পড়ায় শকুন্তলা তার নির্বিঘ্নে প্রসব সংবাদের জন্য পিতা কণ্বের নিকট অনুরোধ জানালো। কণ্বমুনিও সম্মত হলেন। কিন্তু হঠাৎ বস্ত্রপ্রান্তে আকর্ষণ অনুভব করে শকুন্তলা জানতো পারলে যে মাতৃহীন হরিণ শিশুটিকে সে শ্যামাধান্য দিয়ে পালন করেছিলো এবং ইঙ্গুদি তৈলে সেবা করেছিলো, সেই হরিণ শিশুটিই তাকে আকর্ষণ করছে। শকুন্তলা তার নিকট থেকেও বিদায় চাইলো। সমগ্র তপোবনের সঙ্গে শকুন্তলার চোখের জলের সম্পর্ক। (অনুচ্ছেদ ১৮-২৯)

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকে অনসূয়া-প্রিয়ংবদা, কণ্বমুনি ও দুষ্মন্তের মতন তপোবন প্রকৃতিও যেন এক-একটি বিশেষ চরিত্র। প্রকৃতিকে এতটুকু পরিবর্তনের মধ্যে না এনে তার আত্মভাব বজায় রাখা বোধ করি সংস্কৃত সাহিত্য ছাড়া আর কোথাও চোখে পড়ে না। বহিঃপ্রকৃতি যেখানে ব্যবধান রচনা করে, সেখানকার সাহিত্যে এই দুর্লভ গুণটির সৃষ্টি প্রায় অসম্ভব। উত্তররামচরিতেও মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির আত্মার সম্পর্কটি দেখানো হয়েছে। সেখানে রাজপ্রাসাদে থেকেও সীতাদেবীর হৃদয় অরণ্যের পশু-পাখি লতাপাতার জন্য অশ্রু বিসর্জন করেছে। (অনুচ্ছেদ ৩০-৩১)

টেম্পেস্ট নাটকে মানুষ কল্যাণভাবে প্রেমের সম্পর্কে নিজেকে বিস্তার করেনি; সেখানে মানুষ আপন শক্তির দম্ভে বিশ্বকে খর্ব করে দ্বন্দ্ব ও বিরোধের মাধ্যমেই বড়ো হতে চেয়েছে। তাই স্বরাজ্যচ্যুত প্রস্পেরো মন্ত্রবলে প্রকৃতির উপরে আধিপত্য বিস্তার করে এবং মৃত্যু-পথযাত্রী মানুষ পর্যন্ত গোপন ষড়যন্ত্রে বিশ্বাসঘাতকতার পথে নিজেদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখতে সচেষ্ট হয়। এই জন্যই দানবপ্রকৃতি স্তব্ধীভূত হলেও সম্পূর্ণভাবে বিষশূন্য হতে পারেনি। অবশ্য পরিণামে যে যার প্রাপ্য লাভ করেছে। কিন্তু এই বাহ্যিক লাভ কি কাব্যের বিষয়?

টেম্পেস্ট নাটকের মূলভাব বিরোধ ও বিক্ষোভ। তাই নাটকের নামকরণটি সার্থক ও অর্থবহ হয়ে উঠেছে। (অনুচ্ছেদ ৩২, ৩৩)

শাসন-দমন-পীড়নের দ্বারা অবাধ্য প্রকৃতিকে জয় করা কেবল একটি কাজ চলা গোছের উপায়মাত্র। কিন্তু ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক ব্রত সৌন্দর্য প্রেম ও মঙ্গলের দ্বারা পাপকে একেবারে অন্তর থেকে সমূলে ধ্বংস করা। একমাত্র উচ্চসাহিত্যই পবিত্র অশ্রুজলের সাহায্যে পাপকে দগ্ধ ক'রে ভালোকে সুন্দর, শ্রেয়কে প্রিয় ও পুণ্যকে হৃদয়ের ধন ক'রে তুলতে পারে।

(অনুচ্ছেদ ৩৪)

কালিদাস তাঁর নাটকে প্রবৃত্তির দাবদাহকে অনুতপ্ত হৃদয়ের অশ্রুজলে নির্বাপিত করছেন। তিনি ব্যাধিকে পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ না ক'রে কেবল আভাসটুকু মাত্র দিয়েছেন। তিনি দুর্বাসার অভিশাপকে কেন্দ্র ক'রে সংসারে সকল দুঃখ বেদনাকেই সমানভাবে দেখিয়েছেন, কিন্তু সব কদর্যতার উপরেই একটি সূক্ষ্ম প্রলেপ টেনে দিয়েছেন। (অনুচ্ছেদ ৩৫)

কালিদাসের এই নাটকে পঞ্চম অঙ্কের প্রারম্ভে রাজপ্রেয়সী হংসপদিকা নবমধুলোভী মধুকরকে উদ্দেশ করে আপন মনে যে গানটি গেয়েছে, তা' দুষ্মন্তের প্রতিও সমভাবে প্রযোজ্য। তার এই অশ্রুসিক্ত সংগীতটি আমাদেরকে ব্যথিত করে। কারণ এর আগে শকুন্তলার সঙ্গে দুষ্মন্তের প্রণয়দৃশ্যটি আমাদের মনের মণি-কোঠায় রসসঞ্চার করেছে এবং শকুন্তলাও করুণভাবে পতিগৃহে যাত্রা করছে—সুতরাং এর পরেই এই দুর্ভাগ্যের মেঘ আমাদের চিত্তে অন্ধকারের রেখা টেনে দেয়। (অনুচ্ছেদ ৩৬-৩৮)

হংসপদিকার সংগীতটির অর্থ জানতে চাইলে রাজা ঈষৎ হেসে অতি সহজেই বিদূষককে বলেছেন যে, তিনি একবার মাত্র প্রণয় ক'রে তার পরে

ছেড়ে দেন। সুতরাং পঞ্চম অঙ্কের প্রারম্ভেই কবি অতি নিপুণভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, দুর্বাসার শাপে যা' ঘটেছে তার বীজ দুষ্মন্তের স্বভাবের মধ্যেই নিহিত ছিল। কাব্যের খাতিরেই কবি তাকে অন্যরূপে চিত্রিত করেছেন।

(অনুচ্ছেদ ৩৯, ৪০)

চতুর্থ অঙ্ক থেকে পঞ্চম অঙ্কের পরিবেশ সম্পূর্ণ পৃথক। তপোবনের সুর ও নিয়মের সৌন্দর্যপুরী থেকে পঞ্চম অঙ্কের নাগরিকবৃত্তির আকাশ-পাতাল পার্থক্য। এখানকার মানুষদের হৃদয় কঠিন, প্রণয় কুটিল এবং মিলনের পথ আদৌ সহজ সাধ্য নয়। তাই ঋষিশিষ্য শার্ঙ্গরব রাজভবনে প্রবেশ ক'রে অগ্নিগৃহের দাবদাহ এবং শারদ্বত নগরের অশুচি বিষয়ী মানুষগুলিকে দেখে অন্তরে বেদনা অনুভব করে। এই রকম কয়েকটি আভাসচিত্র ও হংসপদিকার করুণ সংগীতটির সাহায্যে কবি আমাদেরকে এমন ভাবে প্রস্তুত ক'রে রাখলেন যাতে শকুন্তলার হঠাৎ প্রত্যাখ্যানে আমরা যেন বেশি আঘাত অনুভব না করি। (অনুচ্ছেদ ৪১)

এর পরে প্রত্যাখ্যানের বজ্রে বনহরিণী শকুন্তলা বিস্ময়ে বেদনায় করুণ। মনে হলো তপোবনের পুষ্পরাশির উপরে যেন অগ্নিবাণ নিক্ষিপ্ত হয়েছে। নাটকে এ পর্যন্ত তপোবনের যে সংগীতধ্বনি অন্তরে বাইরে শকুন্তলাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো, তা' যেন চিরকালের মত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। তাত কণ্ব, মাতা গৌতমী, প্রিয় সখীদ্বয় ও আশ্রম-পশুপক্ষীর সঙ্গে স্নেহের সম্পর্ক মুহূর্তের মধ্যে বিলুপ্তির পথে স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। (অনুচ্ছেদ ৪২)

যে শকুন্তলা আপন চিত্তের কোমলতায় সকলকে অধিকার ক'রে থাকতো, তার চতুর্দিকে বিরাজ করতে লাগলো এক সুগভীর শূন্যতা। কালিদাস সেই একাকিনী শকুন্তলাকে পুনরায় কণ্বের তপোবনে উপস্থিত না ক'রে অসামান্য কবি-কৌশলের পরিচয় দিয়েছেন। কারণ, পূর্বপরিচিত প্রকৃতির সঙ্গে আর দুঃখিনী শকুন্তলার মিলন সম্ভব ছিল না। সেখানে শকুন্তলাকে কণ্বাশ্রমে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেও পদে পদে অসামঞ্জস্য দেখা দিত। শকুন্তলা চুপ করে থাকলেও আশ্রমের তরুলতার ক্রন্দন, সখীদের বিলাপ ও পশুপাখির নির্বাক বেদনা আমাদের হৃদয়ের মধ্যে গুঞ্জরিত হয়ে উঠতো। এক্ষেত্রে ধ্যানগম্ভীর শকুন্তলার পক্ষে মারীচের স্তব্ধ ও নীরব আশ্রমটিই শ্রেয়। কবি এই ধ্যানমগ্ন দুঃখের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আপন তর্জনী সংকেতে পাঠকের সমস্ত প্রশ্ন ও সমগ্র বিশ্বকে বহুদূরে অপসারিত করেছেন। (অনুচ্ছেদ ৪৩)

দুষ্যন্ত তাপের আগুনে পাপমুক্ত হলেন। অনুতাপের তপস্যায় শকুন্তলাকে না পেলে দুষ্যন্তের গৌরব রক্ষিত হ'তো না। কারণ যা সহজে লাভ করা যায়, তার মধ্যে সম্পূর্ণকে পাওয়া যায় না, দুঃখের তপস্যাতেই তাকে প্রকৃতভাবে লাভ করা যায়। তাই কবি দুষ্যন্ত-শকুন্তলাকে কঠোর তপস্যার পথে চালিত করেছেন। দুষ্যন্ত যদি রাজসভায় প্রবেশ মাত্র শকুন্তলাকে গ্রহণ করতেন, তবে হংসপদিকার মতোই শকুন্তলাকে অনাদরের অন্ধকারে জীবন অতিবাহিত করতে হ'তো। (অনুচ্ছেদ ৪৪)

দুষ্যন্তের নিষ্ঠুর কঠোরতা আসলে শকুন্তলার সৌভাগ্যেরই অভিজ্ঞান। আপন নিষ্ঠুরতার অন্তর্দাহেই তিনি শকুন্তলাকে পূর্ণভাবে হৃদয়ের মধ্যে লাভ করলেন। এরূপ অভিজ্ঞতা তাঁর পূর্বে হয়নি, কারণ রাজার কাছে সব কিছু অনায়াসসাধ্য ছিল। কঠিন দুঃখের পথেই তাঁর প্রেমিকসত্তা জাগরিত হ'লো। (অনুচ্ছেদ ৪৫)

কালিদাস এইভাবে পাপকে আচ্ছাদিত না ক'রে দুঃখের আগুনে নিঃশেষ করেছেন। সমস্ত অকল্যাণ কল্যাণে রূপান্তরিত হয়ে নাটকটি পরিণতি লাভ করেছে। কারণ, বাইরের বিষবৃক্ষকে ভিতর থেকে নির্মূল না করলে তা' ধ্বংস হয় না। কালিদাস দুষ্যন্ত-শকুন্তলার প্রণয়কে দুঃখের তপস্যায় পূর্ণ করে তুলেছেন। এই জন্যই মহাকবি গ্যেটে শকুন্তলা নাটকটিকে তরুণ বৎসরের ফুল থেকে পরিণত বৎসরের ফলে পরিণতি এবং মর্ত ও স্বর্গের মিলনভূমি ব'লে বর্ণনা করেছেন। (অনুচ্ছেদ ৪৬)

টেম্পেস্ট নাটকে ফার্দিনন্দের প্রেমের গভীরতা পরীক্ষার জন্য প্রস্পেরো তাকে দিয়ে কাঠের বোঝা বহন করিয়েছেন। কিন্তু কালিদাস একেবারে ভিতর থেকে পাপের কালিমাকে উজ্জ্বল করে তুলেছেন। কালিদাস প্রতিপন্ন করেছেন যে, অপরাধের অভিঘাতেই শাশ্বত মঙ্গল প্রাণশক্তি লাভ করে।

(অনুচ্ছেদ ৪৭)

শকুন্তলাকে আমরা প্রথমে দেখেছি সৌন্দর্যের স্বর্গরাজ্যে। কিন্তু অকস্মাৎ পাপ এসে স্বর্গরাজ্যকে কীটদষ্ট পুষ্পের মতো রিক্ত নিঃস্ব করে তুলেছে। লজ্জা দুঃখ ও বিচ্ছেদে শকুন্তলার পতন ঘটেছে অনুতাপের মর্তভূমিতে। তাই শকুন্তলা নাটকটিকে একত্রে Paradise Lost ও Paradise Regained রূপে চিহ্নিত করা যায়। (অনুচ্ছেদ ৪৮)

প্রথম স্বর্গটি সুন্দর ও সম্পূর্ণ হলেও তা' পদ্মপত্রে শিশিরবিন্দুর মতো ক্ষণস্থায়ী। তাই পাপ সহজেই সেই পদ্মপত্রের বেড়া ভেঙ্গে ধ্বংসের বীজ অঙ্কুরিত করেছে। কিন্তু দ্বিতীয় স্বর্গটি সাধনার স্বর্গ। তীব্র অনুশোচনা ও কঠোর তপস্যার মধ্য দিয়ে সেই শাশ্বত কালের স্বর্গকে লাভ করতে হয়।
(অনুচ্ছেদ ৪৯)

এর সঙ্গে মানুষের জীবনকেও তুলনা করা যেতে পারে। শিশু তার শৈশব অবস্থায় যে স্বর্গে থাকে তা সুন্দর ও সম্পূর্ণ হলেও ক্ষুদ্র। মধ্যবয়সের দুঃসহ অভিজ্ঞতা ও মর্মজ্বালাই তার শৈশব স্বর্গভূমির বেড়া ভেঙ্গে পরিণত বয়সের শান্তিস্বর্গে পৌঁছে দেয়। পাপের অপরাধে স্বর্গচ্যুতি এবং অনুশোচনার মর্মজ্বালায় চিরন্তন স্বর্গপ্রাপ্তির কথাই শকুন্তলা কাব্যে বর্ণিত। (অনুচ্ছেদ ৫০)

বিশ্বপ্রকৃতির বাইরের সৌন্দর্যরূপ ও অন্তরের শক্তিরূপই 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে প্রতিভাত। এমনতরো সংযম ইউরোপীয় নাটকেও অনুপস্থিত। ইউরোপীয় কবি প্রবৃত্তির প্রবলতাকে অতিশয়োক্তির দ্বারাই অধিকমাত্রায় প্রকাশ করেন। শেক্‌সপীয়রের রোমিও-জুলিয়েট প্রভৃতি নাটকই তার উদাহরণ। তাই শকুন্তলার মতো প্রশান্তগম্ভীর ও সংযমপূর্ণ একখানি নাটকও শেক্‌সপীয়র লিখতে পারেন নি। কালিদাস দুষ্যন্ত-শকুন্তলার প্রেমালাপ পর্যন্ত আভাস-ইঙ্গিতে অল্পকথায় ব্যক্ত করেছেন। আবার, রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের পর দুষ্যন্তের শীতল মনোভাবের জন্য শকুন্তলা একটি কথাও প্রকাশ করেননি। শুধু দুর্বাসার প্রতি কর্তব্যে অবহেলা করার জন্য শকুন্তলার এই করুণ অবস্থা। কিন্তু নাটকটির আগাগোড়াই আশ্চর্য সংযম লক্ষ্য করা যায়। শকুন্তলাকে বিদায়কালে কণ্বমুনি ও প্রিয় সখীদ্বয়ের সকরুণ গাম্ভীর্য, প্রত্যাখ্যানের পর শকুন্তলার গভীর নীরবতা এবং দুষ্যন্তের উচ্ছৃঙ্খলতাকে দুর্বাসার শাপের আচ্ছাদনে আবৃত করে কবি কালিদাস নাটকটির সর্বত্রই সংযমের রাশকে ধরে রেখেছেন। কবি কখনই প্রবৃত্তির প্রবলতায় পদ্মবনের পঙ্ক আলোড়িত করার চেষ্টা করেননি। (অনুচ্ছেদ ৫১)

এমন ক্ষেত্রে ইউরোপীয় কবি অবিকলভাবে বাস্তব সত্যের নকল করতেন। কারণ, তাঁদের কাছে সাংসারিক সত্যের মূল্য অপরিসীম। কিন্তু কালিদাস বাস্তব সত্য অপেক্ষা কাব্যের সত্যকেই অধিক মূল্য দিয়েছেন। অথচ তিনি সাংসারিক পাপকে স্বীকার ক'রেও তাকে প্রচ্ছন্ন রেখে অনুতাপ ও তপস্যার দ্বারা শকুন্তলা নাটকটির এমন শিল্পসম্মত

রূপ দিয়েছেন যে তা শান্তি, সৌন্দর্য ও সংযমের আদর্শস্থল হয়েছে। কেবলমাত্র বাস্তব সত্যের অবিকল প্রতিলিপি কালিদাসের লেখনী দ্বারা কখনই সম্ভব ছিল না। (অনুচ্ছেদ ৫২)

তপোবনের নীরবতার সৌন্দর্যই কাব্যটিকে সবল ও সক্রিয় করেছে। নিশ্চুপ তপোবনের বহিঃপ্রকৃতি সর্বদাই শকুন্তলার চারদিকে এক স্নিগ্ধ মাধুর্যের আভা সৃষ্টি করে রেখেছে। শকুন্তলার যৌবনলীলায়, তার কল্যাণ-মূর্তিতে ও বিচ্ছেদকালীন ব্যাকুলতায় এই মাধুর্যরশ্মিরই বিকিরণ ঘটেছে। শকুন্তলা কাব্যে নীরব নিস্তব্ধতাই সবচেয়ে শিল্পসৌন্দর্যের পরিচায়ক। টেম্পেস্টে এরিয়েল যা দাসত্বের বন্ধনে করেছে, শকুন্তলায় প্রকৃতি তাই সম্পন্ন করেছে সৌন্দর্য ও প্রীতির বন্ধনে। (অনুচ্ছেদ ৫৩)

টেম্পেস্টে শক্তি, শকুন্তলায় শান্তি। টেম্পেস্টে শক্তির দ্বারা জয়ঘোষণা, শকুন্তলায় মঙ্গলের দ্বারা সিদ্ধি অর্জন। টেম্পেস্ট মধ্যপথে অসম্পূর্ণ, শকুন্তলায় পূর্ণতায় সমাপ্তি। টেম্পেস্টে মিরন্দা সরলতার প্রতিমূর্তি হলেও তার সরলতা অনভিজ্ঞতারই নামান্তর। কিন্তু শকুন্তলার সরলতা ধৈর্য ও ক্ষমায় চিরস্থায়ী। সুতরাং গ্যেটের মন্তব্যটিকে স্মরণ ক'রে আবার বলতে হয় যে, শকুন্তলায় তরুণ সৌন্দর্য যে পরিণতি লাভ করেছে তা' স্বর্গ ও মর্তকে একত্রে সম্মিলিত ক'রে তুলেছে। (অনুচ্ছেদ ৫৪)

সার-সংক্ষেপ :

'শকুন্তলা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে মহাকবি কালিদাস শুধু সৌন্দর্য-সম্ভোগের কবি নন, তিনি ভোগ-বিরতিরও কবি। যে প্রেম দেহকামনা থেকে জন্মলাভ করে তা' কখনও চিরস্থায়ী হ'তে পারে না। দৈহিক লালসাময় প্রেমকে যদি স্থায়িত্ব দিতে হয় তবে তার জন্য প্রয়োজন হয় সুকঠোর ত্যাগ ও তপস্যা। ত্যাগের মধ্য দিয়ে ভোগ করার যে আদর্শ প্রাচীন ভারতে বর্তমান ছিল, প্রাচীন ভারতীয় কবির কাব্যে-নাটকে সেই আদর্শই প্রতিফলিত। যে দুঃখ বরণ না করেই ভোগের লালসায় উন্মত্ত হয় তাকে দুঃখভোগ করতে হয় এবং সেই দুঃখের তিমির রাত্রি অতিক্রম করলে তবেই সুখের প্রভাত-সূর্য তার জীবনাকাশে উদিত হয়। মহর্ষি কণ্বের তপোবনে আশ্রমদুহিতা শকুন্তলা ও মৃগয়াবিহারী রাজা দুষ্মন্তের যে মিলন ঘটেছিলো, তার উদ্ভব কামনা থেকে, ভোগের লালসা থেকে। তাই,

প্রাচীন ভারতের মহাকবি কালিদাস দুষ্মন্ত-শকুন্তলার এই মিলনকে গৌরবের জয়টিকা না পরিয়ে দুঃখের আঘাতে জর্জরিত করেছেন। দুর্বাশার অভিশাপের প্রবর্তনা ঘটিয়ে কালিদাস দুষ্মন্ত-শকুন্তলার মোহ-বিজড়িত প্রেমকে স্বর্গীয় দ্যুতিতে মণ্ডিত করেছেন। অভিশাপের ফলে নায়ক-নায়িকার মধ্যে যে সুদীর্ঘ বিচ্ছেদ এসেছে তার পরিণামে শকুন্তলা-চরিত্রের পবিত্রতা বর্ধিত হয়েছে। যৌবনের প্রগল্ভতা দুঃখের আগুনে পুড়ে ধ্যানের গম্ভীরতায় পরিণত হয়েছে। শুধু শকুন্তলা নয়, দুষ্মন্ত-চরিত্রও দীর্ঘ অনুতাপের অশ্রুতে সিক্ত হয়ে অলৌকিক সুষমায় মণ্ডিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে হয়—'আভ্যন্তরিক কী উত্তাপে ও পেষণে অঙ্গার হীরক হইয়া উঠে, কালিদাস তাহা দেখাইয়াছেন'।

প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ কালিদাস-কৃত 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকটির মূল্যায়ণ করতে গিয়ে শেক্সপীয়রের 'টেম্পেস্ট' নাটকের সঙ্গে তুলনা করে পাশ্চাত্য মানস-প্রকৃতি ও ভারতীয় জীবনবোধের মূল ভেদরেখাটি নির্দেশ করেছেন। য়ুরোপীয় কবি গ্যেটের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' সম্পর্কিত প্রশস্তি-বাচক শ্লোকের অংশবিশেষকে সূত্র ধ'রে রবীন্দ্রনাথ একই সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় জীবনাদর্শ ও তদনুসারে নাটকটির সামগ্রিক পূর্ণত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। 'শকুন্তলা'র কাহিনীতে তিনি দেখিয়েছেন যে মেঘদূতম্-কাব্যে যেমন পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ, শকুন্তলায়ও তেমনি পূর্বমিলন ও উত্তরমিলন আছে। বাইবেলের গল্প নিয়ে যেমন য়ুরোপীয় কবি মিল্‌টনের প্যারাডাইস্ লষ্ট্ ও প্যারাডাইস্ রিগেইন্‌ড্, কালিদাসের শকুন্তলায়ও তেমনি অপাপবিদ্ধা শকুন্তলার স্বর্গীয় পবিত্রতার বিচ্যুতি ও পুণর্বার স্বর্গীয় সুষমা অর্জনের কাহিনী আছে। কালিদাস পাপকে হৃদয়ের ভিতর দিক থেকে আপনার আগুনে আপনি দগ্ধ করেছেন,—বাইরে থেকে তাকে ছাই-চাপা দিয়ে রাখেন নি। শুধু তাই নয়। তপোবনের বহিঃপ্রকৃতিও নাট্যকাহিনীতে সর্বদা সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। নিস্তব্ধ অথচ ব্যাপকভাবে তপোবন-প্রকৃতি কাজ করে চলেছে। গড়ে চলেছে নায়িকা শকুন্তলার চরিত্র।

তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল :

বিখ্যাত কাব্যনাটক Foust (ফাউস্ট)-এর রচয়িতা জার্মান কবি গ্যেটে (Goethe) সমগ্র ইউরোপ মহাদেশের শ্রেষ্ঠ কবির মর্যাদা পেয়েছিলেন।

তিনি একটিমাত্র শ্লোকে কালিদাসের শকুন্তলার মূল্যায়ণ ক'রে প্রশস্তি করেছিলেন ঃ—

"Wouldst thou the young year's blossoms
and fruits of its decline,
And all that by which the soul is charmed,
enraptured, feasted, fed,,
Wouldst thou the earth and heaven itself,
in one soul combined ?
I name thee, O Sakuntala !
and all atonce is said." (ইং অনুবাদ)

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'কেহ যদি তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল, কেহ যদি মর্ত ও স্বর্গ একত্র দেখিতে চায়, তবে শকুন্তলায় তাহা পাইবে।' রবীন্দ্রনাথের মতে য়ুরোপীয় কবিকুলগুরু গ্যেটের এই শ্লোকটি দীপশিখার মতই তার স্নিগ্ধ আলোয় সমগ্র শকুন্তলা-নাটকের পূর্ণ-পরিচয় ব্যক্ত করেছে। এই উক্তির তাৎপর্য খুব ব্যাপক। ফুল এবং ফল, মর্ত ও স্বর্গ একত্রে দেখা সাধারণভাবে সম্ভব নয়। ফুল পরিণত হয় ফলে, মর্তের অধোলোক ও স্বর্গের ঊর্দ্ধলোক একত্রিত হবার নয়। উভয়ের মধ্যে গভীর ভেদরেখা। সেই ভেদরেখা বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে কালিদাসের শিল্পকৌশলে, অত্যন্ত সহজে তিনি স্বর্গ ও মর্তের মিলিত রূপ সৃষ্টি করেছেন তাঁর 'শকুন্তলা' নাটকে। তিনি ফুলকে অত্যন্ত স্বভাবসম্মত উপায়ে ফলে পরিণত করেছেন। দুষ্যন্ত-শকুন্তলার তরুণ বয়সের প্রেমের ফুল বেদনাদিগ্ধ হয়ে মারীচের আশ্রমে নূতন মিলনের মধ্যে পরিণত-রসে সমৃদ্ধ হয়ে ফলে রূপান্তরিত হয়েছে। দুর্বাশার অভিশাপের প্রভাবে দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে—কণ্বের আশ্রমে প্রস্ফুটিত সেই প্রেমকুসুমকে—প্রত্যাখ্যান করেছে। বিচ্ছেদের বেদনায় দগ্ধ হয়ে উভয়েই দুঃখের তপস্যা সাঙ্গ করেছে। অবশেষে, মারীচের আশ্রমে তাপসী শকুন্তলার সঙ্গে স্বর্গ-প্রত্যাগত দুষ্যন্তের পুনর্মিলনে তরুণ বৎসরের প্রেমের ফুল পরিণত হয়েছে রসসমৃদ্ধ ফলে। এমনি করেই কবি কালিদাস মর্তের সীমাকে স্বর্গের সুষমায় মিশিয়ে দিয়েছেন, কোনও ব্যবধান কারুর দৃষ্টিগোচর হয়নি। গ্যেটে তাঁর শ্লোকটির মধ্য দিয়ে যে কথা বলতে চেয়েছেন তা' হচ্ছে—শকুন্তলার মধ্যে

একটি গভীর পরিণতির ভাব আছে, সে পরিণতি ফুল থেকে ফলে পরিণতি, মর্ত থেকে স্বর্গে পরিণতি। স্বভাব থেকে ধর্মে পরিণতি।

কালিদাস দুষ্যন্ত-শকুন্তলার মোহ-বিজড়িত প্রেমকে মর্তের কামনা-বাসনার কলুষ থেকে মুক্ত ক'রে স্বর্গীয় আলোকে সমুজ্জ্বল করেছেন। কণ্বের আশ্রমের ভীরু সরলা হরিণী শকুন্তলা মৃগয়াবিহারী দুষ্যন্তের পুষ্পশরে বিদ্ধা হয়ে যে মৃত্যুনীল কামনায় উত্তাল হয়েছিলো তার পরিণতি নাটকের পরবর্তী অংশে কালিদাস অতি নৈপুণ্যের সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। দুর্বাশার অভিশাপের আগুনে রাজা দুষ্যন্ত ও আশ্রমকন্যা শকুন্তলা একেবারে ভিতর থেকে দগ্ধ হয়ে পবিত্র হয়েছে। অনুতাপ ও তপস্যার মধ্য দিয়ে স্বর্গীয় মিলনের মাল্য রচিত হয়েছে উভয়ের জন্য। একই সঙ্গে মর্তের প্রেম মণ্ডিত হয়েছে স্বর্গের সুগন্ধে।

শকুন্তলার চরিত্র বিশ্লেষণ করলেও গ্যেটের উক্তির সার্থকতা অনুধাবন করা যায়। পুষ্কর তীর্থে ব্রহ্মা-প্রেরিতা অপ্সরা মেনকার ছলনায় ঋষি বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গের ফলে শকুন্তলার জন্ম। কামনার কলুষ থেকে জন্ম হলেও শকুন্তলা লালিতপালিত হয়েছে মহর্ষি কণ্বের তপোবনে, প্রকৃতি-রাজ্যের উদারতার প্রতিবেশে। তপোবন-প্রকৃতিতেও আশ্রম জীবনের স্বাভাবিক সংসার এবং তাপস জীবনের বৈরাগ্য ও সংযম একসঙ্গে বিরাজিত। স্বভাব ও তপস্যা, সৌন্দর্য ও সংযম একই সঙ্গে মিলেমিশে বিদ্যমান কণ্বের তপোবনে,—শকুন্তলা চরিত্রের অভ্যন্তরের তাই দুই বিপরীতের সহাবস্থান। ভোগ ও ত্যাগ সেখানে একাকার হয়ে আছে। তাই মহাকবি গ্যেটে বলেছেন—জীবনের সব বিস্ময়, সকল বেদনা, প্রগাঢ় আঘাত, সার্বিক পূর্ণতা, তারুণ্যের ফুল, প্রৌঢ়ত্বের ফল, মর্তের মাটি ও স্বর্গের সুষমা সবই একযোগে প্রকটিত হয় শকুন্তলার দিকে দৃষ্টিপাত করলে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে গ্যেটের এই প্রশস্তি-বাচক শ্লোকটি 'একটি দীপবর্তিকার শিখার ন্যায় ক্ষুদ্র, কিন্তু দীপশিখার মতোই সমগ্র'। সম্যক আনুপূর্বিক লোচন—'সমালোচনা' শব্দের এই অর্থ দিনে দিনে নানা ভাবে প্রসারিত হয়েছে। কোন কোন সমালোচক কাব্য-নাটক ইত্যাদির ঘটনা, চরিত্র ও আঙ্গিককে পৃথক ক'রে বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা করেন। অনেকে এই বিশ্লেষণাত্মক পুংখানুপুংখতার রীতি পরিহার ক'রে কাব্য-নাটকের সামগ্রিক সৌন্দর্যের পরিচয় আবিষ্কার করা সমালোচকের কর্তব্য ব'লে মনে

করেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও বিশ্বাস করতেন যে পূজার আবেগ-মিশ্রিত ব্যাখ্যার অপর নাম সমালোচনা। মহাকবি গ্যেটেও শকুন্তলার সামগ্রিক সৌন্দর্যের পরিচয় উদঘাটন করেছেন। গ্যেটের উক্তির আলোকে রবীন্দ্রনাথও তাই বলেছেন যে এই শ্লোকটি 'আনন্দের অত্যুক্তি' নয়, একে কবির উচ্ছ্বাসমাত্র মনে করে লঘুভাবে নেওয়া অসঙ্গত। যথার্থই শকুন্তলা তরুণ বৎসরের ফুল থেকে পরিণত বৎসরের ফলে রূপান্তরের নাট্যকথা, মর্ত ও স্বর্গের একত্র মিলন ভূমি।

টেম্পেস্ট ও শকুন্তলা ঃ

রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকের মূল্যায়ন-সূচক প্রবন্ধ 'শকুন্তলা'র সুরুতেই বলেছেন যে শেক্‌স্‌পীয়রের 'টেম্পেস্ট' নাটকের সঙ্গে কালিদাসের শকুন্তলার তুলনা মনে সহজেই উদয় হতে পারে। এই দুইটি নাটকের মধ্যে বাইরের দিক থেকে সাদৃশ্য আছে, কিন্তু অভ্যন্তরে আছে অনৈক্য। রবীন্দ্রনাথ এই দুই নাটকের বাহ্যসাদৃশ্যও আন্তরিক অনৈক্যকে আলোচনার যোগ্য বিষয় ব'লে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

টেম্পেস্ট-এর নায়িকা মিরান্দা এবং অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্-এর নায়িকা শকুন্তলা—উভয়েই প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে লালিতা-পালিতা। উভয় নাটকেরই ঘটনাস্থলেও সাদৃশ্য আছে। সমুদ্রবেষ্টিত নির্জন দ্বীপে টেম্পেস্ট-এর মূল ঘটনা অনুষ্ঠিত, মহর্ষি কণ্বের তপোবন-ছায়ায় অভিজ্ঞান শকুন্তলম্-এর আসল ঘটনার অনুষ্ঠান। মিরান্দার প্রণয় রাজকুমার ফার্দিনান্দের সঙ্গে, শকুন্তলার প্রণয় রাজা দুষ্যন্তের সঙ্গে। এইভাবে উভয় নাটকের আখ্যান মূলে ঐক্য সন্ধান করা যায়। শকুন্তলা ও মিরান্দা—উভয়েই সুন্দরী, শকুন্তলার পালকপিতা মহর্ষি কণ্ব জ্ঞানতপস্বী, মিরান্দার পিতা প্রস্পেরো নির্জন সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপে জ্ঞানের তপস্যায় রত। রাজা দুষ্যন্তকে দেখেই শকুন্তলা অন্তরে প্রণয় অনুভব করেছে, মিরান্দাও রাজপুত্র ফার্দিনান্দকে দেখেই আপন হৃদয় তাকে দান করেছে। শকুন্তলা ও মিরান্দা—উভয়েরই স্নিগ্ধব্যক্তিত্ব ও সহজ সরলতা সকলকে মুগ্ধ করে। বাহিরের এবম্বিধ সাদৃশ্য সত্ত্বেও নাটক দুইটি থেকে জাত কাব্য-রসের আস্বাদে ভিন্নতা আছে।

শকুন্তলা ও মিরান্দা-দু'জনেই নির্জনতায় লালিতা, তবু দু'জনের এই নির্জনতায় প্রভেদ আছে। শকুন্তলা মহর্ষি কণ্ব ছাড়াও সখি অনসূয়া-প্রিয়ংবদা

মাতা গৌতমী ও আশ্রমশিশুদের সাহচর্যে পরিবর্ধিতা, তপোবনে থেকেও মনুষ্যসাহচর্যে কিছু সমাজবোধ তার মধ্যে বিদ্যমান থাকায় সে সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে বেড়ে উঠেছে। কিন্তু পিতা প্রস্পেরো ও অর্ধপশু ক্যালিবান ছাড়া অন্য কারুর সান্নিধ্য মিরান্দা কখনও লাভ করেনি। স্বভাবের সহজস্পর্শ থেকে সে সম্পূর্ণ বঞ্চিতা। শকুন্তলা ও মিরান্দার সরলতার মধ্যে প্রভেদ আছে। তপোবনে যে গৃহধর্ম পালিত হয় শকুন্তলা তার সঙ্গে জড়িত থাকায়, বাহিরের সম্পর্কে শকুন্তলা অনভিজ্ঞা হলেও অজ্ঞ নয়; কিন্তু মিরান্দার সরলতা অজ্ঞতারই নামান্তর। মিরান্দার জীবনে বাস্তবের সংস্পর্শ কখনও ঘটেনি। কাজেই সরলতার অগ্নিপরীক্ষা মিরান্দাকে দিতে হয়নি। শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যানের বেদনায় আত্মশুদ্ধি করতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে মিরান্দাকে আমরা কেবল প্রথম অবস্থার মধ্যে দেখেছি। কিন্তু শকুন্তলাকে কালিদাস প্রথম থেকে পরিণতি পর্যন্ত দেখিয়েছেন। শকুন্তলায় পূর্ণতা আছে, মিরান্দায় অসম্পূর্ণতা।

মিরান্দা শকুন্তলার মত বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম নয়, সে বাইরের প্রকৃতিকে নিজের মধ্যে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করতে পারেনি। দ্বীপ থেকে বিদায় নেবার কালে মিরান্দার 'হৃদয়ের স্নেহ নাই, চক্ষে জল নাই'। মিরান্দাকে বহিঃপ্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে এনে দেখা চলে। কিন্তু শকুন্তলাকে তার কাব্যগত পরিবেষ্টন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলে না। শকুন্তলা তপোবনের অঙ্গীভূতা। আশ্রমের লতাপাতা, পশুপাখীর সঙ্গে তার আত্মার নিবিড় বন্ধন। তপোবন থেকে বিদায়ের কালে তার পদে পদে আকর্ষণ, পদে পদে বেদনা। মূল-প্রকৃতির সঙ্গে একটি মানবকন্যার এই বিচ্ছেদ বেদনার চিত্র পৃথিবীর সাহিত্যে দ্বিতীয়-রহিত।

শেক্‌স্‌পীয়রের টেম্পেস্ট নাটকে পিতা প্রস্পেরো তাঁর কন্যার প্রতি রাজকুমার ফার্দিনান্দের প্রেমের গভীরতা পরীক্ষা করার জন্য তাঁকে দিয়ে কাঠের বোঝা বহন করিয়েছেন। ফার্দিনান্দের এই ক্লেশ শুধু বাইরের। কিন্তু কালিদাস রাজা দুষ্মন্তকে অনুতাপের ক্লেশ দিয়ে ভেতর থেকে তাঁর চিত্তশুদ্ধি ঘটিয়েছেন। দুষ্মন্ত-শকুন্তলার কামনা বিজড়িত প্রেমকে তিনি অনুতাপ ও তপস্যার দ্বারা সমুজ্জ্বল ক'রে তুলেছেন।

টেম্পেস্ট নামেই নাটকের যথার্থ পরিচয়, সে ঝড়ের প্রতীক। টেম্পেস্টে ঝড়ের শক্তি, শকুন্তলায় তপস্যার শান্তি। টেম্পেস্টে শক্তির মাধ্যমে জয়,

শকুন্তলায় মঙ্গলের দ্বারা সিদ্ধি ; টেম্পেস্ট অর্ধপথে ছেদ, শকুন্তলায় সম্পূর্ণতায় অবসান। মিরান্দার সরল মাধুর্যের প্রতিষ্ঠা অজ্ঞতা-অনভিজ্ঞতার উপরে। শকুন্তলার সরলতা অপরাধে বিজড়িত, দুঃখে কীর্ণ, অভিজ্ঞতায়, ধৈর্যে, ক্ষমায় পরিপক্ক—তা' গম্ভীর ও স্থায়ী। টেম্পেস্ট-এ পীড়ন, শোষণ, দমন,—শকুন্তলায় প্রীতি, শান্তি, সদ্ভাব।

পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ—পূর্বমিলন ও উত্তর মিলন ঃ

শেক্স্পীয়রের মিরান্দা ও দেসদিমনার সঙ্গে শকুন্তলার তুলনা করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা-পদ্ধতির দ্বারা প্রভাবিত হ'লেও উত্তরকালে তিনি সে পথ থেকে সরে এসে নিজস্ব সমালোচন-তত্ত্ব সৃষ্টি করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র শকুন্তলার মূল্যায়ণ করতে গিয়ে বলেছিলেন যে শকুন্তলা অর্ধেক মিরান্দা, অর্ধেক দেসদিমনা। সেই সঙ্গে তিনি আরও বলেছিলেন যে 'পরিণীতা শকুন্তলা দেসদিমনার অনুরূপিনী, অ-পরিণীতা শকুন্তলা মিরান্দার অনুরূপিণী।' রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের মতানুবর্তী না হ'য়ে বলেছেন যে কালিদাসেরই 'মেঘদূতম্' কাব্যে যেমন পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ আছে—পূর্বমেঘে যেমন রামগিরি পর্বত থেকে অলকাপুরীর দ্বারদেশ পর্যন্ত মেঘের পর্যটন-পথের সৌন্দর্য-বর্ণনা এবং উত্তর মেঘে অলকা-পুরীর নিত্যসৌন্দর্যে উত্তরণ—'তেমনি শকুন্তলায় একটি পূর্বমিলন ও একটি উত্তরমিলন আছে।'

মহাকবি কালিদাস 'মেঘদূত' কাব্যে সৌন্দর্যের দুইটি পৃথক চিত্র সৃষ্টি করেছেন। প্রথমটি পূর্বমেঘ, দ্বিতীয়টি উত্তরমেঘ। মেঘদূত-কাব্যে কুবেরের অভিশাপে রামগিরি পর্বতে নির্বাসিত যক্ষ বিরহের তীব্র বেদনায় আষাঢ়ের প্রথম দিবসে পূর্বদিগন্তে উদিত মেঘমালাকে আহ্বান করেছিলেন অলকাপুরীতে গিয়ে তার বিরহিনী প্রিয়ার কাছে বার্তা পৌঁছে দেবার জন্য, বলবার জন্য যে আগামী শরৎ-পূর্ণিমায় তাদের বিচ্ছেদের অবসান হবে। পৃথিবীর নগ-নদী-নগরীর উপর দিয়ে ভেসে যেতে যেতে মেঘ নিম্নে পৃথিবীর যে বিচিত্র সৌন্দর্যকে প্রত্যক্ষ করবে তারই বর্ণনা পূর্বমেঘে। প্রাচীন ভারতের সেই রেবা-শিপ্রা-বেত্রবতীর ছবি, সেই অবন্তী, বিদিশা, উজ্জয়িনীর ছবি ফুটে উঠেছে মেঘদূত-কাব্যের পূর্বমেঘে। কিন্তু সে সৌন্দর্য ক্ষণস্থায়ী, তা'

চিরন্তন সৌন্দর্যের প্রতীক নয়। কণ্বের তপোবনে মৃগয়াবিহারী রাজা দুষ্যন্তের আবির্ভাব, আশ্রমদুহিতা শকুন্তলার সঙ্গে তার প্রণয়-মিলন, গান্ধর্ব-বিবাহ, শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার কালে আশ্রমের লতাপাতা, ফুলফল, ছাগ-মৃগর সঙ্গে তার একাত্মতা, অবশেষে রাজগৃহে রাজা দুষ্যন্তের শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যানের পূর্বপর্যন্ত শকুন্তলা নাটকের সেই পূর্বমেঘ। সেখানে ক্ষণিক সৌন্দর্য, সেখানে দেহজ প্রেম। মেঘদূত কাব্যে পূর্বমেঘের সেই ক্ষণস্থায়ী সৌন্দর্য অতিক্রম করে মেঘকে উত্তীর্ণ হতে হয়েছে অলকাপুরীর চিরস্থায়ী সৌন্দর্যলোকে, যেখানে পুনর্মিলন ও পূর্ণমিলনের সম্ভাবনা—'শকুন্তলা-নাটকেও তেমনি প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলার মারীচের আশ্রমে তাপদগ্ধ হৃদয়ে তাপসী রমণীতে রূপান্তরণ, ভরত-জননী রূপে দুষ্যন্তের সঙ্গে পুনর্মিলনের মধ্য দিয়ে চিরন্তন সৌন্দর্যের আভাষ ফুটে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ পূর্বমিলন ও উত্তর মিলন প্রসংগে যা বলেছেন তার নির্গলিতার্থ হচ্ছে মেঘদূত কাব্যের সৌন্দর্যচিত্রের দুইটি সুস্পষ্ট ভাগের মতই, শকুন্তলা-নাটকে দুইটি পৃথক মিলনচিত্র আছে—একটি মহর্ষি কণ্বের তপোবনে, অন্যটি মারীচের আশ্রমে। কণ্বের তপোবনে শকুন্তলা-দুষ্যন্তের প্রণয়ে মর্তের কামনা বিজড়িত; কিন্তু, মারীচের আশ্রমে তাদের যে পুনর্মিলন তা' তাদের প্রেমকে শাশ্বত ক'রে তুলেছে। কণ্বের তপোবনে নায়ক-নায়িকার ক্ষণস্থায়ী মিলনকে 'পূর্বমেঘ' এবং মারীচের আশ্রমে শাশ্বতমিলনকে 'উত্তরমেঘ' ব'লে রবীন্দ্রনাথ অভিহিত করেছেন।

শকুন্তলা একত্রে Paradise Lost এবং Paradise Regained :

রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের আলোচনা করতে গিয়ে যে অর্থে নাটকটিতে পূর্বমিলন ও উত্তরমিলন—দুইটি পৃথক মিলনচিত্র প্রত্যক্ষ করেছেন, সেই একই অর্থে নাটকটিকে Paradise Lost ও Paradise Regained বলেছেন। য়ুরোপের মহাকবি গ্যেটেও ঐ একই অর্থে 'শকুন্তলা'কে তরুণবৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল, স্বর্গ ও মর্ত—ইত্যাদি অভিধায় ভূষিত করেছেন।

নাটকটির শিল্পনৈপুণ্য ও সৌন্দর্য-রহস্যের মূল সন্ধান করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপীয় কবি মিল্টনের Paradise Lost ও Paradise

Regained-এর কথা স্মরণ করেছেন। তিনি বলেছেন 'শকুন্তলাকে একত্রে Paradise lost এবং Paradise Regained বলা যাইতে পারে'। তপোবনের শান্ত-সমাহিত পরিবেশে রাজা দুষ্মন্তের আবির্ভাবের ফলে যৌবনের প্রগল্‌ভ উচ্ছ্বাসে আশ্রমকন্যা শকুন্তলার স্বর্গচ্যুতি এবং প্রত্যাখ্যানের সুতীব্র আঘাতে গভীর মর্মজ্বালা ও দুঃখবরণের মধ্য দিয়ে পুনর্মিলনের স্বর্গে উত্তীর্ণ হওয়ার কাহিনী অভিজ্ঞান শকুন্তলম্‌-এ বর্ণিত হয়েছে বলেই রবীন্দ্রনাথ এই নাটকটিকে একত্রে Paradise Lost এবং Paradise Regained বলতে চেয়েছেন।

কবি মিল্‌টনের উল্লিখিত কাব্য দু'টিতে পৃথিবীর প্রথম মানব-মানবী আদম ও ইভের স্বর্গচ্যুতি ও স্বর্গে পুনর্বাসনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। বাইবেলের কাহিনী অবলম্বন করে ঈশ্বরের প্রতিপক্ষরূপে শয়তান ও বিল্‌জেবাবকে দাঁড় করিয়ে কবি মিল্‌টন এই দুইটি মহাকাব্য (Literary Epic) রচনা করেন। ঈশ্বরের আনুকূল্যে শান্ত সমাহিত জীবনযাপন করছিলো পৃথিবীর প্রথম মানব আদম ও প্রথমা রমনী ইভ। শয়তানের প্ররোচনায় জ্ঞানবৃক্ষের ফল প্রথমে ইভ ও পরে আদম আস্বাদন করায় তাদের মধ্যে জাগলো দেহচেতনা, বিধাতার অভিশাপে স্বর্গচ্যুত হ'লো তারা। এই তাদের Paradise Lost। তার পরে নানা দুঃখ-কষ্টের দিন যাপনান্তে আদম ও ইভের পুনর্বার স্বর্গরাজ্যে প্রত্যাবর্তনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে মিল্‌টনের Paradise Regained কাব্যগ্রন্থে। দেহ চৈতন্যের আবির্ভাবের আগে যে নির্মল আনন্দে আদম-ইভের দিন কাটছিলো স্বর্গোদ্যানে, সেই একই সরল আনন্দে কণ্বের তপোবনে সখীজন ও তরু-লতা-মৃগের সঙ্গে একাত্ম হয়ে নিষ্কলুষ জীবন কাটছিলো শকুন্তলার। জাগ্রত দেহ-চেতনায় শকুন্তলার প্রণয়-মিলন ঘটলো মৃগয়াবিহারী রাজা দুষ্মন্তের সঙ্গে। মিল্‌টনের আদম-ইভের মতই তপোবনের স্বর্গরাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হ'লো সে। রবীন্দ্রনাথ একেই বলেছেন Pardise Lost।

মারীচের আশ্রমে সুকঠিন তপশ্চর্যার শেষে অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণা হ'লো শকুন্তলা। অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় দর্শনের পর গভীর অনুতাপ ও তীব্র অন্তর্জ্বালায় দগ্ধপ্রাণ দুষ্মন্তেরও মোহমুক্তি ঘটলো। উভয়ের মিলনে যে নূতন স্বর্গ নেমে এলো তাদের জীবনে তাকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—Paradise Regained.

রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যে মিল্‌টনের কাব্যে বর্ণিত কাহিনীর চেয়ে, আমরা মনে করি, কাব্য দুইটির শিরোনামে ব্যবহৃত Pardise শব্দের আক্ষরিক অর্থেরই প্রাধান্য বেশি। মিল্‌টনের কাব্যে Paradise অর্থে দেবস্থান ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ

যেন সেই অর্থে Paradise-কে দেখেননি, দেখেছেন স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত প্রেমস্থলী রূপে। স্বর্গ আছে কণ্বের তপোবনে, স্বর্গ আছে মারীচের আশ্রমে।

॥ উৎসবের দিন ॥

প্রবন্ধের পটভূমি ঃ

১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর ক্যালকাটা গেজেটে বঙ্গদেশকে দ্বিখণ্ডিত করার সরকারি প্রস্তাব প্রকাশিত হয়। লর্ড কার্জন এদেশে গভর্ণর হ'য়ে আসার পর থেকেই ভারতীয়দের রাজনৈতিক প্রয়াস ও হিন্দু-মুসলমানের সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করার সংকল্পকে নানাভাবে প্রতিহত করার আয়োজনে প্রবৃত্ত হন। বাঙালী অসাধারণ শক্তিতে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতায় জেগে উঠলো। এরই মধ্যে লর্ড কার্জন যে 'য়ুনিভার্সিটি বিল' পাস করিয়ে নিলেন তাতে শিক্ষা আশাতীতরূপে ব্যয়সাধ্য হ'য়ে উঠলো। যে বিদ্যা চিরদিন ভারতবর্ষে বিতরিত হয়েছে তা' বিনামূল্যে। ধনীর চণ্ডীমণ্ডপের পাঠশালায় দরিদ্রের ছেলেরা বিনামূল্যেই বিদ্যালাভ করেছে, ধনীর গৃহের উৎসবে দরিদ্র প্রজা বিনা আহ্বানেই প্রবেশলাভ করেছে। এই নূতন বিল পাশ হওয়ার ফলে বিদ্যাশিক্ষা শুধু ব্যয়সাধ্য হ'লো না। তার একমাত্র লক্ষ্য হ'লো ইংরেজের দপ্তরে কাজ পাওয়ার বিদ্যা অর্জন করা। এরই ফলে তখনকার দিনে বা'ংলার মনীষীবর্গ বঙ্গে জাতীয় শিক্ষা প্রচারের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন।

বঙ্গভঙ্গ-কে ঘিরে রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে দেশের মানুষের মনে উগ্র জাতীয়বাদের জন্ম হয়, দেশের সর্বত্র ন্যাশনালিজ্‌মের প্রচার দানা বেঁধে ওঠে। এই ন্যাশন্যালিজ্‌ম্-কে রবীন্দ্রনাথ সোৎসাহে বরণ করতে পারেননি। জাতীয় স্বার্থতন্ত্রই যে মনুষ্যত্বের চরম লাভ—একথা তিনি মনে করেন না। রবীন্দ্রনাথের মন নিত্যধর্ম ও কল্যাণবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি মনুষ্যত্বকে জাতীয়ত্বের চেয়ে বড মনে করতেন, Humanism-কে Nationalism-এর উপরে স্থান দিতেন।

এই সময়ে সখারাম গণেশ দেউস্কর নামে বঙ্গদেশবাসী একজন মারাঠি বাঙ্‌লা ভাষায় 'দেশের কথা' নামে একখানি বইতে ইংরেজের অত্যাচার ও শঠতার চিত্র তুলে ধরলেন। গ্রন্থটির সমালোচনা-প্রসঙ্গে 'বঙ্গদর্শন'-পত্রিকায়

রবীন্দ্রনাথ একটি প্রসঙ্গ-কথা লিখলেন। অল্পদিনের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত প্রবন্ধ 'স্বদেশী সমাজ' লিখিত হ'লো। দেশে তরুণ সমাজে তখন প্রবল উত্তেজনা। শোনা যায়, রমেশচন্দ্র দত্তর সভাপতিত্বে যে সভায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধ পাঠ করেন সেই সভায় প্রবেশের জন্য জনতার ভিড় সামলাতে অশ্বারোহী পুলিশ এসেছিলো এবং পুলিশ-সার্জেন্টের সঙ্গে বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তর হাতাহাতি হয়েছিলো।

১৮৯৫ থেকেই বালগঙ্গাধর তিলক প্রবর্তিত শিবাজী-উৎসব মারাঠিদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। সেই সূত্রেই মারাঠি সখারাম গণেশ দেউস্কর বাঙ্‌লাভাষায় ১৯০৪-এ 'শিবাজীর দীক্ষা' নামে একটি পুস্তিকা লেখেন এবং তার ভূমিকা স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শিবাজী-উৎসব' কবিতা রচনা করেন। 'এক মহারাজ্য পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি'—শিবাজীর এই স্বপ্নের কথা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ফুটে ওঠায় তা' ক্রমে হিন্দুভারতের ধ্যানের বস্তু হয়ে ওঠে। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ মনুষ্যত্বকে জাতীয়ত্বের চেয়ে বড় স্থান দিতেন; সাম্প্রদায়িকতা কিংবা জাতীয়তার সীমায় তাঁর মন কোনদিনই আবদ্ধ থাকেনি। দিনে দিনে তাঁর মনে হ'লো যে শিবাজী সম্পর্কে গৌরববোধ হিন্দুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তাই শিবাজীর মত বীরকে অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার প্রতীক-পুরুষ ভাবা যায় না। ফলে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর কোনও কাব্যগ্রন্থে এই 'শিবাজী-উৎসব' কবিতাকে স্থান দেননি।

শিবাজী-উৎসবের জন্য কবিতা লিখেও তাঁর অন্তরে জেগে রইলো দ্বিধা। এমনতরো উৎসবের মধ্যে মনুষ্যত্বের বৃহত্তর যথার্থ মহিমা ধ্বনিত হয় না। তাঁর মনে হ'লো 'মানুষ যেদিন আপনার মনুষ্যত্বের শক্তি বিশেষভাবে স্মরণ করে সেই দিনই উৎসব পরিপূর্ণ হয়'। 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধ লিখবার পর থেকেই এই সব ভাবনা রবীন্দ্রনাথের মনকে ঘিরে রেখেছিলো। তাই, পরবর্তী মাঘোৎসবের (১৩১১ সাল) উদ্বোধনে যে লিখিত ভাষণ তিনি পাঠ করলেন তা' মূলতঃ ধর্মবিষয়ক হ'লেও তার মধ্যে সমসাময়িক সমস্যার পরোক্ষ ছায়া এসে পড়লো। এই ভাষণটিই ১৯০৪-এ 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত, হ'লো শিরোনাম 'উৎসবের দিন'। পরে 'ধর্ম' গ্রন্থে এটি সন্নিবেশিত হয়। মানুষকে যথাযথ-ভাবে দেখার ও ধনী-নির্ধন, অভিজাত-অনভিজাত সর্বশ্রেণীর মধ্যে মনুষ্যত্বের মর্যাদা ও শক্তিবোধ জাগ্রত করা যে অবশ্য প্রয়োজন তা' তখন রবীন্দ্রনাথ নানা-ভাবে ব্যক্ত করছেন।

বিষয়বস্তু ঃ

সকালবেলায় অন্ধকার ভেদ ক'রে আলো ফুটে উঠলেই বনে উপবনে পাখিদের উৎসব পড়ে যায়। প্রভাতী আলোর স্পর্শে পাখিরা নূতন ক'রে নিজেদের প্রাণবান গতিমান পক্ষীজন্ম সম্পূর্ণ উপলব্ধি ক'রে যে আনন্দ পায় তা' গানের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করে। শুধু পাখিদের নয়, জগতের যেখানে অব্যাহত শক্তির প্রচুর প্রকাশ সেখানেই মূর্তিমান উৎসব। হেমন্তের পাকা শস্যের ক্ষেত্রে সোনালী আলোর স্পর্শে তাই উৎসবের ছোঁয়া, আমের মঞ্জুরীর নিবিড় গন্ধ আর পুষ্পবিতানের বিচিত্র বিকাশে বসন্তের দিনে তাই উৎসবের হিল্লোল।

এতো গেল প্রকৃতি-জীবনের উৎসব। মানুষের উৎসব কবে? মানুষ যেদিন নিজের মনুষ্যত্বের শক্তিকে বিশেষভাবে স্মরণ করে, বিশেষভাবে উপলব্ধি করে সেইদিন মানুষের উৎসব। যখন মানুষ তার প্রাত্যহিক কর্মে লিপ্ত থাকে, সাংসারিক সুখ দুঃখে জড়িত থাকে, প্রকৃতির হাতের খেলনার মত মানুষ যখন নিজেকে অসহায় ও ক্ষুদ্ররূপে অনুভব করে তখন মানুষের উৎসব নয়। তখন মানুষ তার নিজের মধ্যে সর্বজয়ী মানবশক্তিতে উপলব্ধি করে না। প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় মানুষ ক্ষুদ্র, দীন, একাকী। উৎসবের দিনে মানুষ বৃহৎ। সেদিন সব মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মানুষ বৃহৎ, সেদিন সমস্ত মনুষ্যত্বের শক্তি অনুভব করে মানুষ মহৎ।

নিজের সমস্ত প্রয়োজনকে অতিক্রম ক'রে মানুষ যখন ঊর্ধ্বে গিয়ে দাঁড়ায় তখনই সে মহৎ। জ্ঞানপিপাসু মানুষ প্রতিদিনের প্রয়োজনকে অতিক্রম ক'রে জ্ঞানের দুর্লক্ষ্য দুর্গমতার দিকে ধাবিত হয়, প্রেমিক প্রেমের জন্য আপনাকে পরিপূর্ণভাবে বিসর্জন দেয়, কর্মী কর্মের দ্বারা ভয়হীন চিত্তে অসাধ্যসাধনে এগিয়ে যায়—মানুষ তার অপরিমেয় শক্তিকে প্রকাশ করে তার জ্ঞানে, তার প্রেমে, তার কর্মে। মানুষ তার এই শক্তির গৌরব স্মরণ করেই একযোগে উৎসবে মিলিত হ'তে পারে।

নিজের প্রয়োজন সাধনের সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকলেও মানুষ জগতের সমস্ত জীবের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারতো কিন্তু তা'তে স্বাধীন আনন্দের স্বাদ উৎসারিত হ'তো না। যখনই মানুষ প্রয়োজন সাধনের সীমাকে অতিক্রম করে তখনই আনন্দের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে সে উৎসবের আঙিনায় এসে দাঁড়ায়। মানুষের কর্ম যেখানে নিজেকে, নিজের সন্তান-সন্ততিকে এবং

নিজের গোষ্ঠিকে অতিক্রম করে সেখানেই মনুষ্যত্বের পূর্ণশক্তির পরিচয় প্রকট হয়, সেখানেই মানুষের গৌরব।

বুদ্ধদেব বলেছিলেন—মা যেমন নিজের প্রাণ দিয়েও সন্তানকে রক্ষা করেন তেমনি ক'রে বিশ্বের সব প্রাণীর প্রতি দয়াভাব পোষণ করা দরকার। মেঘ যেমন প্রতিদানের প্রত্যাশা না রেখে ভূ-পৃষ্ঠে জলদান করে তেমনি সর্বজনের প্রতি করুণা বর্ষণ করা প্রয়োজন। সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশূন্য হিংসাশূন্য, শত্রুতাশূন্য মন নিয়ে দয়া প্রদর্শন করাতেই মানুষের মনুষ্যত্ব। বুদ্ধদেবের এই জীবনসত্য, এই আবশ্যকের অতীত প্রীতিভাব চিরকালের মনুষ্যত্বের ভাণ্ডারে মহাশক্তির মত সঞ্চিত হয়ে আছে। এর জন্য আমরা মনুষ্যমহিমার গৌরব করতে পারি।

সম্রাট অশোক একদিন রাজার রাজকীয় ঐশ্বর্য ত্যাগ ক'রে আপন প্রয়োজনের অতীত মঙ্গলসাধনের কাজে নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন। তৃপ্তিহীন ভোগকে বিসর্জন দিয়ে শ্রান্তিহীন সেবার ব্রতে জড়িত হয়েছিলেন। মঙ্গলশক্তির এই অপর্যাপ্ত প্রাচুর্য সম্রাট অশোকের মনুষ্যত্বকে সমুজ্জ্বল করেছে। মানুষ তাই, সম্রাট অশোকের জন্য গৌরব করতে পারে, আমাদের উৎসাহকে উজ্জীবিত ক'রে উৎসবের সূচনা করতে পারে।

মানুষ যেদিন বৃহৎ মনুষ্যত্বের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বৃহৎ সম্মিলনের মধ্যে আপনার শক্তিকে উপলব্ধি করে, শক্তি সংগ্রহ করে, সেদিনই মানুষের উৎসব। সেই উৎসবের দিন যেন মানুষের মধ্যে আবির্ভূত হয়—এই প্রার্থনা রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরের কাছে করেছেন।

ব্রহ্মবিহার :

'উৎসবের দিন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ মানুষের উৎসব কবে কিভাবে যথার্থ উদ্‌যাপিত হ'তে পারে তার সন্ধান করতে গিয়ে তথাগত বুদ্ধের 'ব্রহ্মবিহার' সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে মানুষ যখন আপনার পূর্ণশক্তিকে উপলব্ধি করে তখনই তার উৎসবের মুহূর্ত আসে। এই পূর্ণশক্তির উপলব্ধি কি ভাবে সম্ভব। ভালবাসা মানুষের অন্যতম প্রধান প্রবৃত্তি, ভালবাসা তার অন্তরের অন্যতম সৎগুণ। কিন্তু সে ভালবাসা যতক্ষণ সংকীর্ণ সীমায় নিবদ্ধ ততক্ষণ ভালবাসার পূর্ণশক্তি প্রকাশ পায় না।

আপন সন্তানকে ভালবাসা কিংবা আপনজন, আপন সমাজ, আপন গোষ্ঠির জন্য মানুষের যে ভালবাসা তা' সংকীর্ণ, তার মধ্য দিয়ে ভালবাসার পূর্ণশক্তি প্রকটিত হয় না। মানুষের ভালবাসা যখন এই সব আপনজন, আপন দেশ কাল অতিক্রম ক'রে বিশ্বজনের জন্য উৎসারিত হয় তখনই মানুষ তার ভালবাসার শক্তিকে যথার্থ পূর্ণরূপে অনুভব করতে পারে। এরই নাম করুণার ধর্ম, বিশ্বমানবের কাছে বুদ্ধদেব এই ধর্মই প্রচার করেছেন। বুদ্ধদেবের করুণা সন্তান-বাৎসল্য নয়, দেশানুরাগও নয়, তা' জলভরা মেঘের মত নিজের প্রভূত প্রাচুর্যে আপনাকে নিঃশেষে বর্ষণ ক'রে দেয় সর্বলোকের উপরে। জীবনের সবদিকে সর্বক্ষণ অন্তরের এই প্রীতি, করুণা ও মৈত্রীভাব প্রসারিত ক'রে দেওয়াকেই 'ব্রহ্মবিহার' বলা হয়। সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-পরিজন, স্বজাতি-স্বসমাজ, দেশ ও কালের মধ্যে আপন অন্তরের ভালবাসাকে সীমাবদ্ধ রেখে নয়। জগতের সকলের প্রতি, সবকিছুর জন্য সীমাহীন ভালবাসা ও হিংসাশূন্য, দ্বেষশূন্য মন নিয়ে অপরিমেয় দয়াভাব অন্তরে পোষণ করা 'ব্রহ্মবিহার'-এর লক্ষণ। এই ব্রহ্মবিহার যে আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় বাস্তব সত্য তা' বুদ্ধদেব নিজের জীবনে প্রমাণ করেছিলেন। মনুষ্যত্বের এই মহান্ শক্তি তিনি প্রকট করেছিলেন বলেই তিনি মনুষ্যজাতির গৌরব। এই ভালবাসার অসীম শক্তি মানুষ যখন তার নিজের মধ্যে উপলব্ধি করতে পারবে তখনই তার উৎসব।

সংক্ষিপ্তসার :

মানুষের উৎসব কবে? যথার্থ উৎসব মানুষের সেইদিন যেদিন সে আপনার পূর্ণশক্তিকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারে। জীবজগতের মধ্যে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব তার প্রেমে, তার করুণায়, তার দয়ায় ও তার মৈত্রী ভাবে। আপনার অন্তরের এই প্রেম, দয়া, মৈত্রী ও করুণাকে মানুষ যখন সর্বজনের মধ্যে অকাতরে বিলিয়ে দিয়ে অন্তরে প্রসন্নতা লাভ করে এবং মনে করে যে তা'তেই তার মনুষ্যজন্ম সার্থক হ'লো তখনই তার যথার্থ উৎসব। এইভাবে মানুষ যেদিন নিজের মনুষ্যত্বের শক্তিকে বিশেষ ভাবে স্মরণ করে, বিশেষভাবে উপলব্ধি করে সেইদিন মানুষের উৎসব। প্রতিদিনের জীবন-যাত্রায় মানুষ ক্ষুদ্র, দীন, একাকী,—উৎসবের দিনে মানুষ বৃহৎ, সেদিন

আপন বৃহতত্ত্বকে উপলব্ধি ক'রে সে মহৎ। প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম ক'রে মানুষ যখন তার জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের মধ্য দিয়ে অপরিমেয় শক্তিকে প্রকাশ করে তখনই তার জীবনে জাগে উৎসবের আবেশ। সর্ববিধ সংকীর্ণতার উর্দ্ধে উঠে সাম্প্রদায়িকতা, জাতীয়তা, গোষ্ঠিবদ্ধতা ভুলে সর্ব-মানবের জন্য অন্তরে ভালবাসা, করুণা ও মৈত্রীভাব মানুষ যখন অনুভব করে তখনই তার উৎসব সার্থক হয়। মানুষ যেদিন বিশ্বমানবতার ডাকে সাড়া দিয়ে বৃহৎ সম্মিলনের মধ্যে আপনার অপরিমেয় শক্তিকে উপলব্ধি করে, শক্তি সংগ্রহ করে, সেদিনই মানুষের উৎসব।

স্টাইল বা গঠনভঙ্গী :

রচনা দুইজাতের, একটি শাঁসালো রচনা, অপরটি রসালো রচনা। ইংরেজীতে প্রথমটিকে বলা হয় থিসিস, দ্বিতীয়টিকে বলা হয় ফেসিস। রবীন্দ্রনাথ থিসিসের শাঁস ও ফেসিসের রস একসঙ্গে মিশিয়ে প্রবন্ধ রচনায় তাঁর নিজস্ব ভঙ্গী সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি মূলতঃ কবি, তাঁর কবিমন সব রকমের রচনাতেই কাজ করে চলেছে। যুক্তি-বুদ্ধির প্রকৃষ্ট বন্ধন দ্বারা কোনও বিশেষ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েও তিনি কবিস্বভাবকে কখনও পরিত্যাগ করতে পারেননি। তাঁর প্রথম জীবনের রচনা 'শিক্ষার হেরফের'-এ রসের স্পর্শ সামান্য থাকলেও শাঁসেরই প্রাধান্য। 'শকুন্তলা'য় শাঁস ও রস সমানুপাতিক হারে বিদ্যমান। কিন্তু 'উৎসবের দিন'কে শাঁস ও রসের তুলাদণ্ডে চাপিয়ে বিচার করা যাবে না, তার মধ্যে এক স্বতন্ত্র সৌরভ আছে। গভীর সমুদ্রের উপর দিয়ে দক্ষিণ বায়ু প্রবাহিত হয়ে এলে যেমন বিচিত্র তরঙ্গলীলা দেখা দেয়, তেমনি কবি হৃদয়ের গভীরতা বিশ্বমানবতার বায়ুস্পর্শে বিচিত্র হিল্লোলের সৃষ্টি করেছে। সেখানে যুক্তি-তর্ক, রস-শাঁস-কোনও কিছুর বন্ধন নেই, প্রত্যাশা নেই, অথচ সব জড়িয়ে আছে এক আবেগের কম্পন।

'উৎসবের দিন' আসলে প্রবন্ধ রূপে রচিত নয়, সভাকক্ষে ভাষণরূপে তা' প্রবন্ধিত। 'শিক্ষার হেরফের'ও ভাষণরূপেই লিপিবদ্ধ হয়েছিলো। কিন্তু, তবু সেখানে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ক্রটি নির্দেশের অভিপ্রায় থাকায় যুক্তি পরম্পরার দিকে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। 'উৎসবের দিন'-এ সে.

অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়নি। ধর্মসভায় ভাষণের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে বিশেষ একটি বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করা। 'ধৃ' ধাতু থেকে 'ধর্ম' শব্দ নিষ্পন্ন। যা ধারণ করে জীবনপথে চলা যায় তারই নাম ধর্ম। বিশ্বাসকে অপরের মনে সঞ্চারিত করার প্রকৃষ্টতম উপাদান হচ্ছে আবেগ। তাই, আবেগরূপ বিহঙ্গের পক্ষ-বিধূনন সমগ্র 'উৎসবের দিন' প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে শোনা যায়।

আপন আবেগকে অপরের অন্তরে সঞ্চারিত করে দেওয়ার ভিন্ন ভিন্ন পথ আছে। কবি যখন তাঁর আবেগকে পাঠকের মনে সঞ্চারিত করেন তখন তাঁর কবিতার লিখ্যরূপের সঙ্গে যুক্ত হয় শ্রুতি-মাধুরী, যা ছন্দ-অলঙ্কারের সহযোগে সাধিত হয়। প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ ও কবি রবীন্দ্রনাথ মিলিত মূর্তিতে ভাস্বর হয়ে ওঠেন বক্তা রবীন্দ্রনাথ রূপে তাঁর 'উৎসবের দিন'-এ। জনমণ্ডলীর সম্মুখে যখন তিনি বলেন—'যে কঠোরতায়, যে উদ্যমে, যে আত্মবিসর্জনে আমাদের সার্থকতা, তাহার মধ্যে আজ আমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করো। দূর করো সমস্ত আবরণ আচ্ছাদন। সমস্ত ক্ষুদ্র দম্ভ, সমস্ত মিথ্যা কোলাহল, সমস্ত অপবিত্র আয়োজন—মনুষ্যত্বের অভ্রভেদি-চূড়াবিশিষ্ট নিরাভরণ নিস্তব্ধ রাজনিকেতনের দ্বারের সম্মুখে অদ্য আমাকে দাঁড় করাইয়া দাও তখন মনে হয় একটা আবেগের আবেশ শ্রোতৃমণ্ডলীর অন্তরে সঞ্চারিত হয়ে যায়। শ্রুতিমাধুরীই এই জাতীয় রচনার প্রধান গুণ, অনুধাবনযোগ্যতার চেয়ে শ্রবণযোগ্যতাই এমনতরো ভাষণমূলক রচনাকে পরিণামে সুখপাঠ্য ক'রে তোলে। এই ভঙ্গি রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব, প্রবন্ধ-রচনায় এ'টি রাবীন্দ্রিক স্টাইল বলা যেতে পারে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রীকান্ত (১ম পর্ব)

শ্রীকান্ত

এক

আমার এই 'ভবঘুরে' জীবনের অপরাহ্ণবেলায় দাঁড়াইয়া ইহারই একটা অধ্যায় বলিতে বসিয়া আজ কত কথাই না মনে পড়িতেছে!

ছেলেবেলা হইতে এমনি করিয়াই ত বুড়া হইলাম। আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলের মুখে শুধু একটা একটানা 'ছি-ছি' শুনিয়া শুনিয়া নিজেও নিজের জীবনটাকে একটা মস্ত 'ছি-ছি-ছি' ছাড়া আর কিছুই ভাবিতে পারি নাই। কিন্তু কি করিয়া যে জীবনের প্রভাতেই এই সুদীর্ঘ 'ছি-ছি'র ভূমিকা চিহ্নিত হইয়া গিয়াছিল, বহুকালান্তরে আজ সেই সব স্মৃত ও বিস্মৃত কাহিনীর মালা গাঁথিতে বসিয়া যেন হঠাৎ সন্দেহ হইতেছে, এই 'ছি-ছি'-টা যত বড় করিয়া সবাই দেখাইয়াছে, হয়ত ঠিক তত বড়ই ছিল না। মনে হইতেছে, হয়ত ভগবান যাহাকে তাঁহার বিচিত্র সৃষ্টির ঠিক মাঝখানটিতে টান দেন, তাহাকে ভাল ছেলে হইয়া একজামিন পাশ করিবার সুবিধাও দেন নাই; গাড়ি-পাল্কি চড়িয়া বহু লোক-লস্কর সমভিব্যাহারে ভ্রমণ করিয়া, তাহাকে 'কাহিনী' নাম দিয়া ছাপাইবার অভিরুচিও দেন না। বুদ্ধি হয়ত তাহাকে কিছু দেন, কিন্তু বিষয়ী লোকেরা তাহাকে সুবুদ্ধি বলে না। তাই প্রবৃত্তি তাহাদের এমনই অসঙ্গত, খাপছাড়া—এবং দেখিবার বস্তু ও তৃষ্ণাটা স্বভাবতঃই এতই বেয়াড়া হইয়া উঠে যে, তাহার বর্ণনা করিতে গেলে সুধী ব্যক্তিরা বোধ করি হাসিয়াই খুন হইবেন। তারপরে সেই মন্দ ছেলেটি যে কেমন করিয়া অনাদরে অবহেলায় মন্দের আকর্ষণে মন্দ হইয়া, ধাক্কা খাইয়া, ঠোক্কর খাইয়া, অজ্ঞাতসারে অবশেষে একদিন অপযশের ঝুলি কাঁধে ফেলিয়া কোথায় সরিয়া পড়ে—সুদীর্ঘ দিন আর তাহার কোন উদ্দেশই পাওয়া যায় না।

অতএব এ-সকলও থাক। যাহা বলিতে বসিয়াছি, তাহাই বলি। কিন্তু বলিলেই ত বলা হয় না, ভ্রমণ করা এক, তাহা প্রকাশ করা আর। যাহার পা-দুটা আছে, সেই ভ্রমণ করিতে পারে; কিন্তু হাত-দুটা থাকিলেই ত আর লেখা যায় না। সে যে ভারি শক্ত। তা ছাড়া মস্ত মুস্কিল হইয়াছে

আমার এই যে, ভগবান আমার মধ্যে কল্পনা-কবিত্বের বাষ্পটুকুও দেন নাই। এই দুটো পোড়া চোখ দিয়া আমি যা কিছু দেখি, ঠিক তাহাই দেখি। গাছকে ঠিক গাছই দেখি—পাহাড়-পর্বতকে পাহাড়-পর্বতই দেখি। জলের দিকে চাহিয়া জলকে জল ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। আকাশে মেঘের পানে চোখ তুলিয়া রাখিয়া, ঘাড়ে ব্যথা করিয়া ফেলিয়াছি, কিন্তু যে মেঘ সেই মেঘ! কাহারো নিবিড় এলোকেশের রাশি চুলোয় যাক—একগাছি চুলের সন্ধানও কোনদিন তাহার মধ্যে খুঁজিয়া পাই নাই। চাঁদের পানে চাহিয়া চাহিয়া চোখ ঠিক্‌রাইয়া গিয়াছে, কিন্তু কাহারো মুখটুখ ত কখনো নজরে পড়ে নাই। এমন করিয়া ভগবান যাহাকে বিড়ম্বিত করিয়াছেন, তাহার দ্বারা কবিত্ব সৃষ্টি করা ত চলে না। চলে শুধু সত্য কথা সোজা করিয়া বলা। অতএব আমি তাহাই করিব।

কিন্তু, কি করিয়া 'ভবঘুরে' হইয়া পড়িলাম, সে-কথা বলিতে গেলে, প্রভাত-জীবনে এ নেশায় কে মাতাইয়া দিয়াছিল, তাহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তাহার নাম ইন্দ্রনাথ। আমাদের প্রথম আলাপ একটা 'ফুটবল ম্যাচে'। আজ সে বাঁচিয়া আছে কিনা জানি না। কারণ বহু বৎসর পূর্বে একদিন অতি প্রত্যুষে ঘরবাড়ি, বিষয়-আশয়, আত্মীয়-স্বজন সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সেই যে একবস্ত্রে সে সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, আর কখনও ফিরিয়া আসিল না। উঃ—সে দিনটা কি মনেই পড়ে!

ইস্কুলের মাঠে বাঙ্গালী ও মুসলমান ছাত্রদের 'ফুটবল ম্যাচ'। সন্ধ্যা হয়-হয়। মগ্ন হইয়া দেখিতেছি। আনন্দের সীমা নাই। হঠাৎ—ওরে বাবা—এ কি রে! চটাপট্ চটাপট্ শব্দ এবং 'মারো শালাকে, ধরো শালাকে।' কি একরকম যেন বিহ্বল হইয়া গেলাম। মিনিট দুই-তিন। ইতিমধ্যে কে যে কোথায় অন্তর্ধান হইয়া গেল, ঠাহর পাইলাম না। ঠাহর পাইলাম ভাল করিয়া তখন, যখন পিঠের উপর একটা আস্ত ছাতির বাঁট পটাশ্ করিয়া ভাঙ্গিল এবং আরো গোটা-দুই তিন মাথার উপর, পিঠের উপর উদ্যত দেখিলাম। পাঁচ-সাতজন মুসলমান-ছোকরা তখন আমার চারিদিকে ব্যূহ রচনা করিয়াছে—পালাইবার এতটুকু পথ নাই।

আরও একটা ছাতির বাঁট—আরও একটা। ঠিক সেই মুহূর্তে যে মানুষটি বাহির হইতে বিদ্যুদ্‌গতিতে ব্যূহভেদ করিয়া আমাকে আগলাইয়া দাঁড়াইল—সেই ইন্দ্রনাথ।

ছেলেটি কালো। তাহার বাঁশির মত নাক, প্রশস্ত সুডৌল কপাল, মুখে দুই-চারিটা বসন্তের দাগ। মাথায় আমার মতই, কিন্তু বয়সে কিছু বড়। কহিল, ভয় কি! ঠিক আমার পিছনে পিছনে বেরিয়ে এস।

ছেলেটির বুকের ভিতর সাহস এবং করুণা যাহা ছিল, তাহা সুদুর্লভ হইলেও অসাধারণ হয়ত নয়। কিন্তু তাহার হাত দু'খানি যে সত্যই অসাধারণ তাহাতে লেশমাত্র সন্দেহ নাই। শুধু জোরের জন্য বলিতেছি না। সে দু'টি দৈর্ঘ্যে তাহার হাঁটুর নীচে পর্যন্ত পড়িত। ইহার পরম সুবিধা এই যে,যে ব্যক্তি জানিত না, তাহার কস্মিন্‌কালেও এ আশঙ্কা মনে উদয় হইতে পারে না যে, বিবাদের সময় ঐ খাটো মানুষটি অকস্মাৎ হাত-তিনেক লম্বা একটা হাত বাহির করিয়া তাহার নাকের উপর এই আন্দাজের মুষ্ট্যাঘাত করিবে। সে কি মুষ্টি! বাঘের থাবা বলিলেই হয়।

মিনিট-দুয়ের মধ্যে তাহার পিঠ ঘেঁষিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িলাম। ইন্দ্র বিনা-আড়ম্বরে কহিল, 'পালা'।

ছুটিতে শুরু করিয়া কহিলাম, 'তুমি' ?

সে রুক্ষভাবে জবাব দিল, 'তুই পালা না--গাধা কোথাকার!'

গাধাই হই আর যাই হই ; আমার বেশ মনে পড়ে, আমি হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলাম,—'না'।

ছেলেবেলায় মারপিট কে না করিয়াছে ? কিন্তু পাড়াগাঁয়ের ছেলে আমরা —মাস দুই-তিন পূর্বে লেখাপড়ার জন্য শহরে পিসিমার বাড়ি আসিয়াছি— ইতিপূর্বে এভাবে দল বাঁধিয়া মারামারিও করি নাই, এমন আস্ত দু'টা ছাতির বাঁট পিঠের উপরও কোনদিন ভাঙ্গে নাই। তথাপি একা পালাইতে পারিলাম না। ইন্দ্র একবার আমার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, 'না—তবে কি ? দাঁড়িয়ে মার খাবি নাকি ?—ঐ, ওই দিক্ থেকে ওরা আসছে—আচ্ছা, তবে খুব ক'ষে দৌড়ো—

এ কাজটা বরাবরই খুব পারি। বড় রাস্তার উপরে আসিয়া যখন পৌঁছানো গেল, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। দোকানে দোকানে আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে এবং পথের উপর মিউনিসিপ্যালিটির কেরোসিন ল্যাম্প লোহার থামের উপর এখানে একটা, আর ওই ওখানে একটা জ্বালা হইয়াছে। চোখের জোর থাকিলে, একটার কাছে দাঁড়াইয়া আর একটা দেখা যায় না তা নয়। আততায়ীর শঙ্কা আর নাই। ইন্দ্র অতি সহজ স্বাভাবিক গলায় কথা

কহিল। আমার গলা শুকাইয়া গিয়াছিল ; কিন্তু আশ্চর্য, সে একটুকু হাঁপায় নাই। এতক্ষণ যেন কিছুই হয় নাই—মারে নাই, মার খায় নাই, ছুটিয়া আসে নাই—না, কিছুই নয় ; এমনিভাবে জিজ্ঞাসা করিল, তোর নাম কি রে ?

"শ্রী—কা—ন্ত—"

'শ্রীকান্ত ? আচ্ছা।' বলিয়া সে তাহার জামার পকেট হইতে একমুঠা শুক্‌না পাতা বাহির করিয়া কতকটা নিজের মুখে পুরিয়া দিয়া, কতকটা আমার হাতে দিয়া বলিল, ব্যাটাদের খুব ঠুকেছি—চিবো।

কি এ ?

সিদ্ধি।

আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কহিলাম, সিদ্ধি ? এ আমি খাইনে।

সে ততোধিক বিস্মিত হইয়া কহিল, খাস্‌নে! কোথাকার গাধা রে ? বেশ নেশা হবে—চিবো। চিবিয়ে গিলে ফ্যাল্।

নেশা জিনিসটার মাধুর্য তখন ত আর জানি নাই! তাই ঘাড় নাড়িয়া ফিরাইয়া দিলাম। সে তাহাও নিজের মুখে দিয়া চিবাইয়া গিলিয়া ফেলিল।

আচ্ছা, তা হলে সিগ্‌রেট খা। বলিয়া আর একটা পকেট হইতে গোটা-দুই সিগারেট ও দেশলাই বাহির করিয়া, একটি আমার হাতে দিয়া অপরটা নিজে ধরাইয়া ফেলিল। তারপরে তাহার দুই করতল বিচিত্র উপায়ে জড়ো করিয়া সেই সিগারেটটাকে কলিকার মত করিয়া টানিতে লাগিল। বাপ্‌রে সে কি টান! একটানে সিগারেটের আগুন মাথা হইতে তলায় নামিয়া আসিল। চারদিকে লোক—আমি অত্যন্ত ভয় পাইয়া গেলাম। সভয়ে প্রশ্ন করিলাম, চুরুট খাওয়া কেউ যদি দেখে ফ্যালে।

ফেললেই বা! সবাই জানে। বলিয়া স্বচ্ছন্দে সে টানিতে টানিতে রাস্তার মোড় ফিরিয়া, আমার মনের উপর একটা প্রগাঢ় ছাপ মারিয়া দিয়া আর একদিকে চলিয়া গেল।

আজ আমার সেই দিনের অনেক কথাই মনে পড়িতেছে। শুধু এইটি স্মরণ করিতে পারিতেছি না—ঐ অদ্ভুত ছেলেটিকে সেদিন ভালবাসিয়াছিলাম, কিংবা, তাহার প্রকাশ্যে সিদ্ধি ও ধূমপান করার জন্য তাহাকে মনে মনে ঘৃণা করিয়াছিলাম।

* * * *

তারপরে মাস-খানেক গত হইয়াছে। সেদিনের রাত্রিটা যেমন গরম

তেমনি অন্ধকার। কোথাও গাছের একটা পাতা পর্যন্ত নড়ে না। ছাদের উপর সবাই শুইয়া ছিলাম। বারোটা বাজে, তথাপি কাহারো চক্ষে নিদ্রা নাই। হঠাৎ কি মধুর বংশীস্বর কানে আসিয়া লাগিল। সহজ রামপ্রসাদী সুর। কত ত শুনিয়াছি, কিন্তু বাঁশিতে যে এমন মুগ্ধ করিয়া দিতে পারে, তাহা জানিতাম না। বাড়ির পূর্ব-দক্ষিণ কোণে একটা প্রকাণ্ড আম-কাঁঠালের বাগান। ভাগের বাগান, অতএব কেহ খোঁজ-খবর লইত না। সমস্ত নিবিড় জঙ্গলে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। শুধু গরু-বাছুরের যাতায়াতে সেই বনের মধ্য দিয়া সরু একটি পথ পড়িয়াছিল। মনে হইল, যেন সেই বনপথেই বাঁশির সুর ক্রমশঃ নিকটবর্তী হইয়া আসিতেছে। পিসিমা উঠিয়া বসিয়া তাঁহার বড় ছেলেকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিলেন, হাঁ রে নবীন, বাঁশি বাজায় কে, রায়েদের ইন্দ্র নাকি? বুঝিলাম ইঁহারা সকলেই ওই বংশীধারীকে চেনেন। বড়দা বলিলেন, সে হতভাগা ছাড়া এমন বাঁশিই বা বাজাবে কে, আর ঐ বনের মধ্যেই বা ঢুকবে কে!

বলিস্ কি রে? ও কি গোঁসাইবাগানের ভেতর দিয়ে আসছে নাকি?

বড়দা বলিলেন, হুঁ।

পিসিমা এই ভয়ঙ্কর অন্ধকারে ওই অদূরবর্তী গভীর জঙ্গলটা স্মরণ করিয়া মনে মনে বোধ করি শিহরিয়া উঠিলেন। ভীতকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, আচ্ছা, ওর মা কি বারণ করে না? গোঁসাইবাগানে কত লোক যে সাপে-কামড়ে মরেচে, তার সংখ্যা নেই—আচ্ছা, ও জঙ্গলে এত রাত্তিরে ছোঁড়াটা কেন?

বড়দা একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, আর কেন! ও-পাড়া থেকে এ-পাড়ায় আসার এই সোজা পথ। যার ভয় নেই, প্রাণের মায়া নেই, সে কেন বড় রাস্তা ঘুরতে যাবে মা? ওর শিগ্‌গির আসা নিয়ে দরকার। তা সে-পথে নদী-নালাই থাক্ আর সাপ-খোপ বাঘ-ভালুকই থাক্।

ধন্যি ছেলে!—বলিয়া পিসিমা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিলেন। বাঁশির সুর ক্রমশঃ সুস্পষ্ট হইয়া আবার ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হইয়া দূরে মিলাইয়া গেল।

এই সেই ইন্দ্রনাথ। সেদিন ভাবিয়াছিলাম, যদি অতখানি জোর এবং এমন করিয়া মারামারি করিতে পারিতাম! আর আজ রাত্রে যতক্ষণ না

ঘুমাইয়া পড়িলাম, ততক্ষণ কেবলই কামনা করিতে লাগিলাম—যদি অমনি করিয়া বাঁশি বাজাইতে পারিতাম।

কিন্তু কেমন করিয়া ভাব করি! সে যে আমার অনেক উচ্চে। তখন ইস্কুলেও সে আর পড়ে না। শুনিয়াছিলাম, হেডমাষ্টার মহাশয় অবিচার করিয়া তাহার মাথায় গাধার টুপি দিবার আয়োজন করিতেই সে মর্মাহত হইয়া অকস্মাৎ হেডমাষ্টারের পিঠের উপর কি একটা করিয়া ঘৃণাভরে ইস্কুলের রেলিঙ ডিঙাইয়া বাড়ি চলিয়া আসিয়াছিল, আর যায় নাই। অনেকদিন পরে তাহার মুখেই শুনিয়াছিলাম, সে অপরাধ অতি অকিঞ্চিৎ। হিন্দুস্থানী পণ্ডিতজীর ক্লাসের মধ্যেই নিদ্রাকর্ষণ হইত। এমনি একসময়ে সে তাঁহার গ্রন্থিবদ্ধ শিখাটি কাঁচি দিয়া কাটিয়া ছোট করিয়া দিয়াছিল মাত্র। বিশেষ কিছু অনিষ্ট হয় নাই। কারণ, পণ্ডিতজী বাড়ি গিয়া তাঁহার নিজের শিখাটি নিজের চাপকানের পকেটেই ফিরিয়া পাইয়াছিলেন—খোয়া যায় নাই। তথাপি কেন যে পণ্ডিতের রাগ পড়ে নাই, এবং হেডমাষ্টারের কাছে নালিশ করিয়াছিলেন—সে-কথা আজ পর্যন্ত ইন্দ্র বুঝিতে পারে না। সেটা পারে নাই; কিন্তু এটা সে ঠিক বুঝিয়াছিল যে ইস্কুল হইতে রেলিং ডিঙাইয়া বাড়ি আসিবার পথ প্রস্তুত করিয়া লইলে, তথায় ফিরিয়া যাইবার পথ গেটের ভিতর দিয়া আর প্রায়ই খোলা থাকে না! কিন্তু খোলা ছিল, কি ছিল না, এ দেখিবার সখও তাহার আদৌ ছিল না। এমন কি, মাথার উপর দশ-বিশ জন অভিভাবক থাকা সত্ত্বেও কেহ কোনমতেই আর তাহার মুখ বিদ্যালয়ের অভিমুখে ফিরাইতে সক্ষম হইল না। ইন্দ্র কলম ফেলিয়া দিয়া নৌকার দাঁড় হাতে তুলিল। তখন হইতে সে সারাদিন গঙ্গায় নৌকার উপর। তাহার নিজের একখানা ছোট ডিঙি ছিল; জল নাই, ঝড় নাই, দিন নাই, রাত নাই—একা তাহারই পা। হঠাৎ হয়ত একদিন সে পশ্চিমের গঙ্গার একটানা স্রোতে পানসি ভাসাইয়া দিয়া, হাল ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, দশ-পনের দিন আর তাহার কোন উদ্দেশই পাওয়া গেল না। এম্‌নি একদিন উদ্দেশ্যবিহীন ভাসিয়া যাওয়ার মুখেই তাহার সহিত আমার একান্ত-বাঞ্ছিত মিলনের গ্রন্থি সুদৃঢ় হইবার অবকাশ ঘটিয়াছিল। তাই এত কথা আমার বলা।

কিন্তু যাহারা আমাকে জানে, তাহারা বলিবে, তোমার ত এ সাজে নাই বাপু। গরীবের ছেলে লেখাপড়া শিখিতে গ্রাম ছাড়িয়া পরের বাড়িতে

আসিয়াছিলে। তাহার সহিত তুমি মিশিলেই বা কেন, এবং মিশিবার জন্য এত ব্যাকুল হইলেই বা কেন? তা না হইলে ত আজ তোমার—

থাক্ থাক্, আর বলিয়া কাজ নাই। সহস্র লোক এ-কথা আমাকে লক্ষ বার বলিয়াছে, নিজেকে নিজে আমি এ প্রশ্ন কোটিবার করিয়াছি। কিন্তু সব মিছে। কেন যে—এ জবাব তোমরাও দিতে পারিবে না; এবং না হইলে আজ আমি কি হইতে পারিতাম, সে প্রশ্ন সমাধান করিতেও কেহ তোমরা পারিবে না। যিনি সব জানেন, তিনিই শুধু বলিয়া দিতে পারেন —কেন এত লোক ছাড়িয়া সেই একটা হতভাগার প্রতিই আমার সমস্ত মন-প্রাণটা পড়িয়া থাকিত এবং কেন সেই মন্দের সঙ্গে মিলিবার জন্যই আমার দেহের প্রতি কণাটি পর্যন্ত উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল।

* * * *

সে দিনটা আমার খুব মনে পড়ে। সারাদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত হইয়াও শেষ হয় নাই। শ্রাবণের সমস্ত আকাশটা ঘনমেঘে সমাচ্ছন্ন হইয়া আছে, এবং সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই চারিদিক গাঢ় অন্ধকারে ছাইয়া গিয়াছে। সকাল সকাল খাইয়া লইয়া আমরা কয়-ভাই নিত্যপ্রথামত বাহিরের বৈঠকখানায় ঢালা-বিছানার উপর রেড়ির তেলের সেজ জ্বালাইয়া বই খুলিয়া বসিয়া গিয়াছি। বাহিরের বারান্দায় একদিকে পিসেমশায় ক্যাম্বিসের খাটের উপর শুইয়া তাঁহার সান্ধ্য-তন্দ্রাটুকু উপভোগ করিতেছেন এবং অন্যদিকে বসিয়া বৃদ্ধ রামকমল ভট্‌চায আফিং খাইয়া অন্ধকারে চোখ বুজিয়া, থেলো হুঁকায় ধূমপান করিতেছেন। দেউড়িতে হিন্দুস্থানী পেয়াদাদের তুলসীদাসী সুর শুনা যাইতেছে, এবং ভিতরে আমরা তিনভাই মেজদার কঠোর তত্ত্বাবধানে নিঃশব্দে বিদ্যাভ্যাস করিতেছি। ছোড়দা, যতীনদা ও আমি তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি এবং গম্ভীর-প্রকৃতি মেজদা বার দুই এণ্ট্রান্স ফেল করিবার পর গভীর মনোযোগের সহিত তৃতীয়বারের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। তাঁহার প্রচণ্ড শাসনে একমুহূর্ত কাহারো সময় নষ্ট করিবার জো ছিল না। আমাদের পড়ার সময় ছিল সাড়ে সাতটা হইতে নয়টা। এই সময়টুকুর মধ্যে কথাবার্তা কহিয়া মেজদার 'পাশে'র পড়ার বিঘ্ন না করি, এই জন্য তিনি নিজে প্রত্যহ পড়িতে বসিয়াই কাঁচি দিয়া কাগজ কাটিয়া বিশ-ত্রিশখানি টিকিটের মত করিতেন। তাহার কোনটাতে লেখা থাকিত 'বাইরে', কোনটাতে

'থুথুফেলা', কোনটাতে 'নাকঝাড়া' কোনটাতে 'তেষ্টা পাওয়া' ইত্যাদি। যতীনদা একটা 'নাকঝাড়া' টিকিট লইয়া মেজদার সুমুখে ধরিয়া দিলেন। মেজদা তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া লিখিয়া দিলেন—'হুঁ—আটটা তেত্রিশ মিনিট হইতে আটটা সাড়ে চৌত্রিশ মিনিট পর্যন্ত', অর্থাৎ এই সময়টুকুর জন্য সে নাক ঝাড়িতে যাইতে পারে। ছুটি পাইয়া যতীনদা টিকিট-হাতে উঠিয়া যাইতেই ছোড়দা 'থুথুফেলা' টিকিট পেশ করিলেন। মেজদা 'না' লিখিয়া দিলেন। কাজেই ছোড়দা মুখভারী করিয়া মিনিট-দুই বসিয়া থাকিয়া 'তেষ্টা পাওয়া' আর্জি দাখিল করিয়া দিলেন। এবার মঞ্জুর হইল। মেজদা সই করিয়া লিখিলেন—'হুঁ—আটটা একচল্লিশ মিনিট হইতে আটটা সাতচল্লিশ মিনিট পর্যন্ত'। পরওয়ানা লইয়া ছোড়দা হাসিমুখে বাহির হইতেই যতীনদা ফিরিয়া আসিয়া হাতের টিকিট দাখিল করিলেন। মেজদা ঘড়ি দেখিয়া সময় মিলাইয়া, একটা খাতা বাহির করিয়া সেই টিকিট গঁদ দিয়া আঁটিয়া রাখিলেন। সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম তাঁহার হাতের কাছেই মজুত থাকিত। সপ্তাহ পরে এই সব টিকিটের সময় ধরিয়া কৈফিয়ৎ তলব করা হইত।

এইরূপে মেজদার অত্যন্ত সতর্কতায় এবং সুশৃঙ্খলায় আমাদের এবং তাঁহার নিজের কাহারও এতটুকু সময় নষ্ট হইতে পাইত না। প্রত্যহ এই দেড় ঘণ্টাকাল অতিশয় বিদ্যাভ্যাস করিয়া রাত্রি নয়টার সময় আমরা যখন বাড়ির ভিতরে শুইতে আসিতাম, তখন মা-সরস্বতী নিশ্চয় ঘরের চৌকাঠ পর্যন্ত আমাদিগকে আগাইয়া দিয়া যাইতেন; এবং পরদিন ইস্কুলে ক্লাসের মধ্যে যে সকল সম্মান সৌভাগ্য লাভ করিয়া ঘরে ফিরিতাম, সে ত আপনারা বুঝিতেই পারিতেছেন। কিন্তু মেজদার দুর্ভাগ্য তাঁহার নির্বোধ পরীক্ষকগুলো তাহাকে কোনদিন চিনিতেই পারিল না। নিজের এবং পরের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি এরূপ প্রবল অনুরাগ, সময়ের মূল্য সম্বন্ধে এমন সূক্ষ্ম দায়িত্ববোধ থাকা সত্ত্বেও, তাঁহাকে বারংবার ফেল করিয়াই দিতে লাগিল। ইহাই অদৃষ্টের অন্ধ বিচার! যাক্ —এখন আর সে দুঃখ জানাইয়া কি হইবে।

সে-রাত্রেও ঘরের বাহিরে ঐ জমাট অন্ধকার এবং বারান্দায় তন্দ্রাভিভূত সেই দুটো বুড়ো। ভিতরে মৃদু দীপালোকের সম্মুখে গভীর-অধ্যয়নরত আমরা চারিটি প্রাণী।

ছোড়দা ফিরিয়া আসায় তৃষ্ণায় আমার একেবারে বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। কাজেই টিকিট পেশ করিয়া উন্মুখ হইয়া রহিলাম। মেজদা তাঁহার

সেই টিকিট আঁটা খাতার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন—তৃষ্ণা-পাওয়াটা আমার আইনসঙ্গত কি না, অর্থাৎ কাল-পরশু কি পরিমাণে জল খাইয়াছিলাম।

অকস্মাৎ আমার ঠিক পিঠের কাছে একটা 'হুম' শব্দ, এবং সঙ্গে সঙ্গে ছোড়দা ও যতীনদার সমবেত আর্ত-কণ্ঠের গগনভেদী রৈ-রৈ চীৎকার—ওরে বাবা রে, খেয়ে ফেলল রে! কিসে ইহাদিগকে খাইয়া ফেলিল, আমি ঘাড় ফিরাইয়া দেখিবার পূর্বেই, মেজদা মুখ তুলিয়া একটা বিকট শব্দ করিয়া বিদ্যুদ্‌বেগে তাহার দুই পা সম্মুখে ছড়াইয়া দিয়া সেজ উল্টাইয়া দিলেন। তখন সেই অন্ধকারের মধ্যে যেন দক্ষযজ্ঞ বাধিয়া গেল। মেজদা'র ছিল ফিটের ব্যামো। তিনি সেই যে 'আঁ-আঁ' করিয়া প্রদীপ উল্টাইয়া চিৎ হইয়া পড়িলেন, আর খাড়া হইলেন না।

ঠেলাঠেলি করিয়া বাহির হইতেই দেখি, পিসেমশাই তাঁর দুই ছেলেকে বগলে চাপিয়া ধরিয়া, তাহাদের অপেক্ষাও তেজে চেঁচাইয়া বাড়ি ফাটাইয়া ফেলিতেছেন। এ যেন তিন বাপ-বেটার কে কতখানি হাঁ করিতে পারে, তারই লড়াই চলিতেছে।

এই সুযোগে একটা চোর নাকি ছুটিয়া পলাইতেছিল, দেউড়ির সিপাহীরা তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে। পিসেমশাই প্রচণ্ড চীৎকারে হুকুম দিতেছেন—আউর মারো—শালাকো মার ডালো—ইত্যাদি।

মুহূর্তকাল মধ্যে আলোয়, চাকর-বাকরে ও পাশের লোকজনে উঠান পরিপূর্ণ হইয়া গেল। দরওয়ানরা চোরকে মারিতে মারিতে আধ মরা করিয়া টানিয়া আলোর সম্মুখে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল। তখন চোরের মুখ দেখিয়া বাড়িসুদ্ধ লোকের মুখ শুকাইয়া গেল!—আরে, এ যে ভট্‌চায্যিমশাই!

তখন কেহ বা জল, কেহ বা পাখার বাতাস, কেহ বা তাহার চোখে-মুখে হাত বুলাইয়া দেয়। ওদিকে ঘরের ভিতর মেজদাকে লইয়া সেই ব্যাপার!

পাখার বাতাস ও জলের ঝাপটা খাইয়া রামকমল প্রকৃতিস্থ হইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সবাই প্রশ্ন করিতে লাগিল আপনি, অমন করে ছুটছিলেন কেন?

ভট্‌চায্যিমশাই কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, বাবা, বাঘ নয়, সে একটা মস্ত ভালুক—লাফ মেরে বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে এলো।

ছোড়দা ও যতীনদা বারংবার কহিতে লাগিলেন, ভালুক নয় বাবা, একটা নেকড়ে বাঘ। হুম্ করে ল্যাজ গুটিয়ে পাপোশের উপর বসেছিল।

মেজদার চৈতন্য হইলে, তিনি নিমীলিত চক্ষে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সংক্ষেপে কহিলেন, 'দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার'।

কিন্তু কোথা সে ? মেজদার 'দি রয়েল বেঙ্গল'ই হোক, আর রামকমলের 'মস্ত ভালুক'ই হোক, সে আসিলই বা কিরূপে, গেলই বা কোথায় ? এতগুলো লোক যখন দেখিয়াছে. তখন সে একটা কিছু বটেই !

তখন কেহ বা বিশ্বাস করিল, কেহ বা করিল না। কিন্তু সবাই লণ্ঠন লইয়া ভয়চকিত নেত্রে চারিদিকে খুঁজিতে লাগিল।

অকস্মাৎ পালোয়ান কিশোরী সিং 'উহ্ বয়ঠা' বলিয়া একলাফে একেবারে বারান্দার উপর। তারপর সেও এক ঠেলাঠেলি কাণ্ড। এতগুলো লোক, সবাই একসঙ্গে বারান্দায় উঠিতে চায়, কাহারো মুহূর্ত বিলম্ব সয় না। উঠানের একপ্রান্তে একটা ডালিম গাছ ছিল, দেখা গেল, তাহারই ঝোপের মধ্যে বসিয়া একটা বৃহৎ জানোয়ার। বাঘের মতই বটে। চক্ষের পলকে বারান্দা খালি হইয়া বৈঠকখানা ভরিয়া গেল—জনপ্রাণী আর সেখানে নাই। সেই ঘরের ভিড়ের মধ্য হইতে পিসেমশায়ের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর আসিতে লাগিল—সড়কি লাও—বন্দুক লাও। আমাদের পাশের বাড়ির গগনবাবুদের একটা মুঙ্গেরী গাদা বন্দুক ছিল ; লক্ষ্য অস্ত্রটার উপর। 'লাও' ত বটে, কিন্তু আনে কে ? ডালিম-গাছটা যে দরজার কাছেই ; এবং তাহারই মধ্যে যে বাঘ বসিয়া ! হিন্দুস্থানীরা সাড়া দেয় না। তামাশা দেখিতে যাহারা বাড়ি ঢুকিয়াছিল, তাহারাও নিস্তব্ধ।

এমন বিপদের সময় হঠাৎ কোথা হইতে ইন্দ্র আসিয়া উপস্থিত। সে বোধ করি সুমুখের রাস্তা দিয়া চলিয়াছিল, হাঙ্গামা শুনিয়া বাড়ি ঢুকিয়াছে। নিমেষে শত-কণ্ঠ চীৎকার করিয়া উঠিল—ওরে বাঘ ! বাঘ ! পালিয়ে আয় রে ছোঁড়া, পালিয়ে আয় !

প্রথমটা সে থতমত খাইয়া ছুটিয়া আসিয়া ভিতরে ঢুকিল। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই ব্যাপারটা শুনিয়া লইয়া, একা নির্ভয়ে উঠানে নামিয়া গিয়া লণ্ঠন তুলিয়া বাঘ দেখিতে লাগিল।

দোতলার জানালা হইতে মেয়েরা রুদ্ধনিশ্বাসে এই ডাকাত ছেলেটির পানে চাহিয়া দুর্গানাম জপিতে লাগিল। পিসিমা ত ভয়ে কাঁদিয়াই ফেলিলেন ! নীচে ভিড়ের মধ্যে গাদাগাদি দাঁড়াইয়া হিন্দুস্থানী সিপাহীরা তাহাকে সাহস

দিতে লাগিল এবং-একএকটা অস্ত্র পাইলেই নামিয়া আসে, এমন আভাসও দিল।

বেশ করিয়া দেখিয়া ইন্দ্র কহিল, দ্বারিকবাবু, এ বাঘ নয় বোধ হয়। তাহার কথাটা শেষ হইতে-না-হইতেই সেই রয়েল বেঙ্গল টাইগার দুই থাবা জোড় করিয়া মানুষের গলায় কাঁদিয়া উঠিল। পরিষ্কার বাঙ্গলা করিয়া কহিল, না বাবুমশাই, না। আমি বাঘ-ভালুক নই—ছিনাথ বহুরূপী।

ইন্দ্র হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ভট্‌চায্যিমশাই খড়ম হাতে সর্বাগ্রে ছুটিয়া আসিলেন—হারামজাদা! তুমি ভয় দেখাবার জায়গা পাও না?

পিসেমশাই মহাক্রোধে হুকুম দিলেন, শালাকো কান পাকাড়কে লাও!

কিশোরী সিং তাহাকে সর্বাগ্রে দেখিয়াছিল, সুতরাং তাহারই দাবি সর্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া সে-ই গিয়া তাহার কান ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া আনিল। ভট্‌চায্যিমশাই তাহার পিঠের উপর খড়মের এক ঘা বসাইয়া দিয়া রাগের মাথায় হিন্দী বলিতে লাগিলেন, এই হারামজাদা বজ্জাতকে বাস্তে আমার গতর চূর্ণ হো গিয়া। খোট্টা শালার ব্যাটারা আমাকে যেন কিলায়কে কাঁঠাল পাকায় দিয়া—

ছিনাথের বাড়ি বারাসতে। সে প্রতি বৎসর এই সময়টায় একবার করিয়া রোজগার করিতে আসে। কালও এ-বাড়িতে সে নারদ সাজিয়া গান শুনাইয়া গিয়াছিল।

সে একবার ভট্‌চায্যিমশায়ের, একবার পিসেমশায়ের পায়ে পড়িতে লাগিল। কহিল, ছেলেরা অমন করিয়া ভয় পাইয়া প্রদীপ উল্টাইয়া মহামারী কাণ্ড বাধাইয়া তোলায়, সে নিজেও ভয় পাইয়া গাছের আড়ালে গিয়া লুকাইয়াছিল। ভাবিয়াছিল, একটু ঠাণ্ডা হইলেই বাহির হইয়া তাহার সাজ দেখাইয়া যাইবে। কিন্তু ব্যাপার উত্তরোত্তর এমন হইয়া উঠিল যে, তাহার আর সাহসে কুলাইল না।

ছিনাথ কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিল; কিন্তু পিসেমশায়ের আর রাগ পড়ে না। পিসিমা নিজে উপর হইতে কহিলেন, তোমাদের ভাগ্যি ভাল যে, সত্যিকারের বাঘ-ভালুক বা'র হয়নি। যে বীরপুরুষ তোমরা, আর তোমার দরওয়ানরা। ছেড়ে দাও বেচারীকে, আর দূর ক'রে দাও দেউড়ির ঐ খোট্টা-গুলোকে। একটা ছোট ছেলের যা সাহস, একবাড়ি লোকের তা' নেই।

পিসেমশাই কোন কথাই শুনিলেন না বরং পিসিমার এই অভিযোগে চোখ

পাকাইয়া এমন একটা ভাব ধারণ করিলেন যে, ইচ্ছা করিলেই তিনি এই সকল কথার যথেষ্ট সদুত্তর দিতে পারেন, কিন্তু স্ত্রীলোকের কথার উত্তর দিতে যাওয়াই পুরুষমানুষের পক্ষে অপমানকর ; তাই আরও গরম হইয়া হুকুম দিলেন, উহার ল্যাজ কাটিয়া দাও। তখন, তাহার সেই রঙিন-কাপড়-জড়ানো সুদীর্ঘ খড়ের লেজ কাটিয়া দেওয়া হইল।

পিসিমা উপর হইতে রাগ করিয়া বলিলেন, রেখে দাও ; তোমার ওটা অনেক কাজে লাগবে।

ইন্দ্র আমার দিকে চাহিয়া কহিল, তুই বুঝি এই বাড়িতে থাকিস শ্রীকান্ত ?

আমি কহিলাম, হ্যাঁ। তুমি এত রাত্তিরে কোথায় যাচ্চ ?

ইন্দ্র হাসিয়া কহিল, রাত্তির কোথায় রে, এই ত সন্ধ্যা! আমি যাচ্ছি আমার ডিঙিতে—মাছ ধরে আনতে। যাবি ?

আমি সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, এত অন্ধকারে ডিঙিতে চড়বে ?

সে আবার হাসিল। কহিল, ভয় কি রে! সেই ত মজা। তা ছাডা অন্ধকার না হ'লে কি মাছ পাওয়া যায় ? সাঁতার জানিস্ ?

খুব জানি।

তবে আয় ভাই। বলিয়া সে আমার একটা হাত ধরিল। কহিল, আমি একলা এত স্রোতে উজোন বাইতে পারিনে—একজন কাউকে খুঁজি, যে ভয় পায় না।

আমি আর কথা কহিলাম না। তাহার হাত ধরিয়া নিঃশব্দে রাস্তার উপর আসিয়া উপস্থিত হইলাম। প্রথমটা আমার নিজেরই যেন বিশ্বাস হইল না —আমি সত্যিই এই রাত্রে নৌকায় চলিয়াছি। কারণ, সে আহ্বানে এই স্তব্ধ-নিবিড় নিশীথে এই বাডির সমস্ত কঠিন শাসনপাশ তুচ্ছ করিয়া দিয়া, একাকী বাহির হইয়া আসিয়াছি, সে যে কত বড় আকর্ষণ, তাহা তখন বিচার করিয়া দেখিবার আমার সাধ্যই ছিল না। অনতিকাল পরে গোঁসাইবাগানের সেই ভয়ঙ্কর বনপথের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম এবং ইন্দ্রকে অনুসরণ করিয়া স্বপ্নাবিষ্টের মত তাহা অতিক্রম করিয়া গঙ্গার তীরে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

খাড়া কাঁকরের পাড়। মাথার উপর একটা বহু প্রাচীন অশ্বত্থ-বৃক্ষ মূর্তিমান অন্ধকারের মত নীরবে দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহারই প্রায় ত্রিশ হাত নীচে সূচিভেদ্য আঁধার তলে পরিপূর্ণ বর্ষার গভীর জলস্রোত ধাক্কা খাইয়া আবর্ত রচিয়া উদ্দাম হইয়া ছুটিয়াছে। দেখিলাম, সেইখানে ইন্দ্রের ক্ষুদ্র তরীখানি

বাঁধা আছে। উপর হইতে মনে হইল, সেই সুতীব্র জলধারার মুখে একখানি ছোট্ট মোচার খোলা যেন নিরন্তর কেবলই আছাড় খাইয়া মরিতেছে।

আমি নিজেও নিতান্ত ভীরু ছিলাম না। কিন্তু ইন্দ্র যখন উপর হইতে নীচে একগাছি রজ্জু দেখাইয়া কহিল, ডিঙির এই দড়ি ধরে পা টিপে টিপে নেবে যা, সাবধানে নাবিস, পিছলে পড়ে গেলে আর তোকে খুঁজে পাওয়া যাবে না; তখন যথার্থই আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। মনে হইল, ইহা অসম্ভব। কিন্তু তথাপি আমার ত দড়ি অবলম্বন আছে,—'কিন্তু তুমি?'

সে কহিল, তুই নেবে গেলেই আমি দড়ি খুলে দিয়ে নাব্‌ব। ভয় নেই, আমার নেবে যাবার অনেক ঘাসের শিকড় ঝুলে আছে।

আর কথা না কহিয়া আমি দড়িতে ভর দিয়া অনেক যত্নে অনেক দুঃখে নীচে আসিয়া নৌকায় বলিলাম। তখন দড়ি খুলিয়া দিয়া ইন্দ্র ঝুলিয়া পড়িল। সে যে কি অবলম্বন করিয়া নামিতে লাগিল, তাহা আজও আমি জানি না। ভয়ে বুকের ভিতরটায় এমনি টিপ্‌টিপ্ করিতে লাগিল যে, তাহার পানে চাহিতেই পারিলাম না! মিনিট দুই-তিন কাল বিপুল জলধারার মত্তগর্জন ছাড়া কোনও শব্দমাত্র নাই। হঠাৎ ছোট্ট একটুখানি হাসির শব্দে চকিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া দেখি, ইন্দ্র দুই হাত দিয়া নৌকা সজোরে ঠেলিয়া দিয়া লাফাইয়া চড়িয়া বসিল। ক্ষুদ্র তরী তীব্র একটা পাক খাইয়া নক্ষত্রবেগে ভাসিয়া চলিয়া গেল।

দুই

কয়েক মুহূর্তেই ঘনান্ধকারে সম্মুখ এবং পশ্চাৎ লেপিয়া একাকার হইয়া গেল। রহিল শুধু দক্ষিণ ও বামে সমান্তরাল প্রসারিত বিপুল উদ্দাম জলস্রোত এবং তাহারই উপর তীব্র-গতিশীলা এই ক্ষুদ্র তরণীটি এবং কিশোর বয়স্ক দু'টি বালক। প্রকৃতিদেবীর সেই অপরিমেয় গম্ভীর রূপ উপলব্ধি করিবার বয়স তাহাদের নহে, কিন্তু সে-কথা আমি আজও ভুলিতে পারি নাই! বায়ুলেশহীন, নিষ্কম্প, নিস্তব্ধ, নিঃসঙ্গ নিশীথিনীর সে যেন এক বিরাট কালীমূর্তি! নিবিড় কালো চুলে দ্যুলোক ও ভূলোক আচ্ছন্ন হইয়া গেছে, এবং সেই সূচিভেদ্য অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া করাল দংষ্ট্রারেখার ন্যায় দিগন্তবিস্তৃত এই তীব্র জলধারা হইতে কি একপ্রকারের অপরূপ স্তিমিত

দ্যুতি নিষ্ঠুর চাপাহাসির মত বিচ্ছুরিত হইতেছে। আশেপাশে সম্মুখে কোথাও বা উন্মত্ত জলস্রোত গভীর তলদেশে ঘা খাইয়া উপরে উঠিয়া ফাটিয়া পড়িতেছে, কোথাও বা প্রতিকূল গতি পরস্পরের সংঘাতে আবর্ত রচিয়া পাক খাইতেছে, কোথাও বা অপ্রতিহত জলপ্রবাহ পাগল হইয়া ধাইয়া চলিয়াছে।

আমাদের নৌকা কোণাকুণি পাড়ি দিতেছে, এই মাত্র বুঝিয়াছি। কিন্তু পরপারের ঐ দুর্ভেদ্য অন্ধকারের কোন্‌খানে যে লক্ষ্য স্থির করিয়া ইন্দ্র হাল ধরিয়া নিঃশব্দে বসিয়া আছে, তাহার কিছুই জানি না। এই বয়সেই সে যে কত বড় পাকা মাঝি, তখন বুঝি নাই। হঠাৎ সে কথা কহিল,—'কি রে শ্রীকান্ত, ভয় করে?'

আমি বললাম, 'নাঃ—'

ইন্দ্র খুশী হইয়া কহিল, এই ত চাই —সাঁতার জানলে আবার ভয় কিসের!

প্রত্যুত্তরে আমি একটি ছোট্ট নিঃশ্বাস চাপিয়া ফেলিলাম—পাছে সে শুনিতে পায়। কিন্তু এই গাঢ় অন্ধকার রাত্রিতে, এই জলরাশি এবং এই দুর্জয় স্রোতের সঙ্গে সাঁতার জানা এবং না-জানার পার্থক্য যে কি, তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। সেও আর কোন কথা কহিল না। বহুক্ষণ এইভাবে চলার পরে কি একটা যেন শোনা গেল—অস্ফুট এবং ক্ষীণ; কিন্তু নৌকা যত অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই সে শব্দ স্পষ্ট এবং প্রবল হইতে লাগিল। যেন বহুদূরাগত কাহাদের ক্রুদ্ধ আহ্বান। যেন কত বাধাবিঘ্ন ঠেলিয়া ডিঙাইয়া সে আহ্বান আমাদের কানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে—এমনি শ্রান্ত, অথচ বিরাম নাই, বিচ্ছেদ নাই—ক্রোধ যেন তাহাদের কমেও না—বাড়েও না—থামিতেও চাহে না। মাঝে মাঝে এক একবার ঝুপ্‌-ঝাপ্‌ শব্দ। জিজ্ঞাসা করিলাম, ইন্দ্র, ও কিসের আওয়াজ শোনা যায়?

সে নৌকার মুখটা আর একটু সোজা করিয়া দিয়া কহিল, জলের স্রোতে ওপারের বালির পাড় ভাঙার শব্দ।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কত বড় পাড়? কেমন স্রোত?

সে ভয়ানক স্রোত। ওঃ, তাই ত, কাল জল হয়ে গেছে, আর ত তার তলা দিয়ে যাওয়া যাবে না। একটা পাড় ভেঙ্গে পড়লে ডিঙি-সুদ্ধ আমরা সব গুঁড়িয়ে যাবো। তুই দাঁড় টানতে পারিস্?

পারি।

তবে টান্।

আমি টানিতে শুরু করিলাম। ইন্দ্র কহিল, উই—উই যে কালো মত বাঁ-দিকে দেখা যায়, ওটা চড়া। ওরি মধ্যে দিয়ে একটা খালের মত আছে, তারি ভিতর দিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে, কিন্তু খুব আস্তে—জেলেরা টের পেলে আর ফিরে আসতে দেবে না। লগির ঘায়ে মাথা ফাটিয়ে পাঁকে পুঁতে দেবে।

এ আবার কি কথা! সভয়ে বলিলাম, তবে ওর ভিতর দিয়ে নাই গেলে!

ইন্দ্র বোধ করি একটু হাসিয়া কহিল, আর ত পথ নেই। এর মধ্যে দিয়ে যেতেই হবে। বড় চড়ার বাঁদিকের রেস ঠেলে জাহাজ যেতে পারে না—আমরা যাবো কি ক'রে? ফিরে আসতে পারা যাবে কিন্তু যাওয়া যাবে না।

তবে মাছ চুরি ক'রে কাজ নেই ভাই, বলিয়াই আমি দাঁড় ফেলিলাম। চক্ষের পলকে পাক খাইয়া পিছাইয়া গেল। ইন্দ্র বিরক্ত হইয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া তর্জন করিয়া উঠিল—তবে এলি কেন? চল্ তোকে ফিরে রেখে আসি—কাপুরুষ? তখন চৌদ্দ পার হইয়া পনরয় পড়িয়াছি—আমাকে কাপুরুষ! ঝপাৎ করিয়া দাঁড় জলে ফেলিয়া প্রাণপণে টান দিলাম। ইন্দ্র খুশী হইয়া বলিল, এই ত চাই। কিন্তু আস্তে ভাই—ব্যাটারা ভারী পাজী আমি ঝাউবনের পাশ দিয়ে মক্কাক্ষেতের ভেতর দিয়ে এমনি বার করে নিয়ে যাবো যে শালারা টেরও পাবে না। একটু হাসিয়া কহিল, আর টের পেলেই বা কি? ধরা কি মুখের কথা! দ্যাখ শ্রীকান্ত, কিচ্ছু ভয় নেই—ব্যাটাদের চারখানা ডিঙি আছে বটে, কিন্তু যদি দেখিস ঘিরে ফেললে বলে—আর পালাবার জো নেই, তখন ঝুপ্ ক'রে লাফিয়ে পড়ে, একডুবে যতদূর পারিস্ গিয়ে ভেসে উঠলেই হ'ল এ অন্ধকারে আর দেখবার জোটি নাই—তারপর মজা করে সতুয়ার চড়ায় উঠে ভোরবেলায় সাঁতরে এপারে এসে গঙ্গার ধার ধরে বাড়ি ফিরে গেলেই ব্যস্! কি করবে ব্যাটারা?

চড়াটার নাম শুনিয়াছিলাম; কহিলাম, সতুয়ার চড়া ত ঘোরনালার সুমুখে, সে ত অনেক দূর!

ইন্দ্র তাচ্ছিল্যভরে কহিল, কোথায় অনেক দূর? ছ-সাত ক্রোশও হবে না বোধ হয়। হাত ভেরে গেলে চিৎ হয়ে থাকলেই হ'ল। তা ছাড়া মড়া-পোড়ানো বড় বড় গুঁড়ি কত ভেসে যাবে দেখতে পাবি।

আত্মরক্ষার যে সোজা রাস্তা সে দেখাইয়া দিল, তাহাতে প্রতিবাদের আর কিছু রহিল না। এই দিক্-চিহ্নহীন অন্ধকার নিশীথে আবর্তসঙ্কুল গভীর তীব্র

জলপ্রবাহে সাতক্রোশ ভাসিয়া গিয়া ভোরের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকি। ইহার মধ্যে আর এদিকের তীরে উঠিবার জো নাই। দশ-পনর হাত খাড়া উঁচু বালির পাড় মাথায় ভাঙিয়া পড়িবে—এই দিকেই গঙ্গার ভীষণ ভাঙন ধরিয়া জলস্রোত অর্ধবৃত্তাকারে ছুটিয়া চলিয়াছে।

বস্তুটা অস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়াই আমার বীরহৃদয় সঙ্কুচিত হইয়া বিন্দুবৎ হইয়া গিয়াছিল। কিছুক্ষণ দাঁড় টানিয়া বলিলাম, কিন্তু আমাদের ডিঙির কি হবে?

ইন্দ্র কহিল, সেদিন ত আমি ঠিক এমনি করেই পালিয়েছিলাম। তার পরদিন এসে ডিঙি কেড়ে নিয়ে গেলাম, বললাম, নৌকা ঘাট থেকে চুরি ক'রে আর কেউ এনেছিল—আমি নয়।

তবে এ-সকল এর কল্পনা নয়—একেবারে হাতে-নাতে প্রত্যক্ষ-করা সত্য! ক্রমশঃ ডিঙি খাঁড়ির সম্মুখীন হইলে দেখা গেল, জেলেদের নৌকাগুলি সারি দিয়া খাঁড়ির মুখে বাঁধা আছে—মিট্‌মিট্‌ করিয়া আলো জ্বলিতেছে। দুইটি চড়ার মধ্যবর্তী এই জলপ্রবাহটা খালের মত হইয়া প্রবাহিত হইতেছিল। ঘুরিয়া তাহার অপর পারে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সে-স্থানটায় জলের বেগে অনেকগুলো মোহনার মত হইয়াছে এবং সবকয়টাতেই বুনো ঝাউগাছে একটা হইতে আর একটাকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। একটার ভিতর দিয়া খানিকটা বাহিয়া গিয়া আমরা খালের মধ্যে পড়িলাম। জেলেদের নৌকাগুলো তখন অনেকটা দূরে কালো কালো ঝোপের মত দেখাইতেছে। আরও খানিকটা অগ্রসর হইয়া গন্তব্য স্থানে পৌঁছানো গেল।

ধীবর-প্রভুরা খালের সিংহদ্বার আগুলিয়া আছে মনে করিয়া এ স্থানটায় পাহারা রাখে নাই। ইহাকে মায়াজাল বলে। খালে যখন জল থাকে না, তখন এধার হইতে ওধার পর্যন্ত উঁচু উঁচু কাঠি শক্ত করিয়া পুঁতিয়া দিয়া তাহারই বহির্দিকে জাল টাঙাইয়া রাখে। পরে বর্ষার জলস্রোতে বড় বড় রুই-কাতলা ভাসিয়া আসিয়া এক কাঠিতে বাধা পাইয়া লাফাইয়া ওদিকে পড়িতে চায় এবং দড়ির জালে আবদ্ধ হইয়া থাকে।

দশ, পনর, বিশ সের রুই-কাতলা গোটা পাঁচ-ছয় ইন্দ্র চক্ষের নিমেষে নৌকায় তুলিয়া ফেলিল। সেই বিরাটকায় মৎস্যরাজেরা তখন পুচ্ছতাড়নায় ক্ষুদ্র ডিঙিখানা যেন চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিবার উপক্রম করিতে লাগিল এবং তাহার শব্দও বড় কম হইল না।

এত মাছ কি হবে ভাই ?

কাজ আছে। আর না, পালাই চল্। বলিয়া সে জাল ছাড়িয়া দিল। আর দাঁড় টানিবার প্রয়োজন নাই। আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। তখন তেমনি গোপনে আবার সেই পথেই বাহির হইতে হইবে। অনুকূল স্রোতে মিনিট দুই-তিন খরবেগে ভাঁটাইয়া আসিয়া হঠাৎ একস্থানে একটা দমকা মারিয়া যেন আমাদের এই ক্ষুদ্র ডিঙিটি পাশের ভুট্টা-ক্ষেতের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল। তাহার এই আকস্মিক গতি-পরিবর্তনে আমি চকিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম, কি ? কি হল ?

ইন্দ্র আর একটা ঠেলা দিয়া নৌকাখানা আরও খানিকটা ভিতরে পাঠাইয়া দিয়া কহিল, চুপ্। শালারা টের পেয়েছে, চারখানা ডিঙি খুলে দিয়ে এদিকে আসচে—ঐ দ্যাখ ?

তাই ত বটে। প্রবল জল-তাড়নায় ছপাছপ শব্দ করিয়া চারখানা নৌকা আমাদের গিলিয়া ফেলিবার জন্য যেন কৃষ্ণকায় দৈত্যের মত ছুটিয়া আসিতেছে। ওদিকে জাল দিয়া বন্ধ, সুমুখে ইহারা—পালাইয়া নিষ্কৃতি পাইবার এতটুকু স্থান নাই। এই ভুট্টা-ক্ষেতের মধ্যেই যে আত্মগোপন করা চলিবে, তাহাও সম্ভব মনে হইল না।

কি হবে ভাই ?—বলিতে বলিতেই অদম্য বাষ্পোচ্ছ্বাসে আমার কণ্ঠনালী রুদ্ধ হইয়া গেল। এই অন্ধকারে এই ফাঁদের মধ্যে খুন করিয়া এই ক্ষেতের মধ্যে পুঁতিয়া ফেলিলেই বা কে নিবারণ করিবে ?

ইতিপূর্বে পাঁচ-ছয় দিন ইন্দ্র 'চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা' সপ্রমাণ করিয়া নির্বিঘ্নে প্রস্থান করিয়াছে, এতদিন ধরা পড়িয়াও পড়ে নাই, কিন্তু আজ ?

সে মুখে একবার বলিল, ভয় নেই। কিন্তু গলাটা তাহার যেন কাঁপিয়া গেল। কিন্তু সে থামিল না। প্রাণপণে লগি ঠেলিয়া ক্রমাগত ভিতরে লুকাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সমস্ত চড়াটা জলে জলময়। তাহার উপর আট-দশ হাত দীর্ঘ ভুট্টা এবং জনারের গাছ। ভিতরে এই দুটি চোর। কোথাও জল এক বুক, কোথাও এক কোমর, কোথাও হাঁটুর অধিক নয়। উপরে নিবিড় অন্ধকার, সম্মুখে পশ্চাতে দক্ষিণে বামে দুর্ভেদ্য জঙ্গল। পাঁকে লগি পুঁতিয়া যাইতে লাগিল, নৌকা আর এক-হাতও অগ্রসর হয় না। পিছন হইতে জেলেদের অস্পষ্ট কথাবার্তা কানে আসিতে লাগিল। কিছু

একটা সন্দেহ করিয়াই যে তাহারা আসিয়াছে এবং তখনও খুঁজিয়া ফিরিতেছে, তাহাতে লেশমাত্র সংশয় নাই।

সহসা নৌকাটা একটু কাৎ হইয়াই সোজা হইল। চাহিয়া দেখি, আমি একাকী বসিয়া আছি, দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। সভয়ে ডাকিলাম, ইন্দ্র ?

হাত পাঁচ-ছয় দূরে বনের মধ্য হইতে সাড়া আসিল, আমি নীচে।

—নীচে কেন ?

—ডিঙি টেনে বের করতে হবে। আমার কোমরে দড়ি বাঁধা আছে।

—টেনে কোথায় বার করবে ?

—ও গঙ্গায়। খানিকটা যেতে পারলেই বড় গাঙে পড়ব।

শুনিয়া চুপ করিয়া গেলাম। ক্রমশঃ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অকস্মাৎ কিছুদূরে বনের মধ্যে ক্যানেস্ত্রা পিটানো ও চেরা-বাঁশের কটাকট্ শব্দে চমকাইয়া উঠিলাম। সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, ও কি ভাই ?

সে উত্তর দিল, চাষীরা মাচার উপরে বসে বুনো শূয়ার তাড়াচ্ছে।

—বুনো শূয়ার ? কোথায় সে ?

ইন্দ্র নৌকা টানিতে টানিতে তাচ্ছিল্যভরে কহিল, আমি কি দেখতে পাচ্ছি যে বলব ? আছেই কোথাও এইখানে।

জবাব শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলাম, ভাবিলাম, কার মুখ দেখিয়া আজ প্রভাত হইয়াছিল। সন্ধ্যারাত্রে আজই ঘরের মধ্যে বাঘের হাতে পড়িয়াছিলাম। এ জঙ্গলে যে বুনো শূয়ারের হাতে পড়িব, তাহাতে আর বিচিত্র কি ? তথাপি আমি ত নৌকায় বসিয়া ; কিন্তু ঐ লোকটি এক বুক কাদা ও জলের মধ্যে এই বনের ভিতরে—এক-পা নড়িবার চড়িবার উপায় পর্যন্ত তাহার নাই। মিনিট পনর এইভাবে কাটিল। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করিতেছিলাম। প্রায়ই দেখিতেছি, কাছাকাছি এক একটা জনার, ভুট্টাগাছের ডগা ভয়ানক আন্দোলিত হইয়া 'ছপাৎ' করিয়া শব্দ হইতেছে। একটা প্রায় আমার হাতের কাছেই। সশঙ্কিত হইয়া সেদিকে ইন্দ্রের মনোযোগ আকৃষ্ট করিলাম। ধাড়ী শূয়ার না হইলেও বাচ্চা-টাচ্চা নয় ত।

ইন্দ্র অত্যন্ত সহজভাবে কহিল, ও কিছু না—সাপ জড়িয়ে আছে, তাড়া পেয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

কিছু না—সাপ। শিহরিয়া নৌকার মাঝখানে জড়সড় হইয়া বসিলাম। অস্ফুটে কহিলাম, কি সাপ, ভাই?

ইন্দ্র কহিল, সব রকম আছে, ঢোঁড়া, বোড়া. গোখ্‌রো, করেত্‌—জলে ভেসে এসে গাছে জড়িয়ে আছে—কোথাও ডাঙা নেই দেখচিস্‌ নে?

সে ত দেখচি। কিন্তু ভয়ে যে পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্যন্ত আমার কাঁটা দিয়া রহিল। সে লোকটি কিন্তু ভ্রূক্ষেপমাত্র করিল না, নিজের কাজ করিতে করিতে বলিতে লাগিল, কিন্তু কামড়ায় না, ওরা নিজেরাই ভয়ে মরচে—দুটো তিনটে ত আমার গা-ঘেঁসে পালালো। এক একটা মস্ত বড়—সেগুলো বোড়া-ঢোঁড়া হবে বোধ হয়। আর কামড়ালেই বা কি ক'রব। মরতে একদিন ত হবেই ভাই। এমনি আরও কত কি সে মৃদু স্বাভাবিক কণ্ঠে বলিতে বলিতে চলিল, আমার কানে কতক পৌঁছিল, কতক পৌঁছিল না। আমি নির্বাক্‌-নিস্পন্দ কাঠের মত আড়ষ্ট হইয়া এক-স্থানে একভাবে বসিয়া রহিলাম। নিঃশ্বাস ফেলিতেও যেন ভয় করিতে লাগিল—ছপাৎ করিয়া একটা যদি নৌকার উপরেই পড়ে।

কিন্তু সে যাই হোক, ওই লোকটি কি। মানুষ? দেবতা? পিশাচ? কে ও? কার সঙ্গে এই বনের মধ্যে ঘুরিতেছি? যদি মানুষই হয়, তবে ভয় বলিয়া কোন বস্তু যে বিশ্বসংসারে আছে, সে কথা কি ও জানেও না। বুকখানা কি পাথর দিয়া তৈরী? সেটা কি আমাদের মত সঙ্কুচিত বিস্ফারিত হয় না? তবে যে সেদিন মাঠের মধ্যে সকলে পলাইয়া গেলে, সে নিতান্ত অপরিচিত আমাকে একাকী নির্বিঘ্নে বাহির করিবার জন্য শত্রুর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, সে দয়ামায়াও কি ওই পাথরের মধ্যেই নিহিত ছিল। আর আজ? সমস্ত বিপদের বার্তা তন্ন-তন্ন করিয়া জানিয়া শুনিয়া নিঃশব্দে অকুণ্ঠিত-চিত্তে এই ভয়াবহ অতি ভীষণ মৃত্যুর মুখে নামিয়া দাঁড়াইল; একবার একটা মুখের অনুরোধও করিল না—'শ্রীকান্ত, তুই একবার নেমে যা'। সে ত জোর করিয়াই আমাকে নামাইয়া দিয়া নৌকা টানাইতে পারিত। এ ত শুধু খেলা নয়। জীবন্মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া এই স্বার্থত্যাগ এই বয়সে কয়টা লোক করিয়াছে? ঐ যে বিনা আড়ম্বরে সামান্যভাবে বলিয়াছিল—মরতে একদিন ত হবেই—এমন সত্য কথা বলিতে কয়টা মানুষকে দেখা যায়? সে-ই আমাকে এই বিপদের মধ্যে টানিয়া আনিয়াছে সত্য, কিন্তু সে যাই হোক, তাহার এত বড় স্বার্থত্যাগ আমি

মানুষের দেহ ধরিয়া ভুলিয়া যাই কেমন করিয়া? কেমন করিয়া ভুলি, যাহার হৃদয়ের ভিতর হইতে এতবড় অযাচিত দান এতই সহজে বাহির হইয়া আসিল—সে হৃদয় কি দিয়া কে গড়িয়া দিয়াছিল। তার পরে কত কাল কত সুখদুঃখের ভিতর দিয়া আজ এই বার্ধক্যে উপনীত হইয়াছি; কত দেশ, কত প্রান্তর, কত নদ-নদী পাহাড়-পর্বত বন-জঙ্গল ঘাঁটিয়া ফিরিয়াছি, কত প্রকারের মানুষই না এই দুটো চোখে পড়িয়াছে, কিন্তু এতবড় মহাপ্রাণ ত আর কখনও দেখিতে পাই নাই। কিন্তু সে আর নাই। অকস্মাৎ একদিন যেন বুদবুদের মত শূন্যে মিলাইয়া গেল। আজ মনে পড়িয়া এই দুটো শুষ্ক চোখ জলে ভাসিয়া যাইতেছে—কেবল একটা নিষ্ফল অভিমান হৃদয়ের তলদেশ আলোড়িত করিয়া উপরের দিকে ফেনাইয়া উঠিতেছে। সৃষ্টিকর্তা। এই অদ্ভুত অপার্থিব বস্তু কেনই বা সৃষ্টি করিয়া পাঠাইয়াছিলে, এবং কেনই বা তাহা এমন ব্যর্থ করিয়া প্রত্যাহার করিলে! বড় ব্যথায় আমার এই অসহিষ্ণু মন আজ বারংবার এই প্রশ্নই করিতেছে—ভগবান্। টাকা-কড়ি, ধন-দৌলত, বিদ্যা-বুদ্ধি ঢের ত তোমার অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে দিতেছ দেখিতেছি, কিন্তু এত বড় একটা মহাপ্রাণ আজ পর্যন্ত তুমিই বা কয়টা দিতে পারিলে?

যাক সে কথা। ক্রমশঃ ঘোর-কলকল্লোল নিকটবর্তী হইতেছে, তাহা উপলব্ধি করিতেছিলাম। অতএব আর প্রশ্ন না করিয়াই বুঝিলাম, এই বনান্তরালেই সেই ভীষণ প্রবাহ—যাহাকে অতিক্রম করিয়া স্টীমার যাইতে পারে না—তাহাই প্রধাবিত হইতেছে। বেশ অনুভব করিতেছিলাম, জলের বেগ বর্ধিত হইতেছে এবং ধূসর ফেনপুঞ্জ বিস্তৃত বালুকারাশির ভ্রমোৎপাদন করিতেছে। ইন্দ্র আসিয়া নৌকায় উঠিল এবং বোটে হাতে করিয়া সম্মুখবর্তী উদ্দাম স্রোতের জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিল। কহিল, আর ভয় নেই, বড় গাঙে এসে পড়েচি। মনে মনে কহিলাম, ভয় না থাকে ভালই। কিন্তু কিসে যে তোমার ভয় আছে, তাও ত বুঝিলাম না। পরক্ষণেই সমস্ত নৌকাটা আপাদমস্তক একবার যেন শিহরিয়া উঠিল এবং চক্ষের পলক না ফেলিতেই দেখিলাম, তাহা বড় গাঙের স্রোত ধরিয়া উল্কাবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে।

তখন ছিন্ন-ভিন্ন মেঘের আড়ালে বোধ করি যেন চাঁদ উঠিতেছিল। কারণ, যে অন্ধকারের মধ্যে যাত্রা করিয়াছিলাম, সে অন্ধকার আর ছিল না।

এখন অনেক দূর পর্যন্ত অস্পষ্ট হইলেও দেখা যাইতেছিল। দেখিলাম, বন-ঝাউ এবং ভুট্টা-জনারের চড়া ডানদিকে রাখিয়া নৌকা আমাদের সোজা চলিতেই লাগিল।

তিন

বড় ঘুম পেয়েছে, ইন্দ্র, বাড়ি ফিরে চল না ভাই।

ইন্দ্র একটুখানি হাসিয়া ঠিক যেন মেয়েমানুষের মত স্নেহার্দ্র কোমল-স্বরে কথা কহিল। বলিল, ঘুম ত পাবার কথাই ভাই। কি কর্‌ব শ্রীকান্ত, আজ একটু দেরি হবেই—অনেক কাজ রয়েছে। আচ্ছা, এক কাজ কর্‌ না কেন? ঐখানেই একটু শুয়ে ঘুমিয়ে নে' না?

আর দ্বিতীয় অনুরোধ করিতে হইল না। আমি গুটিশুটি হইয়া সেই তক্তাখানির উপর শুইয়া পড়িলাম। কিন্তু ঘুম আসিল না। স্তিমিতচক্ষে চুপ করিয়া আকাশের গায়ে মেঘ ও চাঁদের লুকোচুরি খেলা দেখিতে লাগিলাম। ঐ ডোবে, ঐ ভাসে, আবার ডোবে, আবার ভাসে। আর কানে আসিতে লাগিল—জলস্রোতের সেই একটানা হুঙ্কার। আমার একটা কথা প্রায়ই মনে পড়ে। সেদিন অমন করিয়া সব ভুলিয়া মেঘ আর চাঁদের মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছিলাম কি করিয়া? সে ত আমার তন্ময় হইয়া চাঁদ দেখিবার বয়স নয়! কিন্তু ঐ যে বুড়োরা পৃথিবীর অনেক ব্যাপার দেখিয়া-শুনিয়া বলে যে, ঐ বাহিরের চাঁদটাও কিছু না, মেঘটাও কিছু না, সব ফাঁকি—সব ফাঁকি! আসল যা কিছু, তা এই নিজের মনটা। সে যখন যাকে যা দেখায়, বিভোর হইয়া সে তখন তাই শুধু দেখে। আমারও সেই দশা। এত রকমের ভয়ঙ্কর ঘটনার ভিতর দিয়া এমন নিরাপদে বাহির হইয়া আসিতে পারিয়া আমার নির্জীব মনটা তখন বোধ করি এমনি-কিছু-একটা শান্ত ছবির অন্তরেই বিশ্রাম করিতে চাহিয়াছিল।

ইতিমধ্যে যে ঘণ্টা-দুই কাটিয়া গেছে, তাহা টেরও পাই নাই। হঠাৎ মনে হইল আমার, চাঁদ যেন মেঘের মধ্যে একটা লম্বা ডুব-সাঁতার দিয়া একেবারে ডানদিক হইতে বাঁদিকে গিয়া মুখ বাহির করিলেন। ঘাড়টা একটু তুলিয়া দেখিলাম, নৌকা এবার ওপারে পাড়ি দিবার আয়োজন করিয়াছে। প্রশ্ন করিবার বা একটা কথা কহিবার উদ্যমও তখন বোধ করি

আর আমার মধ্যে ছিল না; তাই তখনি আবার তেমনি করিয়াই শুইয়া পড়িলাম। আবার সেই দু'চক্ষু ভরিয়া চাঁদের খেলা এবং দু'কান ভরিয়া স্রোতের তর্জন। বোধ করি, আরও ঘণ্টাখানেক কাটিল।

খস্—স্—বালুর চরে নৌকা বাধিয়াছে। ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিলাম। এই যে এপারে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। কিন্তু এ কোন জায়গা? বাড়ি আমাদের কত দূরে? বালুকার রাশি ভিন্ন আর কিছুইত কোথাও দেখি না? প্রশ্ন করিবার পূর্বেই হঠাৎ নিকটেই কোথায় যেন কুকুরের কলহ শুনিতে পাইয়া আরও সোজা হইয়া বসিলাম। কাছেই লোকালয় আছে নিশ্চয়।

ইন্দ্র কহিল, একটু বোস, শ্রীকান্ত; আমি এখ্‌খুনি ফিরে আসব— তোর কিচ্ছু ভয় নেই। এই পাড়ের ওধারেই জেলেদের বাড়ি।

সাহসের এতগুলো পরীক্ষায় পাশ করিয়া শেষে এইখানে আসিয়া ফেল করিবার আমার ইচ্ছা ছিল না। বিশেষতঃ মানুষের এই কিশোর বয়সটার মত এমন মহাবিস্ময়কর বস্তু বোধ করি সংসারে আর নাই! এমনিই ত সর্বকালেই মানুষের মানসিক গতিবিধি বড়ই দুর্জ্ঞেয়। কিন্তু কিশোর-কিশোরীর মনের ভাব বোধ করি একেবারেই অজ্ঞেয়। তাই বোধ করি শ্রীবৃন্দাবনের সেই দুটি কিশোর-কিশোরীর কৈশোরলীলা চিরদিনই এমন রহস্যে আবৃত হইয়া রহিল। বুদ্ধি দিয়া তাহাকে ধরিতে না পারিয়া তাহাকে কেহ কহিল ভালো, কেহ কহিল মন্দ—কেহ নীতির, কেহ বা রুচির দোহাই পাড়িল—আবার কেহ বা কোন কথাই শুনিল না—তর্কাতর্কির সমস্ত গণ্ডি মাড়াইয়া ডিঙাইয়া বাহির হইয়া গেল। যাহারা গেল, তাহারা মজিল, পাগল হইল, নাচিয়া, কাঁদিয়া গান গাহিয়া সব একাকার করিয়া দিয়া, সংসারটাকে যেন একটা পাগলাগারদ বানাইয়া ছাড়িল। তখন যাহারা মন্দ বলিয়া গালি পাড়িল, তাহারাও কহিল, এমন রসের উৎস কিন্তু আর কোথাও নাই। যাহাদের রুচির সহিত মিশ খায় নাই, তাহারাও স্বীকার করিল—এই পাগলের দলটি ছাড়া সংসারে এমন গান কিন্তু আর কোথাও শুনিলাম না।

কিন্তু এত কাণ্ড যাহাকে আশ্রয় করিয়া ঘটিল—সেই সে সর্বদিনের পুরাতন, অথচ চিরনূতন—বৃন্দাবনের বনে বনে দুটি কিশোর-কিশোরীর অপরূপ লীলা—বেদান্ত যাহার কাছে ক্ষুদ্র—মুক্তিফল যাহার তুলনায় বারীশের কাছে বারিবিন্দুর মতই তুচ্ছ,—তাহার কে কবে অন্ত খুঁজিয়া পাইল?

পাইল না, পাওয়াও যায় না। তাই বলিতেছিলাম, তেমনি সেও ত আমার সেই কিশোর বয়স। যৌবনের তেজ ও দৃঢ়তা না আসুক, তাহার দম্ভ ত তখন আসিয়া হাজির হইয়াছে। প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা ত হৃদয়ে সজাগ হইয়াছে। তখন সঙ্গীর কাছে ভীরু বলিয়া কে নিজেকে প্রতিপন্ন করিতে চাহে। অতএব তৎক্ষণাৎ জবাব দিলাম, ভয় করব আবার কিসের? বেশ ত যাও না। ইন্দ্র আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়া দ্রুতপদে নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

উপরে, মাথার উপরে আবার সেই আলো-আঁধারের লুকোচুরি খেলা এবং পশ্চাতে বহুদূরাগত সেই অবিশ্রান্ত তর্জন। আর সুমুখে সেই বালির পাড। এটা কোন্ জায়গা, তাহাই ভাবিতেছি, দেখি ইন্দ্র ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। কহিল, শ্রীকান্ত, তোকে একটা কথা বলতে ফিরে এলুম। কেউ যদি মাছ চাইতে আসে, খবরদার দিসনে—খবরদার, ব'লে দিচ্ছি। ঠিক আমার মত হয়েও যদি কেউ আসে, তবু দিবিনে—বলবি, মুখে তোর ছাই দেবো—ইচ্ছে হয়, নিজে তুলে নিয়ে যা। খবরদার হাতে করে দিতে যাসনে যেন—ঠিক আমি হ'লেও না—খবরদার।

—কেন ভাই?

ফিরে এসে বল্‌ব—খবরদার কিন্তু, বলিতে বলিতে সে যেমন ছুটিয়া আসিয়াছিল, তেমনি ছুটিয়া দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল।

এইবার আমার পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্যন্ত কাঁটা দিয়া খাড়া হইয়া উঠিল। বোধ হইতে লাগিল, যেন দেহের প্রতি শিরা-উপশিরা দিয়া বরফ-গলা জল বহিয়া চলিতে লাগিল। নিতান্ত শিশুটি নহি যে, তাহার ইঙ্গিতের মর্ম অনুমান করিতে পারি নাই। আমার জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে যাহার তুলনায় ইহা সমুদ্রের কাছে গোষ্পদের জল। কিন্তু তথাপি এই নিশা-অভিযানের রাতটায় যে ভয় অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। বোধ করি, ভয়ে চৈতন্য হারাইবার ঠিক শেষ ধাপটিতে আসিয়াই পা দিয়াছিলাম। প্রতি মুহূর্তেই মনে হইতেছিল, পাড়ের ওদিক্ হইতে কে যেন উঁকি মারিয়া দেখিতেছে। যেমনি আড়চোখে চাই, অম্‌নি সেও যেন মাথা নীচু করে।

সময় আর কাটে না। ইন্দ্র যেন কত যুগ হইল চলিয়া গিয়াছে—আর ফিরিতেছে না।

মনে হইল, যেন মানুষের কণ্ঠস্বর শুনিলাম। পৈতাটা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে শতপাকে বেষ্টন করিয়া মুখ নীচু করিয়া উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম। কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইলে বেশ বুঝিলাম, দুই-তিনজন লোক কথাবার্তা বলিতে বলিতে এই দিকে আসিতেছে। একজন ইন্দ্র এবং আর অপর দুইজন হিন্দুস্থানী! কিন্তু সে যাহাই হউক, তাহাদের মুখের দিকে চাহিবার আগে ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম, চন্দ্রালোকে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে কি না। কারণ, এই অবিসংবাদী সত্যটা ছেলেবেলা হইতে জানিতাম যে, ইহাদের ছায়া থাকে না।

আঃ—ঐ যে ছায়া! অস্পষ্ট হউক, তবুও ছায়া। জগতে আমার মত সেদিন কোন মানুষ কোন বস্তু চোখে দেখিয়া কি এমন তৃপ্তি পাইয়াছে? পাক্ আর নাই পাক্, ইহাকেই যে বলে দৃষ্টির চরম আনন্দ, এ-কথা আজ আমি বাজি রাখিয়া বলিতে পারি। যাক! যাহারা আসিল, তাহারা অসাধারণ ক্ষিপ্রতার সহিত সেই বৃহদায়তন মাছগুলি নৌকা হইতে তুলিয়া জালের মত একপ্রকার বস্ত্রখণ্ডে বাঁধিয়া ফেলিল এবং তৎপরিবর্তে ইন্দ্রের হাতে যাহা গুঁজিয়া দিল, তাহা একটা টুং করিয়া একটুখানি মৃদুমধুর শব্দ করিয়া নিজেদের পরিচয়টাও আমার কাছে সম্পূর্ণ গোপন করিয়া গেল না।

ইন্দ্র নৌকা খুলিয়া দিল, কিন্তু স্রোতে ভাসাইল না। ধার ঘেঁসিয়া প্রবাহের প্রতিকূলে লগি ঠেলিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল।

আমি কোন কথা কহিলাম না। কারণ আমার মন তখন তাহার বিরুদ্ধে ঘৃণায় ও কি-এক প্রকারের অভিমানে নিবিড়ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এইমাত্র না তাহাকেই চাঁদের আলোয় ছায়া ফেলিয়া ফিরিতে দেখিয়া অধীর আনন্দে ছুটিয়া গিয়া জড়াইয়া ধরিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিলাম।

হ্যাঁ, তা মানুষের স্বভাবই ত এই। একটুখানি দোষ পাইলে পূর্বমুহূর্তের সমস্তই নিঃশেষে ভুলিয়া যাইতে তাহার কতক্ষণ লাগে? ছিঃ। ছিঃ। এমনি করিয়া সে টাকা সংগ্রহ করিল! এতক্ষণ এই মাছ-চুরি ব্যাপারটা আমার মনের মধ্যে বেশ স্পষ্ট চুরির আকারে বোধ করি স্থান পায় নাই। কেননা, ছেলেবেলায় টাকা কড়ি চুরিটাই শুধু যেন বাস্তবিক চুরি আর সব—অন্যায় বটে—কিন্তু কেমন করিয়া যেন সে-সব ঠিক চুরি নয়—এমনই একটা অদ্ভুত ধারণা প্রায় সকল ছেলেরই থাকে; আমারও তাই ছিল। না হইলে এই 'টুং' শব্দটি কানে যাইবামাত্র এতক্ষণের এত বীরত্ব, এত পৌরুষ, সমস্তই একমুহূর্তে এমন

শুষ্ক তৃণের মত ঝরিয়া পড়িত না। সে যদি মাছগুলো জলে ফেলিয়া দিত, কিংবা—আর যাহাই করুক, শুধু টাকা-কড়ির সহিত ইহার সংস্রব না ঘটাইত, তাহা হইলে আমাদের এই মৎস্য-সংগ্রহের অভিযানটিকে কেহ চুরি বলিলে ক্রোধে বোধ করি তাহার মাথাটাই ফাটাইয়া দিতাম এবং সে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য পাইয়াছে বলিয়া মনে করিতাম। কিন্তু ছিঃ ছিঃ! এ কি! এ কাজ ত জেলখানার কয়েদীরা করে!

ইন্দ্র কথা কহিল, জিজ্ঞাসা করিল, তুই একটুও ভয় পাস্‌নি, না রে শ্রীকান্ত?

আমি সংক্ষেপে জবাব দিলাম, না।

ইন্দ্র কহিল, কিন্তু তুই ছাড়া ওখানে আর কেউ বসে থাকতে পারত না, তা জানিস? তোকে আমি খুব ভালবাসি—আমার এমন বন্ধু আর একটিও নেই। আমি যখন আসব, তোকে শুধু ডেকে আনব, কেমন?

আমি জবাব দিলাম না। কিন্তু এই সময়ে তাহার মুখের উপর সদ্য মেঘ-মুক্ত যে চাঁদের আলোটুকু পড়িল, তাহাতে মুখখানি কি যে দেখাইল, আমি এতক্ষণের সব রাগ অভিমান হঠাৎ ভুলিয়া গেলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা ইন্দ্র, তুমি কখনও ঐ-সব দেখেচ?

কি সব?

ঐ যারা মাছ চাইতে আসে?

না ভাই দেখিনি—লোকে বলে, তাই শুনেছি।

আচ্ছা, তুমি এখানে একলা আসতে পারো?

ইন্দ্র হাসিল। কহিল, আমি ত একলাই আসি।

ভয় করে না?

না। রামনাম করি। কিছুতেই তারা আসতে পারে না। একটু থামিয়া কহিল, রামানাম কি সোজা রে? তুই যদি রামনাম করতে করতে সাপের মুখ দিয়ে চলে যাস্‌, তবু তোর কিছু হবে না। সব দেখবি ভয়ে ভয়ে পথ ছেড়ে দিয়ে পালাবে। কিন্তু ভয় করলে হবে না। তা হলেই তারা টের পাবে, এ শুধু চালাকি করচে,—তারা সব অন্তর্যামী কিনা!

বালুর চর শেষ হইয়া আবার কাঁকরের পাড় শুরু হইল। ওপার অপেক্ষা এপারে স্রোত অনেক কম। বরঞ্চ এইখানটায় বোধ হইল, স্রোত যেন উল্টামুখে চলিয়াছে। ইন্দ্র লগি তুলিয়া বোটে হাতে করিয়া কহিল, ঐ যে সামনে বনের

মত দেখাচ্ছে, আমাদের ওর ভেতর দিয়ে যেতে হবে। ঐখানে আমি একবার নেবে যাব। যাব আর আসব। কেমন?

অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলিলাম, আচ্ছা। কারণ, 'না' বলিবার পথ ত একপ্রকার নিজেই বন্ধ করিয়া দিয়াছি। আবার ইন্দ্রও আমার নির্ভীকতা সম্বন্ধে বোধ করি নিশ্চিন্ত হইয়াছে। কিন্তু কথাটা আমার ভাল লাগিল না। এখান হইতে ঐ স্থানটা এমনি জঙ্গলের মত অন্ধকার দেখাইতেছিল যে এইমাত্র রামনামের অসাধারণ মাহাত্ম্য শ্রবণ করা সত্ত্বেও ওই অন্ধকার প্রাচীন বটবৃক্ষতলে নৌকার উপর একা বসিয়া এত রাত্রে রামনাথের শক্তি-সামর্থ্য যাচাই করিয়া লইতে আমার এতটুকু প্রবৃত্তি হইল না এবং তখন হইতেই গা ছম্ ছম্ করিতে লাগিল। সত্য বটে, মাছ আর ছিল না, সুতরাং মৎস্যপ্রার্থীদের শুভাগমন না হইতে পারে, কিন্তু সকলের লোভ যে মাছেরই উপর, তাই বা কে বলিল? মানুষের ঘাড় মটকাইয়া ঈষদুষ্ণ রক্তপান এবং মাংস-চর্বণের ইতিহাসও ত শোনা গিয়াছে!

অনুকূল স্রোত এবং বোটের তাড়নায় ডিঙিখানা তর্ তর্ করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিল। আরও কিছুদূর আসিতেই দক্ষিণদিকের আগ্রীবমগ্ন বনঝাউ এবং কসাড় বন মাথা তুলিয়া, এই দুই অসমসাহসী মানবশিশুর পানে বিস্ময়স্তব্ধভাবে চাহিয়া রহিল এবং কেহ বা মাঝে মাঝে শিরশ্চালনে কি যেন নিষেধ জানাইতে লাগিল; বামদিকেও তাহাদের আত্মীয়পরিজনেরা সু-উচ্চ কাঁকরের পাড় সমাচ্ছন্ন করিয়া তেমনি করিয়াই চাহিয়া রহিল এবং তেমনি করিয়া মানা করিতে লাগিল। আমি একা হইলে নিশ্চয় তাহাদের সঙ্কেত অমান্য করিতাম না। কিন্তু কর্ণধার যিনি, তাঁহার কাছে বোধ করি 'রাম-নামে'র জোরেই ইহাদের সমস্ত আবেদন-নিবেদন একেবারেই ব্যর্থ হইয়া গেল। সে কোনদিকে ভ্রূক্ষেপই করিল না। দক্ষিণদিকের চরের বিস্তৃতি-বশতঃ এ-জায়গাটা একটি ছোটখাটো হ্রদের মত হইয়াছিল—শুধু উত্তরদিকের মুখ খোলা ছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা ডিঙি বেঁধে উপরে উঠবার ত ঘাট নেই, তুমি যাবে কি করে?

ইন্দ্র কহিল, ঐ যে বটগাছ, ওর পাশেতেই একটা সরু ঘাট আছে।

কিছুক্ষণ হইতে একটা দুর্গন্ধ মাঝে মাঝে হাওয়ার সঙ্গে নাকে আসিয়া লাগিতেছিল। যত অগ্রসর হইতেছিলাম, ততই সেটা বাড়িতে ছিল। এখন হঠাৎ একটা দমকা বাতাসের সঙ্গে সেই দুর্গন্ধটা এমন বিকট হইয়া নাকে

লাগিল যে, অসহ্য বোধ হইল। নাকে কাপড় চাপা দিয়া বলিলাম, নিশ্চয় কি পচেছে, ইন্দ্র!

ইন্দ্র বলিল, মড়া। আজকাল ভয়ানক কলেরা হচ্ছে কিনা। সবাই ত পোড়াতে পারে না—মুখে একটুখানি আগুন ছুঁইয়ে ফেলে দিয়ে যায়। শিয়াল-কুকুরে খায় আর পচে। তারই অত গন্ধ।

কোনখানে ফেলে দিয়ে যায় ভাই!

ঐ হোথা থেকে হেথা পর্যন্ত—সবটাই শ্মশান কিনা। যেখানে হোক ফেলে রেখে, ঐ বটতলার ঘাটে চান করে বাড়ি চলে যায়,—আরে দূর, ভয় কিরে! ও শিয়ালে শিয়ালে লড়াই করচে।—আচ্ছা, আয়, আয়, আমার কাছে এসে বোস।

আমার গলা দিয়া স্বর ফুটিল না—কোন মতে হামাগুড়ি দিয়া তাহার কোলের কাছে গিয়া বসিয়া পড়িলাম। সে ক্ষণকালের জন্য আমাকে একবার স্পর্শ করিয়া হাসিয়া কহিল, ভয় কি শ্রীকান্ত? কত রাত্তিরে একা একা আমি এই পথে যাই আসি—তিনবার রামনাম করলে কার সাধ্যি কাছে আসে!

তাহাকে স্পর্শ করিয়া দেহটাকে যেন একটু সাড়া পাইলাম—অস্ফুটে কহিলাম, না ভাই, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, এখানে কোথাও নেবো না সোজা বেরিয়ে চল।

সে আবার আমার কাঁধে হাত ঠেকাইয়া বলিল, না শ্রীকান্ত, একটিবার যেতেই হবে। এই টাকা ক'টি না দিলেই নয়—তারা পথ চেয়ে বসে আছে—আমি তিনদিন আসতে পারিনি।

টাকা কাল দিয়ো না ভাই!

না ভাই, অমন কথাটি বলিসনে। আমার সঙ্গে তুইও চল্—কিন্তু কাউকে এ-কথা বলিস্‌নে যেন।

আমি অস্ফুটে 'না' বলিয়া তাহাকে তেমনি স্পর্শ করিয়া পাথরের মত বসিয়া রহিলাম। গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু হাত বাড়াইয়া জল লইব, কি নড়া-চড়ার কোনপ্রকার চেষ্টা করিব, এ সাধ্যই আমার আর ছিল না।

গাছের ছায়ার মধ্যে আসিয়া পড়ায়, অদূরে সেই ঘাটটি চোখে পড়িল। যেখানে আমাদের অবতরণ করিতে হইবে, তাহার উপর যে গাছপালা নাই,

স্থানটি ম্লান জ্যোৎস্নালোকেও বেশ আলোকিত হইয়া আছে,—দেখিয়া অত দুঃখেও একটু আরাম বোধ করিলাম। ঘাটের কাঁকরে ডিঙি ধাক্কা না খায়, এইজন্য ইন্দ্র পূর্বাহ্ণেই প্রস্তুত হইয়া মুখের কাছে সরিয়া আসিল এবং লাগিতে না লাগিতে লাফাইয়া পড়িয়াই একটা ভয়জড়িত স্বরে 'ইস্' করিয়া উঠিল। আমিও তাহার পশ্চাতে ছিলাম, সুতরাং উভয়েই প্রায় একসময়েই সেই বস্তুটির উপর দৃষ্টিপাত করিলাম। তবে সে নীচে, আমি নৌকার উপরে।

অকালমৃত্যু বোধ করি আর কখনও তেমন করুণভাবে আমার চোখে পড়ে নাই। ইহা যে কত বড় হৃদয়ভেদী ব্যথার আধার, তাহা তেমন করিয়া না দেখিলে বোধ করি দেখাই হয় না। গভীর নিশীথে চারিদিক নিবিড় স্তব্ধতায় পরিপূর্ণ। শুধু মাঝে মাঝে ঝোপ-ঝাড়ের অন্তরালে শ্মশানচারী শৃগালের ক্ষুধার্ত কলহ-চীৎকার, কখন বা বৃক্ষোপবিষ্ট অর্ধসুপ্ত বৃহৎকায় পক্ষীতাডন-শব্দ, আর বহুদূরাগত তীব্র জলপ্রবাহের অবিশ্রাম হু-হু-হু আর্তনাদ—ইহার মধ্যে দাঁড়াইয়া উভয়েই নির্বাক্, নিস্তব্ধ হইয়া এই মহাকরুণ দৃশ্যটির পানে চাহিয়া রহিলাম। একটি গৌরবর্ণ ছয়-সাত বৎসরের হৃষ্টপুষ্ট বালক—তাহার সর্বাঙ্গ জলে ভাসিতেছে, শুধু মাথাটি ঘাটের উপর। শৃগালেরা বোধ করি জল হইতে তাহাকে এইমাত্র তুলিতেছিল, শুধু আমাদের আকস্মিক আগমনে নিকটে কোথাও গিয়া অপেক্ষা করিয়া আছে। খুব সম্ভব তিন চারি ঘণ্টার অধিক তাহার মৃত্যু হয় নাই। ঠিক যেন বিসূচিকার নিদারুণ যাতনা ভোগ করিয়া সে বেচারা মা-গঙ্গার কোলের উপরই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। মা অতি সন্তর্পণে তাহার সুকুমার নশ্বর দেহটিকে এইমাত্র কোল হইতে বিছানায় শোয়াইয়া দিতে-ছিলেন। জলে-স্থলে বিন্যস্ত এমনিভাবেই সেই ঘুমন্ত শিশু দেহটির উপর সেদিন আমাদের চোখ পড়িয়াছিল।

মুখ তুলিয়া দেখি, ইন্দ্রের দুই চোখ বাহিয়া বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা ঝরিয়া পড়িতেছে। সে কহিল, তুই একটু সরে দাঁড়া শ্রীকান্ত, আমি এ-বেচারাকে ডিঙিতে তুলে ঐ চড়ার ঝাউবনের মধ্যে জলে রেখে আসি।

চোখের জল দেখিবামাত্র আমার চোখেও জল আসিতেছিল সত্য ; কিন্তু ছোঁয়া-ছুঁয়ির প্রস্তাবে আমি একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলাম। পরদুঃখে ব্যথা পাইয়া চোখের জল ফেলা সহজ নহে, তাহা অস্বীকার করি না ; কিন্তু তাই বলিয়া সেই দুঃখের মধ্যে নিজের দুই হাত বাড়াইয়া আপনাকে জড়িত করিতে যাওয়া—সে ঢের বেশি কঠিন কাজ। তখন ছোট-বড় কত জায়গাতেই

না টান ধরে। একে ত এই পৃথিবীর সেরা সনাতন হিন্দুর ঘরে বশিষ্ঠ ইত্যাদির পবিত্র পূজ্য রক্তের বংশধর হইয়া জন্মিয়া, জন্মগত সংস্কারবশতঃ মৃতদেহ স্পর্শ করাকেই একটা ভীষণ কঠিন ব্যাপার বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছি, ইহাতে কতই না শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের বাঁধাবাঁধি,—কতই না রকমারি কাণ্ডের ঘটা। তাহাতে এ কোন্ রোগের মড়া, কাহার ছেলে কি জাত—কিছুই না জানিয়া এবং মরিবার পর এ ছোকরা ঠিকমত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়াছিল কি না, সে খবরটা পর্যন্ত না লইয়াই বা ইহাকে স্পর্শ করা যায় কিরূপে ?

কুণ্ঠিত হইয়া যেই জিজ্ঞাসা করিলাম, কি জাতের মড়া—তুমি ছোঁবে ? ইন্দ্র সরিয়া আসিয়া এক হাত তাহার ঘাড়ের তলায় এবং অন্য হাত হাঁটুর নীচে দিয়া একটা শুষ্ক তৃণখণ্ডের মত স্বচ্ছন্দে তুলিয়া লইয়া কহিল, নইলে বেচারাকে শিয়ালে ছেঁড়াছিঁড়ি করে খাবে। আহা! মুখে এখনো এর ওষুধের গন্ধ পর্যন্ত রয়েছে রে। বলিয়া নৌকার যে তক্তাখানির উপর ইতিপূর্বে আমি শুইয়া পড়িয়াছিলাম, তাহারই উপর শোয়াইয়া নৌকা ঠেলিয়া দিয়া নিজেও চড়িয়া বসিল। কহিল, মড়ার কি জাত থাকে রে ?

আমি তর্ক করিলাম, কেন থাকবে না ?

ইন্দ্র কহিল, আরে এ যে মড়া! মড়ার আবার জাত কি ? এই যেমন আমাদের ডিঙিটা—এর কি জাত আছে ? আমগাছ, জামগাছ যে কাঠেরই তৈরী হোক্—এখন ডিঙি ছাড়া একে কেউ বলবে না—আমগাছ, জামগাছ—বুঝলি না ? এও তেমনি।

দৃষ্টান্তটি যে নেহাৎ ছেলেমানুষেরই মত, এখন তাহা জানি। কিন্তু অন্তরের মধ্যে ইহাও ত অস্বীকার করিতে পারি না—কোথায় যেন অতি তীক্ষ্ণ সত্য ইহারই মধ্যে আত্মগোপন করিয়া আছে। মাঝে মাঝে এমনি খাঁটি কথা সে বলিতে পারিত। তাই আমি অনেক সময় ভাবিয়াছি, ওই বয়সে কাহারও কাছে কিছুমাত্র শিক্ষা না করিয়া বরঞ্চ প্রচলিত শিক্ষা-সংস্কারকে অতিক্রম করিয়া, এই সকল তত্ত্ব সে পাইত কোথায় ? এখন কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গেই ইহার উত্তরটাও যেন পাইয়াছি বলিয়া মনে হয়। কপটতা ইন্দ্রের মধ্যে ছিল না। উদ্দেশ্যকে গোপন রাখিয়া কোন কাজ সে করিতেই জানিত না! সেই জন্যই বোধ করি তাহার সেই হৃদয়ের ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্ন সত্য কোন অজ্ঞাত নিয়মের বশে সেই বিশ্বব্যাপী অবিচ্ছিন্ন নিখিল সত্যের দেখা পাইয়া, সে

অনায়াসে অতি সহজেই তাহাকে নিজের মধ্যে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারিত। তাহার শুদ্ধ সরল বুদ্ধি পাকা ওস্তাদের উমেদারী না করিয়াই ঠিক ব্যাপারটি টের পাইত! বাস্তবিক, অকপট সহজ-বুদ্ধিই ত সংসারে পরম এবং চরম বুদ্ধি। ইহার উপরে ত কেহই নাই। ভাল করিয়া দেখিলে, মিথ্যা বলিয়া ত কোন বস্তুরই অস্তিই এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে চোখে পড়ে না। মিথ্যা শুধু মানুষের বুঝিবার এবং বুঝাইবার ফলটা। সোনাকে পিতল বলিয়া বুঝানও মিথ্যা, বুঝাও মিথ্যা, তাহা জানি। কিন্তু তাহাতে সোনারই বা কি, আর পিতলেরই বা কি আসে যায়। তোমরা যাহা ইচ্ছা বুঝ না, তাহারা যা তাই ত থাকে। সোনা মনে করিয়া তাহাকে সিন্দুকে বন্ধ করিয়া রাখিলেও তাহার সত্যকার মূল্যবৃদ্ধি হয় না, আর পিতল বলিয়া টান মারিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিলেও তাহার দাম কমে না। সেদিনও সে পিতল, আজও সে পিতলই। তোমার মিথ্যার জন্য তুমি ছাড়া আর কেহ দায়ীও হয় না, ভ্রূক্ষেপও করে না। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্তটাই পরিপূর্ণ সত্য। মিথ্যার অস্তিত্ব যদি কোথাও থাকে, তবে সে মনুষ্যের মন ছাড়া আর কোথাও নয়। সুতরাং এই অসত্যকে ইন্দ্র যখন তাহার অন্তরের মধ্যে জানিয়া হোক, না জানিয়া হোক, কোনদিন স্থান দেয় নাই, তখন তাহার বিশুদ্ধ বুদ্ধি যে মঙ্গল এবং সত্যকেই পাইবে তাহা ত বিচিত্র নয়!

কিন্তু তাহার পক্ষে বিচিত্র না হইলেও কাহারও পক্ষেই যে বিচিত্র নয়, এমন কথা বলিতেছি না। ঠিক এই উপলক্ষে আমার নিজের জীবনেই তাহার যে প্রমাণ পাইয়াছি, তাহা বলিবার লোভ এখানে সংবরণ করিতে পারিতেছি না। এই ঘটনার দশ-বারো বৎসর পরে, হঠাৎ একদিন অপরাহ্ণকালে সংবাদ পাওয়া গেল যে, একটি বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী ও-পাড়ায় সকাল হইতে মরিয়া পড়িয়া আছেন—কোনমতেই তাঁহার সৎকারের লোক জুটে নাই। না জুটিবার হেতু এই যে, কাশী হইতে ফিরিবার পথে রোগগ্রস্ত হইয়া এই শহরেই রেলগাড়ি হইতে নামিয়া পড়েন এবং সামান্য পরিচয়সূত্রে যাঁহার বাটীতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এক দুই রাত্রি বাস করিয়া আজ সকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তিনি 'বিলাত-ফেরত' এবং সে সময়ে 'একঘরে'। ইহাই বৃদ্ধার অপরাধ যে, তাঁহাকে নিতান্ত নিরুপায় অবস্থায় এই 'একঘরে'র বাটীতে মরিতে হইয়াছে।

যাহা হউক, সৎকার করিয়া পরদিন সকালে ফিরিয়া আসিয়া দেখা গেল, প্রত্যেকেরই বাটীর কবাট বন্ধ হইয়া গিয়াছে। শুনিতে পাওয়া গেল, গতরাত্রি

এগারোটা পর্যন্ত হারিকেন-লণ্ঠন হাতে সমাজপতিরা বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন এবং স্থির করিয়া দিয়াছেন যে, এই অত্যন্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ অপকর্ম (দাহ) করার জন্য এই কুলাঙ্গারদিগকে কেশচ্ছেদ করিতে হইবে, 'ঘাট মানিতে হইবে এবং এমন একটা বস্তু সর্বসমক্ষে ভোজন করিতে হইবে, যাহা সুপবিত্র হইলেও খাদ্য নয়! তাঁহারা স্পষ্ট করিয়া প্রতি বাড়িতেই বলিয়া দিয়াছেন যে, ইহাতে তাঁহাদের কোনই হাত নাই; কারণ জীবিত থাকিতে তাঁহারা অশাস্ত্রীয় কাজ সমাজের মধ্যে কিছুতেই ঘটিতে দিতে পারিবেন না। আমরা অনন্যোপায় হইয়া ডাক্তারবাবুর শরণাপন্ন হইলাম। তিনিই তখন শহরের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক এবং বিনা-দক্ষিণায় বাঙ্গালীর বাটীতে চিকিৎসা করিতেন। আমাদের কাহিনী শুনিয়া ডাক্তারবাবু ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া প্রকাশ করিলেন, যাহারা এইরূপ নির্যাতন করিতেছেন, তাঁহাদের বাটীর কেহ চোখের সম্মুখে বিনা-চিকিৎসায় মরিয়া গেলেও তিনি সেদিকে আর চাহিয়া দেখিবেন না। কে এই কথা তাঁহাদের গোচর করিল, জানি না। দিবা অবসান না হইতেই শুনিলাম, কেশচ্ছেদের আবশ্যকতা নাই, শুধু 'ঘাট' মানিয়া সেই সুপবিত্র পদার্থটা ভক্ষণ করিলেই হইবে। আমরা স্বীকার না করায় পরদিন প্রাতঃকালে শুনিলাম, ঘাট মানিলেই হইবে—ওটা না হয় নাই খাইলাম। ইহাও অস্বীকার করায় শোনা গেল, আমাদের এই প্রথম অপরাধ বলিয়া তাঁহারা এমনিই মার্জনা করিয়াছেন—প্রায়শ্চিত্ত করিবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু ডাক্তারবাবু কহিলেন, প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যকতা নাই বটে, কিন্তু তাঁহারা যে এই দু'টা দিন ইহাদিগকে ক্লেশ দিয়াছেন সেইজন্য যদি প্রত্যেকে আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া না যান, তাহা হইলে তাঁহার যে কথা সেই কাজ; অর্থাৎ তিনি কাহারও বাটীতে যাইবেন না। তারপর সেই সন্ধ্যাবেলাতেই ডাক্তারবাবুর বাটীতে একে একে বৃদ্ধ সমাজপতিদিগের শুভাগমন হইয়াছিল। আশীর্বাদ করিয়া তাঁহারা কি কি বলিয়াছিলেন, তাহা অবশ্য শুনিতে পাই নাই; কিন্তু পরদিন ডাক্তারবাবুর আর ক্রোধ ছিল না, আমাদিগকে ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়ই নাই।

যাক, কি কথায় কি কথা আসিয়া পড়িল। কিন্তু সে যাই হোক, আমি নিশ্চয় জানি—যাঁহারা জানেন, তাঁহারা এই নামধামহীন বিবরণটির মধ্যে সমস্ত সত্যটিই উপলব্ধি করিবেন। আমার বলিবার মূল বিষয়টি এই যে, ইন্দ্র ঐ বয়সে নিজের অন্তরের মধ্যে যে সত্যটির সাক্ষাৎ পাইয়াছিল, অত বড়

বড় সমাজপতিরা অতটা প্রাচীন বয়স পর্যন্ত তাহার কোন তত্ত্বই পান নাই; এবং ডাক্তারবাবু সেদিন অমন করিয়া তাঁহাদের শাস্ত্রজ্ঞানের চিকিৎসা না করিয়া দিলে, কোনদিন এ ব্যাধি তাঁহাদের আরোগ্য হইত কি না, তাহা জগদীশ্বরই জানেন।

চড়ার উপর আসিয়া অর্ধমগ্ন বন-ঝাউয়ের অন্ধকারের মধ্যে জলের উপর সেই অপরিচিত শিশুদেহটিকে ইন্দ্র যখন অপূর্ব মমতার সহিত রাখিয়া দিল, তখন রাত্রি আর বড় বাকী নাই। কিছুক্ষণ ধরিয়া সে সেই শবের পানে মাথা ঝুঁকাইয়া থাকিয়া অবশেষে যখন মুখ তুলিয়া চাহিল, তখন অস্ফুট চন্দ্রালোকে তাহার মুখের যতটুকু দেখা গেল, তাহাতে—অত্যন্ত ম্লান এবং উৎকর্ণ হইয়া অপেক্ষা করিয়া থাকিলে যেরূপ দেখায়, তাহার শুষ্কমুখে ঠিক সেই ভাব প্রকাশ পাইল।

আমি বলিলাম, ইন্দ্র, এইবার চল।

ইন্দ্র অন্যমনস্কভাবে কহিল, কোথায়?

এই যে বললে, কোথায় যাবে?

থাক—আজ আর না।

আমি খুশি হইয়া কহিলাম, বেশ, তাই ভাল ভাই—চল বাড়ি যাই।

প্রত্যুত্তরে ইন্দ্র আমার মুখের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল,—হাঁ রে শ্রীকান্ত, মরলে মানুষ কি হয়, তুই জানিস?

আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম, না ভাই জানিনে। তুমি বাড়ি চল। তারা সব স্বর্গে যায় ভাই। তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমাকে বাড়ি রেখে এস।

ইন্দ্র যেন কর্ণপাতই করিল না, কহিল, সবাই ত স্বর্গে যেতে পায় না। তা ছাড়া, খানিকক্ষণ সবাইকেই এখানে থাকতে হয়। দ্যাখ, আমি যখন ওকে জলের উপর শুইযে দিচ্ছিলুম, তখন সে চুপি চুপি স্পষ্ট বললে, 'ভেইয়া'।

আমি কম্পিতকণ্ঠে কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিয়া উঠিলাম, কেন ভয় দেখাচ্ছ ভাই, আমি অজ্ঞান হয়ে যাবো।

ইন্দ্র কথা কহিল না, অভয় দিল না, ধীরে ধীরে বোটে হাতে করিয়া নৌকা ঝাউবন হইতে বাহির করিয়া ফেলিল এবং সোজা বাহিতে লাগিল। মিনিট দুই নিঃশব্দে থাকিয়া গম্ভীর মৃদুস্বরে কহিল, শ্রীকান্ত, মনে মনে রামনাম কর, সে নৌকা ছেড়ে যায়নি—আমার পেছনেই বসে আছে।

তারপর সেইখানেই মুখ গুঁজিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়াছিলাম। আর

আমার মনে নাই। যখন চোখ চাহিলাম তখন অন্ধকার নাই—নৌকা কিনারায় লাগানো। ইন্দ্র আমার পায়ের কাছে বসিয়াছিল; কহিল, এইটুকু হেঁটে যেতে হবে শ্রীকান্ত, উঠে বোস্।

চার

পা আর চলে না—এম্‌নি করিয়া গঙ্গার ধারে ধারে চলিয়া সকালবেলা রক্তচক্ষু ও একান্ত শুষ্ক ম্লানমুখে বাটী ফিরিয়া আসিলাম। একটা সমারোহ পড়িয়া গেল। এই যে! এই যে! করিয়া সবাই সমস্বরে এমনি অভ্যর্থনা করিয়া উঠিল যে, আমার হৃৎপিণ্ড থামিয়া যাইবার উপক্রম হইল।

যতীনদা আমার প্রায় সমবয়সী। অতএব তাহার আনন্দটাই সর্বাপেক্ষা প্রচণ্ড। সে কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া উন্মত্ত চীৎকার শব্দে—এসেছে শ্রীকান্ত—এই এল, মেজদা! বলিয়া বাড়ি ফাটাইয়া আমার আগমন-বার্তা ঘোষণা করিয়া দিল এবং মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া পরম সমাদরে আমার হাতটি ধরিয়া টানিয়া আনিয়া বৈঠকখানায় পাপোশের উপর দাঁড় করাইয়া দিল।

সেখানে মেজদা গভীর মনোযোগের সহিত 'পাশের পড়া' পড়িতেছিলেন। মুখ তুলিয়া একটিবার মাত্র আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া পুনশ্চ পড়ায় মন দিলেন। অর্থাৎ বাঘ শিকার হস্তগত করিয়া নিরাপদে বসিয়া যেরূপ অবহেলার সহিত অন্যদিকে চাহিয়া থাকে, তাঁহারও সেই ভাব। শাস্তি দিবার এতবড় মাহেন্দ্রযোগ তাঁহার ভাগ্যে আর কখনও ঘটিয়াছে কি না, সন্দেহ।

মিনিটখানেক চুপচাপ। সারারাত্রি বাহিরে কাটাইয়া গেলে কর্ণযুগল ও উভয় গণ্ডের উপর যে-সকল ঘটনা ঘটিবে, তাহা আমি জানিতাম। কিন্তু আর যে দাঁড়াইতে পারি না। অথচ কর্মকর্তারও ফুরসৎ নাই। তাঁহারও যে আবার 'পাশের পড়া'।

আমাদের এই মেজদাদাটিকে আপনারা বোধ করি এত শীঘ্র বিস্মৃত হন নাই। সেই, যাঁহার কঠোর তত্ত্বাবধানে কাল সন্ধ্যাকালে আমরা পাঠাভ্যাস করিতেছিলাম এবং ক্ষণেক পরেই, যাঁহার সুগম্ভীর 'ওঁ ওঁ' রবে ও সেজ-উল্টানোর চোটে গত রাত্রির সেই 'দি রয়েল বেঙ্গল'কেও দিশাহারা হইয়া একেবারে ডালিমতলায় ছুটিয়া পালাইতে হইয়াছিল,—সেই তিনি।

পাঁজিটা একবার দেখ্ দেখি রে সতীশ, এ বেলা আবার বেগুন খেতে আছে না কি ; বলিতে বলিতে পাশের দ্বার ঠেলিয়া পিসিমা ঘরে পা দিয়াই আমাকে দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন—কখন এলি রে? কোথায় গিয়েছিলি? ধন্যি ছেলে বাবা তুমি—সারা রাত্রিটা ঘুমোতে পারিনি—ভেবে মরি, সেই যে ইন্দ্রের সঙ্গে চুপি-চুপি বেরিয়ে গেল—আর দেখা নেই। না খাওয়া, না দাওয়া ; কোথা ছিলি বল্ ত হতভাগা? মুখ কালিবর্ণ, চোখ রাঙা—ছল্ ছল্ করছে, বলি জ্বর-টর হয়নি ত? কই, কাছে আয় ত, গা দেখি—একসঙ্গে এতগুলো প্রশ্ন করিয়া পিসিমা নিজেই আগাইয়া আসিয়া আমার কপালে হাত দিয়াই বলিয়া উঠিলেন, যা ভেবেচি তাই। এই যে বেশ গা গরম হয়েচে—এমন সব ছেলের হাত-পা বেঁধে জলবিছুটি দিলে তবে আমার রাগ যায়। তোমাকে বাড়ি থেকে একেবারে বিদেয় ক'রে তবে আমার আর কাজ। চল্ ঘরে গিয়ে শুবি, আয় হতভাগা ছোঁড়া!—বলিয়া তিনি বার্তাকু-ভক্ষণের প্রশ্ন বিস্মৃত হইয়া আমার হাত ধরিয়া কোলের কাছে টানিয়া লইলেন।

মেজদা জলদগম্ভীর-কণ্ঠে সংক্ষেপে কহিলেন, এখন ও যেতে পারবে না।

কেন, কি করবে ও? না না, এখন আর পড়তে হবে না! আগে যা হোক দুটো মুখে দিয়ে একটু ঘুমোক। আয় আমার সঙ্গে,—বলিয়া পিসিমা আমাকে লইয়া চলিবার উপক্রম করিলেন।

কিন্তু শিকার যে হাতছাড়া হয়! মেজদা স্থান-কাল ভুলিয়া প্রায় চীৎকার করিয়া আমাকে ধমক দিয়া উঠিলেন—খবরদার! যাস্‌নে বলচি শ্রীকান্ত।

পিসিমা পর্যন্ত যেন একটু চমকিয়া উঠিলেন। তারপরে মুখ ফিরাইয়া মেজদার প্রতি চাহিয়া শুধু কহিলেন—সতে। পিসিমা অত্যন্ত রাশভারী লোক। বাড়িসুদ্ধ সবাই তাঁহাকে ভয় করিত। মেজদা সে চাহনির সম্মুখে ভয়ে একেবারে জড়সড় হইয়া উঠিল। আবার পাশের ঘরেই বড়দা বসেন। কথাটা তাঁর কানে গেলে আর রক্ষা থাকিত না।

পিসিমার একটা স্বভাব আমরা চিরদিন লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি, কখনও কোন কারণেই তিনি চেঁচামেচি করিয়া লোক জড় করিয়া তুলিতে ভালবাসিতেন না। হাজার রাগ হইলেও তিনি জোরে কথা বলিতেন না। তিনি কহিলেন, তাই বুঝি ও দাঁড়িয়ে এখানে? দেখ্ সতীশ, যখন তখন

শুনি, তুই ছেলেদের মারধোর করিস্। আজ থেকে কারো গায়ে যদি তুই হাত দিস্ আমি জানতে পারি, এই থামে বেঁধে চাকর দিয়ে তোকে আমি বেত দেওয়াব। বেহায়া, নিজে ফি বছর ফেল হচ্ছে—ও আবার যায় পরকে শাসন করতে। কেউ পড়ুক, না পড়ুক, কারুকে তুই জিজ্ঞেসা পর্যন্ত করতে পাবিনে—বলিয়া তিনি আমাকে লইয়া যে পথে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই পথে বাহির হইয়া গেলেন। মেজদা মুখ কালি করিয়া বসিয়া রহিল। এ আদেশ অবহেলা করিবার সাধ্য বাড়িতে কাহারও নাই—সেকথা মেজদা ভাল করিয়াই জানিত।

আমাকে সঙ্গে করিয়া পিসিমা তাঁর নিজের ঘরের মধ্যে আনিয়া কাপড় ছাড়াইয়া দিলেন এবং পেট ভরিয়া গরম-গরম জিলাপি আহার করাইয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া—আমি মরিলেই তাঁর হাড় জুড়ায়—এই কথা জানাইয়া দিয়া বাহির হইতে শিকল বন্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন।

মিনিট পাঁচেক পরেই খুট করিয়া সাবধানে শিকল খুলিয়া ছোড়দা হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া আমার বিছানার উপর উপুড় হইয়া পড়িল। আনন্দের আতিশয্যে প্রথমটা সে কথা কহিতেই পারিল না। একটুখানি 'দম' লইয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল, মেজদাকে মা কি হুকুম দিয়েচে জানিস? আমাদের কোন কথায় তার থাকবার জো-টি নেই। তুই, আমি, যতে একঘরে প'ড়ব—মেজদা অন্য ঘরে প'ড়বে। আমাদের পুরানো পড়া বড়দা দেখবেন। ওকে আমরা আর কেয়ার করব না—বলিয়া সে দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ একত্র করিয়া সবেগে আন্দোলিত করিয়া দিল।

যতীনদাও পিছনে পিছনে আসিয়া হাজির হইয়াছিল। সে তাহার কৃতিত্বের উত্তেজনায় একেবারে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল এবং ছোড়দাকে এই শুভসংবাদ দিয়া সে-ই এখানে আনিয়াছিল। প্রথমে সে খুব খানিকটা হাসিয়া লইল। হাসি থামিলে নিজের বুকে বারংবার করাঘাত করিয়া কহিল, আমি! আমি! আমার জন্যেই হ'লো তা জানো? ওকে আমি মেজদার কাছে না নিয়ে গেলে কি মা হুকুম দিত! ছোড়দা, তোমার কলের লাট্টুটা কিন্তু আমাকে দিতে হবে, তা বলে দিচ্চি।

আচ্ছা দিলুম। নিগে যা আমার ডেস্ক থেকে, বলিয়া ছোড়দা তৎক্ষণাৎ হুকুম দিয়া ফেলিল। কিন্তু এই লাট্টুটা বোধ করি সে ঘন্টাখানেক পূর্বে পৃথিবীর বিনিময়েও দিতে পারিত না।

এমনিই মানুষের স্বাধীনতার মূল্য। এমনিই মানুষের ব্যক্তিগত ন্যায্য অধিকার লাভ করার আনন্দ। আজ আমার কেবলই মনে হইতেছে—শিশুদের কাছেও তাহার দুর্মূল্যতা একবিন্দু কম নয়। মেজদা তাহার অগ্রজের অধিকারে স্বেচ্ছাচারে ছোটদের যে সমস্ত অধিকার গ্রাস করিয়া বসিয়াছিল, তাহাকেই ফিরিয়া পাইবার সৌভাগ্যে ছোড়দা তাহার প্রাণতুল্য প্রিয় বস্তুটিকেও অসঙ্কোচে হাতছাড়া করিয়া ফেলিল। বস্তুতঃ মেজদার অত্যাচারের আর সীমা ছিল না; রবিবারে দুপুর-রৌদ্রে এক মাইল পথ হাঁটিয়া গিয়া তাঁহার তাসখেলার বন্ধু ডাকিয়া আনিতে হইত; গ্রীষ্মের ছুটির দিনে তাঁহার দিবানিদ্রার সমস্ত সময়টা পাখার বাতাস করিতে হইত; শীতের রাত্রে তিনি লেপের মধ্যে হাত-পা ঢুকাইয়া কচ্ছপের মত বসিয়া বই পড়িতেন, আর আমাদিগকে কাছে বসিয়া তাঁহার বহির পাতা উল্টাইয়া দিতে হইত—এমনি সমস্ত অত্যাচার! অথচ 'না' বলিবার জো নাই, কাহারও কাছে অভিযোগ করিবার সাধ্য পর্যন্ত নাই। ঘুণাক্ষরে জানিতে পারিলেও তৎক্ষণাৎ হুকুম করিয়া বসিতেন, কেশব, তোমার জিয়োগ্রাফি আনো, পুরানো পড়া দেখি। যতীন, যাও, একটা ভাল দেখে ঝাউয়ের ছড়ি ভেঙে আনো। অর্থাৎ প্রহার অনিবার্য। অতএব আনন্দের মাত্রাও যে ইহাদের বাড়াবাড়িতে গিয়া পড়িবে ইহাও আশ্চর্যের বিষয় নয়।

কিন্তু সে যতই হোক, আপাততঃ তাহাকে স্থগিত রাখা আবশ্যক, কারণ, স্কুলের সময় হইতেছে। আমার জ্বর—সুতরাং কোথাও যাইতে হইবে না।

মনে পড়ে সেই রাত্রেই জ্বরটা প্রবল হইয়াছিল এবং সাত আট দিন পর্যন্ত শয্যাগত ছিলাম।

তার কতদিন পরে স্কুলে গিয়াছিলাম এবং আরও যে কতদিন পরে ইন্দ্রের সহিত আবার দেখা হইয়াছিল, তাহা মনে নাই। কিন্তু সেটা যে অনেকদিন পরে, এ-কথা মনে আছে। সেদিন শনিবার। স্কুল হইতে সকাল সকাল ফিরিয়াছি। গঙ্গার তখন জল মরিতে শুরু করিয়াছে। তাহারই সংলগ্ন একটা নালার ধারে বসিয়া, ছিপ দিয়া ট্যাংরা মাছ ধরিতে বসিয়া গিয়াছি। অনেকেই ধরিতেছে। হঠাৎ চোখ পড়িল, কে একজন অদূরে একটা শর-ঝাড়ের আড়ালে বসিয়া টপাটপ্ মাছ ধরিতেছে।

লোকটিকে ভাল দেখা যায় না, কিন্তু তাহার মাছধরা দেখা যায়। অনেকক্ষণ হইতেই আমার এ-জায়গাটা পছন্দ হইতেছিল না। মনে করিলাম, উহারই পাশে গিয়া বসি। ছিপ হাতে করিয়া একটুখানি ঘুরিয়া দাঁড়াইবামাত্র সে কহিল, আমার ডান দিকে বোস্। ভাল আছিস্ ত রে শ্রীকান্ত? বুকের ভিতরটা ধক্ করিয়া উঠিল। তখনও তাহার মুখ দেখিতে পাই নাই; কিন্তু বুঝিলাম, এ ইন্দ্র। দেহের ভিতর দিয়া বিদ্যুতের তীব্র প্রবাহ বহিয়া গেলে যে যেখানে আছে একমুহূর্তে যেমন সজাগ হইয়া উঠে, ইহার কণ্ঠস্বরেও আমার সেই দশা হইল। চক্ষের পলকে সর্বাঙ্গের রক্ত চঞ্চল উদ্দাম হইয়া বুকের উপর আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিল। কোনমতেই মুখ দিয়া একটা জবাব বাহির হইল না। এই কথাগুলি লিখিলাম বটে, কিন্তু জিনিসটা ভাষায় ব্যক্ত করিয়া পরকে বুঝানো শুধুই যে অত্যন্ত কঠিন তা নয়, বোধ করি বা অসাধ্য! কারণ, বলিতে গেলে, এই সমস্ত বহু-ব্যবহৃত মামুলি বাক্যরাশি—যেমন বুকের রক্ত তোলপাড় করা—উদ্দাম চঞ্চল হইয়া আছাড় খাওয়া,—তড়িৎপ্রবাহ বহিয়া যাওয়া—এই সব ছাড়া ত আর পথ নাই! কিন্তু কতটুকু ইহাতে বুঝাইল? যে জানে না, তাহার কাছে আমার মনের কথা কতটুকু প্রকাশ পাইল। আমিই বা কি করিয়া তাহাকে জানাইব, এবং সে-ই বা কি করিয়া তাহা জানিবে? যে নিজের জীবনে একটি দিনের তরেও অনুভব করে নাই, যাহাকে প্রতিনিয়ত স্মরণ করিয়াছি, কামনা করিয়াছি, আকাঙ্ক্ষা করিয়াছি, অথচ পাছে কোথাও কোনরূপে দেখা হইয়া পড়ে এই ভয়েও অহরহ কাঁটা হইয়া আছি, সে এমনি অকস্মাৎ, এতই অভাবনীয়রূপে আমার চোখের উপর থাকিয়া আমাকে পার্শ্বে আসিয়া বসিতে অনুরোধ করিল! পার্শ্বে গিয়াও বসিলাম, কিন্তু তখনও কথা কহিতে পরিলাম না।

ইন্দ্র কহিল, সেদিন ফিরে এসে বড় মার খেয়েছিলি—না রে শ্রীকান্ত? আমি তোকে নিয়ে গিয়ে ভাল কাজ করিনি। আমার সেজন্যে রোজ বড় দুঃখ হয়।

আমি মাথা নাড়িয়া জানাইলাম, মার খাই নাই।

ইন্দ্র খুশি হইয়া বলিল, খাসনি। দেখ্ রে শ্রীকান্ত, তুই চ'লে গেলে আমি মা কালীকে অনেক ডেকেছিলাম—যেন তোকে কেউ না মারে। কালীঠাকুর বড় জাগ্রত দেবতা রে। মন দিয়ে ডাকলে কখনো কেউ মারতে পারে না।

মা এসে তাদের এমনি ভুলিয়ে দেন যে, কেউ কিছু করতে পারে না—বলিয়া সে ছিপটা রাখিয়া দুই হাত জোড করিয়া কপালে ঠেকাইয়া, বোধ করি তাঁকেই মনে মনে প্রণাম করিল। বঁড়শিতে একটা টোপ দিয়া সেটা জলে ফেলিয়া বলিল, আমি তো ভাবিনি তোর জ্বর হবে; তা হ'লে সেও হ'তে দিতুম না।

আমি আস্তে আস্তে প্রশ্ন করিলাম, কি করতে তুমি?

ইন্দ্র কহিল, কিছুই না। শুধু জবাফুল তুলে এনে মা কালীর পায়ে দিতুম। উনি জবাফুল বড় ভালবাসেন। যে যা ব'লে দেয়, তার তাই হয়। এ ত সবাই জানে। তুই জানিস্ নে?

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার অসুখ করেনি?

ইন্দ্র আশ্চর্য হইয়া কহিল, আমার? আমার কখ্খনো অসুখ করে না, কখনো কিছু হয় না। হঠাৎ উদ্দীপ্ত হইয়া বলিল, দেখ্ শ্রীকান্ত, আমি তোকে একটা জিনিস শিখিয়ে দেব। যদি তুই দুবেলা খুব মন দিয়ে ঠাকুর-দেবতার নাম করিস্—তাঁরা সব সামনে এসে দাঁড়াবেন, তুই স্পষ্ট দেখতে পাবি; তখন আর তোর কোন অসুখ করবে না। কেউ তোর একগাছি চুল পর্যন্ত ছুঁতে পারবে না—তুই আপনি টের পাবি। আমার মতন যেখানে খুশি যা, যা খুশি কর্, কোন ভাবনা নেই। বুঝলি?

আমি ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, হুঁ। বঁড়শিতে টোপ দিয়া জলে ফেলিয়া মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম, এখন তুমি কাকে নিয়ে সেখানে যাও?

কোথায়?

ওপারে মাছ ধরতে?

ইন্দ্র ছিপটা তুলিয়া লইয়া সাবধানে পাশে রাখিয়া বলিল, আমি আর যাইনে।

তাহার কথা শুনিয়া ভারি আশ্চর্য হইয়া গেলাম। কহিলাম, আর একদিনও যাওনি?

না, একদিনও না। আমাকে মাথার দিব্যি দিয়ে—কথাটা ইন্দ্র শেষ না করিয়াই ঠিক যেন থতমত খাইয়া চুপ করিয়া গেল।

উহার সম্বন্ধে এই কথাই আমাকে অহরহ খোঁচার মত বিঁধিয়াছে। কোনমতেই সেই সেদিনের মাছ-বিক্রিটা ভুলিতে পারি নাই। তাই সে যদি

বা চুপ করিয়া গেল, আমি পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, কে মাথার দিব্যি দিলে ভাই? তোমার মা?

না, মা নয়।—বলিয়া ইন্দ্র চুপ করিয়া রহিল। তার পরে সে ছিপের গায়ে সুতাটা ধীরে ধীরে জড়াইতে জড়াইতে কহিল, শ্রীকান্ত, আমাদের সে রাত্রির কথা তুই বাড়িতে বলে দিস্ নি?

আমি বলিলাম, না। কিন্তু তোমার সঙ্গে চলে গিয়েছিলাম তা সবাই জানে।

ইন্দ্র আর কোন প্রশ্ন করিল না। আমি ভাবিয়াছিলাম, এইবার সে উঠিবে। কিন্তু তাহাও করিল না—চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার মুখে সর্বদাই কেমন একটা হাসির ভাব থাকে, এখন তাহাও নাই, এবং কি একটা সে যেন আমাকে বলিতে চায়, অথচ তাহাও পারিতেছে না, বলিয়া উঠিতেও পারিতেছে না—বসিয়া থাকিতেও যেন অস্বস্তি বোধ করিতেছে। আপনারা পাঁচজন এখানে হয়ত বলিয়া বসিবেন, এটি বাপু তোমার কিন্তু মিছে কথা। অতখানি মনস্তত্ত্ব আবিষ্কার করিবার বয়সটা ত তা' নয়। আমিও তাহা স্বীকার করি। কিন্তু আপনারাও এ কথাটা ভুলিতেছেন যে, আমি ইন্দ্রকে ভালবাসিয়াছিলাম। একজন আর একজনের মন বুঝে সহানুভূতি এবং ভালবাসা দিয়া—বয়স এবং বুদ্ধি দিয়া নয়। সংসারে যে যত ভালবাসিয়াছে, পরের হৃদয়ের ভাষা তাহার কাছে তত ব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই অত্যন্ত কঠিন অন্তর্দৃষ্টি শুধু ভালবাসার জোরেই পাওয়া যায়, আর কিছুতে নয়। তাহার প্রমাণ দিতেছি। ইন্দ্র মুখ তুলিয়া কি যেন বলিতে গেল, কিন্তু বলিতে না পারিয়া সমস্ত মুখ তাহার অকারণে রাঙ্গা হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি একটা শরের ডাঁটা ছিঁড়িয়া নতমুখে জলের উপর নাড়িতে নাড়িতে কহিল, শ্রীকান্ত!

কি ভাই?

তোর—তোর কাছে টাকা আছে?

ক'টাকা?

ক'টাকা? এই - ধর্, পাঁচ টাকা—

আছে। তুমি নেবে? বলিয়া আমি ভারি খুশি হইয়া তাহার মুখপানে চাহিলাম। এই কয়টি টাকাই আমার ছিল। ইন্দ্রের কাজে লাগিবার অপেক্ষা তাহার সদ্ব্যবহার আমি কল্পনা করিতেও পারিতাম না। কিন্তু ইন্দ্র ত কৈ খুশি

হইল না। মুখ যেন তাহার অধিকতর লজ্জায় কি একরকম হইয়া গেল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কিন্তু আমি ত এখন তোকে ফিরিয়ে দিতে পারব না।

আমি আর চাইনে, বলিয়া সগর্বে তাহার মুখের পানে চাহিলাম।

আবার কিছুক্ষণ সে মুখ নীচু করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, আমি নিজে চাইনে। একজনদের দিতে হবে, তাই। তারা বড় দুঃখী রে—খেতেও পায় না। তুই যাবি সেখানে?

চক্ষের নিমেষে আমার সেই রাত্রির কথা মনে পড়িল। কহিলাম, সেই যাদের তুমি টাকা দিতে নেমে যেতে চেয়েছিলে?

ইন্দ্র অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, হ্যাঁ, তারাই। টাকা আমি নিজেই ত কত দিতে পারি, কিন্তু দিদি যে কিছুতে নিতে চায় না। তোকে একটিবার যেতে হবে শ্রীকান্ত, নইলে এ টাকাও নেবে না; মনে করবে আমি মায়ের বাক্স থেকে চুরি ক'রে এনেচি। যাবি শ্রীকান্ত?

তারা বুঝি তোমার দিদি হয়?

ইন্দ্র একটু হাসিয়া কহিল, না দিদি হয় না—দিদি বলি। যাবি ত?

আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া তখনি কহিল, দিনের বেলা গেলে সেখানে কোন ভয় নেই। কাল রবিবার; তুই খেয়ে-দেয়ে এইখানে দাঁড়িয়ে থাকিস্, আমি নিয়ে যাব; আবার তখ্খুনি ফিরিয়ে আন্‌ব। যাবি ত ভাই? বলিয়া যেমন করিয়া সে আমার হাতটি ধরিয়া মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তাহাতে আমার 'না' বলিবার সাধ্য রহিল না। আমি দ্বিতীয়বার তাহার নৌকায় উঠিবার কথা দিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম।

কথা দিলাম সত্য, কিন্তু সে যে কতবড় দুঃসাহসের কথা, সে ত আমার চেয়ে কেউ বেশি জানে না। সমস্ত বিকালবেলাটা মন ভারী হইয়া রহিল, এবং রাত্রে ঘুমের ঘোরে প্রগাঢ় অশান্তির ভাব সর্বাঙ্গে বিচরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। ভোরবেলা উঠিয়া সর্বাগ্রে ইহাই মনে পড়িল, আজ যেখানে যাইব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছি, সেখানে যাইলে কোনমতেই আমার ভাল হইবে না। কোন সূত্রে কেহ জানিতে পারিলে, ফিরিয়া আসিয়া যে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে, মেজদার জন্যও ছোড়দা বোধ করি সে শাস্তি কামনা করিতে পারিত না। অবশেষে খাওয়া-দাওয়া শেষ হইলে টাকা পাঁচটি লুকাইয়া লইয়া নিঃশব্দে যখন বাহির হইয়া পড়িলাম, তখন

এমন কথাও অনেকবার মনে হইল—কাজ নাই গিয়া। নাই বা কথা রাখিলাম ; এমনই বা তাহাতে কি আসে যায়। যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, শর-ঝাড়ের নীচে সেই ছোট্ট নৌকাটির উপর ইন্দ্র উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিয়া আছে। চোখাচোখি হইবামাত্র সে এমন করিয়া হাসিয়া আহ্বান করিল যে, না-যাওয়ার কথা মুখে আনিতেও পারিলাম না। সাবধানে ধীরে-ধীরে নামিয়া নিঃশব্দে নৌকাটিতে চড়িয়া বসিলাম। ইন্দ্র নৌকা ছাড়িয়া দিল।

আজ মনে ভাবি, আমার বহুজন্মের সুকৃতির ফল যে, সেদিন ভয়ে পিছাইয়া আসি নাই। সেই দিনটিকে উপলক্ষ্য করিয়া যে জিনিসটি দেখিয়া লইয়াছিলাম, সারা জীবনের মধ্যে পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াইয়াও তেমন কয়জনের ভাগ্যে ঘটে ? আমিই বা তাহার মত আর কোথায় দেখিতে পাইলাম ? জীবনে এমন সব শুভ মুহূর্ত অনেকবার আসে না। একবার যদি আসে, সে সমস্ত চেতনার উপর এমন গভীর একটা ছাপ মারিয়া দিয়া যায় যে, সেই ছাঁচেই সমস্ত পরবর্তী জীবন গড়িয়া উঠিতে থাকে। আমার তাই বোধ হয়, স্ত্রীলোককে কখনও আমি ছোট করিয়া দেখিতে পারিলাম না। বুদ্ধি দিয়া যতই কেন না তর্ক করি, সংসারে পিশাচী কি নাই ? নাই যদি, তবে পথে-ঘাটে এত পাপের মূর্তি দেখি কাহাদের ? সবাই যদি সেই ইন্দ্রর দিদি, তবে এত প্রকার দুঃখের স্রোত বহাইতেছে কাহারা ? তবুও কেমন করিয়া যেন মনে হয়, এ সকল তাহাদের শুধু বাহ্য আবরণ ; যখন খুশি ফেলিয়া দিয়া ঠিক তাঁর মতই সতীর আসনের উপর অনায়াসে গিয়া বসিতে পারে। বন্ধুরা বলেন, ইহা আমার একটি অতি জঘন্য শোচনীয় ভ্রম মাত্র। আমি তাহারও প্রতিবাদ করি না। শুধু বলি, ইহা আমার যুক্তি নয়—আমার সংস্কার। সংস্কারের মূলে যিনি, জানি না সেই পুণ্যবতী আজও বাঁচিয়া আছেন কি না। থাকিলেও কোথায় কি ভাবে আছেন, তাঁহার নির্দেশমত কখনো কোন সংবাদ লইবার চেষ্টাও করি নাই। কিন্তু কত যে মনে মনে তাঁকে প্রণাম করিয়াছি, তাহা যিনি সব জানিতে পারেন, তিনিই জানেন।

শ্মশানের সেই সঙ্কীর্ণ ঘাটের পাশে বটবৃক্ষমূলে ডিঙ্গি বাঁধিয়া যখন দুজনে রওনা হইলাম, তখন অনেক বেলা ছিল। কিছুদূর গিয়া ডানদিকে বনের ভিতর ঠাহর করিয়া দেখায়, একটা পথের মতও দেখা গেল। ইন্দ্র তাহাই ধরিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। প্রায় দশ মিনিট চলিবার পর একটা

পর্ণকুটীর দেখা গেল। কাছে আসিয়া দেখিলাম, ভিতরে ঢুকিবার পথ আগড দিয়া আবদ্ধ। ইন্দ্র সাবধানে তাহার বাঁধন খুলিয়া ঠেলা দিয়া প্রবেশ করিল এবং আমাকে টানিয়া লইয়া পুনরায় তেমনি করিয়া বাঁধিয়া দিল। আমি তেমন বাসস্থান কখনো জীবনে দেখি নাই। একে ত চতুর্দিকেই নিবিড জঙ্গল, তাহাতে মাথার উপরে একটা প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছ এবং পাকুড় গাছে সমস্ত জায়গাটা যেন অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের সাডা পাইয়া একপাল মুরগি এবং ছানাগুলো চীৎকার করিয়া উঠিল। একধারে বাঁধা গোটা-দুই ছাগল ম্যাঁ ম্যাঁ করিয়া ডাকিয়া উঠিল। সুমুখে চাহিয়া দেখি—ওরে বাবা! একটা প্রকাণ্ড অজগর সাপ আঁকিয়া-বাঁকিয়া প্রায় সমস্ত উঠান জুড়িয়া আছে। চক্ষের নিমেষে অস্ফুট চীৎকারে মুরগিগুলাকে আরও ত্রস্ত ভীত করিয়া দিয়া আঁচড-পিঁচড করিয়া একেবারে সেই বেডার উপর চডিয়া বসিলাম। ইন্দ্র খিল্‌খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, ও কিছু বলে না রে, বড ভালমানুষ। ওর নাম রহিম। বলিয়া, কাছে গিয়া তাহার পেট্‌টা ধরিয়া টানিয়া উঠানের ওধারে সরাইয়া দিল। তখন নামিয়া আসিয়া ডানদিকে চাহিয়া দেখিলাম, সেই পর্ণকুটীরে বারান্দার উপরে বিস্তর ছেঁডা চাটাই ও ছেঁডা কাঁথার বিছানায় বসিয়া একটা দীর্ঘকায় পাতলা-গোছের লোক প্রবল কাসির পরে হাঁপাইতেছে। তাহার মাথায় জটা উঁচু করিয়া বাঁধা, গলায় বিবিধ প্রকারের ছোটবড মালা। গায়ের জামা এবং পরনের কাপড অত্যন্ত মলিন এবং একপ্রকার হল্‌দে রঙে ছোপানো। তাহার লম্বা দাডি বস্ত্রখণ্ড দিয়া জটার সহিত বাঁধা ছিল বলিয়াই প্রথমটা চিনিতে পারি নাই; কিন্তু কাছে আসিয়াই চিনিলাম সে সাপুড়ে। মাস পাঁচ-ছয় পূর্বে তাহাকে প্রায় সর্বত্রই দেখিতাম। আমাদের বাটীতেও তাহাকে কয়েকবার সাপ খেলাইতে দেখিয়াছি। ইন্দ্র তাহাকে শাহ্‌জী সম্বোধন করিল এবং সে আমাদিগকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া, হাত তুলিয়া ইন্দ্রকে গাঁজার সাজ-সরঞ্জাম এবং কলিকাটি দেখাইয়া দিল। ইন্দ্র দ্বিরুক্তি না করিয়া, আদেশ পালন করিতে লাগিয়া গেল এবং প্রস্তুত হইলে শাহ্‌জী সেই কাসির উপর ঠিক যেন 'মরি-বাঁচি' পণ করিয়া টানিতে লাগিল এবং একবিন্দু ধোঁয়াও পাছে বাহির হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় নাকেমুখে বাম করতল চাপা দিয়া মাথায় একটা ঝাঁকানির সহিত কলিকাটি ইন্দ্রের হাতে তুলিয়া দিয়া কহিল, পিয়ো।

ইন্দ্র পান করিল না। ধীরে ধীরে নামাইয়া রাখিয়া কহিল, না। শাহ্‌জী অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিল; কিন্তু উত্তরের জন্য একমুহূর্ত অপেক্ষা না করিয়াই সেটা নিজেই তুলিয়া লইয়া টানিয়া টানিয়া নিঃশেষ করিয়া উপুড় করিয়া রাখিল। তার পরে দু'জনের মৃদুকণ্ঠে কথাবার্তা শুরু হইল। তাহার অধিকাংশ শুনিতে পাইলাম না, বুঝিতেও পারিলাম না। কিন্তু এই একটা বিষয় লক্ষ্য করিলাম, শাহ্‌জী হিন্দীতে কথা কহিলেও ইন্দ্র বাংলা ছাড়া কিছুই ব্যবহার করিল না।

শাহ্‌জীর কণ্ঠস্বর ক্রমেই উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছিল এবং দেখিতে দেখিতে তাহা উন্মত্ত চীৎকারে পরিণত হইল। কাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া সে যে এরূপ অকথ্য অশ্রাব্য গালি-গালাজ উচ্চারণ করিতে লাগিল, তাহা তখন বুঝিলে, ইন্দ্র সহ্য করিয়াছিল বটে, কিন্তু আমি করিতাম না। তার পরে লোকটা বেড়ায় ঠেস দিয়া বসিল এবং অনতিকাল পরেই ঘাড় গুঁজিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপ-চাপ বসিয়া থাকিয়া যেন অস্থির হইয়া উঠিলাম, বলিলাম, বেলা যায়; তুমি সেখানে যাবে না?

কোথায়, শ্রীকান্ত?

তোমার দিদিকে টাকা দিতে যাবে না?

দিদির জন্যেই ত ব'সে আছি। এই ত তাঁর বাড়ি।

এই তোমার দিদির বাড়ি? এরা ত সাপুড়ে—মুসলমান!

ইন্দ্র কি-একটা কথা বলিতে উদ্যত হইয়াই, চাপিয়া গিয়া চুপ করিয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার দুই চক্ষের দৃষ্টি বড় ব্যথায় একেবারে যেন ম্লান হইয়া গেল। একটু পরেই কহিল, একদিন তোকে সব কথা বলব। সাপ খেলাব দেখবি শ্রীকান্ত?

তাহার কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম—তুমি সাপ খেলাবে কি? কামড়ায় যদি?

ইন্দ্র উঠিয়া গিয়া ঘরে ঢুকিয়া একটা ছোট ঝাঁপি এবং সাপুড়ের বাঁশি বাহির করিয়া আনিল এবং সুমুখে রাখিয়া ডালার বাঁধন আলগা করিয়া বাঁশিতে ফুঁ দিল। আমি ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠিলাম। ডালা খুলো না ভাই, ভেতরে যদি গোখ্‌রো সাপ থাকে! ইন্দ্র তাহার জবাব দেওয়াও আবশ্যক মনে করিল না; শুধু ইঙ্গিতে জানাইল যে, সে গোখ্‌রো সাপই খেলাইবে; এবং পরক্ষণেই মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া বাঁশি বাজাইয়া ডালাটা তুলিয়া ফেলিল।

সঙ্গে-সঙ্গেই প্রকাণ্ড গোখ্‌রো একহাত উঁচু হইয়া ফণা বিস্তার করিয়া উঠিল ; এবং মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া ইন্দ্রের হাতের ডালায় একটা তীব্র ছোবল মারিয়া ঝাঁপি হইতে বাহির হইয়া পড়িল। বাপ্‌রে! বলিয়া ইন্দ্র উঠানে লাফাইয়া পড়িল। আমি বেড়ার গায়ে চড়িয়া বসিলাম। ক্রুদ্ধ সর্পরাজ বাঁশির লাউয়ের উপর আর একটা কামড় দিয়া ঘরের মধ্যে গিয়া ঢুকিল। ইন্দ্র মুখ কালি করিয়া কহিল,—এটা একেবারে বুনো। আমি যাকে খেলাই, সে নয়।

ভয়ে বিরক্তিতে রাগে আমার প্রায় কান্না আসিতেছিল, বলিলাম, কেন এমন কাজ করলে? ও বেরিয়ে যদি শাহ্‌জীকে কামড়ায়?

ইন্দ্রর লজ্জার পরিসীমা ছিল না। কহিল, ঘরের আগড়টা টেনে দিয়ে আসব? কিন্তু যদি পাশেই লুকিয়ে থাকে?

আমি বললাম, তা হ'লে বেরিয়েই ওকে কামড়াবে।

ইন্দ্র নিরুপায়ভাবে এদিক-ওদিক চাহিয়া বলিল, কামড়াক্ ব্যাটাকে। বুনো সাপ ধ'রে রাখে—গাঁজাখোর শালার এতটুকু বুদ্ধি নেই। এই যে দিদি! এসো না, এসো না ; ঐখানেই দাঁড়িয়ে থাকো।

আমি ঘাড় ফিরাইয়া ইন্দ্রর দিদিকে দেখিলাম। যেন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি! যেন যুগ-যুগান্তরব্যাপী কঠোর তপস্যা সাঙ্গ করিয়া তিনি এইমাত্র আসন হইতে উঠিয়া আসিলেন। বাঁ-কাঁকালে আঁটিবাঁধা কতকগুলি শুক্‌নো কাঠ এবং ডানহাতে ফুলের সাজির মত একখানা ডালার মধ্যে কতকগুলি শাক-সবজি। পরনে হিন্দুস্থানী মুসলমানীর মত জামা কাপড়—গেরুয়া রঙে ছোপানো, কিন্তু ময়লায় মলিন নয়। হাতে দু'গাছি গালার চুড়ি। সিঁথায় হিন্দুনারীর মত সিঁদুরের আয়তি-চিহ্ন। তিনি কাঠের বোঝাটা নামাইয়া রাখিয়া আগড়টা খুলিতে খুলিতে বলিলেন, কি?

ইন্দ্র মহাব্যস্ত হইয়া বলিল, খুলো না দিদি, তোমার পায়ে পড়ি—মস্ত একটা সাপ ঘরে ঢুকেছে।

তিনি আমার মুখের পানে চাহিয়া কি যেন ভাবিয়া লইলেন। তার পরে একটুখানি হাসিয়া পরিষ্কার বাঙ্গলায় বলিলেন, তাই ত। সাপুড়ের ঘরে সাপ ঢুকেছে, এ ত বড় আশ্চর্য! কী বল শ্রীকান্ত? আমি অনিমেষ দৃষ্টিতে শুধু তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।—কিন্তু কি ক'রে সাপ ঢুকল ইন্দ্রনাথ?

ইন্দ্র বলিল, ঝাঁপির ভেতর থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। একেবারে বুনো সাপ!

উনি ঘুমোচ্ছেন বুঝি ?

ইন্দ্র রাগিয়া কহিল, গাঁজা খেয়ে একেবারে অজ্ঞান হয়ে ঘুমোচ্চে ; চেঁচিয়ে ম'রে গেলেও উঠবে না।

তিনি আবার একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, তাই সেই সুযোগে তুমি শ্রীকান্তকে সাপ-খেলানো দেখাতে গিয়েছিলে, না ? আচ্ছা, এসো, আমি ধ'রে দিচ্চি।

তুমি যেয়ো না দিদি, তোমাকে খেয়ে ফেলবে। শাহ্‌জীকে তুলে দাও—আমি তোমাকে যেতে দেব না। বলিয়া, ইন্দ্র ভয়ে দুই হাত প্রসারিত করিয়া পথ আগ্‌লাইয়া দাঁড়াইল।

তাহার এই ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে যে ভালবাসা প্রকাশ পাইল, তাহা তিনি টের পাইলেন। মুহূর্তের জন্য চোখ দুটি তাঁহার ছল্‌ছল্‌ করিয়া উঠিল। কিন্তু গোপন করিয়া হাসিয়া বলিলেন, ওরে পাগলা, অত পুণ্যি তোর এই দিদির নেই। আমাকে খাবে না রে—এখ্‌খুনি ধ'রে দিচ্চি দ্যাখ।—বলিয়া বাঁশের মাচা হইতে একটা কেরোসিনের ডিবা জ্বালিয়া লইয়া ঘরে ঢুকিলেন এবং এক মিনিটের মধ্যে সাপটাকে ধরিয়া আনিয়া ঝাঁপিতে বন্ধ করিয়া ফেলিলেন।

ইন্দ্র টিপ্‌ করিয়া তাঁহার পায়ের উপর একটা নমস্কার করিয়া পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া বলিল, দিদি, তুমি যদি আমার আপনার দিদি হ'তে!

তিনি ডান হাত বাড়াইয়া ইন্দ্রের চিবুক স্পর্শ করিলেন, এবং অঙ্গুলির প্রান্তভাগ চুম্বন করিয়া মুখ ফিরাইয়া বোধ করি অলক্ষ্যে একবার নিজের চোখ দুটি মুছিয়া ফেলিলেন।

পাঁচ

সমস্ত ব্যাপারটা শুনিতে শুনিতে ইন্দ্রের দিদি হঠাৎ বার-দুই এম্‌নি শিহরিয়া উঠিলেন যে, ইন্দ্রের সেদিকে যদি কিছুমাত্র খেয়াল থাকিত, সে আশ্চর্য হইয়া যাইত। সে দেখিতে পাইল না, কিন্তু আমি পাইলাম। তিনি কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া সস্নেহে তিরস্কারের কণ্ঠে কহিলেন, ছি দাদা, এমন কাজ আর কখ্‌খনো করো না। এ সব ভয়ানক জানোয়ার নিয়ে কি খেলা করতে আছে ভাই ? ভাগ্যে তোমার হাতের ডালাটায় ছোবল মেরেছিল, না হ'লে আজ কি কাণ্ড হ'ত বল ত ?

আমি কি তেমনি খোকা, দিদি! বলিয়া ইন্দ্র সপ্রতিভ হাসিমুখে ফস্ করিয়া তাহার কোঁচার কাপড়টা টানিয়া ফেলিয়া কোমরে সুতা-বাঁধা কি একটা শুক্‌নো শিকড় দেখাইয়া বলিল, এই দ্যাখো দিদি, আট-ঘাট বেঁধে রেখেচি কি না। এ না থাকলে কি আর আজ আমাকে না ছুব্‌লে ছেড়ে দিত? শাহ্‌জীর কাছে এটুকু আদায় করতে কি আমাকে কম কষ্ট পেতে হয়েছে। এ সঙ্গে থাকলে কেউ ত কামড়াতে পারেই না; আর তাই যদি বা কামড়াত—তাতেই বা কি! শাহ্‌জীকে টেনে তুলে তখ্‌খুনি বিষ-পাথরটা ধরিয়ে দিতুম। আচ্ছা দিদি, ঐ বিষ-পাথরটায় কতক্ষণে বিষ টেনে নিতে পারে? আধ ঘণ্টা? এক ঘণ্টা? না অতক্ষণ লাগে না, না দিদি?

দিদি কিন্তু তেমনি নীরবে চাহিয়া রহিলেন। ইন্দ্র উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল, বলিল আজ দাও না দিদি আমাকে একটি। তোমাদের ত দুটো তিনটে রয়েচে—আর আমি কতদিন ধ'রে চাইচি।—বলিয়া সে উত্তরের জন্য প্রতীক্ষামাত্র না করিয়া ক্ষুণ্ণ অভিমানের সুরে তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, আমাকে তোমরা যা বল তাই করি—আর তোমরা কেবল পট্টি দিয়ে আমাকে আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু—যদি নাই দেবে তবে ব'লে দাও না কেন? আমি আর আসব না—যাও।

ইন্দ্র লক্ষ্য করিল না, কিন্তু আমি তাহার দিদির মুখের পানে চাহিয়া বেশ অনুভব করিলাম যে, তাঁহার মুখখানি কিসের অপরিসীম ব্যথায় ও লজ্জায় যেন একেবারে কালিবর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই জোর করিয়া একটুখানি হাসির ভাব সেই শীর্ণ শুষ্ক ওষ্ঠাধরে টানিয়া আনিয়া কহিলেন, হাঁ রে ইন্দ্র, তুই কি তোর দিদির বাড়িতে শুধু সাপের মন্তর আর বিষ-পাথরের জন্যই আসিস্ রে?

ইন্দ্র অসঙ্কোচে বলিয়া বসিল, তবে না ত কি! নিদ্রিত শাহ্‌জীকে একবার আড চোখে চাহিয়া দেখিয়া কহিল, কিন্তু কেবলই আমাকে ভোগা দিচ্ছে—এ তিথি নয়, ও তিথি নয়, সে তিথি নয়, সেই যে কবে শুধু হাতচালার মন্তরটুকু দিয়েছিল, আর দিতেই চায় না। কিন্তু আজ আমি টের পেয়েছি দিদি, তুমিও কম নও, তুমিও সব জানো। ওকে আর আমি খোশামোদ করচি নে দিদি, তোমার কাছ থেকেই সমস্ত মন্তর আদায় ক'রে নেব। বলিয়াই আমার প্রতি চাহিয়া, সহসা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া শাহ্‌জীকে উদ্দেশ্য করিয়া গভীর সম্ভ্রমের সহিত কহিল, শাহ্‌জী গাঁজা-

টাঁজা খান বটে, শ্রীকান্ত, কিন্তু তিন দিনের বাসি মড়া আধ ঘণ্টার মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন—এত বড় ওস্তাদ উনি! হ্যাঁ, দিদি, তুমিও মড়া বাঁচাতে পারো?

দিদি কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া সহসা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সে কি মধুর হাসি! অমন করিয়া হাসিতে আমি আজ পর্যন্ত কম লোককেই দেখিয়াছি। কিন্তু সে যেন নিবিড় মেঘভরা আকাশের বিদ্যুৎদীপ্তির মত পরক্ষণেই অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

কিন্তু ইন্দ্র সেদিক দিয়াই গেল না। বরঞ্চ একেবারে পাইয়া বসিল। সেও হাসিয়া কহিল, আমি জানি, তুমি সব জানো। কিন্তু আমাকে একটি একটি করে তোমাকে সব বিদ্যে দিতে হবে, তা বলে দিচ্চি! আমি যতদিন বাঁচব, তোমাদের একেবারে গোলাম হয়ে থাকব। তুমি কটা মড়া বাঁচিয়েচ, দিদি?

দিদি কহিলেন, আমি ত মড়া বাঁচাতে জানিনে, ইন্দ্রনাথ!

ইন্দ্র প্রশ্ন করিল, তোমাকে এ মন্তর শাহজী দেয়নি?

দিদি ঘাড় নাড়িয়া 'না' বলিলে, ইন্দ্র মিনিট-খানেক তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া নিজেই তখন মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, এ বিদ্যে কি কেউ শিগ্‌গির দিতে চায় দিদি। আচ্ছা, কড়ি-চালাটা নিশ্চয়ই শিখে নিয়েচ, না?

দিদি বলিলেন, কা'কে কড়ি চালা বলে, তাই ত জানিনে ভাই।

ইন্দ্র বিশ্বাস করিল না। বলিল, ইস্! জান না বৈ কি! দেবে না, তাই বল। আমার দিকে চাহিয়া কহিল, কড়ি-চালা কখনো দেখেচিস শ্রীকান্ত? দুটি কড়ি মন্তর প'ড়ে ছেড়ে দিলে তারা উড়ে গিয়ে যেখানে সাপ আছে, তার কপালে গিয়ে কামড়ে ধরে সাপটাকে দশ দিনের পথ থেকে টেনে এনে হাজির করে দেয়। এম্‌নি মন্তরের জোর! আচ্ছা দিদি ঘর-বন্ধন, দেহ-বন্ধন, ধূলো-পড়া এ সব জান ত? আর যদি না-ই জানবে ত অমন সাপটাকে ধ'রে দেবে কি করে?—বলিয়া সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে দিদির মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

দিদি অনেকক্ষণ নিঃশব্দে নতমুখে বসিয়া মনে মনে কি যেন চিন্তা করিয়া লইলেন; শেষে মুখ তুলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, ইন্দ্র, তোর দিদির এ-সব কানাকড়ির বিদ্যেও নেই। কিন্তু কেন নেই, সে যদি তোরা বিশ্বাস করিস্ ভাই, তা হ'লে আজ তোদের কাছে আমি সমস্ত ভেঙ্গে ব'লে

আমার বুকখানা হালকা করে ফেলি। বল্, তোরা আমার সব কথা আজ বিশ্বাস করবি? বলিতে বলিতেই তাঁহার শেষের কথাগুলি কেমন একরকম যেন ভারী হইয়া উঠিল।

আমি নিজে এতক্ষণ প্রায় কোন কথাই কহি নাই। এইবার সর্বাগ্রে জোর করিয়া বলিয়া উঠিলাম, আমি তোমার সব কথা বিশ্বাস করব দিদি! সব—যা বলবে সমস্ত। একটি কথাও অবিশ্বাস করব না।

তিনি আমার প্রতি চাহিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, বিশ্বাস করবে বৈ কি ভাই। তোমরা যে ভদ্রলোকের ছেলে। যারা ইতর তারাই শুধু অজানা অচেনা লোকের কথায় সন্দেহে ভয়ে পিছিয়ে দাঁড়ায়। তা ছাড়া, আমি ত কখনও মিথ্যে কথা কইনে ভাই। বলিয়া তিনি আর একবার আমার প্রতি চাহিয়া ম্লানভাবে একটুখানি হাসিলেন।

তখন সন্ধ্যার ঝাপ্‌সা কাটিয়া গিয়া আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল এবং তাহারই অস্ফুট কিরণ-রেখা গাছের ঘন-বিন্যস্ত ডাল ও পাতার ফাঁক দিয়া নীচের গাঢ় অন্ধকারে ঝরিয়া পড়িতেছিল।

কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া, দিদি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, ইন্দ্রনাথ, মনে করেছিলুম, আজই আমার সমস্ত কথা তোমাদের জানিয়ে দেব। কিন্তু ভেবে দেখছি, এখনও সে সময় আসেনি। আমার এই কথাটুকু আজ শুধু বিশ্বাস ক'রো ভাই, আমাদের আগাগোড়া সমস্তই ফাঁকি। আর তুমি মিথ্যে আশা নিয়ে শাহ্‌জীর পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়িয়ো না—আমরা তন্ত্র-মন্ত্র কিছুই জানিনে, মড়াও বাঁচাতে পারিনে; কড়ি চেলে সাপ ধরে আনতেও পারিনে। আর কেউ পারে কিনা, জানিনে, কিন্তু আমাদের কোন ক্ষমতাই নেই।

কি জানি কেন, আমি এই অত্যল্পকালের পরিচয়েই তাঁহার প্রত্যেক কথাটি অসংশয়ে বিশ্বাস করিলাম; কিন্তু এতদিনের ঘনিষ্ঠ পরিচয়েও ইন্দ্র পারিল না। সে ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, যদি পার না, তবে সাপ ধরলে কি করে?

দিদি বলিলেন, ওটা শুধু হাতের কৌশল, ইন্দ্র, কোন মন্ত্রের জোরে নয়। সাপের মন্ত্র আমরা জানিনে।

ইন্দ্র বলিল, যদি জান না, তবে তোমরা দু'জনে জোচ্চুরি করে ঠকিয়ে আমার কাছ থেকে এত টাকা নিয়েচ কেন?

দিদি তৎক্ষণাৎ জবাব দিতে পারিলেন না; বোধ করি বা নিজেকে একটুখানি সামলাইয়া লইতে লাগিলেন। ইন্দ্র পুনরায় কর্কশকণ্ঠে কহিল, ঠগ্ জোচ্চোর সব—আচ্ছা, আমি দেখাচ্ছি তোমাদের মজা।

অদূরেই একটা কেরোসিনের ডিবা জ্বলিতেছিল। আমি তাহারই আলোকে দেখিতে পাইলাম, দিদির মুখখানি একেবারে যেন মড়ার মত সাদা হইয়া গেল। সভয়ে সসঙ্কোচে বলিলেন, আমরা যে সাপুড়ে—ভাই, ঠকানোই যে আমাদের ব্যবসা।

ব্যবসা বার ক'রে দিচ্চি—চল্‌রে শ্রীকান্ত, জোচ্চোর শালাদের ছায়া মাড়াতে নেই। হারামজাদা বজ্জাত ব্যাটারা। বলিয়া ইন্দ্র সহসা আমার হাত ধরিয়া সজোরে একটা টান দিয়া খাড়া হইয়া উঠিল, এবং মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া আমাকে টানিয়া লইয়া চলিল।

ইন্দ্রকে দোষ দিতে পারি না; কারণ তাহার অনেক দিনের অনেক বড় আশা একেবারে চোখের পলকে ভূমিসাৎ হইয়া গেল। কিন্তু আমার দুই চোখ যে দিদির সেই দুটি চোখের পানে চাহিয়া আর চোখ ফিরাইতে পারিল না। জোর করিয়া ইন্দ্রের হাত ছাড়াইয়া লইয়া পাঁচটি টাকা রাখিয়া দিয়া বলিলাম, তোমার জন্যে এনেছিলাম দিদি—এই নাও!

ইন্দ্র ছোঁ মারিয়া তুলিয়া লইয়া কহিল, আবার টাকা! জোচ্চুরি ক'রে এরা আমার কাছে কত টাকা নিয়েচে, তা তুই জানিস্ শ্রীকান্ত? এরা না খেয়ে শুকিয়ে মরুক, সেই আমি চাই।

আমি তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, না ইন্দ্র, দাও—আমি দিদির নাম করে এনেচি—

ওঃ—ভারী দিদি!—বলিয়া সে আমাকে টানিয়া বেড়ার কাছে আনিয়া ফেলিল।

এতক্ষণে গোলমালে শাহ্‌জীর নেশার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে কেয়া হুয়া, কেয়া হুয়া?—বলিয়া উঠিয়া বসিল।

ইন্দ্র আমাকে ছাড়িয়া দিয়া তাহার কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, ডাকু শালা। রাস্তায় তোমাকে দেখতে পেলে চাবকে তোমার পিঠের চামড়া তুলে দেব। কেয়া হুয়া! বদমাস্ ব্যাটা কিচ্ছু জানে না—আর ব'লে বেড়ায় মন্তরের জোরে মড়া বাঁচাই! কখনো পথে দেখা হ'লে এবার ভাল

করে বাঁচাব তোমাকে। বলিয়া সে এমনি একটা অশিষ্ট ইঙ্গিত করিল যে শাহ্‌জী চম্‌কাইয়া উঠিল।

তাহার একে নেশার ঘোর, তাহাতে অকস্মাৎ এই অভাবনীয় কাণ্ড। সেই যে সাধু ভাষায় বলে 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়' হইয়া বসিয়া থাকা, ঠিক সেই ভাবে ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ করিয়া চাহিয়া বসিয়া রহিল।

ইন্দ্র আমাকে লইয়া যখন দ্বারের বাহিরে আসিয়া পড়িল, তখন সে বোধ করি কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া পরিষ্কার বাঙলা করিয়া ডাকিল, শোন ইন্দ্রনাথ, কি হয়েচে বল ত? আমি তাহাকে এই প্রথম বাঙলা বলিতে শুনিলাম।

ইন্দ্র ফিরিয়া আসিয়া বলিল, তুমি কিছু জান না—কেন মিছামিছি আমাকে ধোঁকা দিয়ে এত দিন এত টাকা নিয়েচ, তার জবাব দাও।

সে কহিল, জানিনে তোমাকে কে বললে?

ইন্দ্র তৎক্ষণাৎ ঐ স্তব্ধ নতমুখী দিদির দিকে একটা হাত বাড়াইয়া বলিল, ঐ বললে, তোমার কানাকড়ির বিদ্যে নাই। বিদ্যে আছে শুধু জোচ্চুরি করবার আর লোক ঠকাবার। এই তোমাদের ব্যবসা। মিথ্যাবাদী, চোর!

শাহ্‌জীর চোখ দুটা ধক্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সে যে কি ভীষণ প্রকৃতির লোক, সে পরিচয় তখনও জানিতাম না। শুধু তাহার সেই চোখের দৃষ্টিতে আমার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। লোকটা তাহার এলোমেলো জটাটা বাঁধিতে বাঁধিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সুমুখে আসিয়া কহিল, বলেচিস্‌ তুই?

দিদি তেমনি নত মুখে নিরুত্তরে বসিয়া রহিলেন।

ইন্দ্র আমাকে একটা ঠেলা দিয়া বলিল, রাত্তির হচ্ছে—চল্‌ না।

রাত্রি হইতেছে সত্য, কিন্তু আমার পা যে আর নড়ে না। কিন্তু ইন্দ্র সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করিল না, আমাকে প্রায় জোর করিয়াই টানিয়া লইয়া চলিল।

কয়েক পদ অগ্রসর হইতেই শাহ্‌জীর কণ্ঠস্বর আমার কানে আসিল—কেন বললি?

প্রশ্ন শুনিলাম বটে, কিন্তু প্রত্যুত্তর শুনিতে পাইলাম না। আমরা আরও কয়েক পদ অগ্রসর হইতেই, অকস্মাৎ চারিদিকের সেই নিবিড়

অন্ধকারের বুক চিরিয়া একটা তীব্র আর্তস্বর পিছনের আঁধার কুটীর হইতে ছুটিয়া আসিয়া আমাদের কানে বিঁধিল, এবং চক্ষের পলক না ফেলিতেই ইন্দ্র সেই শব্দ অনুসরণ করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। কিন্তু আমার অদৃষ্টে অন্যরূপ ঘটিল। সুমুখেই একটা শিয়াকুল গাছের মস্ত ঝাড় ছিল, আমি সবেগে গিয়া তাহারই উপরে পড়িলাম। কাঁটায় সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেল। সে যাক, কিন্তু নিজেকে মুক্ত করিয়া লইতেই প্রায় দশ মিনিট কাটিয়া গেল। এ কাঁটা ছাড়াই ত সে কাঁটায় কাপড় বাধে, সে কাঁটা ছাড়াই ত আর একটা কাঁটায় কাপড় আটকায়। এমনি করিয়া অনেক কষ্টে, অনেক বিলম্বে যখন কোনমতে শাহ্‌জীর বাড়ির প্রাঙ্গণের ধারে গিয়া পড়িলাম, তখন দেখি, সেই প্রাঙ্গণেরই একপ্রান্তে দিদি মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া আছেন এবং আর এক প্রান্তে গুরু-শিষ্যের রীতিমত মল্লযুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে। পাশেই একটা তীক্ষ্ণধার বর্শা পড়িয়া আছে।

শাহ্‌জীর লোকটি অত্যন্ত বলবান। কিন্তু ইন্দ্র যে তাহার অপেক্ষাও কত বেশি শক্তিশালী, এ সংবাদ তাহার জানা ছিল না। থাকিলে বোধ হয় সে এতবড় দুঃসাহসের পরিচয় দিত না। দেখিতে দেখিতে ইন্দ্র তাহাকে চিত করিয়া ফেলিয়া তাহার বুকের উপর বসিয়া গলা টিপিয়া ধরিল। সে এমনি টিপুনি যে আমি বাধা না দিলে হয়ত সে যাত্রা শাহ্‌জীর সাপুড়ে যাত্রাটাই শেষ হইয়া যাইত।

বিস্তর টানা-হেঁচড়ার পর যখন উভয়কে পৃথক করিলাম, তখন ইন্দ্রের অবস্থা দেখিয়া ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিলাম। অন্ধকারে প্রথমে নজরে পড়ে নাই যে তাহার সমস্ত কাপড়-জামা রক্তে ভাসিয়া যাইতেছে। ইন্দ্র হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল, শালা গাঁজাখোর আমাকে সাপ-মারা বর্শা দিয়ে খোঁচা মেরেছে—এই দ্যাখ্। জামার আস্তিন তুলিয়া দেখাইল, বাহুতে প্রায় দুই-তিন ইঞ্চি পরিমাণ ক্ষত এবং তাহা দিয়া অজস্র রক্তস্রাব হইতেছে।

ইন্দ্র কহিল, কাঁদিস্ নে—এই কাপড়টা দিয়ে খুব টেনে বেঁধে দে—এই খবরদার। ঠিক অমনি বসে থাকো। উঠলেই গলায় পা দিয়ে তোমার জিভ টেনে বা'র করব—হারামজাদা শুয়ার। নে, তুই টেনে বাঁধ্—দেরি করিস্‌নে। বলিয়া সে চড়চড় করিয়া তাহার কোঁচার খানিকটা টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। আমি কম্পিত হস্তে ক্ষতটা বাঁধিতে লাগিলাম এবং

শাহ্‌জী অদূরে বসিয়া মুমূর্ষু বিষাক্ত সর্পের দৃষ্টি দিয়া নিঃশব্দে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

ইন্দ্র কহিল, না, তোমাকে বিশ্বাস নেই, তুমি খুন করতে পারো। আমি তোমার হাত বাঁধব।—বলিয়া তাহারই গেরুয়ারঙে ছোপানো পাগড়ি দিয়া টানিয়া টানিয়া তাহার দুই হাত জড়ো করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। সে বাধা দিল না, প্রতিবাদ করিল না, একটা কথা পর্যন্ত কহিল না।

যে লাঠিটার আঘাতে দিদি অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিল সেটা তুলিয়া লইয়া একপাশে রাখিয়া ইন্দ্র কহিল, কি নেমকহারাম শয়তান এই ব্যাটা! বাবার কত টাকা যে চুরি করে একে দিয়েছি, আরও কত হয়ত দিতাম, যদি দিদি না আমাকে মাথার দিব্যি দিয়ে নিষেধ করত। আর স্বচ্ছন্দে ও ঐ বল্লমটা আমাকে ছুঁড়ে মেরে বসল। শ্রীকান্ত, নজর রাখ্‌, যেন না ওঠে—আমি দিদির চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিই।

জলের ঝাপটা দিয়া বাতাস করিতে করিতে কহিল, যেদিন থেকে দিদি বললে, ইন্দ্রনাথ, তোমার রোজগারের টাকা হলে নিতাম, কিন্তু এ নিয়ে আমাদের ইহকাল পরকাল মাটি করব না, সেইদিন থেকে ঐ শয়তান ব্যাটা দিদিকে কত মার মেরেচে, তার হিসেব নিকেশ নেই। তবুও দিদি ওকে কাঠ কুড়িয়ে ঘুঁটে বেচে খাওয়াচ্ছে, গাঁজার পয়সা দিচ্ছে—তবু কিছুতে ওর হয় না। কিন্তু আমি ওকে পুলিশে দিয়ে তবে ছাড়ব—না হ'লে দিদিকে ও খুন ক'রে ফেলবে—ও খুন করতে পারে।

আমার মনে হইল, লোকটা যেন এই কথায় শিহরিয়া মুখ তুলিয়া চাহিয়াই তৎক্ষণাৎ মুখখানা নত করিয়া ফেলিল। সে একটি নিমেষ মাত্র। কিন্তু অপরাধীর নিবিড় আশঙ্কা তাতে এমনি পরিস্ফুট হইতে দেখিয়াছিলাম যে, আমি আজিও তাহার তখনকার সেই চেহারাটা স্পষ্ট মনে করিতে পারি!

আমি বেশ জানি, এই যে কাহিনী আজ লিপিবদ্ধ করিলাম, তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে লোকে দ্বিধা ত করিবেই, পরন্তু, উদ্ভট কল্পনা বলিয়া উপহাস করিতে হয়ত ইতস্তত করিবে না। তথাপি এতটা জানিয়াও যে লিখিলাম, ইহাই অভিজ্ঞতার সত্যকার মূল্য। কারণ সত্যের উপরে না দাঁড়াইতে পারিলে কোনমতেই এই সকল কথা মুখ দিয়া বাহির করা যায় না। প্রতি পদেই ভয় হইতে থাকে, লোকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। জগতের বাস্তব ঘটনা যে কল্পনাকেও বহুদূরে অতিক্রম করিয়া যায়, এ কৈফিয়ৎ নিজের কোন

জোরই দেয় না, বরঞ্চ হাতের কলমটাকে প্রতি হাতেই টানিয়া টানিয়া ধরিতে থাকে।

যাক সে কথা। দিদি যখন চোখ চাহিয়া উঠিয়া বসিলেন, তখন রাত্রি বোধ করি দ্বিপ্রহর! তাঁহার বিহ্বল ভাবটা ঘুচাইতে আরও ঘণ্টাখানেক কাটিয়া গেল। তারপরে আমার মুখে সমস্ত বিবরণ শুনিয়া, ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া শাহ্‌জীর বন্ধন মুক্ত করিয়া দিয়া বলিলেন, যাও, শোও গে।

লোকটা ঘরে চলিয়া গেলে, তিনি ইন্দ্রকে কাছে ডাকিয়া, তাহার ডান হাতটা নিজের মাথার উপর টানিয়া লইয়া বলিলেন, ইন্দ্র এই আমার মাথায় হাত দিয়ে শপথ কর ভাই, আর কখনো এ বাড়িতে আসিস্‌নে। আমাদের যা হবার হোক, তুই আর আমাদের কোন সংবাদ রাখিস্ নে।

ইন্দ্র প্রথমটা অবাক হইয়া রহিল। কিন্তু পরক্ষণেই আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, তা বটে! আমাকে খুন করতে গিয়েছিল, সেটা কিছু নয়। আর আমি যে ওকে বেঁধে রেখেচি, তাতেই, তোমার এত রাগ! এমন না হ'লে কলিকাল বলেচে কেন? কিন্তু কি নেমকহারাম তোমরা দু'জন!—আয় শ্রীকান্ত, আর না।

দিদি চুপ করিয়া রহিলেন—একটি অভিযোগেরও প্রতিবাদ করিলেন না। কেন যে করিলেন না, তাহা পরে যত বেশিই বুঝিয়া থাকি না কেন, তখন বুঝি নাই। তথাপি আমি অলক্ষ্যে নিঃশব্দে সেই টাকা পাঁচটি খুঁটির কাছে রাখিয়া দিয়া ইন্দ্রের অনুসরণ করিলাম। ইন্দ্র প্রাঙ্গণের বাহিরে আসিয়া চেঁচাইয়া বলিল, হিঁদুর মেয়ে হয়ে যে মোচলমানের সঙ্গে বেরিয়ে আসে, তার আবার ধর্মকর্ম! চুলোয় যাও—আর আমি খোঁজ করব না,—খবরও নেব না—হারামজাদা নচ্ছার! বলিয়া দ্রুতপদে বনপথ অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল।

দু'জনে নৌকায় আসিয়া বসিলে ইন্দ্র নিঃশব্দে বাহিতে লাগিল এবং মাঝে মাঝে হাত তুলিয়া চোখ মুছিতে লাগিল। সে যে কাঁদিতেছে, তাহা স্পষ্ট বুঝিয়া আর কোন প্রশ্ন করিলাম না।

শ্মশানের সেই পথ দিয়াই ফিরিয়া আসিলাম এবং সেই পথ দিয়াই এখনও চলিয়াছি; কিন্তু কেন জানি না, আজ আমার ভয়ের কথাও মনে আসিল না। বোধ করি, মন আমার এমনি বিহ্বল আচ্ছন্ন হইয়াছিল যে, এত রাত্রে কেমন

করিয়া বাড়ি ঢুকিব এবং ঢুকিলেও যে কি দশা হইবে, সে চিন্তাও মনে স্থান পাইল না।

প্রায় শেষ-রাত্রে নৌকা আসিয়া ঘাটে লাগিল। আমাকে নামাইয়া দিয়া ইন্দ্র কহিল, বাড়ি যা শ্রীকান্ত। তুই বড় অপয়া! তোকে সঙ্গে নিলেই একটা-না-একটা ফ্যাসাদ বাধে। আজ থেকে তোকে আর আমি কোন কাজে ডাকব না—তুইও আর আমার সামনে আসিস্‌নে। যা! বলিয়া সে গভীর জলে নৌকা ঠেলিয়া দিয়া দেখিতে দেখিতে বাঁকের মুখে অদৃশ্য হইয়া গেল। আমি বিস্মিত, ব্যথিত, স্তব্ধ হইয়া নির্জন নদীতীরে একাকী দাঁড়াইয়া রহিলাম।

ছয়

নিস্তব্ধ গভীর রাত্রে মা-গঙ্গার উপকূলে ইন্দ্র যখন আমাকে নিতান্ত অকারণে একাকী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, তখন কান্না আর সামলাইতে পারিলাম না। তাহাকে যে ভালবাসিয়াছিলাম, সে তাহার কোন মূল্যই দিল না। পরের বাড়ির যে কঠিন শাসনপাশ উপেক্ষা করিয়া তাহার সঙ্গে গিয়াছিলাম, তাহারও এতটুকু মর্যাদা রাখিল না। উপরন্তু অপয়া, অকর্মণ্য বলিয়া একান্ত অসহায় অবস্থায় বিদায় দিয়া স্বচ্ছন্দে চলিয়া গেল। তাহার এই নিষ্ঠুরতা আমাকে যে কত বিঁধিয়াছিল, তাহা বলিবার চেষ্টা করাও বাহুল্য। তারপরে অনেকদিন সেও আর সন্ধান করিল না, আমিও না। দৈবাৎ পথে-ঘাটে যদি কখনও দেখা হইয়াছে, এমন করিয়া মুখ ফিরাইয়া আমি চলিয়া গিয়াছি, যেন তাহাকে দেখিতে পাই নাই। কিন্তু আমার এই 'যেন'টা আমাকে শুধু সারাদিন তুষের আগুনে দগ্ধ করিত, তাহার কতটুকু ক্ষতি করিতে পারিত? ছেলে-মহলে সে একজন মস্ত লোক! ফুটবল ক্রিকেটের দলের কর্তা, জিমন্যাস্টিক আখড়ার মাষ্টার, তাহার কত অনুচর, কত ভক্ত! আমি ত তাহার তুলনায় কিছুই নয়। তবে কেনই বা দু'দিনের পরিচয়ে আমাকে সে বন্ধু বলিয়া ডাকিল, কেনই বা বিসর্জন দিল! কিন্তু সে যখন দিল, তখন আমিও টানাটানি করিয়া বাঁধিতে গেলাম না। আমার বেশ মনে পড়ে, আমাদের সঙ্গী-সাথীরা যখন ইন্দ্রের উল্লেখ করিয়া তাহার সম্বন্ধে নানাবিধ অদ্ভুত আশ্চর্য গল্প

শুরু করিয়া দিত, আমি চুপ করিয়া শুনিতাম। একটা কথার দ্বারাও কখনও ইহা প্রকাশ করি নাই যে, সে আমাকে চিনে, কিংবা আমি তাহার সম্বন্ধে কোন কথা জানি। সেই বয়সেই আমি কেমন করিয়া যেন জানিতে পারিয়াছিলাম, 'বড' ও 'ছোট'র বন্ধুত্ব সচরাচর এমন দাঁড়ায়। বোধ করি ভাগ্যবশে পরবর্তী জীবনে অনেক 'বড' বন্ধুর সংস্পর্শে আসিব বলিয়াই ভগবান দয়া করিয়া এই সহজ জ্ঞানটা আমাকে দিয়াছিলেন যে, কখনও কোন কারণেই যেন অবস্থাকে ছাড়াইয়া বন্ধুত্বের মূল্য ধার্য করিতে না যাই। গেলেই যে দেখিতে দেখিতে 'বন্ধু' প্রভু হইয়া দাঁড়ান এবং সাধের বন্ধুত্ব-পাশ দাসত্বের বেড়ি হইয়া 'ছোট'র পায়ে বাজে, এই দিব্যজ্ঞানটি এত সহজে এমন সত্য করিয়াই শিখিয়াছিলাম বলিয়া লাঞ্ছনার হাত হইতে চিরদিনের মত নিষ্কৃতি পাইয়া বাঁচিয়াছি।

তিন চারি মাস কাটিয়াছে। উভয়েই উভয়কে ত্যাগ করিয়াছি—তার বেদনা এক পক্ষের যত নিদারুণই হোক—কেহ কাহারও খোঁজ করি না।

দত্তদের বাড়িতে কালীপূজা উপলক্ষ্যে পাড়ার সখের থিয়েটারের স্টেজ বাঁধা হইতেছে। 'মেঘনাদবধ' হইবে। ইতিপূর্বে পাড়াগাঁয়ে যাত্রা অনেকবার দেখিয়াছি, কিন্তু থিয়েটার বেশি চোখে দেখি নাই। সারাদিন আমার নাওয়া-খাওয়া নাই, বিশ্রামও নাই। স্টেজ-বাঁধায় সাহায্য করিতে পারিয়া একেবারে কৃতার্থ হইয়া গিয়াছি! শুধু তাই নয়, যিনি রাম সাজিবেন, স্বয়ং তিনি সেদিন আমাকে একটা দড়ি ধরিতে বলিয়াছিলেন। সুতরাং ভারি আশা করিয়াছিলাম, রাত্রে ছেলেরা যখন কানাতের ছেঁড়া দিয়া গ্রীনরুমের মধ্যে উঁকি মারিতে গিয়া লাঠির খোঁচা খাইবে, আমি তখন শ্রীরামের কৃপায় বাঁচিয়া যাইব। হয়ত বা আমাকে দেখিলে এক-আধবার ভিতরে যাইতেও দিবেন। কিন্তু হায় রে দুর্ভাগ্য! সমস্ত দিন যে প্রাণপাত পরিশ্রম করিলাম, সন্ধ্যার পর আর তাহার কোন পুরস্কারই পাইলাম না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গ্রীনরুমের দ্বারের সন্নিকটে দাঁড়াইয়া রহিলাম। রামচন্দ্র কতবার আসিলেন, গেলেন, আমাকে কিন্তু চিনিতে পারিলেন না। একবার জিজ্ঞাসাও করিলেন না, আমি অমন করিয়া দাঁড়াইয়া কেন? অকৃতজ্ঞ রাম! দড়ি-ধরার প্রয়োজনও কি তাঁহরে একেবারেই শেষ হইয়া গিয়াছে।

রাত্রি দশটার পর থিয়েটারের পয়লা 'বেল' হইয়া গেলে, নিতান্ত

ক্ষুণ্নমনে সমস্ত ব্যাপারটার উপরেই হতশ্রদ্ধ হইয়া সুমুখে আসিয়া একটা জায়গা দখল করিয়া বসিলাম। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই সমস্ত অভিমান ভুলিয়া গেলাম। সে কি প্লে! জীবনে অনেক প্লে দেখিয়াছি বটে, কিন্তু তেমনটি আর দেখিলাম না। মেঘনাদ স্বয়ং এক বিপর্যয় কাণ্ড! তাঁহার ছয় হাত উঁচু দেহ। পেটের ঘেরটা চার সাড়ে-চার হাত। সবাই বলিত, মরিলে গরুর গাড়ি ছাড়া উপায় নাই। অনেক দিনের কথা। আমার সমস্ত ঘটনা মনে নাই। কিন্তু এটা মনে আছে, তিনি সেদিন যে বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমাদের দেশের হারাণ পলসাঁই ভীম সাজিয়া মস্ত একটা সজিনার ডাল ঘাড়ে করিয়া দাঁত কিড়মিড় করিয়াও তেমনটি করিতে পারিতেন না।

ড্রপ-সিন উঠিয়াছে। বোধ করি বা তিনি লক্ষ্মণই হইবেন—অল্প-স্বল্প বীরত্ব প্রকাশ করিতেছেন। এমনি সময়ে সেই মেঘনাদ কোথা হইতে একেবারে লাফ দিয়া সুমুখে আসিয়া পড়িল। সমস্ত স্টেজটা মড়মড় করিয়া কাঁপিয়া দুলিয়া উঠিল—ফুট-লাইটের গোটা পাঁচ-ছয় ল্যাম্প উল্টাইয়া নিবিয়া গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিজের পেট-বাঁধা জরির কোমরবন্ধটা পটাস্ করিয়া ছিঁড়িয়া পড়িল। একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল! তাহাকে বসিয়া পড়িবার জন্য কেহ-বা সভয় চীৎকারে অনুনয় করিয়া উঠিল কেহ-বা সিন্ ফেলিয়া দিবার জন্য চেঁচাইতে লাগিল—কিন্তু বাহাদুর মেঘনাদ! কাহারও কোন কথায় বিচলিত হইলেন না। বাঁ হাতের ধনুক ফেলিয়া দিয়া, পেন্টুলানের মুখ চাপিয়া ধরিয়া ডান হাতের শুধু তীর দিয়াই যুদ্ধ করিতে লাগিলেন!

ধন্য বীর! ধন্য বীরত্ব! অনেকে অনেক প্রকার যুদ্ধ দেখিয়াছে মানি, কিন্তু ধনুক নাই, বাঁ হাতের অবস্থাও যুদ্ধক্ষেত্রের অনুকূল নয়,—শুধু ডান হাত এবং শুধু তীর দিয়া ক্রমাগত যুদ্ধ কে কবে দেখিয়াছে। অবশেষে তাহাতেই জিত। বিপক্ষকে সে-যাত্রা পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে হইল।

আনন্দের সীমা নাই—মগ্ন হইয়া দেখিতেছি এবং এই অপরূপ লড়াইয়ের জন্য মনে মনে তাঁহার শতকোটি প্রশংসা করিতেছি, এমন সময় পিঠের উপর একটা আঙুলের চাপ পড়িল। মুখ ফিরাইয়া দেখি—ইন্দ্র। চুপি চুপি কহিল, আয় শ্রীকান্ত, দিদি একবার তোকে ডাকচেন। তড়িৎস্পৃষ্টের মত সোজা খাড়া হইয়া উঠিলাম। কোথায় তিনি?

বেরিয়ে আয় না—বলচি। পথে আসিয়া সে শুধু কহিল, আমার সঙ্গে আয়।—বলিয়া চলিতে লাগিল।

গঙ্গার ঘাটে পৌঁছিয়া দেখিলাম, তাহার নৌকা বাঁধা আছে। নিঃশব্দে উভয়ে চড়িয়া বসিলাম, ইন্দ্র বাঁধন খুলিয়া দিল।

আবার সেই সমস্ত অন্ধকার বনের পথ বাহিয়া দু'জনে শাহ্‌জীর কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন বোধ করি, রাত্রি আর বেশি নাই।

একটা কেরোসিনের ডিবা জ্বালাইয়া দিদি বসিয়া আছেন। তাঁহার ক্রোড়ের উপর শাহ্‌জীর মাথা। তাহার পায়ের কাছে একটা প্রকাণ্ড গোখ্‌রো সাপ লম্বা হইয়া আছে। দিদি মৃদুকণ্ঠে ঘটনাটা সংক্ষেপে বিবৃত করিলেন। আজ দুপুরবেলা কাহার বাটীতে সাপ ধরিবার বায়না থাকে। সেখানে ঐ সাপটিকে ধরিয়া যাহা বক্‌সিস্ পায়, তাহাতে কোথা হইতে তাড়ি খাইয়া মাতাল হইয়া সন্ধ্যার প্রাকালে বাড়ি ফিরিয়া, দিদির পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও সাপ খেলাইতে উদ্যত হয়। খেলাইয়াও ছিল। কিন্তু অবশেষে খেলা সাঙ্গ করিয়া তাহার লেজ ধরিয়া হাঁড়িতে পুরিবার সময় মদের ঝোঁকে মুখের কাছে মুখ আনিয়া চুমকুড়ি দিয়া আদর করিতে গেলে, সেও আদর করিয়া শাহ্‌জীর গলার উপর তীব্র চুম্বন দিয়াছে।

দিদি তাঁহার মলিন অঞ্চলপ্রান্তে চোখ মুছিয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, শ্রীকান্ত, তখনই কিন্তু তাঁর চৈতন্য হ'ল যে, সময় আর বেশি নেই। বললেন, আয়, দু'জনে একসঙ্গেই যাই, ব'লে পা দিয়ে সাপটার মাথা চেপে ধ'রে দুই হাত দিয়ে তাকে টেনে টেনে ঐ অত বড় ক'রে ফেলে দিলেন। তার পরে দু'জনেরই খেলা সাঙ্গ হ'ল। বলিয়া তিনি হাত দিয়া অত্যন্ত সন্তর্পণে শাহ্‌জীর মুখাবরণ উন্মোচন করিয়া, গভীর স্নেহে তাহার সুনীল ওষ্ঠাধরে ওষ্ঠ স্পর্শ করিয়া বলিলেন, যাক্, ভালই হ'ল ইন্দ্রনাথ। ভগবানকে আমি এতটুকু দোষ দিইনে।

আমরা উভয়েই নির্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। সে কণ্ঠস্বরে যে কি মর্মান্তিক বেদনা, কি প্রার্থনা, কি সুনিবিড় অভিমান প্রকাশ পাইল, তাহা যে শুনিয়াছে, তাহার সাধ্য নাই যে, জীবনে বিস্মৃত হয়। কিন্তু কিসের জন্য এই অভিমান? প্রার্থনাই বা কাহার জন্য?

একটুখানি স্থির থাকিয়া বলিলেন, তোমরা ছেলেমানুষ, কিন্তু তোমরা দুটি ছাড়া ত আমার আর কেউ নেই ভাই, তাই এই ভিক্ষে করি, এঁর একটু

তোমরা উপায় করে দিয়ে যাও। আঙুল দিয়া কুটীরের দক্ষিণদিকের জঙ্গলটা নির্দেশ করিয়া বলিলেন, ওইখানে একটু জায়গা আছে, ইন্দ্রনাথ, আমি অনেকদিন ভেবেচি, যদি আমার মরণ হয়, ওইখানেই যেন শুয়ে থাকতে পাই। সকাল হলে সেই জায়গাটুকুতে এঁকে শুইয়ে রেখো ভাই, অনেক কষ্টই এ-জীবনে ভোগ করে গেছেন—তবু একটু শান্তি পাবেন।

ইন্দ্র প্রশ্ন করিল, শাহ্‌জীকে কি কবর দিতে হবে?

দিদি বলিলেন, মুসলমান যখন, তখন দিতে হবে বৈ কি ভাই!

ইন্দ্র পুনরায় প্রশ্ন করিল, দিদি তুমিও কি মুসলমান?

দিদি বলিলেন, হ্যাঁ, মুসলমান বৈ কি।

উত্তর শুনিয়া ইন্দ্র কেমন যেন সঙ্কুচিত ও কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। বেশ দেখিতে পাইলাম, এ জবাব সে আশা করে নাই! দিদিকে সে বাস্তবিকই ভালবাসিয়াছিল। তাই বোধ করি মনের মধ্যে একটা গোপন আশা পোষণ করিয়া রাখিয়াছিল, তাঁহার দিদি তাহাদেরই একজন। আমার কিন্তু বিশ্বাস হইল না। তাঁহার নিজের মুখের স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও কোনমতেই ভাবিতে পারিলাম না যে, তিনি হিন্দু-কন্যা নহেন!

বাকি রাতটুকু কাটিয়া গেলে, ইন্দ্র সেই নির্দিষ্ট স্থানে কবর খুঁড়িয়া আসিল এবং তিনজনে আমরা ধরাধরি করিয়া শাহ্‌জীর মৃতদেহটা সমাহিত করিলাম। গঙ্গার ঠিক উপরের কাঁকরের একটুখানি পাড় ভাঙ্গিয়া ঠিক যেন কাহারও শেষ-শয্যা বিছাইবার জন্যই এই স্থানটুকু প্রস্তুত হইয়াছিল। কুড়ি পঁচিশ হাত নীচেই জাহ্নবী-মায়ের প্রবাহ—মাথার উপরে বন্য লতার আচ্ছাদন। প্রিয়বস্তুকে সযত্নে লুকাইয়া রাখিবার স্থান বটে! বড় ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনজনে পাশাপাশি উপবেশন করিলাম—আর একজন আমাদের কোলের কাছে মৃত্তিকাতলে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়া ঘুমাইয়া রহিল। তখনও সূর্যোদয় হয় নাই—নীচে মন্দস্রোতা ভাগীরথীর কুলুকুলু শব্দ কানে আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল—মাথার উপরে আশেপাশে বনের পাখীরা প্রভাতী গাহিতে লাগিল। কাল যে ছিল, আজ সে নাই। কাল প্রভাতে কে ভাবিয়াছিল আজ এমনি করিয়া আমাদের নিশাবসান হইবে। কে জানিত, একজনের শেষমুহূর্ত এত কাছেই ঘনাইয়া উঠিয়াছিল!

হঠাৎ দিদি সেই গোরের উপর লুটাইয়া পড়িয়া বিদীর্ণ কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিলেন,—মা গঙ্গা, আমাকে পায়ে স্থান দাও মা। আমার যে আর

কোথাও জায়গা নেই। তাঁহার এই প্রার্থনা, এই নিবেদন যে কিরূপ মর্মান্তিক সত্য, তাহা তখনও তেমন বুঝিতে পারি নাই, যেমন দুদিন পরে পারিয়াছিলাম। ইন্দ্র একবার আমার মুখের পানে চোখ তুলিল, তারপর উঠিয়া গিয়া সে আর্ত নারীর ভূলুণ্ঠিত মাথাটি নিজের কোলের উপর তুলিয়া লইয়া, তাঁহারই মত আর্তস্বরে বলিয়া উঠিল, দিদি আমার কাছে তুমি চল—আমার মা এখনো বেঁচে আছেন, তিনি তোমাকে ফেলবেন না—কোলে টেনে নেবেন। তাঁর বড় মায়ার শরীর, একবার শুধু তাঁর কাছে গিয়ে তুমি দাঁড়াবে চল। তুমি হিন্দুর মেয়ে দিদি, কিছুতেই মুসলমানী নও।

দিদি কথা কহিলেন না। মূর্চ্ছিতের মত কিছুক্ষণ তেমনিভাবে পড়িয়া থাকিয়া শেষে উঠিয়া বসিলেন। তার পরে উঠিয়া আসিয়া তিনজনে গঙ্গাস্নান করিলাম। দিদি হাতের নোয়া জলে ফেলিয়া দিলেন, গালার চুড়ি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন মাটি দিয়া সিঁথির সিন্দুর তুলিয়া ফেলিয়া সদ্য-বিধবার সাজে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কুটিরে ফিরিয়ে আসিলেন।

এতদিন পরে আজ তিনি প্রথম বলিলেন যে, শাহ্‌জী তাঁহার স্বামী ছিলেন।

ইন্দ্র কিন্তু কথাটা ঠিকমত মনের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিল না; সন্দিগ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কিন্তু তুমি যে হিন্দুর মেয়ে, দিদি!

দিদি বলিলেন, হাঁ, বামুনের মেয়ে। তিনিও ব্রাহ্মণ ছিলেন।

ইন্দ্র ক্ষণকাল অবাক্ হইয়া থাকিয়া কহিল, জাত দিলেন কেন?

দিদি বলিলেন, সে-কথা ঠিক জানিনে ভাই। কিন্তু তিনি যখন দিলেন, তখন আমারও সেইসঙ্গে জাত গেল। স্ত্রী সহধর্মিণী বই ত নয়। নইলে আমি নিজে হ'তে জাতও দিইনি—কোনদিন কোন অনাচারও করিনি।

ইন্দ্র গাঢ়স্বরে কহিল, সে আমি দেখেচি দিদি—সেইজন্যেই আমার যখন তখন এই কথাই মনে হয়েচে—আমাকে মাপ ক'রো দিদি, তুমি কি ক'রে এর মধ্যে আছ—তোমার কেমন ক'রে এমন দুর্মতি হয়েছিল। কিন্তু এখন আমি আর কোন কথা শুনব না, আমাদের বাড়িতে তোমাকে যেতেই হবে। এখনি চল।

দিদি অনেকক্ষণ পর্যন্ত নীরবে কি যেন চিন্তা করিয়া লইলেন, পরে মুখ তুলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, এখন আমি কোথাও যেতে পারিনে ইন্দ্রনাথ।

কেন পার না দিদি?

দিদি বলিলেন, আমি জানি, তিনি কিছু-কিছু দেনা রেখে গেছেন। সেগুলি শোধ না দেওয়া পর্যন্ত ত কোথাও নড়তে পারিনে।

ইন্দ্র হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল—সে আমিও জানি। তাড়ির দোকানে, গাঁজার দোকানে তার দেনা ; কিন্তু তোমার তাতে কি ? কার সাধ্যি তোমার কাছে টাকা চাইতে পারে ? তুমি চল আমার সঙ্গে, কে তোমাকে আটকায় দেখি একবার !

অত দুঃখেও দিদি একটুখানি হাসিলেন। বলিলেন, ওরে পাগলা, যে আমাকে আটক ক'রে রাখবে, সে যে আমার নিজেরই ধর্ম। স্বামীর ঋণ যে আমার নিজেরই ঋণ। সে পাওনাদারকে তুমি কি করে বাধা দেবে ভাই। তা হয় না। আজ তোমরা বাড়ি যাও—আমার অল্প-স্বল্প যা-কিছু আছে বিক্রি ক'রে ধার শোধ দেবার চেষ্টা করি। কাল-পরশু একদিন এসো।

আমি এতক্ষণ প্রায় চুপ করিয়াই ছিলাম। এইবার কথা কহিলাম। বলিলাম, দিদি, আমার কাছে বাড়িতে আরও চার-পাঁচটা টাকা আছে—নিয়ে আসব ?

কথাটা শেষ না হইতেই তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া আমাকে ছোট ছেলেটির মত একেবারে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া, আমার কপালের উপর তাঁহার ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিয়া, মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, না দাদা, আর এনে কাজ নেই। তুমি সেই যে টাকা পাঁচটি রেখে গিয়েছিলে, তোমার সে দয়া আমি মরণ পর্যন্ত মনে রাখব ভাই। আশীর্বাদ ক'রে যাই, তোমার বুকের ভিতর ব'সে ভগবান চিরদিন যেন অমনি ক'রে দুঃখীর জন্যে চোখের জল ফেলেন। বলিতে বলিতেই তাঁহার দু'চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

বেলা আটটা-নয়টার সময় আমরা বাটী ফিরিতে উদ্যত হইলে, সেদিন তিনি সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা পর্যন্ত আসিলেন। যাবার সময় ইন্দ্রের একটা হাত ধরিয়া বলিলেন, ইন্দ্রনাথ, শ্রীকান্তকে আশীর্বাদ করলুম বটে, কিন্তু তোমাকে আশীর্বাদ করি, সে সাহস আমার হয় না। তুমি মানুষের আশীর্বাদের বাইরে। তবে ভগবানের শ্রীচরণে তোমাকে মনে মনে আজ সঁপে দিলুম। তিনি তোমাকে যেন আপনার ক'রে নেন।

ইন্দ্রকে তিনি চিনিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার বাধা দেওয়া সত্ত্বেও

ইন্দ্র জোর করিয়া তাঁহার দুই পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, দিদি, এ জঙ্গলে তোমাকে একলা ফেলে রেখে যেতে আমার কিছুতেই মন সরচে না। আমার কি জানি কেন কেবলি মনে হচ্ছে, তোমাকে আর দেখতে পাব না।

দিদি জবাব দিলেন না। সহসা মুখ ফিরাইয়া চোখ মুছিতে মুছিতে সেই বনপথ ধরিয়া তাঁহার শোকাচ্ছন্ন শূন্য কুটীরে ফিরিয়া গেলেন। যতক্ষণ দেখা গেল, তাঁহাকে দাঁড়াইয়া দেখিলাম। কিন্তু একটিবারও আর তিনি ফিরিয়া চাহিলেন না—তেমনি মাথা নত করিয়া একভাবে দৃষ্টির বাহিরে মিলাইয়া গেলেন। অথচ কেন যে তিনি ফিরিয়া চাহিলেন না, তাহা দু' জনেই মনে মনে অনুভব করিলাম।

তিনদিন পরে স্কুলের ছুটির পর বাহির হইয়াই দেখি, ইন্দ্র গেটের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মুখ অত্যন্ত শুষ্ক, পায়ে জুতা নাই—হাঁটু পর্যন্ত ধূলায় ভরা! এই অত্যন্ত দীন চেহারা দেখিয়া ভয় পাইয়া গেলাম। বড়লোকের ছেলে, বাহিরে সে একটু বিশেষ বাবু। এমন অবস্থা তাহার আমি তো দেখিই নাই—বোধ করি, আর কেহও দেখে নাই। ইশারা করিয়া মাঠের দিকে আমাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া ইন্দ্র বলিল, দিদি নেই—কোথায় চলে গেছেন। আমার মুখের প্রতিও আর সে চাহিয়া দেখিল না। কহিল, কাল থেকে আমি কত জায়গায় যে খুঁজেচি, কিন্তু দেখা পেলাম না। তোকে একখানা চিঠি লিখে গেছেন—এই নে, বলিয়া একখানা ভাঁজকরা হলুদে রঙের কাগজ আমার হাতে গুঁজিয়া দিয়াই সে আর একদিকে দ্রুতপদে চলিয়া গেল। বোধ করি, হৃদয় তাহার এতই পীড়িত, এতই শোকাতুর হইয়াছিল যে, কাহারও সঙ্গ বা কাহারও সহিত আলোচনা তাহার সাধ্যাতীত হইয়া উঠিয়াছিল।

সেইখানেই আমি ধপ করিয়া বসিয়া পড়িয়া ভাঁজ খুলিয়া কাগজখানি চোখের সামনে মেলিয়া ধরিলাম। চিঠিতে যাহা লেখা ছিল, এতকাল পরে তাহার সমস্ত কথা যদিচ মনে নাই, তথাপি অনেক কথাই স্মরণ করিতে পারি। চিঠিতে লেখা ছিল, শ্রীকান্ত, যাইবার সময় আমি তোমাদের আশীর্বাদ করিতেছি। শুধু আজ নয়, যতদিন বাঁচিব, ততদিন তোমাদের আশীর্বাদ করিব। কিন্তু, আমার জন্য তোমরা দুঃখ করিও না। ইন্দ্রনাথ

আমাকে খুঁজিয়া বেড়াইবে, সে জানি। কিন্তু তুমি তাহাকে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া নিরস্ত করিও। আমার সমস্ত কথা যে আজই তোমরা বুঝিতে পারিবে, তাহা নয়; কিন্তু বড় হইলে একদিন বুঝিবে, সেই আশায় এই পত্র লিখিয়া গেলাম। কিন্তু নিজের কথা নিজের মুখেই ত তোমাদের কাছে বলিয়া যাইতে পরিতাম। অথচ কেন যে বলি নাই,—বলি বলি করিয়াও কেন চুপ করিয়া গিয়াছি, সেই কথাটাই আজ না বলিতে পারিলে আর বলা হইবে না। আমার কথা—শুধু আমারই কথা নয় ভাই, সে আমার স্বামীর কথা। আমার তাও ভাল কথা নয়। এ-জন্মের পাপ যে আমার কত, তাহা ঠিক জানি না; কিন্তু পূর্বজন্মের সঞ্চিত পাপের যে আমার সীমা-পরিসীমা নাই, তাহাতে ত কোন সংশয় নাই। তাই যখনই বলিতে চাহিয়াছি, তখনই মনে হইয়াছে, স্ত্রী হইয়া নিজের মুখে স্বামীর নিন্দা-গ্লানি করিয়া সে পাপের বোঝা আর ভারাক্রান্ত করিব না। কিন্তু এখন তিনি পরলোকে গিয়াছেন। আর গিয়াছেন বলিয়াই যে বলিতে আর দোষ নাই, সে মনে করিও না। অথচ কেন জানি না, আমার এই অন্তবিহীন দুঃখের কথাগুলো তোমাদের না জানাইয়াও কোনমতেই বিদায় লইতে পারিতেছি না। শ্রীকান্ত, তোমার এই দুঃখিনী দিদির নাম অন্নদা। স্বামীর নাম কেন গোপন করিয়া গেলাম, তাহার কারণ—এই লেখাটুকুর শেষ পর্যন্ত পড়িলেই বুঝিতে পারিবে। আমার বাবা বড়লোক। তাঁর ছেলে ছিল না। আমরা দুটি বোন। সেইজন্য বাবা দরিদ্রের গৃহ হইতে স্বামীকে আনাইয়া নিজের কাছে রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহাকে লেখাপড়া শিখাইতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু মানুষ করিতে পারেন নাই। আমার বড় বোন বিধবা হইয়া বাড়িতেই ছিলেন—ইঁহাকেই হত্যা করিয়া স্বামী নিরুদ্দেশ হন। এ দুষ্কর্ম কেন করিয়াছিলেন, তাহার হেতু তুমি ছেলেমানুষ, আজ না বুঝিতে পরিলেও একদিন বুঝিবে। সে যাই হোক, বল ত শ্রীকান্ত, এ দুঃখ কত বড? এ লজ্জা কি মর্মান্তিক। তবুও তোমার দিদি সব সহিয়াছিল। কিন্তু স্বামী হইয়া যে অপমানের আগুন তিনি তাঁর স্ত্রীর বুকের মধ্যে জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, সে জ্বালা আজও তোমার দিদির থামে নাই। যাক সে কথা! তার পরে, সাত বৎসর পরে আবার দেখা পাই। যেমন বেশে তোমরা তাকে দেখিয়াছিলে, তেমনি বেশে আমাদেরই বাটীর সম্মুখে তিনি সাপ খেলাইতেছিলেন।

তাঁহাকে আর কেহ চিনিতে পারে নাই, কিন্তু আমি পারিয়াছিলাম। আমার চক্ষুকে তিনি ফাঁকি দিতে পারেন নাই। শুনি, এ দুঃসাহসের কাজ নাকি তিনি আমার জন্যই করিয়াছিলেন। কিন্তু সে মিছে কথা। তবুও একদিন গভীর রাত্রে খিড়কীর দ্বার খুলিয়া আমি স্বামীর জন্যই গৃহত্যাগ করিয়াছিলাম। কিন্তু সবাই শুনিল, সবাই জানিল, অন্নদা কুলত্যাগ করিয়া গিয়াছে। এ কলঙ্কের বোঝা আমাকে চিরদিনই বহিয়া বেড়াইতে হইবে। কোন উপায় নাই। কারণ স্বামী জীবিত থাকিতে আত্মপ্রকাশ করিতে পারি নাই। পিতাকে চিনিতাম; তিনি কোনমতেই তার সন্তানঘাতীকে ক্ষমা করিতেন না। কিন্তু আজ যদিও আর সে ভয় নাই—আজ গিয়া তাঁহাকে বলিতে পারি, কিন্তু এ গল্প এতদিন পরে কে বিশ্বাস করিবে? সুতরাং পিতৃগৃহে আমার আর স্থান নাই। তা' ছাড়া আমি আবার মুসলমানী!

এখানে স্বামীর ঋণ যাহা ছিল, পরিশোধ করিয়াছি। আমার কাছে লুকানো দু'টি সোনার মাকৃড়ি ছিল, তাহাই বেচিয়াছি, তুমি যে পাঁচটি টাকা একদিন রাখিয়া গিয়াছিলে, তাহা খরচ করি নাই; আমাদের বড় রাস্তার মোড়ের উপর যে মুদীর দোকান আছে, তাহার কর্তার কাছে রাখিয়া দিয়াছি—চাহিলেই পাইবে। মনে দুঃখ করিও না ভাই! টাকা কয়টি ফিরাইয়া দিলাম বটে, কিন্তু তোমার ওই কচি বুকটুকু আমি বুকে পুরিয়া লইয়া গেলাম। আর এইটি তোমার দিদির আদেশ শ্রীকান্ত, আমার কথা ভাবিয়া তোমরা মন খারাপ করিও না। মনে করিও, তোমার দিদি, যেখানেই থাকুক, ভালই থাকিবে; কেন-না, দুঃখ সহিয়া সহিয়া এখন কোন দুঃখই আর তার গায়ে লাগে না! তাকে কিছুতেই আর ব্যথা দিতে পারে না। আমার ভাই দুটি, তোমাদের আমি কি বলিয়া যে আশীর্বাদ করিব খুঁজিয়া পাই না। তবে শুধু এই বলিয়া যাই—ভগবান পতিব্রতার যদি মুখ রাখেন, তোমাদের বন্ধুত্বটি যেন চিরদিন তিনি অক্ষয় করেন।

তোমাদের দিদি

অন্নদা

সাত

আজ একাকী গিয়া মুদীর কাছে দাঁড়াইলাম। পরিচয় পাইয়া মুদী একটি ছোট ন্যাকড়া বাহির করিয়া গেরো খুলিয়া দুটি সোনার মাকড়ি এবং পাঁচটি টাকা বাহির করিল। টাকা কয়টি আমার হাতে দিয়া কহিল, বহু, মাকড়ি দুটি আমাকে একুশ টাকায় বিক্রি করিয়া শাহ্‌জীর সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কোথায় গিয়েছেন, তাহা জানি না। এই বলিয়া সে কাহার কত ঋণ মুখে মুখে একটা হিসাব দিয়া কহিল, যাবার সময় বহুর হাতে সাড়ে পাঁচ আনা পয়সা ছিল। অর্থাৎ বাইশটি মাত্র পয়সা অবলম্বন করিয়া এই নিরুপায় নিরাশ্রয় রমণী সংসারের সুদুর্গম পথে একাকী যাত্রা করিয়াছেন। পাছে তাহার সেই স্নেহাস্পদ বালক দুইটি তাঁহাকে আশ্রয় দিবার ব্যর্থ প্রয়াসে, উপায়হীন বেদনায় ব্যথিত হয় এই ভয়ে নিঃশব্দে অলক্ষে বাহির হইয়া গিয়াছেন—কোথায়, কাহাকেও জানিতে পর্যন্ত দেন নাই। না দিন, কিন্তু আমার টাকা পাঁচটি নিলেন না। অথচ নিয়াছেন মনে করিয়া আমি আনন্দে, গর্বে কতদিন কত আকাশকুসুম সৃষ্টি করিয়াছিলাম—আজ সব আমার শূন্যে মিলাইয়া গেল। অভিমানে চোখ ফাটিয়া জল আসিল। তাহাই এই বুড়ার কাছে লুকাইবার জন্য দ্রুতপদে চলিয়া গেলাম। বার বার বলিতে লাগিলাম, ইন্দ্রের কাছে তিনি কতই লইয়াছেন, কিন্তু আমার কাছে কিছুই লইলেন না—যাইবার সময় না বলিয়া ফিরাইয়া দিয়া গেলেন।

কিন্তু এখন আর আমার মনে সে অভিমান নাই। বড় হইয়া বুঝিয়াছি, আমি এমন কি সুকৃতি করিয়াছি যে, তাঁহাকে দান করিতে পাইব? সেই জ্বলন্ত শিখায় যাহা আমি দিব, তাহাই বুঝি পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে বলিয়াই দিদি আমার দান প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। কিন্তু ইন্দ্র! ইন্দ্র আর আমি কি এক ধাতুতে প্রস্তুত যে, সে যেখানে দান করিবে, আমি সেখানে হাত বাড়াইব! তা ছাড়া ইহাও ত বুঝিতে পারি, দিদি কাহার মুখ চাহিয়া সেই ইন্দ্রের কাছেও হাত পাতিয়াছিলেন। যাক্ সে কথা।

তার পরে অনেক জায়গায় ঘুরিয়াছি; কিন্তু এই দুটো পোড়া চোখে আর কখনও তাঁহার দেখা পাই নাই। না পাই, কিন্তু অন্তরের মধ্যে সেই প্রসন্ন হাসিমুখখানি চিরদিন তেম্‌নিই দেখিতে পাই। তাঁহার চরিত্রের কথা স্মরণ করিয়া যখনই মাথা নোয়াইয়া প্রণাম করি, তখন এই একটা কথা কেবল মনে হয়, ভগবান! এ তোমার কি বিচার? আমাদের এই সতী-সাবিত্রীর দেশে

স্বামীর জন্য সহধর্মিণীকে অপরিসীম দুঃখ দিয়া সতীর মাহাত্ম্য তুমি উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর করিয়া সংসারকে দেখাইয়াছ, তাহা জানি। তাঁহাদের সমস্ত দুঃখ-দৈন্যকে চিরস্মরণীয় কীর্তিতে রূপান্তরিত করিয়া জগতের সমস্ত নারী-জাতিকে কর্তব্যের ধ্রুবপথে আকর্ষণ করিতেছ—তোমার সে ইচ্ছাও বুঝিতে পারি, কিন্তু আমার এমন দিদির ভাগ্যে এতবড় বিডম্বনা নির্দেশ করিয়া দিলে কেন? কিসের জন্য এত বড় সতীর কপালে অসতীর গভীর কালো ছাপ মারিয়া চিরদিনের জন্য তাঁকে তুমি সংসারে নির্বাসিত করিয়া দিলে? কি না তুমি তাঁর নিলে? তাঁর জাতি নিলে, ধর্ম নিলে—সমাজ, সংসার, সম্ভ্রম সমস্তই নিলে। দুঃখ যত দিয়াছ, আমি ত আজো তাহার সাক্ষী রহিয়াছি। এতেও দুঃখ করি না, জগদীশ্বর! কিন্তু যাঁর আসন সীতা, সাবিত্রী, সতীর সঙ্গেই, তাঁকে তাঁর বাপ-মা আত্মীয়স্বজন, শত্রু-মিত্র জানিয়া রাখিল কি বলিয়া? কুলটা বলিয়া, বেশ্যা বলিয়া। ইহাতে তোমারই বা কি লাভ? সংসারই বা পাইল কি?

হায় রে, কোথায় তাঁহার এই সব আত্মীয়-স্বজন, শত্রু-মিত্র—এ যদি একবার জানিতে পারিতাম! সে দেশ যে খানে যত দূরে হোক, এ দেশের বাহিরে হইলেও হয়ত এতদিন গিয়া হাজির হইয়া বলিয়া আসিতাম—এই তোমাদের অন্নদা! এই তাঁর অক্ষয় কাহিনী! তোমাদের যে মেয়েটিকে কুলত্যাগিনী বলিয়া জানিয়া রাখিয়াছ, সকালবেলায় একবার তাঁর নামটাই লইও—অনেক দুষ্কৃতির হাত এড়াইতে পারিবে।

তবে আমি একটা সত্য বস্তু লাভ করিয়াছি। পূর্বেও একবার বলিয়াছি, নারীর কলঙ্ক আমি সহজে প্রত্যয় করিতে পারি না। আমার দিদিকে মনে পড়ে। যদি তাঁর ভাগ্যেও এতবড় দুর্নাম ঘটিতে পারে, তখন সংসারে পারে না কি? এক আমি, আর সেই সমস্ত কালের সমস্ত পাপ-পুণ্যের সাক্ষী তিনি ছাড়া জগতে আর কেহ কি আছে, যে অন্নদাকে একটুখানি স্নেহের সঙ্গেও স্মরণ করিবে! তাই ভাবি, না জানিয়া নারীর কলঙ্কে অবিশ্বাস করিয়া সংসারে বরঞ্চ ঠকাও ভাল, কিন্তু বিশ্বাস করিয়া পাপের ভাগী হওয়ায় লাভ নাই।

তার পরে অনেকদিন ইন্দ্রকে আর দেখি নাই। গঙ্গার তীরে বেড়াইতে গেলেই দেখি, তাহার ডিঙ্গি কূলে বাঁধা। জলে ভিজিতেছে, রৌদ্রে ফাটিতেছে।

শুধু আর একটি দিন মাত্র আমরা উভয়ে সেই নৌকায় চড়িয়াছিলাম। সেই শেষ। তার পরে সেও আর চড়ে নাই, আমিও না। এই দিনটা আমার খুব মনে পড়ে। শুধু আমাদের নৌকা-যাত্রার সমাপ্তি বলিয়াই নয়। সেদিন অখণ্ড স্বার্থপরতার যে উৎকট দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাহা সহজে ভুলিতে পারি নাই। সেই কথাটাই বলিব।

সেদিন কনকনে শীতের সন্ধ্যা। আগের দিন খুব এক-পশলা বৃষ্টিপাত হওয়ায়, শীতটা যেন ছুঁচের মত গায়ে বিঁধিতেছিল। আকাশে পূর্ণচন্দ্র, চারিদিক জ্যোৎস্নায় যেন ভাসিয়া যাইতেছে। হঠাৎ ইন্দ্র আসিয়া হাজির। কহিল,—ভে থিয়েটার হবে, যাবি ?

থিয়েটারের নামে একেবারেই লাফাইয়া উঠিলাম। ইন্দ্র কহিল, তবে কাপড় পরে শিগ্‌গির আমাদের বাড়ি আয়।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে একখানা র‍্যাপার টানিয়া লইয়া ছুটিয়া বাহির হইলাম। সেখানে যাইতে হইলে ট্রেনে যাইতে হয়। ভাবিলাম, উহাদের বাড়ির গাড়ি করিয়া স্টেশনে যাইতে হইবে—তাই তাড়াতাড়ি।

ইন্দ্র কহিল, তা নয়। আমরা ডিঙিতে যাব। আমি নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলাম। কারণ গঙ্গায় উজান ঠেলিয়া যাইতে হইলে বহু বিলম্ব হওয়াই সম্ভব। হয়ত-বা সময়ে উপস্থিত হইতেই পারা যাইবে না। ইন্দ্র কহিল, ভয় নেই, জোর হাওয়া আছে, দেরি হবে না। আমার নতুনদা কলকাতা থেকে এসেছেন, তিনি গঙ্গা দিয়ে যেতে চান।

যাক, দাঁড় বাঁধিয়া পাল খাটাইয়া ঠিক হইয়া বসিয়াছি—অনেক বিলম্বে ইন্দ্রর নতুনদা আসিয়া ঘাটে পৌঁছিলেন। চাঁদের আলোকে তাঁহাকে দেখিয়া ভয় পাইয়া গেলাম। কলকাতার বাবু—অর্থাৎ ভয়ঙ্কর বাবু। সিল্কের মোজা, চকচকে পাম্প-সু, আগাগোড়া ওভারকোটে মোড়া, গলায় গলাবন্ধ, হাতে দস্তানা, মাথায় টুপি—পশ্চিমের শীতের বিরুদ্ধে তাঁহার সতর্কতার অন্ত নাই। আমাদের সাথের ডিঙিটাকে তিনি অত্যন্ত 'যাচ্ছেতাই' বলিয়া কঠোর মত প্রকাশ করিয়া ইন্দ্রর কাঁধে ভর দিয়া আমার হাত ধরিয়া. অনেক কষ্টে, অনেক সাবধানে নৌকার মাঝখানে জাঁকিয়া বসিলেন।

তোর নাম কি রে ?

ভয়ে ভয়ে বলিলাম—শ্রীকান্ত।

তিনি দাঁত খিঁচাইয়া বলিলেন, আবার শ্রী—কান্ত। শুধু কান্ত। সে,

তামাক সাজ্‌। ইন্দ্র, হুঁকো-কল্‌কে রাখলি কোথায়? ছোঁড়াটাকে দে, তামাক সাজুক।

ওরে বাবা! মানুষ চাকরকেও ত এমন বিকট ভঙ্গী করিয়া আদেশ করে না। ইন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া কহিল, শ্রীকান্ত, তুই এসে একটু হাল ধর, আমি তামাক সাজচি!

আমি তাহার জবাব না দিয়ে তামাক সাজিতে লাগিয়া গেলাম। কারণ তিনি ইন্দ্রর মাসতুতো ভাই, কলিকাতার অধিবাসী এবং সম্প্রতি এল. এ. পাশ করিয়াছেন। কিন্তু মনটা আবার বিগড়াইয়া গেল। তামাক সাজিয়া হুকা হাতে দিতে, তিনি প্রসন্ন-মুখে টানিতে টানিতে প্রশ্ন করিলেন, তুই থাকিস্‌ কোথায় রে কান্ত? তোর গায়ে ওটা কালোপানা কি রে? র‍্যাপার? আহা, র‍্যাপারের কি শ্রী! তেলের গন্ধে ভূত পালায়! ফুটচে—পেতে দে দেখি, বসি।

আমি দিচ্ছি, নতুনদা। আমার শীত করছে না—এই নাও, বলিয়া ইন্দ্র নিজের গায়ের আলোয়ানটা তাড়াতাড়ি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। তিনি সেটা জড়ো করিয়া লইয়া বেশ করিয়া বসিয়া সুখে তামাক টানিতে লাগিলেন।

শীতের গঙ্গা। অধিক প্রশস্ত নয়। আধ ঘণ্টায় মধ্যেই ডিঙি ওপারে গিয়া ভিড়িল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বাতাস পড়িয়া গেল।

ইন্দ্র ব্যাকুল হইয়া কহিল, নতুনদা, এ যে ভারি মুস্কিল হ'ল, হাওয়া প'ড়ে গেল। আর ত পাল চলবে না।

নতুনদা জবাব দিলেন, এই ছোঁড়াটাকে দে না, দাঁড় টানুক।

কলিকাতাবাসী নতুনদার অভিজ্ঞতায় ইন্দ্র ঈষৎ ম্লান হাসিয়া কহিল, দাঁড়! কারুর সাধ্যি নেই নতুনদা, এই স্রোত ঠেলে উজোন ব'য়ে যায়। আমাদের ফিরতে হবে।

প্রস্তাব শুনিয়া, নতুনদা একমুহূর্তেই একেবারে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিলেন, তবে আনলি কেন হতভাগা! যেমন ক'রে হোক তোকে পৌঁছে দিতেই হবে। আমার থিয়েটারে হারমোনিয়াম বাজাতেই হবে—তারা বিশেষ ক'রে ধরেচে।

ইন্দ্র কহিল, তাদের বাজাবার লোক আছে, নতুনদা। তুমি না গেলেও আটকাবে না।

না! আটকাবে না? এই মেড়োর দেশের ছেলেরা বাজাবে হারমোনিয়াম! চল্‌, যেমন করে পারিস্‌ নিয়ে চল্‌। বলিয়া তিনি যেরূপ মুখভঙ্গি করিলেন,

তাহাতে আমার গা জ্বলিয়া গেল। ইহার ব্যঞ্জনা পরে শুনিয়াছিলাম; কিন্তু সে কথায় আর প্রয়োজন নাই।

ইন্দ্রর অবস্থা-সঙ্কট অনুভব করিয়া আমি আস্তে আস্তে কহিলাম, ইন্দ্র, গুণ টেনে নিয়ে গেলে হয় না?

কথাটা শেষ হইতে-না-হইতেই আমি চমকাইয়া উঠিলাম। তিনি এমনি দাঁত-মুখ ভ্যাংচাইয়া উঠিলেন যে, সে মুখখানি আমি আজও মনে করিতে পারি। বলিলেন, তবে যাও না, টানো গে না হে। জানোয়ারের মত বসে থাকা হচ্ছে কেন?

তার পরে একবার ইন্দ্র, একবার আমি গুণ টানিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কখনো-বা উঁচু পাড়ের উপর দিয়া, কখনো-বা নীচে নামিয়া এবং সময়ে সময়ে সেই বরফের মত ঠাণ্ডা জলের ধার ঘেঁসিয়া অত্যন্ত কষ্ট করিয়া চলিতে হইল। আবার তারই মাঝে মাঝে বাবুর তামাক সাজার জন্য নৌকা থামাইতে হইল। অথচ বাবুটি ঠায় বসিয়া রহিলেন—এতটুকু সাহায্য করিলেন না। ইন্দ্র একবার তাঁহাকে হালটা ধরিতে বলায় জবাব দিলেন, তিনি দস্তানা খুলে এই ঠাণ্ডায় নিমোনিয়া করিতে পারিবেন না।

ইন্দ্র বলিতে গেল, না খুলে—

হ্যাঁ। দামী দস্তানাটা মাটি করে ফেলি আর কি। নে—যা করছিস্ কর।

বস্তুতঃ আমি এমন স্বার্থপর অসজ্জন ব্যক্তি জীবনে অল্পই দেখিয়াছি। তাঁহারই একটা অপদার্থ খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য আমাদের এত ক্লেশ সমস্ত চোখে দেখিয়াও তিনি এতটুকু বিচলিত হইলেন না। অথচ আমরা বয়সে তাঁহার অপেক্ষা কতই-বা ছোট ছিলাম। পাছে এতটুকু ঠাণ্ডা লাগিয়া তাঁহার অসুখ করে, পাছে একফোঁটা জল লাগিয়া দামী ওভারকোট খারাপ হইয়া যায়, পাছে নড়িলে-চড়িলে কোনরূপ ব্যাঘাত হয়, এই ভয়েই আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলেন এবং অবিশ্রাম চেঁচামেচি করিয়া হুকুম করিতে লাগিলেন।

আরও বিপদ, গঙ্গার রুচিকর হাওয়ায় বাবুর ক্ষুধার উদ্রেক হইল এবং দেখিতে দেখিতে সে ক্ষুধা অবিশ্রান্ত বকুনির চোটে একেবারে ভীষণ হইয়া উঠিল। এদিকে চলিতে চলিতে রাত্রিও প্রায় দশটা হইয়া গেছে—থিয়েটারে পৌঁছিতে রাত্রি দুটা বাজিয়া যাইবে শুনিয়া বাবু প্রায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন।

রাত্রি যখন এগারোটা, তখন কলিকাতার বাবু কাবু হইয়া বলিলেন, হ্যাঁ রে ইন্দ্র, এদিকে খোট্টা-মোট্টাদের বস্তি-টস্তি নেই? মুড়িটুড়ি পাওয়া যায় না?

ইন্দ্র কহিল, সামনেই একটা বেশ বড় বস্তি নতুনদা। সব জিনিস পাওয়া যায়।

তবে লাগা লাগা—ওরে ছোঁড়া—ঐ—টান্ না একটু জোরে—ভাত খাস্‌নে? ইন্দ্র বল না তোর ওই ওটাকে, একটু জোর করে টেনে নিয়ে চলুক।

ইন্দ্র কিংবা আমি কেহই তাহার জবাব দিলাম না। যেমন চলিতেছিলাম, তেমনিভাবেই অনতিকাল পরে একটা গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে পাড়টা ঢালু ও বিস্তৃত হইয়া জলে মিশিয়াছিল। ডিঙ্গি জোর করিয়া ধাক্কা দিয়া সঙ্কীর্ণ জলে তুলিয়া দিয়া আমরা দুজনে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

বাবু কহিলেন, হাত-পা একটু খেলানো চাই। নামা দরকার। অতএব ইন্দ্র তাঁহাকে কাঁধে করিয়া নামাইয়া আনিল। তিনি জ্যোৎস্নার আলোকে গঙ্গার শুভ্র সৈকতে পদচারণা করিতে লাগিলেন।

আমরা দুজনে তাঁহার ক্ষুধাশান্তির উদ্দেশ্যে গ্রামের ভিতরে যাত্রা করিলাম। যদিচ বুঝিয়াছিলাম এত রাত্রে এই দরিদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে আহার্য সংগ্রহ করা সহজ ব্যাপার নয়, তথাপি চেষ্টা না করিয়াও ত নিস্তার ছিল না। অথচ তাঁহার একাকী থাকিতেও ইচ্ছা নাই। সে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেই, ইন্দ্র তৎক্ষণাৎ আহ্বান করিয়া কহিল, চল না নতুনদা, একলা তোমার ভয় করবে—আমাদের সঙ্গে একটু বেড়িয়ে আসবে। এখানে চোর-টোর নেই, ডিঙি কেউ নেবে না—চল।

নতুনদা মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিলেন, ভয়! আমরা দর্জিপাড়ার ছেলে, যমকে ভয় করিনে, তা জানিস্। কিন্তু তা ব'লে ছোটলোকদের dirty পাড়ার মধ্যেও আমরা যাইনে। ব্যাটাদের গায়ের গন্ধ নাকে গেলেও আমাদের ব্যামো হয়। অথচ তাঁহার মনোগত অভিপ্রায়—আমি তাঁহার পাহারায় নিযুক্ত থাকি এবং তামাক সাজি।

কিন্তু আমি তাঁহার ব্যবহারে মনে মনে এত বিরক্ত হইয়াছিলাম যে, ইন্দ্র আভাস দিলেও, আমি কিছুতেই একাকী এই লোকটার সংসর্গে থাকিতে রাজী হইলাম না; ইন্দ্রর সঙ্গেই প্রস্থান করিলাম।

দর্জিপাড়ার বাবু হাততালি দিয়া গান ধরিয়া দিলেন—ঠুন-ঠুন পেয়ালা—

আমরা অনেক দূর পর্যন্ত তাঁহার সেই মেয়েলি নাকিসুরে সঙ্গীতচর্চা শুনিতে শুনিতে গেলাম। ইন্দ্র নিজেও তাহার ভ্রাতার ব্যবহারে মনে মনে অতিশয় লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। ধীরে ধীরে কহিল, এরা কলকাতার লোক কিনা, জল-হাওয়া আমাদের মত সহ্য করতে পারে না—বুঝলি না শ্রীকান্ত!

আমি বলিলাম, হুঁ।

ইন্দ্র তখন তাঁহার অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয়—বোধ করি আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবার জন্যই দিতে দিতে চলিল। তিনি অচিরেই বি-এ পাশ করিয়া ডেপুটি হইবেন, কথা-প্রসঙ্গে তাহাও কহিল। যাই হোক, এতদিন পরে, এখন তিনি কোথাকার ডেপুটি, কিংবা আদৌ সে-কাজ পাইয়াছেন কি না, সে সংবাদ জানি না। কিন্তু মনে হয় যেন পাইয়াছেন, না হইলে বাঙ্গালী ডেপুটির মাঝে মাঝে এত সুখ্যাতি শুনিতে পাই কি করিয়া? তখন তাঁহার প্রথম যৌবন। শুনি, জীবনের এই সময়টায় নাকি হৃদয়ের প্রশস্ততা, সমবেদনার ব্যাপকতা যেমন বৃদ্ধি পায়, এমন আর কোন কালে নয়, অথচ ঘণ্টা-কয়েকের সংসর্গেই যে নমুনা তিনি দেখাইয়াছিলেন, এতকালের ব্যবধানেও তাহা ভুলিতে পারা গেল না। তবে ভাগ্যে এমন সব নমুনা কদাচিৎ চোখে পড়ে; না হইলে বহু পূর্বেই সংসারটা রীতিমত একটা পুলিশ থানায় পরিণত হইয়া যাইত। কিন্তু যাক্ সে কথা।

কিন্তু ভগবানও যে তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, সে খবরটা পাঠককে দেওয়া আবশ্যক। এ অঞ্চলে পথ-ঘাট, দোকান-পত্র সমস্তই ইন্দ্রর জানা ছিল। সে গিয়া মুদির দোকানে উপস্থিত হইল। কিন্তু দোকান বন্ধ এবং দোকানী শীতের ভয়ে দরজা-জানালা রুদ্ধ করিয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন। এই গভীরতা যে কিরূপ অতলস্পর্শী, সেকথা যাহার জানা নাই, তাহাকে লিখিয়া বুঝানো যায় না। ইহারা অম্লরোগী নিষ্কর্মা জমিদারও নয়, বহুভারাক্রান্ত কন্যাদায়গ্রস্ত বাঙালী গৃহস্থও নয়! সুতরাং ঘুমাইতে জানে। দিনের বেলা খাটিয়া-খুটিয়া রাত্রিতে একবার 'চারপাই' আশ্রয় করিলে ঘরে আগুন না দিয়া, শুধুমাত্র চেঁচামেচি ও দোর-নাড়ানাড়ি করিয়া জাগাইয়া দিব, এমন প্রতিজ্ঞা যদি স্বয়ং সত্যবাদী অর্জুন জয়দ্রথ-বধের পরিবর্তে করিয়া

বসিতেন, তবে তাঁহাকেও মিথ্যা-প্রতিজ্ঞা-পাপে দগ্ধ হইয়া মরিতে হইত, তাহা শপথ করিয়া বলিতে পারা যায়।

তখন উভয়েই বাহিরে দাঁড়াইয়া তারস্বরে চিৎকার করিয়া এবং যত-প্রকার ফন্দি মানুষের মাথায় আসিতে পারে, তাহা সমস্তগুলি একে একে চেষ্টা করিয়া আধঘণ্টা পরে রিক্ত হস্তে ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু ঘাট যে জনশূন্য। জ্যোৎস্নালোকে যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূরই যে শূন্য। 'দর্জিপাড়া'র চিহ্নমাত্র কোথাও নাই। ডিঙি যেমন ছিল, তেমনি রহিয়াছে—ইনি গেলেন কোথায়? দু'জনে প্রাণপণে চীৎকার করিলাম—নতুনদা, ও নতুনদা! কিন্তু কোথায় কে? ব্যাকুল আহ্বান শুধু বাম ও দক্ষিণের সু-উচ্চ পাড়ে ধাক্কা খাইয়া অস্পষ্ট হইয়া বার'বার ফিরিয়া আসিল। এ অঞ্চলে মাঝে মাঝে শীতকালে বাঘের জনশ্রুতিও শোনা যাইত। গৃহস্থ কৃষকেরা দলবদ্ধ 'হুড়ার'-এর জ্বালায় সময়ে সময়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিত। সহসা ইন্দ্র সেই কথাই বলিয়া বসিল, বাঘে নিলে না ত রে! ভয়ে সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া উঠিল—সে কি কথা! ইতিপূর্বে তাঁহার নিরতিশয় অভদ্র ব্যবহারে আমি অত্যন্ত কুপিত হইয়া উঠিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু এতবড় অভিশাপ ত দিই নাই।

সহসা উভয়েরই চোখে পড়িল, কিছুদূরে বালুর উপর কি একটা বস্তু চাঁদের আলোয় চক্‌চক্ করিতেছে। কাছে গিয়া দেখি, তাঁরই সেই বহুমূল্য পাম্প-সু'র এক পাটি। ইন্দ্র সেই ভিজা বালির উপরেই একেবারে শুইয়া পড়িল—শ্রীকান্ত রে। আমার মাসিমাও এসেছেন যে! আমি আর বাড়ি ফিরে যাব না। তখন ধীরে ধীরে সমস্ত বিষয়টাই পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল। আমরা যখন মুদির দোকানে দাঁড়াইয়া তাহাকে জাগ্রত করিবার ব্যর্থ প্রয়াস পাইতেছিলাম, তখন এইদিকের কুকুরগুলাও যে সমবেত আর্ত চীৎকারে আমাদিগকে এই দুর্ঘটনার সংবাদটাই গোচর করিবার ব্যর্থ প্রয়াস পাইতেছিল, তাহা জলের মত চোখে পড়িল। তখনও দূরে তাহাদের ডাক শুনা যাইতেছিল। সুতরাং আর সংশয়মাত্র রহিল না যে, নেকড়েগুলা তাঁহাকে টানিয়া লইয়া গিয়া সেখানে ভোজন করিতেছে, তাহারই আশেপাশে দাঁড়াইয়া সেগুলা এখনও চেঁচাইয়া মরিতেছে।

অকস্মাৎ ইন্দ্র সোজা হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আমি যাব।

আমি সভয়ে তাহার হাত চাপিয়া ধরিলাম—তুমি পাগল হয়েচ ভাই!

ইন্দ্র তাহার জবাব দিল না, ডিঙিতে ফিরিয়া গিয়া লগিটা তুলিয়া লইয়া কাঁধে ফেলিল। একটা বড় ছুরি পকেট হইতে বাহির করিয়া বাঁ হাতে লইয়া কহিল, তুই থাক্, শ্রীকান্ত ; আমি না এলে ফিরে গিয়ে বাড়িতে খবর দিস্—আমি চললুম।

তাহার মুখ অত্যন্ত পাণ্ডুর, কিন্তু চোখ-দুটো জ্বলিতে লাগিল। তাহাকে আমি চিনিয়াছিলাম। এ তাহার নিরর্থক শূন্য আস্ফালন নয় যে, হাত ধরিয়া দু'টো ভয়ের কথা বলিলেই মিথ্যা দম্ভ মিথ্যায় মিলাইয়া যাইবে। আমি নিশ্চয়ই জানিতাম, কোনমতেই তাহাকে নিরস্ত করা যাইবে না—সে যাইবেই। ভয়ের সহিত যে চির-অপরিচিত, তাহাকে আমিই বা কেমন করিয়া, কি বলিয়া বাধা দিব। যখন সে নিতান্তই চলিয়া যায় তখন আর থাকিতে পারিলাম না—আমিও যা হোক একটা হাতে করিয়া অনুসরণ করিতে উদ্যত হইলাম।

এইবার ইন্দ্র মুখ ফিরাইয়া আমার একটা হাত ধরিয়া ফেলিল ; বলিল, তুই ক্ষেপেচিস্, শ্রীকান্ত ? তোর দোষ কি ? তুই কেন যাবি ?

তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া একমুহূর্তেই আমার চোখে জল আসিয়া পড়িল। কোনমতে গোপন করিয়া বলিলাম, তোমারই বা দোষ কি, ইন্দ্র ? তুমিই বা কেন যাবে ?

প্রত্যুত্তরে ইন্দ্র আমার হাতের বাঁশটা টানিয়া লইয়া নৌকায় ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল, আমারও দোষ নেই ভাই, আমিও নতুনদাকে আনতে চাইনি। কিন্তু একলা ফিরে যেতেও পারব না, আমাকে যেতেই হবে।

কিন্তু আমারও ত যাওয়া চাই। কারণ পূর্বেই একবার বলিয়াছি, আমি নিজেও নিতান্ত ভীরু ছিলাম না। অতএব বাঁশটা পুনরায় সংগ্রহ করিয়া লইয়া দাঁড়াইলাম, এবং আর বাক্‌বিতণ্ডা না করিয়া উভয়েই ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলাম।

ইন্দ্র কহিল, বালির উপর দৌড়ানো যায় না—খবরদার, সে চেষ্টা করিস্‌নে—জলে গিয়ে পড়্‌বি।

সুমুখে একটা বালির ঢিপি ছিল। সেইটা অতিক্রম করিয়াই দেখা গেল অনেক দূরে জলের ধার ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া পাঁচ-সাতটা কুকুর চীৎকার করিতেছে। যতদূর দেখা গেল, একপাল কুকুর ছাড়া বাঘ ত দূরের কথা, একটা শৃগালও নাই! সন্তর্পণে আরও কতকটা অগ্রসর হইতেই মনে হইল,

তাহারা কি একটা কালোপানা বস্তু জলে ফেলিয়া পাহারা দিয়া আছে। ইন্দ্র চীৎকার করিয়া ডাকিল, নতুনদা!

নতুনদা একগলা জলে দাঁড়াইয়া অব্যক্তস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন—এই যে আমি!

দু'জনে প্রাণপণে ছুটিয়া গেলাম; কুকুরগুলো সরিয়া দাঁড়াইল, এবং ইন্দ্র ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আকণ্ঠনিমজ্জিত মূর্চ্ছিতপ্রায় তাহার দর্জিপাড়ার মাসতুতো ভাইকে টানিয়া তীরে তুলিল। তখনও তাঁহার একটা পায়ে বহুমূল্য পাম্প, গায়ে ওভারকোট, হাতে দস্তানা, গলায় গলাবন্ধ এবং মাথায় টুপি,—ভিজিয়া ফুলিয়া ঢোল হইয়া উঠিয়াছে। আমরা গেলে সেই যে তিনি হাততালি দিয়া 'ঠুন্‌-ঠুন্‌-পেয়ালা' ধরিয়াছিলেন, খুব সম্ভব, সেই সঙ্গীত চর্চাতেই আকৃষ্ট হইয়া গ্রামের কুকুরগুলো দল বাঁধিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, এবং এই অশ্রুতপূর্ব গীত এবং অদৃষ্টপূর্ব পোশাকের ছটায় বিভ্রান্ত হইয়া এই মহামান্য ব্যক্তিটিকে তাড়া করিয়াছিল। এতটা আসিয়াও আত্মরক্ষার কোন উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া, অবশেষে তিনি জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিলেন, এবং এই দুর্দান্ত শীতের রাত্রে তুষার-শীতল জলে আকণ্ঠ মগ্ন থাকিয়া এই অর্ধঘণ্টাকাল ব্যাপিয়া পূর্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছিলেন। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের ঘোর কাটাইয়া তাঁহাকে চাঙ্গা করিয়া তুলিতেও সে রাত্রে আমাদিগকে কম মেহনত করিতে হয় নাই। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে বাবু ডাঙ্গায় উঠিয়াই প্রথম কথা কহিলেন, আমার একপাটি পাম্প?

সেটা ওখানে পড়িয়া আছে—সংবাদ দিতেই, তিনি সমস্ত দুঃখ-ক্লেশ বিস্মৃত হইয়া তাহা অবিলম্বে হস্তগত করিবার জন্য, সোজা খাড়া হইয়া উঠিলেন। তার পরে কোটের জন্য, গলাবন্ধের জন্য, মোজার জন্য, দস্তানার জন্য, একে একে পুনঃ-পুনঃ শোকপ্রকাশ করিতে লাগিলেন; এবং সে-রাত্রে যতক্ষণ পর্যন্ত না ফিরিযা গিয়া নিজেদের ঘাটে পৌঁছিতে পারিলাম, ততক্ষণ পর্যন্ত কেবল এই বলিয়া আমাদের তিরস্কার করিতে লাগিলেন—কেন আমরা নির্বোধের মত সে-সব তাঁহার গা হইতে তাড়াতাড়ি খুলিতে গিয়াছিলাম। না খুলিলে ত ধূলাবালি লাগিয়া এমন করিয়া মাটি হইতে পারিত না। আমরা খোট্টার দেশের লোক, আমরা চাষার সামিল, আমরা এ-সব কখনো চোখ্‌খে দেখি নাই—এই সমস্ত অবিশ্রান্ত বকিতে বকিতে

গেলেন। যে দেহটাকে ইতিপূর্বে একটি ফোঁটা জল লাগাইতেও তিনি ভয়ে সারা হইতেছিলেন, জামা-কাপড়ের শোকে সে দেহটাকেও তিনি বিস্মৃত হইলেন। উপলক্ষ্য যে আসল বস্তুকেও কেমন করিয়া বহুগুণে অতিক্রম করিয়া যায়, তাহা এই সব লোকের সংসর্গে না আসিলে, এমন করিয়া চোখে পড়ে না।

রাত্রি দু'টার পর আমাদের ডিঙি আসিয়া ঘাটে ভিড়িল। আমার যে র‍্যাপারখানির বিকট গন্ধে কলিকাতার বাবু ইতিপূর্বে মূর্চ্ছিত হইতেছিলেন সেইখানি গায়ে দিয়া, তাহারই অবিশ্রাম নিন্দা করিতে-করিতে—পা মুছিতেও ঘৃণা হয়, তাহা পুনঃ-পুনঃ শুনাইতে শুনাইতে, ইন্দ্রর খানি পরিধান করিয়া তিনি সে-যাত্রা আত্মরক্ষা করিয়া বাটী গেলেন। যাই হোক তিনি যে দয়া করিয়া ব্যাঘ্র-কবলিত না হইয়া সশরীরে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন, তাঁহার এই অনুগ্রহের আনন্দেই আমরা পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিলাম। এত উপদ্রব-অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য করিয়া, আজ নৌকাচড়ার পরিসমাপ্তি করিয়া, এই দুর্জয় শীতের রাত্রে কোঁচার খুঁটমাত্র অবলম্বন করিয়া, কাঁপিতে-কাঁপিতে বাটী ফিরিয়া গেলাম।

আট:

লিখিতে বসিয়া আমি অনেক সময়েই আশ্চর্য হইয়া ভাবি, এই সব এলোমেলো ঘটনা আমার মনের মধ্যে এমন করিয়া পরিপাটিভাবে সাজাইয়া রাখিয়াছিল কে? যেমন করিয়া বলি, তেমন করিয়া ত তাহার একটির পর একটি শৃঙ্খলিত হইয়া ঘটে নাই। আবার তাই কি সেই শিকলের সকল গ্রন্থিগুলোই বজায় আছে? তাও ত নাই। কত হারাইয়া গিয়াছে টের পাই, কিন্তু তবু ত শিকল ছিঁড়িয়া যায় না? কে তবে নূতন করিয়া এ-সব জোড়া দিয়া রাখে?

আরও একটা বিস্ময়ের বস্তু আছে। পণ্ডিতেরা বলেন, বড়দের চাপে ছোটরা গুঁড়াইয়া যায়। কিন্তু তাই যদি হয়, তবে জীবনের প্রধান ও মুখ্য ঘটনাগুলিই ত কেবল মনে থাকিবার কথা। কিন্তু তাও ত দেখি না। ছেলেবেলার কথা-প্রসঙ্গে হঠাৎ একসময়ে দেখিতে পাই, স্মৃতির মন্দিরে অনেক তুচ্ছ ক্ষুদ্র ঘটনাও কেমন করিয়া না-জানি বেশ বড় হইয়া জাঁকিয়া

বসিয়া গিয়াছে, এবং বড়রা ছোট হইয়া কবে কোথায় ঝরিয়া পড়িয়া গিয়াছে। অতএব বলিবার সময়েও ঠিক তাহাই ঘটে। তুচ্ছ বড় হইয়া দেখা দেয়, বড় মনেও পড়ে না। অথচ কেন যে এমন হয়, সে কৈফিয়ৎ আমি পাঠককে দিতে পারিব না, শুধু যা ঘটে তাই জানাইয়া দিলাম।

এমনি একটা তুচ্ছ বিষয় যে মনের মধ্যে এতদিন নীরবে, এমন সঙ্গোপনে, এত বড় হইয়া উঠিয়াছিল, আজ তাহার সন্ধান পাইয়া আমি নিজেও বড় বিস্মিত হইয়া গেছি। সেইটাই আজ পাঠককে বলিব। অথচ জিনিসটি ঠিক কি, তাহার সমস্ত পরিচয়টা না দেওয়া পর্যন্ত চেহারাটা কিছুতেই পরিষ্কার হইবে না। কারণ, গোড়াতেই যদি বলি—সে একটা প্রেমের ইতিহাস—মিথ্যাভাষণের পাপ তাহাতে হইবে না বটে, কিন্তু ব্যাপারটা নিজের চেষ্টায় যতটা বড় হইয়া উঠিয়াছে, আমার ভাষাটা হয়ত তাহাকেও ডিঙ্গাইয়া যাইবে। সুতরাং অত্যন্ত সতর্ক হইয়া বলা আবশ্যক।

সে বহুকাল পরের কথা। দিদির স্মৃতিটাও তখন ঝাপ্সা হইয়া গেছে। যাঁর মুখখানি মনে করিলেই, কি জানি কেন, প্রথম যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতা আপনি মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইত, সে দিদিকে আর তখন তেমন করিয়া মনে পড়িত না। এ সেই সময়ের কথা। এক রাজার ছেলের নিমন্ত্রণে তাঁহার শিকার-পার্টিতে গিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এঁর সঙ্গে অনেকদিন স্কুলে পড়িয়াছি, গোপনে অনেক আঁক কষিয়া দিয়াছি—তাই তখন ভারি ভাব ছিল। তার পরে এন্ট্রান্স ক্লাস হইতে ছাড়াছাড়ি। রাজার ছেলেদের স্মৃতিশক্তি কম, তাও জানি। কিন্তু ইনি যে মনে করিয়া চিঠিপত্র লিখিতে শুরু করিবেন, ভাবি নাই। মাঝে হঠাৎ একদিন দেখা। তখন সবে সাবালক হইয়াছেন। অনেক জমানো টাকা হাতে পড়িয়াছে এবং তার পরে —ইত্যাদি ইত্যাদি। রাজার ছেলের কানে গিয়াছে—অতিরঞ্জিত হইয়াই গিয়াছে—রাইফেল চালাইতে আমার জুড়ি নাই, এবং আরও এত প্রকারের গুণগ্রামে ইতিমধ্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছি যে, একমাত্র সাবালক রাজপুত্রেরই অন্তরঙ্গ বন্ধু হইবার আমি উপযুক্ত। তবে কিনা, আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবেরা আপনার লোকের সুখ্যাতিটা একটু বাড়াইয়াই করে, না হইলে, সত্যসত্যই যে অতখানি বিদ্যা অমন বেশী পরিমাণে ওই বয়সটাতেও অর্জন করিতে

পারিয়াছিলাম, সে অহঙ্কার করা আমার শোভা পায় না, অন্ততঃ একটু বিনয় থাকা ভাল।

কিন্তু যাক সে কথা। শাস্ত্রকারেরা বলেন, রাজ-রাজড়ার সাদর আহ্বান কখনো উপেক্ষা করিবে না। হিঁদুর ছেলে, শাস্ত্র অমান্য করিতে ত আর পারি না। কাজেই গেলাম। স্টেশন হইতে দশ বারো ক্রোশ পথ গজপৃষ্ঠে গিয়া দেখি, হাঁ, রাজপুত্রের সাবালকের লক্ষণ বটে! গোটা-পাঁচেক তাঁবু পড়িয়াছে। একটা তাঁহার নিজস্ব, একটা বন্ধুদের, একটা ভৃত্যদের, একটায় খাবার বন্দোবস্ত। আর একটা অমনি একটু দূরে—সেটা দুই ভাগ করিয়া জন-দুই বাইজী ও তাঁহাদের সাঙ্গোপাঙ্গদের আড্ডা।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। রাজপুত্রের খাস-কামরায় অনেকক্ষণ হইতেই যে সঙ্গীতের বৈঠক বসিয়াছে, তাহা প্রবেশমাত্রই টের পাইলাম। রাজপুত্র অত্যন্ত সমাদরে আমাকে গ্রহণ করিলেন। এমন কি, আদরের আতিশয্যে দাঁড়াইবার আয়োজন করিয়া, তিনি তাকিয়ায় ঠেস্ দিয়া শুইয়া পড়িলেন। বন্ধু-বান্ধবেরা বিহ্বল-কলকণ্ঠে সম্বর্ধনা করিতে লাগিলেন। আমি সম্পূর্ণ অপরিচিত। কিন্তু সেটা, তাঁহাদের যে অবস্থা, তাহাতে অপরিচয়ের জন্য বাধে না।

এই বাইজীটি পাটনা হইতে অনেক টাকার শর্তে দুই সপ্তাহের জন্য আসিয়াছেন। এইখানে রাজকুমার যে বিবেচনা এবং যে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন, সে কথা স্বীকার করিতেই হইবে। বাইজী সুশ্রী, অতিশয় সুকণ্ঠ এবং গান গাহিতে জানে।

আমি প্রবেশ করিতেই গানটা থামিয়া গিয়াছিল। তার পরে সময়োচিত বাক্যালাপ ও আদব-কায়দা সমাপন করিতে কিছুক্ষণ গেল। রাজপুত্র অনুগ্রহ করিয়া আমাকে গান ফরমাস করিতে অনুরোধ করিলেন। রাজাজ্ঞা শুনিয়া প্রথমটা অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া উঠিলাম, কিন্তু অল্প কিছুক্ষণেই বুঝিলাম, এই সঙ্গীতের মজলিসে আমিই যাহোক একটু ঝাপ্সা দেখি, আর সবাই ছুঁচোর মত কানা।

বাইজী প্রফুল্ল হইয়া উঠিলেন। পয়সার লোভে অনেক কাজই পারা যায় জানি; কিন্তু এই নিরেটের দরবারে বীণা-বাজানো বাস্তবিকই এতক্ষণ তাহার একটা সুকঠিন কাজ হইতেছিল। এইবার একজন সমঝদার পাইয়া সে যেন বাঁচিয়া গেল। তার পরে গভীর রাত্রি পর্যন্ত যেন শুধুমাত্র আমার

জন্যই, তাঁহার সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত সৌন্দর্য ও কণ্ঠের সমস্ত মাধুর্য দিয়া আমার চারিদিকের এই সমস্ত কদর্য মদোন্মত্ততা ডুবাইয়া অবশেষে স্তব্ধ হইয়া আসিল।

বাইজী পাটনার লোক—নাম পিয়ারী। সে রাত্রে আমাকে সে যেমন করিয়া সমস্ত প্রাণ দিয়া গান শুনাইয়াছিল, বোধ করি, এমন আর সে কখনও শুনায় নাই। মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম। গান থামিলে আমার মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল, বেশ!

পিয়ারী মুখ নীচু করিয়া হাসিল। তারপর দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া প্রণাম করিল—সেলাম করিল না। মজলিস রাত্রির মত শেষ হইয়াছিল।

তখন দলের মধ্যে কেহ সুপ্ত, কেহ তন্দ্রাভিভূত—অধিকাংশই অচৈতন্য। নিজের তাঁবুতে যাইবার জন্য বাইজী যখন তাহার দলবল লইয়া বাহির হইতেছিল, আমি তখন আনন্দের আতিশয্যে হিন্দী করিয়া বলিয়া ফেলিলাম —বাইজী, আমার বড় সৌভাগ্য যে তোমার গান দু' সপ্তাহ ধ'রে প্রত্যহ শুনতে পাব।

বাইজী প্রথমটা থমকিয়া দাঁড়াইল। পরক্ষণেই একটু কাছে সরিয়া আসিয়া অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে পরিষ্কার বাঙ্গলা করিয়া কহিল, টাকা নিয়েছি, আমাকে ত গাইতেই হবে; কিন্তু আপনি এই পনেরো-ষোল দিন ধ'রে এঁর মোসাহেবি করবেন? যান, কালকেই বাড়ি চ'লে যান।

কথা শুনিয়া আমি হতবুদ্ধি, কাঠ হইয়া গেলাম এবং কি জবাব দিব তাহা ভাবিয়া ঠিক করিবার পূর্বেই বাইজী বাহির হইয়া গেল।

সকালে সোরগোল করিয়া কুমারজী শিকারে বাহির হইলেন। মদ্য-মাংসের আয়োজনটাই সবচেয়ে বেশি। সঙ্গে জন-দশেক শিকারী অনুচর। বন্দুক পনরটা—তার মধ্যে ছয়টা রাইফেল। স্থান—একটা আধশুক্‌নো নদীর উভয় তীর। এপারে গ্রাম, ওপারে বালুর চর। এপারে ক্রোশ ব্যাপিয়া বড় বড় শিমূল গাছ—ওপারে বালুর উপর স্থানে স্থানে কাশ ও কুশের ঝোপ। এইখানে এই পনরটা বন্দুক লইয়া শিকার করিতে হইবে! শিমূল গাছে-গাছে ঘুঘু গোটাকয়েক দেখিলাম, মরা নদীর বাঁকের কাছটায় দুটো চকা-চকী ভাসিতেছে বলিয়াই মনে হইল।

কে কোন্ দিকে যাইবেন, অত্যন্ত উৎসাহের সহিত পরামর্শ করিতে করিতেই সবাই দুই-এক পাত্র টানিয়া লইয়া দেহ ও মন বীরের মত করিয়া

লইলেন। আমি বন্দুক রাখিয়া দিলাম। একে বাইজীর খোঁচা খাইয়া রাত্রি হইতেই মনটা বিকল হইয়াছিল, তাহাতে শিকারের ক্ষেত্র দেখিয়া সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল।

কুমার প্রশ্ন করিলেন, কি হে শ্রীকান্ত, তুমি যে বড় চুপচাপ? ওকি, বন্দুক রেখে দিলে যে!

আমি পাখি মারি না।

সে কি হে? কেন, কেন?

আমি গোঁফ ওঠবার পর থেকে আর ছর্‌রা দেওয়া বন্দুক ছুড়িনি—ও আমি ভুলে গেছি।

কুমার সাহেব হাসিয়াই খুন। কিন্তু সে হাসির কতটা দ্রব্যগুণে, সে কথা অবশ্য আলাদা।

সুরযুর চোখ-মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনিই এ দলের প্রধান শিকারী এবং রাজপুত্রের প্রিয় পার্শ্বচর। তাঁহার অব্যর্থ লক্ষ্যের খ্যাতি আমি আসিয়াই শুনিয়াছিলাম। রুষ্ট হইয়া কহিলেন, চিড়িয়া শিকারমে কুছ্ সরম হ্যায়?

আমারও মেজাজ ত ভাল ছিল না, সুতরাং জবাব দিলাম, সবাইকার নেহি হ্যায়, কিন্তু আমার হ্যায়। যাক, আমি তাঁবুতে ফিরিলাম,—কুমার সাহেব, আমার শরীরটা ভাল নেই,—বলিয়া ফিরিলাম। তাহাতে কে হাসিল, কে চোখ ঘুরাইল, কে মুখ ভ্যাঙাইল, তাহা চাহিয়াও দেখিলাম না।

কখন সবেমাত্র তাঁবুতে ফিরিয়া ফরাসের উপর চিৎ হইয়া পড়িয়াছি এবং আর এক পেয়ালা চা আদেশ করিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়াছি,—বেয়ারা আসিয়া সসম্ভ্রমে জানাইল, বাইজী একবার সাক্ষাৎ করিতে চায়। ঠিক এইটি আশাও করিতেছিলাম, আশঙ্কাও করিতেছিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন সাক্ষাৎ করিতে চায়?

তা' জানিনে।

তুমি কে?

আমি বাইজীর খানসামা।

তুমি বাঙ্গালী?

আজ্ঞে হাঁ—পরামাণিক। নাম রতন।

বাইজি কি হিন্দু?

রতন হাসিয়া বলিল, নইলে থাকব কেন বাবু?

আমাকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া, তাঁবুর দরজা দেখাইয়া দিয়া রতন সরিয়া গেল। পর্দা তুলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া দেখিলাম, বাইজী একাকিনী প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। কাল রাত্রে পেশোয়াজ ও ওড়নায় ঠিক চিনিতে পারি নাই; আজ দেখিয়াই টের পাইলাম, বাইজী যে-ই হোক, বাঙ্গালীর মেয়ে বটে। একখণ্ড মূল্যবান কার্পেটের উপর গরদের শাড়ী পরিয়া বাইজী বসিয়া আছে। ভিজা এলোচুল পিঠের ওপর ছড়ানো; হাতের কাছে পানের সাজ-সরঞ্জাম, সুমুখে গুড়গুড়িতে তামাক সাজা। আমাকে দেখিয়া গাত্রোত্থান করিয়া হাসিমুখে সুমুখের আসনটা দেখাইয়া দিয়া কহিল, বোসো। তোমার সুমুখে তামাকটা খাবো না আর—ওরে রতন, গুড়গুড়িটা নিয়ে যা। ও কি, দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বোসো না?

রতন হাসিয়া গুড়গুড়ি লইয়া গেল। বাইজী কহিল, তুমি তামাক খাও তা জানি; কিন্তু দেব কিসে? অন্য জায়গায় যা কর, তা কর; কিন্তু আমি জেনে-শুনে আমার গুড়গুড়িটা ত আর তোমাকে দিতে পারিনে। আচ্ছা, চুরুট আনিয়ে দিচ্চি—ওরে ও—

থাক থাক; চুরুটে কাজ নেই. আমার পকেটেই আছে।

আছে? বেশ, তাহ'লে ঠাণ্ডা হ'য়ে একটু বোসো, ঢের কথা আছে। ভগবান কখন যে কার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেন, তা' কেউ বলতে পারে না। স্বপ্নের অগোচর। শিকারে গিয়েছিলে, হঠাৎ ফিরে এলে যে?

ভাল লাগল না।

না লাগবারই কথা। কি নিষ্ঠুর এই পুরুষমানুষ জাতটা। অনর্থক জীবহত্যা ক'রে.কি আমোদ পায়, তারাই জানে! বাবা ভাল আছেন?

বাবা মারা গেছেন।

মারা গেছেন! মা?

তিনি আগেই গেছেন।

ওঃ—তাইতেই, বলিয়া বাইজী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আমার মুখপানে চাহিয়া রহিল। একবার মনে হইল, তাহার চোখ দুটি যেন ছলছল করিয়া উঠিল; কিন্তু সে হয়ত আমার মনের ভুল। পরক্ষণেই যখন সে কথা কহিল, তখন আর ভুল রহিল না যে, এই মুখরা নারীর চটুল ও পরিহাস-লঘু কণ্ঠস্বর সত্য সত্যই মৃদু এবং আর্দ্র হইয়া গিয়াছে। কহিল, তা' হ'লে যত্ন-টত্ন করবার আর কেউ নেই বলো। পিসিমার ওখানেই আছ ত?

নইলে আর থাকবেই বা কোথায় ? বিয়ে হয়নি, সে ত দেখতেই পাচ্ছি। পড়াশুনা করচ ? না, তাও ঐ-সঙ্গে শেষ ক'রে দিয়েছ ?

এতক্ষণ পর্যন্ত ইহার কৌতূহল এবং প্রশ্নমালা আমি যথাসাধ্য সহ্য করিয়া গিয়াছি। কিন্তু এই শেষ কথাটা কেমন যেন হঠাৎ অসহ্য হইয়া উঠিল। বিরক্ত এবং রুক্ষকণ্ঠে বলিয়া উঠিলাম, আচ্ছা, কে তুমি ? তোমাকে জীবনে কখনো দেখেছি ব'লেও ত মনে হয় না। আমার সম্বন্ধে এত কথা তুমি জানতে চাইছই বা কেন ? আর জেনেই বা তোমার লাভ কি ?

বাইজী রাগ করিল না, হাসিল, কহিল ; লাভ-ক্ষতিই কি সংসারে সব ? মায়া, মমতা, ভালবাসাটা কি কিছু নয় ? আমার নাম পিয়ারী, কিন্তু আমার মুখ দেখেও যখন চিনতে পারলে না, তখন ছেলেবেলার ডাকনাম শুনেই কি আমাকে চিনতে পারবে ? তা'ছাড়া আমি তোমাদের ও গ্রামের মেয়েও নই।

আচ্ছা, তোমাদের বাড়ি কোথায় বল ?

না, সে আমি ব'লব না।

তবে তোমার বাবার নাম কি বল ?

বাইজী জিভ কাটিয়া কহিল, তিনি স্বর্গে গেছেন। ছি ছি, তাঁর নাম কি আর এ মুখে উচ্চারণ ক'রতে পারি ?

আমি অধীর হইয়া উঠিলাম। বলিলাম, তা যদি না পারো, আমাকে চিনলে কি ক'রে, সে-কথা বোধ হয় উচ্চারণ ক'রতে দোষ হবে না ?

পিয়ারী আমার মনের ভাব লক্ষ্য করিয়া আবার মুখ টিপিয়া হাসিল। কহিল, না, তাতে দোষ নেই। কিন্তু সে কি তুমি বিশ্বাস ক'রতে পারবে ?

বলেই দেখ না।

পিয়ারী কহিল, তোমাকে চিনেছিলাম ঠাকুর, দুবুর্দ্ধির তাড়নায়—আর কিসে ? তুমি যত চোখের জল আমার ফেলিয়েছিলে, ভাগ্যি সূয্যিদেব তা শুকিয়ে নিয়েচেন, নইলে চোখের জলের একটা পুকুর হ'য়ে থাকত। বলি, বিশ্বাস ক'রতে পারো কি ?

সত্যিই বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। কিন্তু সে আমারই ভুল। তখন কিছুতেই মনে পড়িল না যে পিয়ারীর ঠোঁটের গঠনই এইরূপ—যেন সব কথাই সে তামাশা করিয়া বলিতেছে, এবং মনে-মনে হাসিতেছে। আমি চুপ করিয়া রহিলাম। সেও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া এবার সত্যসত্যই হাসিয়া উঠিল। কিন্তু এতক্ষণে, কেমন করিয়া জানি না, আমার সহসা মনে

হইল, সে নিজের লজ্জিত অবস্থা যেন সামলাইয়া ফেলিল। সহাস্যে কহিল, না ঠাকুর, তোমাকে যত বোকা ভেবেছিলুম, তুমি তা নও। এ যে আমার একটা বলার ভঙ্গী, তা তুমি ঠিক ধরেছ। কিন্তু তাও বলি, তোমার চেয়ে অনেক বুদ্ধিমানও আমার এই কথাটায় অবিশ্বাস ক'রতে পারেনি। তা এতই যদি বুদ্ধিমান, তবে মোসাহেবী ব্যবসাটা ধরা হ'ল কেন? এ চাকরী ত তোমাদের মত মানুষ দিয়ে হয় না। যাও, চটপট স'রে পড।

ক্রোধে সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল; কিন্তু প্রকাশ পাইতে দিলাম না। সহজ-ভাবে বলিলাম, চাকরী যতদিন হয় ততদিনই ভাল। বসে না থাকি বেগার খাটি—জানো ত? আচ্ছা, এখন উঠি। বাইরের লোক হয়ত বা কিছু মনে ক'রে বসবে।

পিয়ারী কহিল, করলে সে ত তোমার সৌভাগ্য, ঠাকুর! এ কি আর একটা আপসোসের কথা?

উত্তর না দিয়া যখন আমি দ্বারের কাছে আসিয়া পডিয়াছি, তখন সে অকস্মাৎ হাসির লহর তুলিয়া বলিয়া উঠিল, কিন্তু দেখো ভাই, আমার সেই চোখের জলের গল্পটা যেন ভুলে যেয়ো না। বন্ধুমহলে কুমার-সাহেবের দরবারে প্রকাশ করলে—চাই কি তোমার নসিবটাই হয়ত ফিরে যেতে পারে।

আমি নিরুত্তরে বাহির হইয়া পডিলাম। কিন্তু এই নির্লজ্জার হাসি এবং কদর্য পরিহাস আমার সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া যেন বিছার কামড়ের মত জ্বলিতে লাগিল।

স্বস্থানে আসিয়া এক পেয়ালা চা খাইয়া চুরুট ধরাইয়া, মাথা যথাসম্ভব ঠাণ্ডা করিয়া ভাবিতে লাগিলাম—কে এ? আমার পাঁচবছর বয়সের ঘটনা পর্যন্ত আমি স্পষ্ট মনে করিতে পারি। কিন্তু অতীতের মধ্যে যতদূর দৃষ্টি যায়, ততদূর পর্যন্ত তন্ন-তন্ন করিয়া দেখিলাম, কোথাও এই পিয়ারীকে খুঁজিয়া পাইলাম না। অথচ এ আমাকে বেশ চিনে! পিসিমার কথা পর্যন্ত জানে। আমি যে দরিদ্র, ইহাও তাহার অবিদিত নহে! সুতরাং আর কোন অভিসন্ধি থাকিতেই পারে না। অথচ যেমন করিয়া পারে, আমাকে সে এখান হইতে তাডাইতে চায়। কিন্তু কিসের জন্য? আমার থাকা-না-থাকায় ইহার কি! তখন কথায়-কথায় বলিয়াছিল, সংসারে লাভ-ক্ষতিই কি সমস্ত? ভাল-বাসাটাসা কিছু নাই? আমি যাহাকে কখনো চোখেও দেখি নাই, তাহার

মুখের এই কথাটা মনে করিয়া আমার হাসি পাইল। কিন্তু সমস্ত কথাবার্তা ছাপাইয়া তাহার শেষ বিদ্রূপটা আমাকে যেন অবিশ্রান্ত মর্মান্তিক করিয়া বিঁধিতে লাগিল।

সন্ধ্যার সময় শিকারীর দল ফিরিয়া আসিল। চাকরের মুখে শুনিলাম, আটটা ঘুঘুপাখি মারিয়া আনা হইয়াছে। কুমার ডাকিয়া পাঠাইলেন; অসুস্থতার ছুতা করিয়া বিছানায় পড়িয়াই রহিলাম, এবং এইভাবেই অনেক রাত্রি পর্যন্ত পিয়ারীর গান এবং মাতালের বাহবা শুনিতে পাইলাম।

তার পরের তিন-চারিদিন প্রায় একভাবেই কাটিয়া গেল। 'প্রায়' বলিলাম—কারণ, এক শিকার করা ছাড়া আর সমস্তই একপ্রকার। পিয়ারীর অভিশাপ ফলিল না কি! প্রাণিহত্যার প্রতি আর কাহারো কোন উৎসাহই দেখিলাম না। কেহ তাঁবুর বাহির হইতেই যেন চাহে না। অথচ আমাকেও ছাড়িয়া দেয় না। আমার পলাইবার আর যে কোন বিশেষ কারণ ছিল, তাহা নয়। কিন্তু এই বাইজীর প্রতি আমার কি যে ঘোর বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গেল; সে হাজির হইলেই, আমাকে কিসে যেন মারিতে থাকিত; উঠিয়া গিয়া স্বস্তি পাইতাম। উঠিতে না পারিলে, অন্ততঃ আর কোন দিকে মুখ ফিরাইয়া, কাহারও সহিত কথাবার্তা কহিয়া অন্যমনস্ক হইবার চেষ্টা করিতাম। অথচ, সে প্রতিমুহূর্তেই আমার সহিত চোখাচোখি করিবার সহস্র কৌশল করিত, তাহাও টের পাইতাম। প্রথম দুই-একদিন সে আমাকে লক্ষ্য করিয়াই পরিহাসের চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু আমার ভাব দেখিয়া সেও একেবারে নির্বাক্ হইয়া গেল।

সেদিন ছিল শনিবার। আমি আর কোনমতেই থাকিতে পারি না। খাওয়া-দাওয়ার পরেই রওনা হইয়া পড়িব স্থির হওয়ায়,—আজ সকাল হইতেই গান-বাজনার বৈঠক বসিয়া গিয়াছিল। শ্রান্ত হইয়া বাইজী গান থামাইয়াছে, হঠাৎ গল্পের সেরা গল্প—ভূতের গল্প উঠিয়া পড়িল। নিমিষে যে যেখানে ছিল, আগ্রহে বক্তাকে ঘেরিয়া ধরিল।

প্রথমটা আমি তাচ্ছিল্যভরেই শুনিতেছিলাম। কিন্তু শেষে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়া বসিলাম। বক্তা ছিলেন একজন গ্রামেরই হিন্দুস্থানী প্রবীণ ভদ্রলোক। গল্প কেমন করিয়া বলিতে হয়, তাহা তিনি জানিতেন। তিনি বলিতেছিলেন, প্রেত-যোনিতে যদি কাহারও সংশয় থাকে—যেন আজিকার এই শনিবার অমাবস্যা তিথিতে, এই গ্রামে আসিয়া চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া যান।

তিনি যে জাত, যেমন লোকই হুন এবং যত ইচ্ছা লোক সঙ্গে করিয়া লইয়া যান, আজ রাত্রে মহাশ্মশানে যাওয়া তাঁহার পক্ষে নিষ্ফল হইবে না। আজিকার ঘোর রাত্রে সেই শ্মশানচারী প্রেতাত্মাকে শুধু যে চোখে দেখা যায়, তাহা নয়; তাহার কণ্ঠস্বর শুনা যায় এবং ইচ্ছা করিলে তাহার সহিত কথা-বার্তা পর্যন্ত বলা যায়।

আমি ছেলেবেলার কথা স্মরণ করিয়া হাসিয়া ফেলিলাম।

বৃদ্ধ তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, আপনি আমার কাছে আসুন।

আমি নিকটে সরিয়া গেলাম। তিনি প্রশ্ন করিলেন, আপনি বিশ্বাস করেন না?

না।

কেন করেন না? না করার বিশেষ কোন হেতু আছে?

না।

তবে? এই গ্রামেই এমন দুই-একজন সিদ্ধ সাধক আছেন যাঁরা চোখে দেখেছেন। তবুও যে আপনারা বিশ্বাস করেন না, মুখের উপর হাসেন, সে শুধু দু'পাতা ইংরিজী পড়ার ফল। বিশেষতঃ বাঙ্গালীরা ত নাস্তিক—ম্লেচ্ছ।

কি কথায় কি কথা আসিয়া পড়িল। দেখিয়া আমি অবাক হইয়া গেলাম। বলিলাম, দেখুন, এ-সম্বন্ধে আমি তর্ক করতে চাইনে। আমার বিশ্বাস আমার কাছে। আমি নাস্তিকই হই, ম্লেচ্ছই হই, ভূত মানিনে। যাঁরা চোখে দেখেছেন বলেন—হয় তাঁরা ঠকেছেন, না হয় তাঁরা মিথ্যাবাদী—এই আমার ধারণা।

ভদ্রলোক খপ করিয়া আমার ডান হাতটা চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, আপনি আজ রাত্রে শ্মশানে যেতে পারেন?

আমি হাসিয়া বলিলাম পারি। আমি ছেলেবেলা থেকে অনেক শ্মশানেই অনেক রাত্রে গেছি।

বৃদ্ধ চটিয়া উঠিয়া বলিলেন, আপ্ সোখ মৎ করো বাবু, বলিয়া তিনি সমস্ত শ্রোতৃবর্গকে স্তম্ভিত করিয়া, এই শ্মশানের মহা-ভয়াবহ বিবরণ বিবৃত করিতে লাগিলেন। এ শ্মশান যে-সে স্থান নয়, ইহা মহাশ্মশান, এখানে সহস্র নরমুণ্ড গণিয়া লইতে পারা যায়, এ শ্মশানে মহাভৈরবী তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া প্রত্যহ রাত্রে নরমুণ্ডের গেণ্ডুয়া খেলিয়া নৃত্য করিয়া বিচরণ করেন, তাঁহাদের খল্‌খল্ হাসির বিকট শব্দে কতবার কত অবিশ্বাসী

ইংরাজ জজ-ম্যাজিস্ট্রেটেরও হৃদ্‌স্পন্দন থামিয়া গিয়াছে—এমনি সব লোম-হর্ষক কাহিনী এমন করিয়াই বলিতে লাগিলেন যে, এত লোকের মধ্যে দিনের বেলা তাঁবুর ভিতরে বসিয়া থাকিয়াও অনেকের মাথার চুল পর্যন্ত খাড়া হইয়া উঠিল। আড়চোখে চাহিয়া দেখিলাম, পিয়ারী কোন্ এক সময়ে কাছে ঘেঁসিয়া আসিয়া বসিয়াছে এবং কথাগুলো যেন সর্বাঙ্গ দিয়া গিলিতেছে।

এইরূপে এই মহাশ্মশানের ইতিহাস যখন শেষ হইল, তখন বক্তা গর্বভরে আমার প্রতি কটাক্ষ হানিয়া প্রশ্ন করিলেন, কেয়া বাবুসাহেব, আপ্ যায়েগা ?

যায়েগা বৈকি।

যায়েগা! আচ্ছা, আপ্ কা খুশি। প্রাণ যানেসে—

আমি হাসিয়া বলিলাম, না বাবুজী, না। প্রাণ গেলেও তোমাকে দোষ দেওয়া হবে না. তোমার ভয় নেই। কিন্তু অজানা জায়গায় আমিও ত শুধু-হাতে যাব না—বন্দুক নিয়ে যাব।

তখন আলোচনাটা একটু অতিমাত্রায় খর হইয়া উঠিল দেখিয়া আমি উঠিয়া গেলাম। আমি পাখি মারিতে পারি না, কিন্তু বন্দুকেব গুলিতে ভূত মারিতে পারি; বাঙ্গালীরা ইংরাজী পড়িয়া হিন্দুশাস্ত্র মানে না; তাহারা মুরগি খায়; তাঁহারা মুখে যত বড়াই করুক, কার্যকালে ভাগিয়া যায়; তাহাদিগকে তাড়া দিলেই তাহাদেব দাঁতকপাটি লাগে—এই প্রকারের সমালোচনা চলিতে লাগিল। অর্থাৎ যে সকল সূক্ষ্ম যুক্তিতর্কের অবতারণা করিলে আমাদের রাজা-রাজড়াদের আনন্দোদয় হয় এবং তাঁহাদের মস্তিষ্ককে অতিক্রম করিয়া যায় না অর্থাৎ তাঁহারাও দু কথা কহিতে পারেন, সেইসব কথাবার্তা।

ইহাদের দলে শুধু একটিমাত্র লোক ছিল, যে স্বীকার করিয়াছিল, সে শিকার করিতে জানে না, এবং কথাটাও সে সচরাচর একটু কম কহিত এবং মদও একটু কম করিয়া খাইত। তাহার নাম পুরুষোত্তম। সে সন্ধ্যার সময় আসিয়া আমাকে ধরিল—সঙ্গে যাইবে। কারণ, ইতিপূর্বে সেও কোনদিন ভূত দেখে নাই। অতএব আজ যদি এমন সুবিধা ঘটিয়াছে, তবে ত্যাগ করিবে না, বলিয়া খুব হাসিতে লাগিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কি ভূত মান না ?

একেবারে না।

কেন মান না?

মানি না, নেই ব'লে; এই বলিয়া সে প্রচলিত তর্ক তুলিয়া বারংবার অস্বীকার করিতে লাগিল।

আমি কিন্তু অত সহজে তাহাকে সঙ্গে লইতে স্বীকার করিলাম না। কারণ, বহুদিনের অভিজ্ঞতায় জানিয়াছিলাম, এ সকল যুক্তিতর্কের ব্যাপার নয়—সংস্কার। বুদ্ধি দিয়া যাহারা একেবারেই মানে না, তাহারাও ভয়ের জায়গায় আসিয়া পড়িলে ভয়ে মূর্ছা যায়।

পুরুষোত্তম কিন্তু নাছোড়বান্দা। সে মালকোঁচা মারিয়া পাকা বাঁশের লাঠি ঘাড়ে ফেলিয়া কহিল, শ্রীকান্তবাবু, আপনার ইচ্ছা হয় বন্দুক নিন, কিন্তু আমার হাতে লাঠি থাকতে ভূতই বলো আর প্রেতই বলো—কাউকে কাছে ঘেঁষতে দেব না।

কিন্তু সময়ে লাঠি হাতে থাকবে ত?

ঠিক থাকবে বাবু, আপনি তখন দেখে নেবেন। এক ক্রোশ পথ—রাত্রি—এগারোটার মধ্যেই রওনা হওয়া চাই।

দেখিলাম, তাহার আগ্রহটা যেন একটু অতিরিক্ত।

যাত্রা করিতে তখনও ঘণ্টাখানেক বিলম্ব আছে। আমি তাঁবুর বাহিরে পায়চারি করিয়া এই ব্যাপারটিই মনে-মনে আন্দোলন করিয়া দেখিতেছিলাম –জিনিসটা সম্ভবতঃ কি হইতে পারে। এ সকল বিষয়ে আমি যে লোকের শিষ্য, তাহাতে ভূতের ভয়টা আর ছিল না। ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে—সেই একটি রাত্রে যখন ইন্দ্র কহিয়াছিল, শ্রীকান্ত মনে-মনে রামনাম কর! ছেলেটি আমার পিছনে বসিয়া আছে—সেইদিনই শুধু ভয়ে চৈতন্য হারাইয়াছিলাম, আর না। সুতরাং সে ভয় ছিল না। কিন্তু আজিকার গল্পটা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এটাই বা কি? ইন্দ্র নিজে ভূত বিশ্বাস করিত। কিন্তু সেও কখনো চোখে দেখে নাই। আমি নিজেও মনে-মনে যত অবিশ্বাসই করি, স্থান এবং কাল-মাহাত্ম্যে গা ছম্-ছম্ যে না করিত, তাহা নয়। সহসা সম্মুখের এই দুর্ভেদ্য অমাবস্যার অন্ধকারের পানে চাহিয়া আমার আর একটা অমা-রজনীর কথা মনে পড়িয়া গেল। সে দিনটাও এমনি শনিবারই ছিল।

বৎসর পাঁচ-ছয় পূর্বে আমাদের প্রতিবেশিনী হতভাগিনী নিরুদিদি

বালবিধবা হইয়াও যখন সূতিকা-রোগে আক্রান্ত হইয়া ছয়মাস ভুগিয়া ভুগিয়া মরেন, তখন সেই মৃত্যুশয্যার পাশে আমি ছাড়া আর কেহ ছিল না। বাগানের মধ্যে একখানি মাটির ঘরে তিনি একাকিনী বাস করিতেন। সকলের সর্বপ্রকার রোগে, শোকে, সম্পদে, বিপদে এতবড় সেবাপরায়ণা নিঃস্বার্থ পরোপকারিণী রমণী পাড়া'র মধ্যে আর কেহ ছিল না। কত মেয়েকে তিনি যে লেখাপড়া শিখাইয়া, সূঁচের কাজ শিখাইয়া গৃহস্থালীর সর্বপ্রকার দুরূহ কাজকর্ম শিখাইয়া দিয়া, মানুষ করিয়া দিয়াছিলেন তাহার সংখ্যা নাই। একান্ত স্নিগ্ধ শান্তস্বভাব এবং সুনির্মল চরিত্রের জন্য পাড়ার লোকও তাঁহাকে বড় কম ভালবাসিত না। কিন্তু সেই নিরুদিদির ত্রিশ বৎসর বয়সে হঠাৎ যখন পা-পিছলাইয়া গেল এবং ভগবান এই সুকঠিন ব্যাধির আঘাতে তাঁহার আজীবন-উঁচু মাথাটি একেবারে মাটির সঙ্গে একাকার করিয়া দিলেন, তখন পাড়ার কোন লোকই দুর্ভাগিনীকে তুলিয়া ধরিবার জন্য হাত বাড়াইল না। দোষস্পর্শলেশহীন নির্মল হিন্দুসমাজ হতভাগিনীর মুখের উপরেই তাহার সমস্ত দরজা-জানালা আঁটিয়া বন্ধ করিয়া দিল; সুতরাং যে পাড়ার মধ্যে একটি লোকও বোধ করি ছিল না, যে কোন-না কোন প্রকারে নিরুদিদির সযত্ন-সেবা উপভোগ করে নাই, সেই পাড়ারই একপ্রান্তে অন্তিম-শয্যা পাতিয়া এই দুর্ভাগিনী ঘৃণায়, লজ্জায় নিঃশব্দে নতমুখে একাকিনী দিনের পর দিন ধরিয়া এই সুদীর্ঘ ছয়মাসকাল বিনা চিকিৎসায় তাহার পদস্খলনের প্রায়শ্চিত্ত সমাধা করিয়া শ্রাবণের এক গভীর রাত্রে ইহলোক ত্যাগ করিয়া যে-লোকে চলিয়া গেলেন, তাহার অভ্রান্ত বিবরণ যে-কোন স্মার্ত ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানা যাইতে পারিত।

আমার পিসিমা যে অত্যন্ত সঙ্গোপনে তাঁহাকে সাহায্য করিতেন, এ-কথা আমি এবং বাটীর বুড়া ঝি ছাড়া আর জগতে কেহই জানে না। পিসিমা একদিন দুপুরবেলা আমাকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিলেন, বাবা শ্রীকান্ত, তোরা ত এমন অনেকেরই রোগে শোকে গিয়ে দেখিস্; এই ছুঁড়িটাকে এক-আধবার গিয়ে দেখিস্ না। সেই অবধি আমি মাঝে-মাঝে গিয়া দেখিতাম এবং পিসিমার পয়সায় এটা-ওটা-সেটা কিনিয়া দিয়া আসিতাম। তাঁহার শেষকালে একা আমিই কাছে ছিলাম। মরণকালে অমন পরিপূর্ণ বিকার

এবং পরিপূর্ণ জ্ঞান আমি আর দেখি নাই! বিশ্বাস না করিলেও যে ভয়ে গা ছম্ ছম্ করে, আমি সেই কথাটাই বলিতেছি।

সেদিন শ্রাবণের অমাবস্যা। রাত্রি বারোটার পর ঝড় এবং জলের প্রকোপে পৃথিবী যেন উপড়াইয়া যাইবার উপক্রম করিল। সমস্ত জানালা দরজা বন্ধ; আমি খাটের অদূরে বহু প্রাচীন অর্ধভগ্ন একটা ইজিচেয়ারে শুইয়া আছি। নিরুদিদি স্বাভাবিক মুক্তকণ্ঠে আমাকে কাছে ডাকিয়া, হাত তুলিয়া আমার কানটা তাঁহার মুখের কাছে আনিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন, শ্রীকান্ত, তুই বাড়ি যা।

সে কি নিরুদি, এই ঝড়-জলের মধ্যে?

তা' হোক। প্রাণটা আগে।

ভুল বকিতেছেন ভাবিয়া বলিলাম, আচ্ছা যাচ্ছি—জলটা একটু থামুক। নিরুদিদি ভয়ানক ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—না, না, শ্রীকান্ত তুই যা। যা ভাই যা,—আর এতটুকু দেরি করিস্‌নে—তুই পালা।

এইবার তাঁর কণ্ঠস্বরের ভঙ্গিতে আমার বুকের ভিতরটায় ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। বলিলাম, আমাকে যেতে বলছ কেন?

প্রত্যুত্তরে তিনি আমার হাতটা টানিয়া লইয়া রুদ্ধ জানালার প্রতি লক্ষ্য করিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন, যাবিনে, তবে কি প্রাণটা দিবি? দেখ্‌চিস নে, আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে কালো কালো সেপাই এসেচে? তুই আছিস্ ব'লে ঐ জানালা দিয়ে আমাকে শাসাচ্চে?

তার পরে সেই যে শুরু করিলেন—ওই খাটের তলায়! ওই মাথার শিয়রে! ওই মারতে আসচে! ওই নিলে! ওই ধরলে! এ চীৎকার শুধু থামিল শেষরাত্রে যখন প্রাণটাও প্রায় শেষ হইয়া আসিল।

ব্যাপারটা আজও আমার বুকের মধ্যে কাটিয়া কাটিয়া বসিয়া আছে। সে রাত্রে ভয় পাইয়াছিলাম ত বটেই, বোধ করি বা যেন কি সব চেহারাও দেখিয়াছিলাম। এখন মনে করিয়া হাসি পায় সত্য; কিন্তু সেদিন অমাবস্যার ঘোর দুর্যোগ তুচ্ছ করিয়াও বোধ করি বা ছুটিয়া পলাইতাম, যদি না একথা অসংশয়ে বিশ্বাস হইত—কপাট খুলিয়া বাহির হইলেই নিরুদিদির কালো কালো সেপাই-শান্ত্রীর ভিড়ের মধ্যে গিয়া পড়িব। অথচ এ সব কিছুই নাই, কিছুই ছিল না, তাহাও জানিতাম; মুমূর্ষু যে কেবলমাত্র নিদারুণ বিকারের ঘোরেই প্রলাপ বকিতেছিলেন, তাহাও বুঝিয়াছিলাম। অথচ—

বাবু ?

চমকিয়া ফিরিয়া দেখিলাম, রতন।

কি রে ?

বাইজী একবার প্রণাম জানাচ্ছেন।

যেমন বিস্মিত হইলাম, তেমনি বিরক্ত হইলাম। এতরাত্রে অকস্মাৎ আহ্বান করাটা শুধু যে অত্যন্ত অপমানকর স্পর্ধা বলিয়া মনে হইল, তাহা নয়; গত তিন-চারিদিনের উভয় পক্ষের ব্যবহারগুলা স্মরণ করিয়াও এই প্রণাম পাঠানোটা যেন সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড বলিয়া ঠেকিল। কিন্তু ভৃত্যের সম্মুখে কোনরূপ উত্তেজনা পাছে প্রকাশ পায়, সেই আশঙ্কায় নিজেকে প্রাণপণে সংবরণ করিয়া কহিলাম, আজ আমার সময় নেই রতন, আমাকে বেরুতে হবে; কাল দেখা হবে।

রতন সুশিক্ষিত ভৃত্য; আদব-কায়দায় পাকা। সম্ভ্রমের সহিত মৃদুস্বরে কহিল, বড দরকার বাবু, এখনি একবার পায়ের ধুলো দিতে হবে। নইলে বাইজীই আসবেন বললেন।

কি সর্বনাশ! এই তাঁবুতে, এত রাত্রে, এত লোকের সুমুখে! বলিলাম, তুমি বুঝিয়ে বলগে রতন, আজ নয়, কাল সকালেই দেখা হবে। আজ আমি কোনমতেই যেতে পারব না।

রতন কহিল, তা হলে তিনিই আসবেন। আমি এই পাঁচ বছর দেখে আসচি বাবু, বাইজীর কোনদিন এতটুকু কথার কখনো নড-চড় হয় না। আপনি না গেলে তিনি নিশ্চয়ই আসবেন।

এই অন্যায় অসঙ্গত জিদ দেখিয়া পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্যন্ত জ্বলিয়া গেল। বলিলাম, আচ্ছা দাঁড়াও, আমি আসচি। তাঁবুর ভিতরে ঢুকিয়া দেখিলাম, বারুণীর কৃপায় জাগ্রত আর কেহ নাই। পুরুষোত্তম গভীর নিদ্রায় মগ্ন। চাকরদের তাঁবুতে দুই চারিজন জাগিয়া আছে মাত্র। তাডাতাড়ি বুটটা পরিয়া লইয়া একটা কোট গায়ে দিয়া ফেলিলাম। রাইফেল ঠিক করাই ছিল। হাতে লইয়া রতনের সঙ্গে সঙ্গে বাইজীর তাঁবুতে গিয়া প্রবেশ করিলাম। পিয়ারী সুমুখেই দাঁড়াইয়াছিল। আমার আপাদমস্তক বার বার নিরীক্ষণ করিয়া, কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়াই ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল, শ্মশানে-টশানে তোমার কোনমতেই যাওয়া হবে না—কোন মতেই না।

ভয়ানক আশ্চর্য হইয়া গেলাম,—কেন ?

কেন আবার কি? ভূত-প্রেত কি নেই যে, এই শনিবারের অমাবস্যায় তুমি যাবে শ্মশানে? প্রাণ নিয়ে কি তা হলে আর ফিরে আসতে হবে! বলিয়াই পিয়ারী অকস্মাৎ ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। আমি বিহ্বলের মত নিঃশব্দে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। কি করিব, কি জবাব দিব, ভাবিয়াই পাইলাম না। ভাবিয়া না পাওয়া আর আশ্চর্য কি? যাহাকে চিনি না, জানি না সে যদি উৎকট হিতাকাঙ্ক্ষায় দুপুর-রাত্রে ডাকাইয়া আনিয়া সুমুখে দাঁড়াইয়া খামোকা কান্না জুড়িয়া দেয়—হতবুদ্ধি হয় না কে? আমার জবাব না পাইয়া পিয়ারী চোখ মুছিতে মুছিতে কহিল, তুমি কি কোনদিন শান্ত-সুবোধ হবে না? তেমনি একগুঁয়ে হয়ে চিরকালটা কাটাবে? কই, যাও দিকি কেমন করে যাবে, আমিও তাহলে সঙ্গে যাবো, বলিয়া সে শালখানা কুড়াইয়া লইয়া নিজের গায়ে জড়াইবার উপক্রম করিল।

আমি সংক্ষেপে কহিলাম, বেশ, চল।

আমার এই প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপে জ্বলিয়া উঠিয়া পিয়ারী বলিল, আহা! দেশ-বিদেশে তা'হলে সুখ্যাতির আর সীমা পরিসীমা থাকবে না! বাবু শিকারে এসে একটা বাইউলি সঙ্গে করে দুপুর-রাত্রে ভূত দেখতে গিয়েছিলেন। বলি বাড়িতে কি একেবারে আউট হয়ে গেছ নাকি? ঘেন্না-পিত্তি লজ্জা-সরম আর কিছু দেহতে নেই, বলিতে বলিতেই তাহার তীব্র কণ্ঠ ভিজিয়া যেন ভারি হইয়া উঠিল, কহিল, কখনো ত এমন ছিলে না। এত অধঃপাতে তুমি যেতে পারো, কেউ ত কোন দিন ভাবেনি।

তাহার শেষ কথাটায় অন্য কোন সময়ে আমার বিরক্তির হয়ত অবধি থাকিত না, কিন্তু এখন রাগ হইল না। মনে হইল পিয়ারীকে যেন চিনিয়াছি। কেন যে মনে হইল তাহা পরে বলিতেছি। কহিলাম, লোকের ভাবাভাবির দাম কত, সে নিজেও ত জানো? তুমিই যে এত অধঃপাতে যাবে সেই বা ক'জন ভেবেছিল?

মুহূর্তের জন্য পিয়ারীর মুখের উপর শরতের মেঘলা জ্যোৎস্নার মত একটা সহজ হাসির আভা দেখা দিল। কিন্তু সে ঐ মুহূর্তের জন্যই। পরক্ষণেই সে ভীতস্বরে কহিল, আমার তুমি কি জানো? কে আমি, বল ত দেখি?

তুমি পিয়ারী।

সে ত সবাই জানে।

সবাই যা জানে না, তা আমি জানি—শুনলে কি তুমি খুশি হবে? হ'লে

ত নিজেই তোমার পরিচয় দিতে। যখন দাওনি তখন আমার মুখ থেকেও কোন কথা পাবে না। এর মধ্যে ভেবে দেখো, আত্মপ্রকাশ করবে কি না। কিন্তু এখন আর সময় নেই—আমি চললুম।

পিয়ারী বিদ্যুৎগতিতে পথ আগলাইয়া দাঁড়াইয়া কহিল, যদি যেতে না দিই, জোর করে যেতে পার?

কিন্তু যেতেই বা দেবে না কেন?

পিয়ারী কহিল, দেবই বা কেন? সত্যিকারের ভূত কি নেই, যে তুমি যাবে বললেই যেতে দেব? মাইরি, আমি চেঁচিয়ে হাট বাধাব—তা বলে দিচ্ছি, বলিয়াই আমার বন্দুকটা কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল। আমি এক-পা পিছাইয়া গেলাম।

কিছুক্ষণ হইতেই আমার বিরক্তির পরিবর্তে হাসি পাইতেছিল। এবার হাসিয়া ফেলিযা বলিলাম, সত্যিকারের ভূত আছে কি না জানি না, কিন্তু মিথ্যাকারের ভূত আছে জানি। তারা সুমুখে দাঁড়িয়ে কথা কয়, কাঁদে, পথ আগ্‌লায়—এমন অনেক কীর্তি করে, আবার দরকার হলে ঘাড মটকেও খায়।

পিয়ারী মলিন হইয়া গেল; এবং ক্ষণকালের জন্য বোধ করি বা কথা খুঁজিয়াও পাইল না। তারপর বলিল, আমাকে তা হ'লে তুমি চিনেচ বল! কিন্তু ওটা তোমার ভুল। তারা অনেক কীর্তি করে সত্যি, কিন্তু ঘাড মট্‌কাবার জন্যই পথ আগ্‌লায় না। তাদেরও আপনার-পর বোধ আছে।

আমি পুনরায় সহাস্যে প্রশ্ন করিলাম, এ ত তোমার নিজের কথা, কিন্তু তুমি কি ভূত?

পিয়ারী কহিল, ভূত বইকি! যারা মরে গিয়েও মরে না, তারাই ভূত; এই ত তোমার বলবার কথা। একটুখানি থামিয়া নিজেই পুনরায় কহিতে লাগিল, এক হিসাবে আমি যে মরেছি, তা সত্যি। কিন্তু সত্যি হোক মিথ্যে হোক—নিজের মরণ আমি নিজে রটাইনি। মামাকে দিয়ে মা রটিয়েছিলেন। শুনবে সব কথা?

তাহার মরণের কথা শুনিয়া এতক্ষণে আমার সংশয় কাটিয়া গেল। ঠিক চিনিতে পারিলাম—এই সেই রাজলক্ষ্মী। অনেকদিন পূর্বে মায়ের সহিত সে তীর্থযাত্রা করিয়াছিল—আর ফিরে নাই। কাশীতে ওলাউঠা রোগে মরিয়াছে—এই কথা মা গ্রামে আসিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। তাহাকে কখনো যে

আমি ইতিপূর্বে দেখিয়াছিলাম—এ কথা আমি মনে করিতে পারি নাই বটে, কিন্তু তাহার একটা অভ্যাস আমি এখানে আসিয়া পর্যন্ত লক্ষ্য করিতেছিলাম। সে রাগিলেই দাঁত দিয়া অধর চাপিয়া ধরিতেছিল। কখন কোথায়, কাহাকে যেন ঠিক এম্‌নি ধারা করিতে অনেকবার দেখিয়াছি বলিয়া কেবলি মনে হইতেছিল; কিন্তু কে সে, কোথায় দেখিয়াছি, কবে দেখিয়াছি কিছুতেই মনে পড়িতেছিল না। সেই রাজলক্ষ্মী এই হইয়াছে দেখিয়া আমি ক্ষণকালের জন্য বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেলাম। আমি যখন আমাদের গ্রামের মনসা পণ্ডিতের পাঠশালের সর্দার-পোড়ো, সেই সময়ে ইহার দুইপুরুষে কুলীন বাপ আর একটা বিবাহ করিয়া ইহার মাকে তাড়াইয়া দেয়। স্বামী-পরিত্যক্তা মা সুরলক্ষ্মী ও রাজলক্ষ্মী দুই মেয়ে লইয়া বাপের বাড়ি চলিয়া আসে। ইহার বয়স তখন আট-নয় বৎসর; সুরলক্ষ্মীর বারো-তেরো। ইহার রঙটা বরাবরই ফর্সা; কিন্তু ম্যালেরিয়া ও প্লীহায় পেটটা ধামার মত, হাত পা কাঠির মত, মাথার চুলগুলা তামার শলার মত—কতগুলি তাহা গুণিয়া বলা যাইতে পারিত। আমার মারের ভয়ে এই মেয়েটা বঁইচির বনে ঢুকিয়া প্রত্যহ একছড়া পাকা বঁইচি ফলের মালা গাঁথিয়া আনিয়া আমাকে দিত। সেটা কোনদিন ছোট হইলেই, পুরানো পড়া জিজ্ঞাসা করিয়া, ইহাকে প্রাণ ভরিয়া চপেটাঘাত করিতাম। মার খাইয়া এই মেয়েটা ঠোঁট কামড়াইয়া গোঁজ হইয়া বসিয়া থাকিত; কিন্তু কিছুতেই বলিত না—প্রত্যহ পাকা ফল সংগ্রহ করা তাহার পক্ষে কত কঠিন। তা সে যাই হোক, এতদিন জানিতাম, মারের ভয়েই সে এত ক্লেশ স্বীকার করিত; কিন্তু আজ যেন হঠাৎ একটুখানি সংশয় হইল। তা সে যাক। তার পরে ইহার বিবাহ। সেও এক চমৎকার ব্যাপার। ভাগ্নীদের বিবাহ হয় না, মামা ভাবিয়া খুন। দৈবাৎ জানা গেল, বিরিঞ্চি দত্তের পাচক ব্রাহ্মণ ভঙ্গ-কুলীনের সন্তান। এই কুলীন-সন্তানকে দত্তমশাই বাঁকুড়া হইতে বদলি হইয়া আসার সময় সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। বিরিঞ্চি দত্তের দুয়ারে মামা ধন্না দিয়া পড়িলেন—ব্রাহ্মণের জাতিরক্ষা করিতেই হইবে। এতদিন সবাই জানিত দত্তদের বামুনঠাকুর হাবা-গোবা ভালমানুষ। কিন্তু প্রয়োজনের সময় দেখা গেল, ঠাকুরের সাংসারিক-বুদ্ধি কাহারো অপেক্ষা কম নয়। একান্নো টাকা পণের কথায় সে সবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, অত সস্তায় হবে না মশায়—বাজারে যাচিয়ে দেখুন। পঞ্চাশ-এক টাকায় একজোড়া ভাল রামছাগলও পাওয়া যায় না—তা

জামাই খুঁজচেন। একশ-একটি টাকা দিন—একবার এ-পিঁড়িতে ব'সে আর একবার ও-পিঁড়িতে বসে, দুটো ফুল ফেলে দিচ্চি। দুটি ভাগ্নীই একসঙ্গে পার হবে। আর একশখানি টাকা—দুটো ষাঁড় কেনার খরচাটাও দেবেন না? কথাটা অসঙ্গত নয়, তথাপি অনেক ঘষা-মাজা ও সহি-সুপারিশের পর সত্তর টাকায় রফা হইয়া একরাত্রে একসঙ্গে সুরলক্ষ্মী ও রাজলক্ষ্মীর বিবাহ হইয়া গেল। দুইদিন পরে সত্তর টাকা নগদ লইয়া দু-পুরুষে কুলীন-জামাই বাঁকুড়া প্রস্থান করিলেন। আর কেহ তাঁহাকে দেখে নাই। বছর-দেড়েক পরে প্লীহা-জ্বরে সুরলক্ষ্মী মরিল এবং আরও বছর দেড়েক পরে এই রাজলক্ষ্মী কাশীতে মরিয়া শিবত্ব লাভ করিল। এই ত পিয়ারী বাইজীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

বাইজী কহিল, তুমি কি ভাবছ, বলব ?

কি ভাবচি ?

তুমি ভাবছ, আহা! ছেলেবেলায় একে কত কষ্টই দিয়েচি। কাঁটার বনে পাঠিয়ে রোজ-রোজ বঁইচি তুলিয়েচি, আর তার বদলে শুধু মারধর করেছি। মার খেয়ে চুপ ক'রে কেবল কেঁদেচে, কিন্তু কখনো কিছু চায়নি। আজ যদি একটা কথা বলচে ত শুনিই না। না হয় নাই গেলাম শ্মশানে—এই না ?

আমি হাসিয়া ফেলিলাম।

পিয়ারীও হাসিয়া কহিল, হবেই ত। ছেলেবেলায় একবার যাকে ভালবাসা যায়, তাকে কি কখনো ভোলা যায় ? সে একটা অনুরোধ করলে কেউ কখনো কি পায়ে ঠেলে যেতে পারে ? এমন নিষ্ঠুর সংসারে আর কে আছে! চল, একটু বসি গে, অনেক কথা আছে। রতন, বাবুর বুটটা খুলে দিয়ে যা রে। হাসচ যে ?

হাসচি, কি করে তোমরা মানুষ ভুলিয়ে বশ করো, তাই দেখে।

পিয়ারীও হাসিল; কহিল, তাই বৈ কি! পরকে কথায় ভুলিয়ে বশ করা যায়; কিন্তু জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত নিজেই যার বশ হয়ে আছি, তাকেও কি কথায় ভুলানো যায় ? আচ্ছা, আজই না হয় কথা কইচি; কিন্তু প্রত্যহ কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে যখন বঁইচির মালা গেঁথে দিতুম, তখন কটা কথা কয়েছিলুম শুনি ? সে কি তোমার মারের ভয়ে না কি ? মনেও ক'রো না। সে মেয়ে রাজলক্ষ্মী নয়। কিন্তু ছিঃ! আমাকে তুমি একেবারেই

ভুলে গিয়েছিলে—দেখে চিনতেও পারোনি। বলিয়া হাসিয়া মাথা নাড়িতেই তাহার দুই কানের হীরাগুলা পর্যন্ত দুলিয়া উঠিল।

আমি বলিলাম, তোমাকে মনেই বা কবে করেছিলুম যে, ভুলে যাবো না? বরং আজ চিনতে পেরেচি দেখে, নিজেই আশ্চর্য হ'য়ে গেছি। আচ্ছা, বারোটা বাজে—চললুম।

পিয়ারীর হাসিমুখ এক নিমেষেই একেবারে বিবর্ণ ম্লান হইয়া গেল। একটুখানি স্থির থাকিয়া কহিল, আচ্ছা ভূত-প্রেত না মানো, সাপ-খোপ, বাঘ-ভালুক, বুনো শূয়ার এগুলোকে ত বনে-জঙ্গলে অন্ধকার রাত্রে মানা চাই।

আমি বলিলাম, এগুলোকে আমি মেনে থাকি এবং যথেষ্ট সতর্ক হয়েও চলি।

আমাকে যাইতে উদ্যত দেখিয়া ধীরে ধীরে কহিল, তুমি যে-ধাতের মানুষ, তাতে তোমাকে যে আটকাতে পারব না সে ভয় আমার খুবই ছিল; তবু ভেবেছিলাম, কান্নাকাটি ক'রে হাতে-পায়ে ধরলে শেষ পর্যন্ত হয়ত নাও যেতে পারো। কিন্তু আমার কান্নাই সার হ'ল। আমি জবাব দিলাম না দেখিয়া পুনরায় কহিল, আচ্ছা যাও - পেছু ডেকে আর অমঙ্গল করব না। কিন্তু একটা-কিছু হ'লে, এই বিদেশ-বিভূঁয়ে রাজ-রাজড়া বন্ধু-বান্ধব কোন কাজেই লাগবে না, তখন আমাকেই ভুগতে হবে। আমাকে চিনতে পারো না, আমার মুখের ওপর ব'লে তুমি পৌরুষী করে গেলে, কিন্তু আমার মেয়েমানুষের মন ত? বিপদের সময় আমি ত আর বলতে পারব না—এঁকে চিনিনে, বলিয়া সে একটি দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া ফেলিল।

আমি যাইতে যাইতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হাসিলাম। কেমন যেন একটা ক্লেশ বোধ হইল। বলিলাম, বেশ ত বাইজী, সেও ত আমার একটা মস্ত লাভ। আমার কেউ কোথাও নেই—তবু ত জানতে পারব, একজন আছে—যে আমাকে ফেলে যেতে পারবে না।

পিয়ারী কহিল, সে কি আর তুমি জানো না? একশবার 'বাইজী' বলে যত অপমানই কর না কেন, রাজলক্ষ্মী তোমাকে যে ফেলে যেতে পারবে না—এ কি আর তুমি মনে মনে বোঝো না? কিন্তু ফেলে যেতে পারলেই ভাল

হ'তো। তোমাদের একটা শিক্ষা হ'তো। কিন্তু কি বিশ্রী এই মেয়েমানুষ জাতটা, একবার যদি ভালবেসেচে, ত মরেচে।

আমি বলিলাম, পিয়ারী, ভালো সন্ন্যাসীতেও ভিক্ষা পায় না, কেন জানো?

পিয়ারী বলিল, জানি। কিন্তু তোমার এ খোঁচায় এত ধার নেই যে আমাকে বেঁধো! এ আমার ঈশ্বরদত্ত ধন। যখন সংসারের ভাল-মন্দ জ্ঞান পর্যন্ত হয়নি, তখনকার; আজকের নয়।

আমি নরম হইয়া বলিলাম, বেশ কথা। আশা করি, আমার আজ একটা কিছু হবে। হ'লে তোমার ঈশ্বরদত্ত ধনের হাতে-হাতে একটা যাচাই হয়ে যাবে।

পিয়ারী কহিল, দুর্গা! দুর্গা! ছিঃ! এমন কথা ব'লো না। ভালোয়-ভালোয় ফিরে এসো—এ সত্যি আর যাচাই করে কাজ নেই। আমার কি সেই কপাল যে, নিজের হাতে-নেড়ে-চেড়ে সেবা করে, দুঃসময়ে তোমাকে সুস্থ, সবল করে তুলব। তা হ'লে ত জানতুম, এ জন্মের একটা কাজ করে নিলুম। বলিয়া সে যে মুখ ফিরাইযা অশ্রু গোপন করিল, তাহা হ্যারিকেনের ক্ষীণ আলোতেও টের পাইলাম।

আচ্ছা, ভগবান তোমার এ সাধ হয়ত একদিন পূর্ণ করে দেবেন, বলিযা আমি আর দেবি না করিয়া তাঁবুর বাহিরে আসিয়া পড়িলাম। তামাশা করিতে গিয়া যে মুখ দিয়া একটা প্রকাণ্ড সত্য বাহির হইয়া গেল, সে-কথা তখন আর কে ভাবিযাছিল?

তাঁবুর ভিতর হইতে অশ্রুবিকৃত কণ্ঠের দুর্গা। দুর্গা! নামের সকাতর ডাক কানে আসিয়া পৌছিল। আমি দ্রুতপদে শ্মশানের পথে প্রস্থান করিলাম।

সমস্ত মনটা পিযারীর কথাতেই আচ্ছন্ন হইয়া রহিল। কখন যে আমবাগানের দীর্ঘ অন্ধকার পথ পার হইয়া গেলাম, কখন নদীর ধারের সরকারী বাঁধের উপর আসিয়া পড়িলাম, জানিতেই পারিলাম না। সমস্ত পথটা শুধু এই একটা কথাই ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছি—এ কি বিরাট্ অচিন্তনীয় ব্যাপার এই নারীর মনটা। কবে যে ঐ পিলোরোগা মেয়েটা

তাহার ধামার মত পেট এবং কাঠির মত হাত-পা লইয়া আমাকে প্রথম ভালবাসিয়াছিল এবং বঁইচি ফলের মালা দিয়া তাহার দরিদ্র পূজা নীরবে সম্পন্ন করিয়া আসিতেছিল, আমি টেরও পাই নাই। যখন টের পাইলাম, তখন বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। বিস্ময় শুধু জন্যও নয়। নভেল-নাটকেও বাল্যপ্রণয়ের কথা অনেক পড়িয়াছি। কিন্তু এই বস্তুটি, যাহাকে সে তাহার ঈশ্বরদত্ত ধন বলিয়া সগর্বে প্রচার করিতেও কুণ্ঠিত হইল না, তাহাকে সে এতদিন তাহার এই ঘৃণিত জীবনের শতকোটি মিথ্যা প্রণয়-অভিনয়ের মধ্যে কোন্‌খানে জীবিত রাখিয়াছিল? কোথা হইতে ইহাদের খাদ্য সংগ্রহ করিত? কোন্ পথে প্রবেশ করিয়া তাহাকে লালন-পালন করিত?

বাপ্‌!

চমকিয়া উঠিলাম। সম্মুখে চাহিয়া দেখি, ধূসর বালুর বিস্তীর্ণ প্রান্তর এবং তাহাকেই বিদীর্ণ করিয়া শীর্ণ নদীর বক্ররেখা আঁকিয়া-বাঁকিয়া কোন্ সুদূরে অন্তর্হিত হইয়া গেছে। সমস্ত প্রান্তর ব্যাপিয়া এক-একটা কাশের ঝোপ। অন্ধকারে হঠাৎ মনে হইল, এগুলো যেন এক-একটা মানুষ—আজিকার এই ভয়ঙ্কর অমানিশায় প্রেতাত্মার নৃত্য দেখিতে আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছে এবং বালুকার আস্তরণের উপর যে যাহার আসন গ্রহণ করিয়া, নীরবে প্রতীক্ষা করিতেছে। মাথার উপর নিবিড় কালো আকাশ, সংখ্যাতীত গ্রহতারকারাও আগ্রহে চোখ মেলিয়া চাহিয়া আছে। হাওয়া নাই, শব্দ নাই, নিজের বুকের ভিতরটা ছাড়া যতদূর চোখ যায়, কোথাও এতটুকু প্রাণের সাড়া পর্যন্ত অনুভব করিবার জো নাই। যে রাত্রিচর পাখিটা একবার 'বাপ্‌' বলিয়াই থামিয়াছিল, সেও আর কথা কহিল না। পশ্চিম-মুখে ধীরে ধীরে চলিলাম। এই দিকেই সেই মহাশ্মশান। একদিন শিকারে আসিয়া সেই যে শিমুলগাছগুলা দেখিয়া গিয়াছিলাম, কিছু দূরে আসিতেই তাহাদের কালো-কালো ডাল পালা চোখে পড়িল। ইহারাই মহাশ্মশানের দ্বারপাল! ইহাদের অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। এইবার অতি অস্ফুট প্রাণের সাড়া পাইতে লাগিলাম; কিন্তু তাহা আহ্লাদ করিবার মত নয়। আরও একটু অগ্রসর হইতে, তাহা পরিস্ফুট হইল। এক-একটা মা 'কুম্ভকর্ণের ঘুম' ঘুমাইলে তাহার কচি ছেলেটা কাঁদিয়া কাঁদিয়া শেষকালে নির্জীব হইয়া যে প্রকারে রহিয়া রহিয়া কাঁদে, ঠিক তেমনি করিয়া শ্মশানের একান্ত হইতে কে যেন কাঁদিতে

লাগিল। যে এ ক্রন্দনের ইতিহাস জানে না, এবং পূর্বে শুনে নাই—সে যে এই গভীর অমানিশায় একাকী সেদিকে আর এক-পা অগ্রসর হইতে চাহিবে না, তাহা বাজি রাখিয়া বলিতে পারি। সে যে মানব-শিশু নয়—শকুন-শিশু, অন্ধকারে মাকে দেখিতে না পাইয়া কাঁদিতেছে—না জানিলে কাহারো সাধ্য নাই, এ কথা ঠাহর করিয়া বলে। আরও কাছে আসিতে দেখিলাম—ঠিক তাই বটে। কালো কালো ঝুড়ির মত শিমূলের ডালে ডালে অসংখ্য শকুন রাত্রিবাস করিতেছে; এবং তাহাদেরই কোন একটা দুষ্ট ছেলে অমন করিয়া আর্তকণ্ঠে কাঁদিতেছে।

গাছের উপরে সে কাঁদিতেই লাগিল; আমি নীচে দিয়া অগ্রসর হইয়া ঐ মহাশ্মশানের এক প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইলাম। সকালে তিনি যে বলিয়াছিলেন, লক্ষ নরমুণ্ড গণিয়া লওয়া যায়—দেখিলাম, কথাটা নিতান্ত অত্যুক্তি নয়। সমস্ত স্থানটাই প্রায় নরকঙ্কালে খচিত হইয়া আছে। গেণ্ডুয়া খেলিবার নরকপাল অসংখ্য পড়িয়া আছে; তবে খেলোয়াড়েরা তখনও আসিয়া জুটিতে পারে নাই। আমি ছাড়া আর কোন অশরীরী দর্শক তথায় উপস্থিত ছিলেন কি না, এই দু'টা নশ্বর চোখে আবিষ্কার করিতে পারিলাম না। তখন ঘোর অমাবস্যা। সুতরাং খেলা শুরু হইবার আর বেশি দেরি নাই আশা করিয়া, একটা বালুর ঢিপির উপর চাপিয়া বসিলাম। বন্দুকটা খুলিয়া, টোটাটা আর একবার পরীক্ষা করিয়া পুনরায় যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়া, কোলের উপর রাখিয়া প্রস্তুত হইয়া রহিলাম। হায় রে টোটা! বিপদের সময় কিন্তু সে কোনই সাহায্য করিল না।

পিয়ারীর কথাটা মনে পড়িল। সে বলিয়াছিল, যদি অকপটে বিশ্বাসই কর না, তবে কর্মভোগ করিতে যাওয়া কেন? আর যদি বিশ্বাসের জোর না থাকে, তাহা হইলে ভূত-প্রেত থাক বা না থাক তোমাকে কিছুতেই যাইতে দিব না। সত্যই ত! এ কি দেখিতে আসিয়াছি? মনের অগোচরে ত পাপ নাই। আমি কিছুই দেখিতে আসি নাই; শুধু দেখাইতে আসিয়াছি—আমার সাহস কত। সকালে যাহারা বলিয়াছিল, ভীরু বাঙ্গালী কার্যকালে ভাগিয়া যায়, তাহাদের কাছে শুধু এই কথাটা সপ্রমাণ করা যে, বাঙ্গালী বড় বীর।

আমার বহুদিনের দৃঢ় বিশ্বাস, মানুষ মরিলে আর বাঁচে না, এবং যদি বা বাঁচে, যে শ্মশানে তাহার পার্থিব দেহটাকে অশেষ প্রকারে নিপীড়িত করা

হয়, সেইখানেই ফিরিয়া নিজের মাথাটায় লাথি মারিয়া মারিয়া গড়াইয়া বেড়াইবার ইচ্ছা হওয়া তাহার পক্ষে স্বাভাবিকও নয়, উচিতও নয়—অন্ততঃ আমার পক্ষে ত নয়। তবে কি না, মানুষের রুচি ভিন্ন। যদি বা কাহারও হয়, তাহা হইলে এমন একটা চমৎকার রাত্রে রাত্রি-জাগিয়া আমার এতদূরে আসাটা নিষ্ফল হইবে না। অথচ এম্‌নি একটা গুরুতর আশাই আজিকার প্রবীণ ব্যক্তিটি দিয়াছিলেন।

হঠাৎ একটা দমকা বাতাস কতকগুলো ধূলা-বালি উড়াইয়া গায়ের উপর দিয়া বহিয়া গেল, এবং সেটা শেষ না হইতেই আর একটা এবং আর একটা বহিয়া গেল। মনে হইল, এ আবার কি? এতক্ষণ ত বাতাসের লেশমাত্র ছিল না। যতই কেন না বুঝি এবং বুঝাই, মরণের পরেও যে কিছু-একটা অজানা গোছের থাকে—এ সংস্কার হাড়ে-মাসে জড়ানো। যতক্ষণ হাড়-মাস আছে ততক্ষণ সেও আছে—তাহাকে স্বীকার করি, আর না করি। সুতরাং এই দমকা বাতাসটা শুধু ধূলা-বালিই উড়াইল না, আমার মজ্জাগত সেই গোপন সংস্কারে গিয়াও ঘা দিল। ক্রমশঃ ধীরে ধীরে বেশ একটু জোরে হাওয়া উঠিল। অনেকেই হয়ত জানেন না যে, মড়ার মাথার ভিতর দিয়া বাতাস বহিলে ঠিক দীর্ঘশ্বাস ফেলা গোছের শব্দ হয়। দেখিতে দেখিতে আশে-পাশে, সুমুখে পিছনে দীর্ঘশ্বাসের যেন ছড়াছড়ি পড়িয়া গেল। ঠিক মনে হইতে লাগিল, কত লোক যেন আমাকে ঘিরিয়া বসিয়া অবিশ্রাম হা-হুতাশ করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিতেছে, এবং ইংরাজীতে যাহাকে বলে 'uncanny feeling' ঠিক সেই ধরনের একটা অস্বস্তি সমস্ত শরীরটাকে যেন গোটা-দুই ঝাঁকুনি দিয়া গেল। সেই শকুনির বাচ্চাটা তখনও চুপ করে নাই, সে যেন পিছনে আরও বেশি করিয়া গোঙাইতে লাগিল। বুঝিলাম, ভয় পাইয়াছি। বহু অভিজ্ঞতার ফলে বেশ জানিতাম, এ যে-স্থানে আসিয়াছি, এখানে এই বস্তুটাকে সময়ে চাপিতে না পারিলে মৃত্যু পর্যন্ত অসম্ভব ব্যাপার নয়। বস্তুতঃ এইরূপ ভয়ানক জায়গায় ইতিপূর্বে আমি কখনো একাকী আসি নাই। একাকী যে স্বচ্ছন্দে আসিতে পারিত, সে ইন্দ্র—আমি নয়। অনেকবার তাহার সঙ্গে অনেক ভয়ানক স্থানে গিয়া আমারও একটা ধারণা জন্মিয়াছিল যে, ইচ্ছা করিলে আমিও তাহার মত এইসব স্থানে একাকী আসিতে পারি। কিন্তু সেটা যে কত বড় ভ্রম এবং আমি যে শুধু ঝোঁকের উপরেই তাহাকে অনুসরণ

করিতে গিয়াছিলাম, একমুহূর্তেই আজ তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। আমার সেই চওড়া বুক কই? আমার সে বিশ্বাস কোথায়? আমার সেই রাম-নামের অভেদ্য কবচ কই? আমি ত ইন্দ্র নই যে, এই প্রেতভূমিতে নিঃসঙ্গ দাঁড়াইয়া, চোখ মেলিয়া, প্রেতাত্মার গেণ্ডুয়া-খেলা দেখিব? মনে হইতে লাগিল, একটা জীবন্ত বাঘ-ভালুক দেখিতে পাইলেও বুঝি বাঁচিয়া যাই। হঠাৎ কে যেন পিছনে দাঁড়াইয়া আমার ডান কানের উপর নিঃশ্বাস ফেলিল। তাহা এমনি শীতল যে, তুষারকণার মত সেইখানেই জমিয়া উঠিল। ঘাড় না তুলিয়াও স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, এ নিঃশ্বাস যে নাকের মস্ত ফুটাটা হইতে বাহির হইয়া আসিল, তাহাতে চামড়া নাই, একফোঁটা রক্তের সংস্রব পর্যন্ত নাই—কেবল হাড় আর গহ্বর! সুমুখে, পিছনে, দক্ষিণে, বামে অন্ধকার। স্তব্ধ নিশীথ রাত্রি ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল। আশেপাশে হা হুতাশ ও দীর্ঘশ্বাস ক্রমাগতই যেন হাতের কাছে ঘেঁষিয়া আসিতে লাগিল। কানের উপর তেমনিই কন্‌কনে ঠাণ্ডা নিঃশ্বাসের বিরাম নাই। এইটাই সর্বাপেক্ষা আমাকে অবশ করিয়া আনিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, সমস্ত প্রেতলোকের ঠাণ্ডা হাওয়া যেন এই গহ্বরটা দিয়াই বহিয়া আসিয়া আমার গায়ে লাগিতেছে।

এত কাণ্ডের মধ্যেও কিন্তু এ কথাটা ভুলি নাই যে, কোনমতেই আমার চৈতন্য হারাইলে চলিবে না। তাহা হইলে মরণ অনিবার্য। দেখি, ডান পা-টা ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে। থামাইতে গেলাম, থামিল না। সে যেন আমার পা নয়।

ঠিক এমনি সময়ে অনেক দূরে অনেকগুলো গলার সমবেত চীৎকার কানে পৌঁছিল—বাবুজী! বাবুসাব! সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া উঠিল। কাহারা ডাকে? আবার চীৎকার করিল—গুলি ছুঁড়বেন না যেন। শব্দ ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিল—গোটা দুই ক্ষীণ আলোর রেখাও আড়চোখে চাহিতে চোখে পড়িল। একবার মনে হইল, চীৎকারের মধ্যে যেন রতনের গলার আভাস পাইলাম। খানিক পরেই টের পাইলাম, সেই বটে। আর কিছুদূর অগ্রসর হইয়া, সে একটা শিমুলের আড়ালে দাঁড়াইয়া চেঁচাইয়া বলিল, বাবু, আপনি যেখানেই থাকুন, গুলি-টুলি ছুঁড়বেন না—আমরা রতন। রতন লোকটা যে সত্যিই নাপিত তাহাতে আর ভুল নাই।

উল্লাসে চেঁচাইয়া সাড়া দিতে গেলাম, কিন্তু স্বর ফুটিল না।

একটা প্রবাদ আছে, ভূত-প্রেত যাবার সময় কিছু একটা ভাঙ্গিয়া দিয়া যায়। যে আমার পিছনে ছিল, সে আমার কণ্ঠস্বরটা ভাঙ্গিয়া দিয়াই বিদায় হইল।

রতন এবং আরও তিনজন লোক গোটা-দুই লণ্ঠন ও লাঠিসোঁটা হাতে করিয়া কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই তিনজনের মধ্যে একজন ছট্টুলাল—সে তব্‌লা বাজায়, এবং আর একজন পিয়ারীর দরোয়ান। তৃতীয় ব্যক্তি গ্রামের চৌকিদার।

রতন কহিল, চলুন—তিনটে বাজে।

চল, বলিয়া আমি অগ্রসর হইলাম। পথে যাইতে যাইতে রতন বলিতে লাগিল, বাবু, ধন্য আপনার সাহস! আমরা চারজনে যে কত ভয়ে ভয়ে এসেচি, তা বলতে পারিনে।

এলি কেন?

রতন কহিল, টাকার লোভে। আমরা সবাই একমাসের মাইনে নগদ পেয়ে গেছি। বলিয়া আমার পাশে আসিয়া গলা খাটো করিয়া বলিতে লাগিল, বাবু, আপনি চলে এলে গিয়ে দেখি, মা বসে বসে কাঁদচেন। আমাকে বললেন, রতন, কি হবে বাবা? তোরা পিছনে যা। আমি এক মাসের মাইনে তোদের বকশিশ দিচ্ছি। আমি বললুম, ছট্টুলাল আর গণেশকে সঙ্গে নিয়ে আমি যেতে পারি মা; কিন্তু পথ চিনিনে। এমন সময় চৌকিদার হাঁক দিতেই মা বললেন, ওকে ডেকে আন রতন, ও নিশ্চয়ই পথ চেনে। বেরিয়ে গিয়ে ডেকে আনলুম। চৌকিদার দু'টাকা হাতে পেয়ে তবে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে। আচ্ছা বাবু, কচি ছেলের কান্না শুনতে পেয়েছেন? বলিয়া রতন শিহরিয়া উঠিয়া আমার কোটের পিছনটা চাপিয়া ধরিল। কহিল, আমাদের গণেশ পাঁড়ে বামুন মানুষ, তাই আজ রক্ষে পাওয়া গেছে, নইলে—

আমি কথা কহিলাম না। প্রতিবাদ করিয়া কাহারো ভুল ভাঙ্গিবার মত মনের অবস্থা আমার ছিল না। আচ্ছন্ন, অভিভূতের মত নিঃশব্দে পথ চলিতে লাগিলাম।

কিছুদূর আসার পর রতন প্রশ্ন করিল, আজ কিছু দেখতে পেলেন, বাবু?

আমি বলিলাম, না।

আমার এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে রতন ক্ষুব্ধ হইয়া কহিল, আমরা যাওয়ায় আপনি কি রাগ করেছেন, বাবু? মার কান্না দেখলে কিন্তু—

আমি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলাম, না রতন, আমি একটুও রাগ করিনি।

তাঁবুর কাছাকাছি আসিয়া চৌকিদার তাহার কাজে চলিয়া গেল। গণেশ, ছট্টুলাল চাকরদের তাঁবুতে প্রস্থান কহিল। রতন কহিল, মা বলেছিলেন, যাবার সময় একটিবার দেখা দিয়ে যেতে।

থমকিয়া দাঁড়াইলাম। চোখের উপর যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, পিয়ারী দীপের সম্মুখে অধীর আগ্রহে সজল-চক্ষে বসিয়া প্রতীক্ষা করিয়া আছে, এবং আমার সমস্ত মনটা উন্মত্ত ঊর্ধ্বশ্বাসে তাহার পানে ছুটিয়া চলিয়াছে।

রতন সবিনয়ে ডাকিল, আসুন।

মুহূর্তকালের জন্য চোখ বুজিয়া নিজের অন্তরের মধ্যে ডুব দিয়া দেখিলাম সেখানে প্রকৃতিস্থ কেহ নাই। সবাই আকণ্ঠ মদ খাইয়া মাতাল হইয়া উঠিয়াছে। ছি ছি! এই মাতালের দল লইয়া যাইব দেখা করিতে? সে আমি কিছুতেই পারি না।

বিলম্ব দেখিয়া রতন বিস্মিত হইয়া কহিল, ওখানে অন্ধকারে দাঁড়ালেন কেন বাবু—আসুন।

আমি তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিলাম, না রতন, এখন নয়—আমি চললুম।

রতন ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, মা কিন্তু পথ চেয়ে বসে আছেন—

পথ চেয়ে? তা হোক। তাঁকে আমার অসংখ্য নমস্কার দিয়ে ব'লো, কাল যাবার আগে দেখা হবে—এখন নয়। আমার বড ঘুম পেয়েছে রতন, আমি চললুম। বলিয়া বিস্মিত ক্ষুব্ধ রতনকে জবাব দিবার সময়মাত্র না দিয়া দ্রুতপদে ওদিকের তাঁবুর দিকে চলিয়া গেলাম।

নয়

মানুষের অন্তর জিনিসটিকে চিনিয়া লইয়া, তাহার বিচারের ভার অন্তর্যামীর উপর না দিয়া মানুষ যখন নিজেই গ্রহণ করিয়া বলে, আমি এমন, আমি তেমন, এ-কাজ আমার দ্বারা কদাচ ঘটিত না, সে-কাজ আমি মরিয়া গেলেও করিতাম না—আমি শুনিয়া আর লজ্জায় বাঁচি না।

আমার শুধু নিজের মনটাই নয়, পরের সম্বন্ধেও দেখি তাহার অহংকারের অন্ত নাই। একবার সমালোচকের লেখাগুলা পড়িয়া দেখ—হাসিয়া আর বাঁচিবে না। কবিকে ছাপাইয়া তাহারা কাব্যের মানুষটিকে চিনিয়া লয়। জোর করিয়া বলে, এ চরিত্র কোনমতেই ওরূপ হইতে পারে না, সে চরিত্র কখনও সেরূপ করিতে পারে না—এমনি কত কথা। লোকে বাহবা দিয়া বলে, বাঃ রে, বাঃ? এই ত ক্রিটিসিজম্! একেই ত বলে চরিত্র-সমালোচনা! সত্যই ত! অমুক সমালোচক বর্তমান থাকিতে ছাই-পাঁশ যা-তা লিখিলেই কি চলিবে? এই দেখ বইখানার যত ভুল ভ্রান্তি সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া ধরিয়া দিয়াছে! তা দিক। ত্রুটি আর কিসে না থাকে! কিন্তু তবুও যে আমি নিজের জীবন আলোচনা করিয়া, এই সব পড়িয়া তাহাদের লজ্জায় আপনার মাথাটা তুলিতে পারি না। মনে মনে বলি, হা রে পোড়া কপাল! মানুষের অন্তর জিনিসটা যে অনন্ত, সে কি শুধু একটা মুখেরই কথা! দম্ভ-প্রকাশের বেলায় কি তাহার কাণাকড়ির মূল্য নাই? তোমার কোটী কোটী জন্মের কত অসংখ্য কোটী অদ্ভুত ব্যাপার যে এই অনন্তে মগ্ন থাকিতে পারে এবং হঠাৎ জাগরিত হইয়া তোমার ভূয়োদর্শন, তোমার লেখাপড়া, তোমার মানুষ বাছাই করিবার জ্ঞানভাণ্ডটুকু একমুহূর্তে গুঁড়া করিয়া দিতে পারে, এ কথাটা কি একটিবারও মনে পড়ে না! এও কি মনে পড়ে না, এটা সীমাহীন আত্মার আসন!

এই ত আমি অন্নদাদিদিকে স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তাঁহার অম্লান দিব্যমূর্তি ত এখনো ভুলিয়া যাই নাই। দিদি যখন চলিয়া গেলেন, তখন কত গভীর স্তব্ধ রাত্রে চোখের জলে বালিশ ভাসিয়া গিয়াছে; আর মনে মনে বলিয়াছি, দিদি, নিজের জন্য আর ভাবি না, তোমার পরশমাণিক-স্পর্শে আমার অন্তর-বাহিরের সব লোহা সোনা হইয়া গিয়াছে, কোথাকার কোন জল-হাওয়ার দৌরাত্মোই আর মরিচা লাগিয়া ক্ষয় পাইবার ভয় নাই। কিন্তু কোথায় তুমি গেলে দিদি! দিদি, আর কাহাকেও এ সৌভাগ্যের ভাগ দিতে পারিলাম না। আর কেহ তোমাকে দেখিতে পাইল না। পাইলে, যে যেখানে আছে, সবাই যে সচ্চরিত্র সাধু হইয়া যাইত, তাহাতে আমার লেশমাত্র সন্দেহ ছিল না। কি উপায়ে ইহা সম্ভব হইতে পারিত, তখন এ লইয়া সারারাত্রি জাগিয়া ছেলেমানুষি কল্পনার বিরাম ছিল না। কখনো ভাবিতাম, দেবী-চৌধুরাণীর মত কোথাও যদি সাতঘড়া মোহর পাই ত

অন্নদাদিদিকে একটা মস্ত সিংহাসনে বসাই ; বন কাটিয়া, জায়গা করিয়া, দেশের লোক ডাকিয়া তাঁহার সিংহাসনের চতুর্দিকে জড় করি। কখনো ভাবিতাম, একটা প্রকাণ্ড বজরায় চাপাইয়া ব্যাণ্ড বাজাইয়া তাঁহাকে দেশ-বিদেশে লইয়া বেড়াই। এমনি কত কি যে উদ্ভট আকাশকুসুমের মালা গাঁথা—সে-সব মনে করিলেও এখন হাসি পায় ; চোখের জলও বড় কম পড়ে না।

তখন মনের মধ্যে এ বিশ্বাস হিমাচলের মত দৃঢ়ও ছিল—আমাকে ভুলাইতে পারে এমন নারী ত ইহলোকে নাই-ই, পরলোকে আছে কি না, তাহাও যেন ভাবিতে পারিতাম না। মনে করিতাম, জীবনে যদি কখনো কাহারো মুখে এম্‌নি মৃদু কথা, ঠোঁটে এম্‌নি মধুর হাসি, ললাটে এম্‌নি অপরূপ আভা, চোখে এম্‌নি সজল করুণ চাহনি দেখি, তবে চাহিয়া দেখিব। যাহাকে মন দিব, সেও যেন এম্‌নি সতী, এম্‌নি সাধ্বী হয়। প্রতি পদক্ষেপে তাহারও যেন এমনি অনির্বচনীয় মহিমা ফুটিয়া উঠে, এমনি করিয়া সে-ও যেন সংসারের সমস্ত সুখ-দুঃখ, সমস্ত ভাল-মন্দ, সমস্ত ধর্মাধর্ম ত্যাগ করিয়াই গ্রহণ করিতে পারে।

সেই ত আমি! তবুও আজ সকালে ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই কাহার মুখের কথা, কাহার ঠোঁটের হাসি, কাহার চোখের জল মনে পড়িয়া বুকের একান্তে একটুখানি ব্যথা বাজিল? আমার সন্ন্যাসিনী দিদির সঙ্গে কোথাও কোন অংশে কি তাহার বিন্দু-পরিমাণও সাদৃশ্য ছিল? অথচ এমনিই বটে। ছয়টা দিন আগে আমার অন্তর্যামী আসিয়াও যদি এ-কথা বলিয়া যাইতেন, আমি হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া বলিতাম, অন্তর্যামি! তোমার এই শুভ কামনার জন্য তোমাকে সহস্র ধন্যবাদ! কিন্তু তুমি তোমার কাজে যাও, আমার জন্য চিন্তা করিবার আবশ্যকতা নাই। আমার বুকের কষ্টিপাথরে পাকা সোনার কষ ধরানো আছে, সেখানে পিতলের দোকান খুলিলে খরিদ্দার জুটিবে না।

কিন্তু তবু ত খরিদ্দার জুটিল। আমার অন্তরের মধ্যে যেখানে অন্নদাদিদির আশীর্বাদে পাকা সোনার ছড়াছড়ি, তার মধ্যেও যে এক দুর্ভাগা পিতলের লোভ সামলাইতে পারিল না, কিনিয়া বসিল—এ কি কম আশ্চর্যের কথা!

আমি বেশ বুঝিতেছি, যাঁরা খুব কড়া সমঝদার, তাঁরা আমার আত্মকথার এইখানে অধীর হইয়া বলিয়া উঠিবেন, বাপু, এত ফেনিয়ে কি বলতে চাও

তুমি? বেশ স্পষ্ট ক'রেই বল না, সেটা কি? আজ ঘুম ভাঙ্গিয়াই পিয়ারীর মুখ মনে করিয়া তোমার ব্যথা বাজিয়াছিল—এই ত? যাহাকে মনের দোড়গোড়া হইতে ঝাঁটাইয়া বিদায় করিতেছিলে, আজ তাহাদেই ডাকিয়া ঘরে বসাইতে চাহিতেছ,—এই ত? তা বেশ। এ যদি সত্য হয়, তবে এর মধ্যে তোমার অন্নদাদিদির নামটা আর তুলিও না। কারণ, তুমি যত কথা যেমন করিয়াই সাজাইয়া বল না কেন, আমরা মানব-চরিত্র বুঝি! জোর করিয়া বলিতে পারি, সে সতী-সাধ্বীর আদর্শ তোমার মনের মধ্যে স্থায়ী হয় নাই, তাঁহাকে তোমার সমস্ত মন দিয়া কস্মিনকালেও গ্রহণ করিতে পার নাই। পারিলে এই ঝুটায় তোমাকে ভুলাইতে পারিত না।

তা বটে। কিন্তু আর তর্ক নয়। আমি টের পাইয়াছি, মানুষ শেষ পর্যন্ত কিছুতেই নিজের সমস্ত পরিচয় পায় না। সে যা নয়, তাই বলিয়া নিজেকে জানিয়ে রাখে এবং বাহিরে প্রচার করিয়া শুধু বিডম্বনার সৃষ্টি করে; এবং যে দণ্ড ইহাতে দিতে হয়, তাহা নিতান্ত লঘুও নয়। কিন্তু থাক, আমি ত নিজে জানি, আমি কোন নারীর আদর্শে এতদিন কি কথা 'প্রিচ' করিয়া বেড়াইয়াছি। সুতরাং আজ আমার এ দুর্গতির ইতিহাসে লোকে যখন বলিবে, শ্রীকান্তটা হম্‌বগ—হিপোক্রিট্, তখন আমাকে চুপ করিয়াই শুনিতে হইবে। অথচ হিপোক্রিট আমি ছিলাম না; হম্‌বগ করা আমার স্বভাব নয়। আমার অপরাধ শুধু এই যে, আমার মধ্যে যে দুর্বলতা আত্মগোপন করিয়া ছিল, তাহার সন্ধান রাখি নাই। আজ যখন সে সময় পাইয়া, মাথাঝাড়া দিয়া উঠিয়া, তাহারই মত আর একটা দুর্বলতাকে সাদরে আহ্বান করিয়া, একেবারে অন্দরের মধ্যে লইয়া বসাইয়া দিয়াছে, তখন অসহ্য বিস্ময়ে আমার চোখ দিয়া জল পড়িয়াছে; কিন্তু 'যাও' বলিয়া তাহাকে বিদায় দিতে পারি নাই। ইহাও জানিয়াছি, আজ আমার লজ্জা রাখিবার আর ঠাঁই নাই; কিন্তু পুলক যে হৃদয়ের কানায়-কানায় আজ ভরিয়া উঠিয়াছে! লোকসান যা হয় তা হোক, হৃদয় যে ইহাকে ত্যাগ করিতে চাহে না।

'বাবু-সাব্।' রাজভৃত্য আসিয়া উপস্থিত হইল। শয্যার উপর সোজা উঠিয়া বসিলাম। সে সসম্মানে নিবেদন করিল, কুমার সাহেব এবং বহুলোক আমার গত-রাত্রির কাহিনী শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতেছে। প্রশ্ন করিলাম, তাঁরা জানিলেন কিরূপে? বেহারা কহিল, তাঁবুর দরোয়ান জানাইয়াছে যে, আমি রাত্রিশেষে ফিরিয়া আসিয়াছি।

হাত-মুখ ধুইয়া, কাপড় ছাড়িয়া, বড়-তাঁবুতে প্রবেশ করিবামাত্রই সকলে হৈ-হৈ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। একসঙ্গে এক লক্ষ প্রশ্ন হইয়া গেল। দেখিলাম, কালকের সেই প্রবীণ ব্যক্তিটিও আছেন এবং একপাশে পিয়ারী তাহার দলবল লইয়া নীরবে বসিয়া আছে। প্রতি-দিনের মত আজ আর তাহার সহিত চোখাচোখি হইল না। সে যেন ইচ্ছা করিয়াই আর একদিকে চোখ ফিরাইয়া বসিয়া ছিল।

উচ্ছ্বসিত প্রশ্নতরঙ্গ শান্ত হইয়া আসিলে জবাব দিতে শুরু করিলাম। কুমারজী কহিলেন, ধন্য সাহস তোমার, শ্রীকান্ত! কত রাত্রে সেখানে পৌঁছুলে?

বারোটা থেকে একটার মধ্যে।

প্রবীণ ব্যক্তিটি কহিলেন, ঘোর অমাবস্যা। সাড়ে এগারোটার পর অমাবস্যা পড়িয়াছিল।

চারিপাশ হইতেই বিস্ময়সূচক ধ্বনি উত্থিত হইয়া ক্রমশঃ প্রশমিত হইলে, কুমারজী পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, তারপর? কি দেখলে?

আমি বলিলাম, বিস্তর হাড়গোড় আর মড়ার মাথা।

কুমারজী বলিলেন, উঃ, কি ভয়ঙ্কর সাহস! শ্মশানের ভেতরে ঢুকলে, না বাইরে দাঁড়িয়েছিলে?

আমি বলিলাম, ভেতরে ঢুকে একলা বালির ঢিবিতে গিয়ে বসলুম।

তারপর, তারপর? বসে কি দেখলে?

ধূ ধূ করছে বালির চর।

আর?

কসাড়-ঝোপ, আর শিমুল গাছ।

আর?

নদীর জল।

কুমারজী অধীর হইয়া কহিলেন, এ সব ত জানি হে! বলি, সে সব কিছু—

আমি হাসিয়া ফেলিলাম। বলিলাম, আর গোটা-দুই বাদুড় মাথার উপর দিয়ে উড়ে যেতে দেখেছিলুম।

প্রবীণ ব্যক্তিটি তখন নিজে অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আউর কুছ নেহি দেখা?

আমি কহিলাম, না।

উত্তর শুনিয়া এক-তাঁবু লোক সকলেই যেন নিরাশ হইয়া পড়িল। প্রবীণ লোকটি তখন হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, এ্যাসা কভি হো নহি সক্তা। আপ্ গয়া নহি।

তাঁহার রাগ দেখিয়া আমি শুধু হাসিলাম। কারণ, রাগ হইবারই কথা। কুমারজী আমার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া মিনতির স্বরে কহিলেন, তোমার দিব্যি শ্রীকান্ত, কি দেখলে, সত্যি বল।

সত্যিই বলচি, কিছু দেখিনি।

কতক্ষণ ছিলে সেখানে?

ঘণ্টা তিনেক।

আচ্ছা, না দেখেচ, কিছু শুনতেও কি পাওনি?

তা পেয়েছি।

এক মুহূর্তেই সকলের মুখ উৎসাহে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। কি শুনিয়াছি, শুনিবার জন্য তাহারা আরও একটু ঘেঁসিয়া আসিল। আমি তখন বলিতে লাগিলাম, কেমন করিয়া পথের উপরেই একটা রাত্রিচর পাখি বাপ্ বলিয়া উড়িয়া গেল; কেমন করিয়া শিশুকণ্ঠে শকুনশিশু শিমুলগাছের উপর গোঁঙাইয়া-গোঁঙাইয়া কাঁদিতে লাগিল, কেমন করিয়া হঠাৎ ঝড় উঠিল এবং মড়ার মাথাগুলা দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে লাগিল এবং সকলের শেষে কে যেন আমার পিছনে দাঁড়াইয়া অবিশ্রাম তুষারশীতল নিঃশ্বাস আমার ডান কানের উপর ফেলিতে লাগিল। আমার বলা শেষ হইয়া গেল, কিন্তু বহুক্ষণ পর্যন্ত কাহারো মুখ দিয়া একটা কথা বাহির হইল না। সমস্ত তাঁবুটা স্তব্ধ হইয়া রহিল। অবশেষে সেই প্রবীণ ব্যক্তিটি একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া আমার কাঁধের উপর একটা হাত রাখিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, বাবুজী, আপনি যথার্থ ব্রাহ্মণসন্তান বলিয়াই কাল প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু আর কেহ হইলে পারিত না। কিন্তু আজ হইতে এই বুড়ার শপথ রহিল বাবুজী, আর কখনও এরূপ দুঃসাহস করিবেন না। আপনার পিতামাতার চরণে আমার কোটী কোটী প্রণাম—এ শুধু তাঁদেরই পুণ্যে আপনি বাঁচিয়াছেন। এই বলিয়া সে ঝোঁকের মাথায় খপ্ করিয়া আমার পায়েতেই হাত দিয়া ফেলিল।

আগে বলিয়াছি, এই লোকটি কথা কহিতে জানে। এইবার সে কথা শুরু করিল। চোখের তারা, ভুরু কখনো সঙ্কুচিত, কখনো প্রসারিত,

কখনো নির্বাপিত, কখনো প্রজ্বালিত করিয়া, সে শকুনির কান্না হইতে আরম্ভ করিয়া কানের উপর নিঃশ্বাস ফেলার এমনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা জুড়িয়া দিল যে, দিনের বেলা এতগুলো লোকের মধ্যে বসিয়াও আমার পর্যন্ত মাথার চুল কাঁটা-দিয়া খাড়া হইয়া উঠিল। কাল সকালের মত আজও কখন যে পিয়ারী নিঃশব্দে ঘেঁষিয়া আসিয়া বসিয়াছিল, তাহা লক্ষ্য করি নাই। হঠাৎ একটা নিঃশ্বাসের শব্দে ঘাড় ফিরাইয়া দেখি, সে আমার ঠিক পিঠের কাছে বসিয়া নির্নিমেষ-চক্ষে বক্তার মুখেব পানে চাহিয়া আছে এবং তাহার নিজের দুটি স্নিগ্ধোজ্জ্বল গণ্ডের উপর ঝরা-অশ্রুর ধারা-দুটি শুকাইয়া ফুটিয়া রহিয়াছে। কখন কি জন্য যে চোখের জল গড়াইয়া-ছিল, এ বোধ করি সে টের পায় নাই; পাইলে মুছিয়া ফেলিত। কিন্তু সেই অশ্রু-কলুষিত তদ্গত মুখখানি পলকের দৃষ্টিপাতেই আমার বুকের মধ্যে আগুনের রেখায় আঁকিয়া গেল। গল্প শেষ হইলে সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কুমারজীকে একটা সেলাম করিয়া, অনুমতি লইয়া নিঃশব্দে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

আজ সকালেই আমার বিদায় লইবার কথা ছিল। কিন্তু শরীরটা ভাল ছিল না বলিয়া, কুমারজীর অনুরোধ স্বীকার করিয়া ও-বেলায় যাওয়াই স্থির করিয়া নিজেদের তাঁবুতে ফিরিয়া আসিলাম। এতদিনের মধ্যে আজ এই প্রথম পিয়ারীর আচরণে ভাবান্তর লক্ষ্য করিলাম। এতদিন সে পরিহাস করিয়াছে, বিদ্রূপ করিয়াছে, কলহের আভাস পর্যন্ত তাহার দুই চোখের দৃষ্টিতে কতদিন ঘনাইয়া উঠিয়াছে, অনুভব করিয়াছি; কিন্তু এরূপ ঔদাসীন্য কখনও দেখি নাই। অথচ ব্যথার পরিবর্তে খুশিই হইলাম! কেন তাহা জানি! যদিচ, যুবতী নারীর মনের গতিবিধি লইয়া মাথা-ঘামানো আমার পেশা নহে, ইতিপূর্বে এ কাজ কোনদিন করিও নাই—কিন্তু আমার মনের মধ্যে বহু জনমনের যে অখণ্ড ধারাবাহিকতা লুকাইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার বহুদর্শনের অভিজ্ঞতায় রমণী-হৃদয়ের নিগূঢ় তাৎপর্য ধরা পড়িয়া গেল। সে ইহাকে তাচ্ছিল্য মনে করিয়া ক্ষুণ্ণ হইল না, বরং প্রণয়-অভিমান জানিয়া পুলকিত হল। বোধ করি, ইহারই গোপন ইশারায় আমার শ্মশান-অভিযানের এতখানি ইতিহাসের মধ্যে শুধু এই কথাটার উল্লেখ পর্যন্ত করিলাম না যে, পিয়ারী কাল রাত্রে আমাকে ফিরাইয়া আনিতে শ্মশানে লোক পাঠাইয়াছিল, এবং সে নিজেও

গল্প-শেষে তেমনি নীরবেই বাহির হইয়া গিয়াছিল। তাই অভিমান! কাল রাত্রে ফিরিয়া আসিয়া দেখা করিয়া বলি নাই, কি ঘটিয়াছিল। যে-কথা সকলের আগে একলা বসিয়া তাহার শুনিবার অধিকার ছিল, তাহাই আজ সে সকলের পিছনে বসিয়া যেন দৈবাৎ শুনি‌তে পাইয়াছে। কিন্তু, অভিমান যে এত মধুর, জীবনে এই স্বাদ আজ প্রথম উপলব্ধি করিয়া শিশুর মত তাহাকে নির্জনে বসিয়া অবিরাম রাখিয়া-চাখিয়া উপভোগ করিতে লাগিলাম।

আজ দুপুরবেলাটা আমার ঘুমাইয়া পড়িবারই কথা; বিছানায় পড়িয়া মাঝে-মাঝে তন্দ্রাও আসিতে লাগিল; কিন্তু রতনের আসার আশাটা ক্রমাগত নাড়া দিয়া-দিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া দিতে লাগিল। এমনি করিয়া বেলা গড়াইয়া গেল, কিন্তু রতন আসিল না। সে যে আসিবেই, এ বিশ্বাস আমার মনে এত দৃঢ় ছিল যে, বিছানা ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া যখন দেখিলাম সূর্য অনেকখানি পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছে, তখন নিশ্চয় মনে হইল, আমার কোন্ এক তন্দ্রার ফাঁকে রতন ঘরে ঢুকিয়া আমাকে নিদ্রিত মনে করিয়া ফিরিয়া গেছে। মূর্খ! একবার ডাকিতে কি হইয়াছিল! দ্বিপ্রহরের নির্জন অবসর নিরর্থক বহিয়া গেল মনে করিয়া ক্ষুব্ধ হয়ইা উঠিলাম; কিন্তু সন্ধ্যার পরে সে যে আবার আসিবে—একটা কিছু অনুরোধ—না হয় একছত্র লেখা—যা হোক একটা, গোপনে হাতে দিয়া যাইবে, তাহাতে সংশয়মাত্র নাই। কিন্তু এই সময়টুকু কাটাই কি করিয়া? সুমুখে চাহিতেই খানিকটা দূরে অনেকখানি জল একসঙ্গে চোখের উপর ঝকঝক করিয়া উঠিল। সে কোন একটা বিস্মৃত জমিদারের মস্ত কীর্তি। দীঘিটা প্রায় আধ ক্রোশ দীর্ঘ। উত্তর দিকটা মজিয়া বুজিয়া গিয়াছে এবং তাহা ঘন জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন। গ্রামের বাহিরে বলিয়া গ্রামের মেয়েরা ইহার জল ব্যবহার করিতে পারিত না। কথায় কথায় শুনিয়াছিলাম, এই দীঘিটি যে কতদিনের এবং কে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল, তাহা কেহ জানে না। একটা পুরানো ভাঙ্গা ঘাট ছিল, তাহারই একান্তে গিয়া বসিয়া পড়িলাম। এক সময়ে ইহারই চতুর্দিক ঘিরিয়া বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল; কবে নাকি ওলাউঠায় মহামারীতে উজাড় হইয়া গিয়া বর্তমান স্থানে সরিয়া গিয়াছে। পরিত্যক্ত গৃহের বহু চিহ্ন চারিদিকে বিদ্যমান। অস্তগামী সূর্যের তির্যক রশ্মিছটা ধীরে ধীরে নামিয়া আসিয়া দীঘির কালো জলে সোনা মাখাইয়া দিল, আমি চাহিয়া বসিয়া রহিলাম।

তারপরে ক্রমশঃ সূর্য ডুবিয়া দীঘির কালো জল আরো কালো হইয়া উঠিল; অদূরে বন হইতে বাহির হইয়া দুই-একটা পিপাসার্ত শৃগাল ভয়ে ভয়ে জলপান করিয়া সরিয়া গেল। আমার যে উঠিবার সময় হইয়াছে, যে সময়টুকু কাটাইতে আসিয়াছিলাম তাহা কাটিয়া গিয়াছে—সমস্ত অনুভব করিয়াও উঠিতে পারিলাম না—এই ভাঙ্গা ঘাট যেন আমাকে জোর করিয়া বসাইয়া রাখিল।

মনে হইল, এই যেখানে পা রাখিয়া বসিয়াছি, সেইখানে পা দিয়া কত লোক কতবার আসিয়াছে, গিয়াছে। এই ঘাটেই তাহারা স্নান করিত, গা ধুইত, কাপড় কাচিত, জল তুলিত। এখন তাহারা কোথাকার কোন্ জলাশয়ে এই সমস্ত নিত্যকর্ম সমাধা করে? এই গ্রাম যখন জীবিত ছিল, তখন নিশ্চয়ই তাহারা এম্‌নি সময়ে এখানে আসিয়া বসিত; কত গান, কত গল্প করিয়া সারাদিনের শ্রান্তি দূর করিত। তারপরে অকস্মাৎ একদিন যখন মহাকাল মহামারীরূপে দেখা দিয়া সমস্ত গ্রাম ছিঁড়িয়া লইয়া গেলেন, তখন কত মুমূর্ষু হয়ত তৃষ্ণায় ছুটিয়া আসিয়া এই ঘাটের উপরই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাঁহার সঙ্গে গিয়াছে। হয় ত তাহাদের তৃষ্ণার্ত আত্মা আজিও এইখানে ঘুরিয়া বেড়ায়। যাহা চোখে দেখি না, তাহাই যে নাই, এমন কথাই বা জোর করিয়া বলিবে? আজ সকালেই সেই প্রবীণ ব্যক্তিটি বলিয়াছিলেন, বাবুজী, মৃত্যুর পরে যে কিছুই থাকে না, অসহায় প্রেতাত্মারা যে আমাদের মতই সুখ-দুঃখ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিয়ে বিচরণ করে না, তাহা কদাচ মনে করিয়ো না। এই বলিয়া তিনি রাজা বিক্রমাদিত্যের গল্প, তাল-বেতাল সিদ্ধির গল্প, আর কত তান্ত্রিক সাধু-সন্ন্যাসীর কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। আরও বলিয়াছিলেন যে, সময় এবং সুযোগ হইলে তাহারা যে দেখা দিতে, কথা কহিতে পারে না বা করে না, তাহাও ভাবিয়ো না; তোমাকে আর কখনো সে স্থানে যাইতে বলি না; কিন্তু, যাহারা এ-কাজ পারে, তাহাদের সমস্ত দুঃখ যে কোনদিন সার্থক হয় না, এ-কথা স্বপ্নেও অবিশ্বাস করিয়ো না!

তখন সকালবেলার আলোর মধ্যে যে কথাগুলো শুধু নিরর্থক হাসির উপাদান আনিয়া দিয়াছিল, এখন সেই কথাগুলাই এই নির্জন গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে আর এক প্রকার চেহারা লইয়া দেখা দিল। মনে হইতে লাগিল, জগতে প্রত্যক্ষ সত্য যদি কিছু থাকে ত সে মরণ। এই জীবনব্যাপী ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখের অবস্থাগুলা যেন আতসবাজীর বিচিত্র সাজ-সরঞ্জামের মত শুধু একটা

কোন্ বিশেষ দিনে পুড়িয়া ছাই হইবার জন্যই এত যত্নে এত কৌশলে গড়িয়া উঠিতেছে। তবে মৃত্যুর পরপারের ইতিহাসটা যদি কোন উপায়ে শুনিয়া লইতে পারা যায়, তার চেয়ে লাভ আব আছে কি? তা সে যেই বলুক এবং যেমন করিয়াই বলুক না।

হঠাৎ কাহার পায়ের শব্দে ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল। ফিরিয়া দেখিলাম, শুধু অন্ধকার—কেহ কোথাও নাই। একটা গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। গত রাত্রির কথা স্মরণ করিয়া নিজের মনে হাসিয়া বলিলাম, না বসে থাকা নয়। কাল ডান কানের উপর দিয়ে নিঃশ্বাস ফেলে গেছে, আজ এসে যদি বাঁ কানের উপর শুরু করে দেয় ত সে বড় সোজা হবে না।

কতক্ষণ যে বসিয়া কাটাইয়াছি, এখন রাত্রি কত ঠিক ঠাহর করিতে পরিলাম না। বোধ হয় যেন দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি। কিন্তু এ কি? চলিয়াছি ত চলিয়াছি—এই সঙ্কীর্ণ পায়ে-চলা পথ আর শেষ হয় না! এতগুলা তাঁবুর একটা আলোও যে চোখে পড়ে না! অনেকক্ষণ হইতেই সম্মুখে একটা বাঁশঝাড দৃষ্টিরোধ করিয়া বিরাজ করিতেছিল, হঠাৎ মনে হইল, কৈ এটা ত আসিবার সময় লক্ষ্য করি নাই। দিক্ ভুল করিয়া ত আর একদিকে চলি নাই? আরো খানিকটা অগ্রসর হইতেই টের পাইলাম, সেটা বাঁশঝাড নয়, গোটাকয়েক তেঁতুলগাছ জডাজডি করিয়া, দিগন্ত আবৃত করিয়া, অন্ধকার জমাট বাঁধাইয়া দাঁডাইয়া আছে; তাহারই নীচে দিয়া পথটা আঁকিয়া-বাঁকিয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। জায়গাটা এমনি অন্ধকার যে নিজের হাতটা পর্যন্ত দেখা যায় না। বুকের ভিতরটা কেমন যেন গুরগুর্ করিয়া উঠিল—এ যাইতেছি কোথায়? চোখ-কান বুজিয়া কোনমতে সেই তেঁতুলতলাটা পার হইয়া দেখি, সম্মুখে অনন্ত কালো আকাশ যতদূর দেখা যায়, ততদূর বিস্তৃত হইয়া আছে। কিন্তু সুমুখে ওই উঁচু জায়গাটা কি? নদীর ধারে সরকারী বাঁধ নয় ত? বাঁধই ত বটে!

পা-দুটা যেন ভাঙ্গিয়া আসিতে লাগিল; তবুও টানিয়া-টানিয়া কোনমতে তাহার উপর উঠিয়া দাঁডাইলাম। যা ভাবিয়াছিলাম, ঠিক তাই! ঠিক নীচেই সেই মহাশ্মশান! আবার কাহার পদশব্দ সুমুখ দিয়াই নীচে শ্মশানে গিয়া মিলাইয়া গেল! এইবার টলিয়া-টলিয়া সেই ধূলা-বালুর উপরেই মূর্ছিতের মত ধপ্ করিয়া বসিয়া পডিলাম। আর আমার লেশমাত্র সংশয় রহিল না যে, কে আমাকে এক মহাশ্মশান হইতে আর এক মহাশ্মশানে পথ দেখাইয়া

পৌঁছাইয়া দিয়া গেল। সেই যাহার পদশব্দ শুনিয়া ভাঙ্গা ঘাটের উপর গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম, তাহার পদশব্দ এতক্ষণ পরে ওই সম্মুখে মিলাইল।

দশ

সমস্ত ঘটনারই হেতু দেখাইবার জিদ্‌টা মানুষের যে বয়সে থাকে, সে বয়স আমার পার হয়ে গেছে। সুতরাং কেমন করিয়াই যে এই সূচিভেদ্য অন্ধকার নিশীথে একাকী পথ চিনিয়া দীঘির ভাঙ্গাঘাট হইতে এই শ্মশানের উপকণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, এবং কাহারই বা সেই পদধ্বনি সেখানে আহ্বান-ইঙ্গিত করিয়া এই মাত্র সুমুখে মিলাইয়া গেল, এ-সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিবার মত বুদ্ধি আমার নাই—পাঠকের কাছে আমার দৈন্য স্বীকার করিতে এখন আর আমি কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করিতেছি না। এ রহস্য আজও আমার কাছে তেমনি আঁধারে আবৃত রহিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া প্রেতযোনি স্বীকার করাও এ স্বীকারোক্তির প্রচ্ছন্ন তাৎপর্য নয়। কারণ নিজের চোখেই ত দেখিয়াছি—আমাদের গ্রামেই একটা বৃদ্ধ পাগল ছিল, সে দিনের বেলা বাড়ি বাড়ি ভাত চাহিয়া খাইত, আর রাত্রিতে একটা ছোট মইয়ের উপর কোঁচার কাপড়টা তুলিয়া দিয়া, সেটা সুমুখে উঁচু করিয়া ধরিয়া পথের ধারের বাগানের মধ্যে গাছের ছায়ায় ঘুরিয়া বেড়াইত। সে চেহারা দেখিয়া অন্ধকারে কত লোকের যে দাঁতকপাটি লাগিয়াছে, তাহার অবধি নাই। কোন স্বার্থ নাই, অথচ এই ছিল তাহার অন্ধকার রাত্রির কাণ্ড। নিরর্থক মানুষকে ভয় দেখাইবার আরও কত প্রকারের অদ্ভুত ফন্দি যে তাহার ছিল, তাহার সীমা নাই। শুকনো কাঠের আঁটি গাছের ডালে বাঁধিয়া তাহাতে আগুন দিত; মুখে কালিঝুলি মাখিয়া বিশালাক্ষী দেবীর মন্দিরে বহু-ক্লেশে খড়া বাহিয়া উঠিয়া বসিয়া থাকিত; গভীর রাত্রিতে ঘরের কানাচে বসিয়া খোনা-গলায় চাষাদের নাম ধরিয়া ডাকিত। অথচ, কেহ কোন দিন তাহাকে ধরিতে পারে নাই, এবং দিনের বেলায় তাহার চাল-চলন স্বভাব-চরিত্র দেখিয়া ঘুণাক্ষরেও তাহাকে সংশয় করিবার কথা কাহারও মনে উদয় হয় নাই। আর এ শুধু আমাদের গ্রামের নয়,—আট-দশখানা গ্রামের মধ্যেই সে এই কর্ম করিয়া বেড়াইত। মরিবার সময় নিজের বজ্জাতি সে নিজে স্বীকার করিয়া

যায় এবং ভূতের দৌরাত্ম্যও তখন হইতে শেষ হয়। এ ক্ষেত্রেও হয়ত তেমনি কিছু ছিল,—হয়ত ছিল না। কিন্তু যাক্ গে।

বলিতেছিলাম যে সেই ধূলোবালি-ভরা বাঁধের উপর যখন হতজ্ঞানের মত বসিয়া পড়িলাম, তখন শুধু দু'টি লঘু পদধ্বনি শ্মশানের অভ্যন্তরে গিয়া ধীরে ধীরে মিলাইল। মনে হইল, সে যেন স্পষ্ট করিয়া জানাইল—ছি ছি, ও তুই কি করিলি? তোকে এতটা পথ যে পথ দেখাইয়া আনিলাম, সে কি ওইখানে বসিয়া পড়িবার জন্য? আয় আয়! একেবারে আমাদের ভিতরে চলিয়া আয়! এমন অশুচি অস্পৃশ্যের মত প্রাঙ্গণের একপ্রান্তে বসিস্ না—আমাদের সকলের মাঝখানে আসিয়া বোস্! কথাগুলা কানে শুনিয়াছিলাম, কিংবা হৃদয় হইতে অনুভব করিয়াছিলাম—এ কথা আজ আর স্মরণ করিতে পারি না। কিন্তু, তবুও যে চেতনা রহিল, তাহার কারণ চৈতন্যকে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলে, সে এমনি একরকম করিয়া বজায় থাকে, একেবারে যায় না, এ আমি বেশ দেখিয়াছি। তাই দু-চোখ মেলিয়া চাহিয়া রহিলাম বটে, কিন্তু সে যেন এক তন্দ্রার চাহনি। সে ঘুমানোও নয়, জাগাও নয়! তাহাতে নিদ্রিতের বিশ্রামও থাকে না, সজাগের উদ্যমও আসে না। ঐ এক রকম।

তথাপি এ কথাটা ভুলি নাই যে, অনেক রাত্রি হইয়াছে—আমাকে তাঁবুতে ফিরিতে হইবে; এবং সেজন্য একবার অন্ততঃ চেষ্টা করিতাম, কিন্তু মনে হইল সব বৃথা। এখানে আমি ইচ্ছা করিয়া আসি নাই—আসিবার কল্পনাও করি নাই। সুতরাং যে আমাকে এই দুর্গম পথে পথ দেখাইয়া আনিয়াছে, তাহার বিশেষ কোন কাজ আছে। সে আমাকে শুধু শুধু ফিরিতে দিবে না। পূর্বে শুনিয়াছিলাম, নিজের ইচ্ছায় ইহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। যে পথে যেমন করিয়াই জোর করিয়া বাহির হও না কেন, সব পথই গোলক-ধাঁধার মত ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া সাবেক জায়গায় আনিয়া হাজির করে।

সুতরাং চঞ্চল হইয়া ছটফট করা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক মনে করিয়া কোনপ্রকার গতির চেষ্টামাত্র না করিয়া, যখন স্থির হইয়া বসিলাম, তখন অকস্মাৎ যে জিনিসটি চোখে পড়িয়া গেল তাহার কথা আমি কোনদিন বিস্মৃত হই নাই।

রাত্রির যে একটা রূপ আছে, তাহাকে পৃথিবীর গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত, জল-মাটি, বন-জঙ্গল প্রভৃতি যাবতীয় দৃশ্যমান বস্তু হইতে পৃথক করিয়া একান্ত করিয়া দেখা যায়, ইহা যেন আজ এই প্রথম চোখে পড়িল। চাহিয়া দেখি,

অন্তহীন কালো আকাশ-তলে পৃথিবী-জোড়া আসন করিয়া গভীর রাত্রি নিমীলিত-চক্ষে ধ্যানে বসিয়াছে, আর সমস্ত বিশ্বচরাচর মুখ বুজিয়া, নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া, অত্যন্ত সাবধানে স্তব্ধ হইয়া সেই অটল শান্তি রক্ষা করিতেছে। হঠাৎ চোখের উপরে যেন সৌন্দর্যের তরঙ্গ খেলিয়া গেল। মনে হইল, কোন মিথ্যাবাদী প্রচার করিয়াছে—আলোরই রূপ, আঁধারের রূপ নাই। এতবড ফাঁকি মানুষে কেমন করিয়া নীরবে মানিয়া লইয়াছে! এই যে আকাশ-বাতাস, স্বর্গ-মর্ত্য পরিব্যাপ্ত করিয়া দৃষ্টির অন্তরে-বাহিরে আঁধারের প্লাবন বহিয়া যাইতেছে, মরি! মরি! এমন অপরূপ রূপের প্রস্রবণ আর কবে দেখিয়াছি। এ ব্রহ্মাণ্ডে যাহা যত গভীর, যত অচিন্ত্য, যত সীমাহীন—তাহা ত ততই অন্ধকার। অবাধ বারিধি মসীকৃষ্ণ; অগম্য গহন অরণ্যানী ভীষণ আঁধার; সর্বলোকাশ্রয়, আলোর আলো, গতির গতি, জীবনের জীবন, সকল সৌন্দর্যের প্রাণপুরুষও মানুষের চোখে নিবিড আঁধার। কিন্তু সে কি রূপের অভাবে? যাহাকে বুঝি না, জানি না—যাহার অন্তরে প্রবেশের পথ দেখি না—তাহাই তত অন্ধকার! মৃত্যু তাই মানুষের চোখে এত কালো, তাই তার পরলোকের পথ এমন দুস্তর আঁধারে মগ্ন। তাই রাধার দু-চক্ষু ভরিয়া যে-রূপ প্রেমের বন্যায় জগৎ ভাসাইয়া দিল, তাহাও ঘনশ্যাম। কখনও এ-সকল কথা ভাবি নাই, কোন দিন এ-পথে চলি নাই; তবুও কেমন করিয়া জানি না, এই ভয়াকীর্ণ মহাশ্মশান-প্রান্তে বসিয়া, নিজের এই নিরুপায় নিঃসঙ্গ একাকিত্বকে অতিক্রম করিয়া আজ হৃদয় ভরিয়া একটা অকারণ রূপের আনন্দ খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল, এবং অত্যন্তইঅকস্মাৎ মনে হইল, কালোর যে এত রূপ ছিল, সে ত কোন দিন জানি নাই! তবে হয়ত মৃত্যুও কালো বলিয়া কুৎসিত নয়; একদিন যখন সে আমাকে দেখা দিতে আসিবে, তখন হয়ত তার এমনি অফুরন্ত, সুন্দর রূপে আমার দু-চক্ষু জুড়াইয়া যাইবে! আর সে দেখার দিন যদি আজই আসিয়া থাকে, তবে, হে আমার কালো! হে আমার অভ্যগ্র পদধ্বনি! হে আমার সর্বদুঃখ-ভয়-ব্যথাহারী অনন্ত সুন্দর! তুমি তোমার অনাদি আঁধারে সর্বাঙ্গ ভরিয়া আমার এই দুটি চোখের দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ হও, আমি তোমার এই অন্ধতমসাবৃত নির্জন মৃত্যুমন্দিরের দ্বারে তোমাকে নির্ভয়ে বরণ করিয়া মহানন্দে তোমার অনুসরণ করি। সহসা মনে হইল, তাই ত! তাঁহার ওই নির্বাক আহ্বান উপেক্ষা করিয়া হীন অন্তেবাসীর মত এই বাহিরে বসিয়া আছি কি জন্যে? একেবারে ভিতরে মাঝখানে গিয়া বসি না কেন?

নামিয়া গিয়া ঠিক মধ্যস্থলে একেবারে চাপিয়া বসিয়া পড়িলাম। কতক্ষণ যে এখানে এইভাবে স্থির হইয়া ছিলাম, তখন হুঁশ ছিল না। হুঁশ হইলে দেখিলাম, তেমন অন্ধকার আর নাই—আকাশের একপ্রান্ত যেন স্বচ্ছ হইয়া গিয়াছে এবং তাহারই অদূরে শুকতারা দপ দপ করিয়া জ্বলিতেছে। একটা চাপা কথাবার্তার কোলাহল কানে গেল। ঠাহর করিয়া দেখিলাম, দূরে শিমূল-গাছের আড়ালে বাঁধের উপর দিয়া কাহারা যেন চলিয়া আসিতেছে এবং তাহাদের দুই-চারিটা লণ্ঠনের আলোকও আশেপাশে ইতস্ততঃ দুলিতেছে। পুনর্বার বাঁধের উপর উঠিয়া সেই আলোকেই দেখিলাম, দুইখানা গরুর গাড়ির অগ্রপশ্চাৎ জনকয়েক লোক এই দিকেই অগ্রসর হইতেছে। বুঝিলাম কাহারা এই পথে স্টেশনে যাইতেছে।

মাথায় সুবুদ্ধি আসিল যে, পথ ছাড়িয়া আমার দূরে সরিয়া যাওয়া আবশ্যক। কারণ, আগন্তুকের দল যত বুদ্ধিমান এবং সাহসীই হোক, হঠাৎ এই অন্ধকার রাত্রিতে এরূপ স্থানে আমাকে একাকী ভূতের মত দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলে, আর কিছু না করুক, একটা বিষম হৈ হৈ রৈ রৈ চীৎকার তুলিয়া দিবে, তাহাতে আর সংশয় নাই।

ফিরিয়া আসিয়া পূর্বস্থানে দাঁড়াইলাম; এবং অনতিকাল পরেই ছই-দেওয়া দুইখানি গো-শকট পাঁচ-ছয়জনের প্রহরায় সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। একবার মনে হইল, ইহাদের অগ্রগামী লোক-দুটা আমার দিকে চাহিয়াই ক্ষণকালের জন্য স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া অতি মৃদুকণ্ঠে কি যেন বলাবলি করিয়াই পুনরায় অগ্রসর হইয়া গেল; এবং অনতিকাল মধ্যেই সমস্ত দলবল বাঁধের ধারে একটা ঝাঁকড়া-গাছের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল। রাত্রি আর বেশি বাকি নাই অনুভব করিয়া ফিরিবার উপক্রম করিতেছি, এমনি সময়ে সেই বৃক্ষান্তরাল হইতে সু-উচ্চ কণ্ঠের ডাক কানে গেল, শ্রীকান্তবাবু—

সাড়া দিলাম, কে রে, রতন?

আজ্ঞে, হাঁ বাবু, আমি। একটু এগিয়ে আসুন।

দ্রুতপদে বাঁধের উপর উঠিয়া ডাকিলাম, রতন, তোরা কী বাড়ি যাচ্ছিস?

রতন উত্তর দিল, হাঁ বাবু, বাড়ি যাচ্ছি—মা গাড়িতে আছেন।

অদূরে উপস্থিত হইতেই, পিয়ারী পর্দার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া কহিল, এ যে তুমি ছাড়া আর কেউ নয়, তা আমি দরোয়ানের কথা শুনেই বুঝতে পেরেচি। গাড়িতে উঠে এসো, কথা আছে।

আমি সন্নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কি কথা ?

উঠে এসো, বলচি।

না, তা পারব না, সময় নেই। ভোরের আগেই আমাকে তাঁবুতে পৌঁছুতে হবে।

পিয়ারী হাত বাড়াইয়া খপ্ করিয়া আমার ডান হাতটা চাপিয়া ধরিয়া তীব্র জিদের স্বরে বলিল, চাকর-বাকরের সামনে আর ঢলাঢলি ক'রো না—তোমার পায়ে পড়ি, একবার উঠে এসো—

তাহার অস্বাভাবিক উত্তেজনায় কতকটা যেন হতবুদ্ধি হইয়াই গাড়িতে উঠিয়া বসিলাম। পিয়ারী গাড়ি হাঁকাইতে আদেশ দিয়া কহিল, আজ আবার এখানে তুমি কেন এলে ?

আমি সত্য কথাই বলিলাম। কহিলাম, জানি না।

পিয়ারী এখনও আমার হাত ছাড়ে নাই। বলিল, জান না ? আচ্ছা বেশ। কিন্তু লুকিয়ে এসেছিলে কেন ?

বলিলাম, এখানে আমার কথা কেউ জানে না বটে, কিন্তু লুকিয়ে আসিনি।

মিথ্যে কথা।

না।

তার মানে ?

মানে যদি খুলে বলি, বিশ্বাস করবে ? আমি লুকিয়েও আসিনি, আসবার ইচ্ছেও ছিল না।

পিয়ারী বিদ্রূপের স্বরে কহিল, তা হ'লে তাঁবু থেকে তোমাকে উড়িয়ে এনেচে—বোধ করি বলতে চাও ?

না, তা বলতে চাইনে। উড়িয়ে কেউ আনেনি ; নিজের পায়ে হেঁটে এসেছি সত্যি। কিন্তু কেন এলুম, কখন এলুম, বলতে পারিনে।

পিয়ারী চুপ করিয়া রহিল। আমি বলিলাম, রাজলক্ষ্মী, তুমি বিশ্বাস করতে পারবে কি না জানিনে, কিন্তু বাস্তবিক ব্যাপারটা একটু আশ্চর্য। এই বলিয়া আমি সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক বিবৃত করিলাম।

শুনিতে শুনিতে আমার হাত-ধরা তাহার হাতখানা বারংবার শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু সে একটা কথাও কহিল না। পর্দা তোলা ছিল, পিছনে চাহিয়া দেখিলাম, আকাশ ফর্সা হইয়া গিয়াছে। বলিলাম, এইবার আমি যাই।

পিয়ারী স্বপ্নাবিষ্টের মত কহিল, না।

না কি রকম? এমনভাবে চ'লে যাবার অর্থ কি হবে জান?

জানি—সব জানি। কিন্তু এরা তো তোমার অভিভাবক নয় যে মানের দায়ে প্রাণ দিতে হবে? বলিয়াই সে আমার হাত ছাড়িয়া দিয়া পা ধরিয়া ফেলিয়া রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল, কান্তদা, কিন্তু সেখানে ফিরে গেলে আর তুমি বাঁচবে না। তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে না, কিন্তু সেখানেও আর ফিরে যেতে দেব না। তোমার টিকিট কিনে দিচ্ছি, তুমি বাড়ি চলে যাও—কিংবা যেখানে খুশি যাও, কিন্তু ওখানে আর এক দণ্ডও না।

আমি বলিলাম আমার কাপড়-চোপড় রয়েছে যে!

পিয়ারী কহিল, থাক প'ড়ে। তাদের ইচ্ছে হয় তোমাকে পাঠিয়ে দেবে; না হয় থাকগে। তার দাম বেশি নয়।

আমি বলিলাম, তার দাম বেশি নয় সত্য, কিন্তু যে মিথ্যা কুৎসার রটনা হবে, তার দাম ত কম নয়!

পিয়ারী আমার পা ছাড়িয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। গাড়ি এই সময় মোড় ফিরিতেই পিছনটা আমার সম্মুখে আসিয়া পড়িল। হঠাৎ মনে হইল, সম্মুখের ওই পূর্ব-আকাশটার সঙ্গে এই পতিতার মুখের কি যেন একটা নিগূঢ় সাদৃশ্য রহিয়াছে। উভয়ের মধ্য দিয়াই যেন একটা বিরাট অগ্নিপিণ্ড অন্ধকার ভেদ করিয়া আসিতেছে,—তাহারই আভাস দেখা দিয়াছে। কহিলাম, চুপ করে রইলে যে?

পিয়ারী একটুখানি ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, কি জান কান্তদা, যে কলম দিয়ে সারাজীবন জাল খত তৈরী করেচি, সেই কলমটা দিয়েই আজ আর দানপত্র লিখতে হাত সরচে না। যাবে? আচ্ছা যাও! কিন্তু কথা দাও—আজ বেলা বারোটার আগেই বেরিয়ে পড়বে?

আচ্ছা।

কারো কোন অনুরোধেই আজ রাত্রি ওখানে কাটাবে না, বল?

না।

পিয়ারী হাতের আঙটি খুলিয়া আমার পায়ের উপর রাখিয়া গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিল এবং পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া আঙটিটা আমার পকেটে ফেলিয়া দিল। বলিল, তবে যাও—বোধ করি, ক্রোশ-দেড়েক পথ তোমাকে বেশী হাঁটতে হবে।

গো-যান হইতে অবতরণ করিলাম। তখন প্রভাত হইয়াছিল। পিয়ারী অনুনয় করিয়া কহিল, আমার আর একটি কথা তোমাকে রাখতে হবে। বাড়ি ফিরে গিয়ে একখানি চিঠি দেবে।

আমি স্বীকার করিয়া প্রস্থান করিলাম। একটিবারও পিছনে চাহিয়া দেখিলাম না, তখনও তাঁহারা দাঁড়াইয়া আছে, কিংবা অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু বহুদূর পর্যন্ত অনুভব করিতে পারিলাম, দু'টি চক্ষের সজল-করুণদৃষ্টি আমার পিঠের উপর বারংবার আছাড় খাইয়া পড়িতেছে।

আড্ডায় পৌঁছাইতে প্রায় আটটা বাজিয়া গেল। পথের ধারে পিয়ারীর ভাঙ্গা-তাঁবুর বিক্ষিপ্ত পরিত্যক্ত জিনিসগুলি চোখে পড়িবামাত্রই একটা নিষ্ফল ক্ষোভ বুকের মধ্যে যেন হাহাকার করিয়া উঠিল। মুখ ফিরাইয়া দ্রুতপদে তাঁবুর মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিলাম।

পুরুষোত্তম জিজ্ঞাসা করিল, আপনি বড় ভোরেই বেড়াতে বার হয়েছিলেন?

আমি হাঁ-না কোন কথাই না বলিয়া শয্যায় চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িলাম।

এগারো

পিয়ারীর কাছে সে সত্য করিয়াছিলাম, তাহা যে রক্ষাও করিয়াছিলাম, বাটী ফিরিয়া এই সংবাদ জানাইয়া তাহাকে চিঠি দিলাম। অবিলম্বে জবাব আসিল। আমি একটা বিষয় বরাবর লক্ষ্য করিয়াছিলাম—কোন দিন পিয়ারী আমাকে তাহার পাটনার বাটীতে যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করেই নাই, সামান্য একটা মুখের নিমন্ত্রণ পর্যন্ত জানায় নাই। এই পত্রের মধ্যেও তাহার লেশমাত্র ইঙ্গিত ছিল না। শুধু নীচের দিকে একটা 'নিবেদন' ছিল যাহা আমি আজিও ভুলি নাই। সুখের দিনে না হোক, দুঃখের দিনে তাঁহাকে বিস্মৃত না হই—এই প্রার্থনা।

দিন কাটিতে লাগিল। পিয়ারীর স্মৃতি ঝাপ্সা হইয়া প্রায় বিলীন হইয়া গেল। কিন্তু এই একটা আশ্চর্য ব্যাপার মাঝে মাঝে আমার চোখে পড়িতে লাগিল—এবার শিকার হইতে ফিরিয়া পর্যন্ত আমার মন যেন কেমন বিমনা হইয়া গেছে; কেমন যেন একটা অভাবের বেদনা চাপা সর্দির মত দেহের

রন্ধ্রে-রন্ধ্রে পরিব্যাপ্ত হইয়া গেছে। বিছানায় শুইতে গেলেই তাহা খচখচ করিয়া বাজে।

এটা মনে পড়ে, সে দিনটা হোলির রাত্রি। মাথা হইতে তখনও আবিরের গুঁড়া সাবান দিয়া ঘষিয়া তুলিয়া ফেলা হয় নাই। শ্রান্ত বিবশ দেহে শয্যার উপর পড়িয়াছিলাম। পাশের জানালাটা খোলা ছিল; তাই দিয়া সুমুখের অশ্বত্থ গাছের ফাঁক দিয়া আকাশ-ভরা জ্যোৎস্নার দিকে চাহিয়াছিলাম। এতটাই মনে পড়ে। কিন্তু কেন যে দোর খুলিয়া সোজা স্টেশনে চলিয়া গেলাম এবং পাটনার টিকিট কাটিয়া ট্রেনে চড়িয়া বসিলাম, তাহা মনে পড়ে না। রাত্রিটা গেল। কিন্তু দিনের বেলা যখন শুনিলাম, সেটা 'বাড়' স্টেশন এবং পাটনার আর দেরি নাই—তখন হঠাৎ সেইখানেই নামিয়া পড়িলাম। পকেটে হাত দিয়া দেখি উদ্বেগের কিছুমাত্র হেতু নাই, দু-আনি এবং পয়সাতে দশটা পয়সা তখনও আছে। খুশি হইয়া, দোকানের সন্ধানে স্টেশন হইতে বাহির হইয়া গেলাম। দোকান মিলিল। চূড়া, দহি শর্করা-সহযোগে অত্যুৎকৃষ্ট ভোজন সম্পন্ন করিতে অর্ধেক ব্যয় হইয়া গেল। তা যাক। জীবনে অমন কত যায়—সেজন্য ক্ষুণ্ণ হওয়া কাপুরুষতা।

গ্রামে পরিভ্রমণ করিতে বাহির হইলাম। ঘণ্টা-খানেক ঘুরিতে-না-ঘুরিতে টের পাইলাম জায়গাটার দধি ও চূড়া যে পরিমাণে উপাদেয়, পানীয় জলটা সেই পরিমাণে নিকৃষ্ট। আমার অমন ভূরিভোজন এইটুকু সময়ের মধ্যে এমনি পরিপাক নষ্ট করিয়া দিল যে, মনে হইতে লাগিল, যেন দশ-বিশ দিন তণ্ডুল-কণাটিও মুখে যায় নাই। এরূপ কদর্য স্থানে বাস করা একদণ্ড উচিত নয় মনে করিয়া স্থান ত্যাগের কল্পনা করিতেছি, দেখি অদূরে একটা আমবাগানের ভিতর হইতে ধূম দেখা দিয়াছে।

আমার ন্যায়শাস্ত্র জানা ছিল। ধূম দেখিয়া অগ্নি নিশ্চয়ই অনুমান করিলাম; বরঞ্চ অগ্নিরও হেতু অনুমান করিতে আমার বিলম্ব হইল না। সুতরাং সোজা সেই দিকে অগ্রসর হইয়া গেলাম। পূর্বেই বলিয়াছি, জলটা এখানকার বড় বদ।

বাঃ—এই ত চাই! এ যে খাঁটি সন্ন্যাসীর আশ্রম! মস্ত ধুনির উপর লোটায় করিয়া চায়ের জল চড়িয়াছে। 'বাবা' অর্ধমুদ্রিত-চক্ষে সম্মুখে বসিয়া আছেন; তাঁহার আশেপাশে গাঁজার উপকরণ। একজন বাচ্চা-সন্ন্যাসী একটা ছাগী দোহন করিতেছে—চা-সেবায় লাগিবে। গোটা দুই উট, গোটা দুই টাট্টু,

ঘোড়া এবং সবৎসা গাভী কাছাকাছি গাছের ডালে বাঁধা রহিয়াছে। পাশেই একটা ছোট তাঁবু। উঁকি মারিয়া দেখি, ভিতরে আমার বয়সী এক চেলা দুই পায়ে পাথরের বাটি ধরিয়া মস্ত একটা নিমদণ্ড দিয়া ভাঙ তৈয়ারি করিতেছে। দেখিয়া আমি ভক্তিতে আপ্লুত হইয়া গেলাম; এবং চক্ষের পলকে সাধু-বাবাজীর পদতলে একেবারে লুটাইয়া পড়িলাম। পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া করজোড়ে মনে মনে বলিলাম, ভগবান, তোমার কি অসীম করুণা! কি স্থানেই আমাকে আনিয়া দিলে! চুলোয় যাক্‌গে পিয়ারী,—এই মুক্তিমার্গের সিংহদ্বার ছাড়িয়া তিলার্ধ যদি অন্যত্র যাই, আমার যেন অনন্ত নরকেও আর স্থান না হয়।

সাধুজী বলিলেন, কেঁও বেটা?

আমি সবিনয়ে নিবেদন করিলাম, আমি গৃহত্যাগী, মুক্তি-পথান্বেষী হতভাগ্য শিশু; আমাকে দয়া করিয়া তোমার চরণ-সেবার অধিকার দাও।

সাধুজী মৃদু হাস্য করিয়া বার-দুই মাথা নাড়িয়া হিন্দী করিয়া সংক্ষেপে বলিলেন, বেটা ঘরে ফিরিয়া যাও—এ পথ অতি দুর্গম।

আমি করুণ-কণ্ঠে তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর করিলাম, বাবা, মহাভারতে লেখা আছে, মহাপাপিষ্ঠ জগাই-মাধাই বশিষ্ঠ মুনির পা ধরিয়া স্বর্গে গিয়াছিলেন; আর আপনার পা ধরিয়া আমি কি মুক্তিও পাইব না? নিশ্চয়ই পাইব।

সাধুজী খুশি হইয়া বলিলেন, বাত্‌ তেরা সাচ্চা হ্যায়। আচ্ছা বেটা, রামজীকা খুশি। যিনি দুগ্ধ দোহন করিতেছিলেন, তিনি আসিয়া চা তৈরি করিয়া 'বাবা'কে দিলেন। তাঁহার সেবা হইয়া গেলে আমরা প্রসাদ পাইলাম।

ভাঙ তৈয়ারী হইতেছিল সন্ধ্যার জন্যে। তখনও বেলা ছিল, সুতরাং অন্য প্রকার আনন্দের উদ্যোগ করিতে 'বাবা' তাঁর দ্বিতীয় চেলাকে গঞ্জিকার কলিকাটা ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিলেন; এবং প্রস্তুত হইতে বিলম্ব না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ করিয়া উপদেশ দিলেন।

আধ-ঘণ্টা কাটিয়া গেল। সর্বদর্শী 'বাবা' আমার প্রতি পরম তুষ্ট হইয়া বলিলেন, হাঁ বেটা, তোমার অনেক গুণ। তুমি আমার চেলা হইবার উপযুক্ত পাত্র।

আমি পরমানন্দে আর একবার বাবার পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলাম।

পরদিন প্রাতঃস্নান করিয়া আসিলাম। দেখিলাম, গুরুজীর আশীর্বাদে অভাব কিছুরই নাই। প্রধান চেলা যিনি, তিনি টাটকা এক-সুট গেরুয়া বস্ত্র,

জোড়া-দশেক ছোটবড় রুদ্রাক্ষমালা এবং একজোড়া পিতলের তাগা বাহির করিয়া দিলেন। যেখানে যেটি মানায়—সাজগোজ করিয়া, খানিকটা ধুনির ছাই মাথায় মুখে মাখিয়া ফেলিলাম। চোখ টিপিয়া কহিলাম, বাবাজী, আয়না-টায়না হ্যায়? মুখখানা যে ভারি একবার দেখতে ইচ্ছে হচ্চে।

দেখিলাম, তাঁহারও রসবোধ আছে। তথাপি একটুখানি গম্ভীর হইয়া তাচ্ছিল্যভরেই বলিলেন, হ্যায় একঠো।

তবে লুকিয়ে আনো না একবার।

মিনিট-দুই পরে আয়না লইয়া একটা গাছের আড়ালে গেলাম। পশ্চিমী নাপিতরা যেরূপ একখানি আয়না হাতে ধরাইয়া দিয়া ক্ষৌরকর্ম সম্পন্ন করে, সেইরূপ ছোট একটুখানি টিন মোড়া আরশি। তা হোক, একটুখানি দেখিলাম, যত্নে এবং সদা-ব্যবহারে বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। চেহারা দেখিয়া আর হাসিয়া বাঁচি না। কে বলিবে—আমি সেই শ্রীকান্ত, যিনি কিছুকাল পূর্বেই রাজ-রাজড়ার মজলিসে বসিয়া বাইজীর গান শুনিতেছিলেন। তা যাক।

ঘণ্টাখানেক পরে গুরু-মহারাজের সমীপে দীক্ষার জন্য নীত হইলাম। মহারাজ চেহারা দেখিয়া সাতিশয় প্রীত হইয়া বলিলেন, বেটা, মহিনা এক-আধ ঠহ্‌রো।

মনে মনে বহুত আচ্ছা বলিয়া তাঁর পদধূলি গ্রহণ করিয়া যুক্তকরে, ভক্তিভরে একপাশে বসিলাম।

আজ কথায় কথায় তিনি আধ্যাত্মিকতার অনেক উপদেশ দিলেন। ইহার দুরূহতার বিষয়, ইহার গভীর বিরাগ এবং কঠোর সাধনার বিষয়, আজকাল ভণ্ড-পাষণ্ডেরা কি প্রকারে ইহা কলঙ্কিত করিতেছে, তাহার বিশেষ বিবরণ, এবং ভগবৎপাদপদ্মে মতি স্থির করিতে হইলেই বা কি কি আবশ্যক, এতৎপক্ষে বৃক্ষজাতীয় শুষ্ক বস্তুবিশেষের ধূম ঘন-ঘন মুখ-বিবর দ্বারা শোষণ করতঃ নাসারন্ধ্রপথে শনৈঃ শনৈঃ বিনির্গত করায় কিরূপ আশ্চর্য উপকার তাহা বুঝাইয়া দিলেন, এবং এ-বিষয়ে আমার নিজের অবস্থা যে অত্যন্ত আশাপ্রদ, সেই ইঙ্গিত করিয়াও আমার উৎসাহবর্ধন করিলেন। এইরূপে সে দিন মোক্ষ-পথের অনেক নিগূঢ় তাৎপর্য অবগত হইয়া গুরুমহারাজের তৃতীয় চেলাগিরিতে বহাল হইয়া গেলাম।

গভীর বিরাগ এবং কঠোর সাধনার জন্য মহারাজের আদেশে আমাদের সেবার ব্যবস্থাটা এমনি একটু কঠোর রকমের ছিল। তাহার পরিমাণও যেমনি,

রসনাতেও তাহা তেমনি। চা, রুটি, ঘৃত, দধি-দুগ্ধ, চুড়া, শর্করা ইত্যাদি কঠোর সাত্ত্বিক ভোজন এবং তাহা জীর্ণ করিবার অনুপান। আবার ভগবৎপদারবিন্দ হইতেও চিত্ত বিক্ষিপ্ত না হয়, সেদিকেও আমাদের লেশমাত্র অবহেলা ছিল না। ফলে, আমার শুক্‌নো কাঠে ফুল ধরিয়া গেল,—একটুখানি ভুঁড়ির লক্ষণও দেখা দিল।

একটা কাজ ছিল—ভিক্ষায় বাহির হওয়া। সন্ন্যাসীর পক্ষে ইহা সর্বপ্রধান কাজ না হইলেও, একটা প্রধান কাজ বটে। কারণ সাত্ত্বিক ভোজনের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কিন্তু মহারাজ নিজে ইহা করিতেন না, আমরা তাঁহার সেবকেরা পালা করিয়া করিতাম। সন্ন্যাসীর অপরাপর কর্তব্যে আমি তাঁহার অন্য দুই চেলাকে অতি সত্বর ডিঙাইয়া গেলাম; শুধু এইটাতেই বরাবর খোঁড়াইতে লাগিলাম। এটা কোনদিনই নিজের কাছে সহজ এবং রুচিকর করিয়া তুলিতে পারিলাম না। তবে এই একটা সুবিধা ছিল—সেটা হিন্দুস্থানীদের দেশ। আমি ভাল-মন্দর কথা বলিতেছি না, আমি বলিতেছি, বাঙ্গলাদেশের মত সেখানকার মেয়েরা 'হাতজোড়া—আর এক বাড়ি এগিয়ে দেখ' বলিয়া উপদেশ দিত না, এবং পুরুষেরাও চাকরি না করিয়া ভিক্ষা করি কেন, তাহার কৈফিয়ত তলব করিত না। ধনী-দরিদ্রনির্বিশেষে প্রতি গৃহস্থই সেখানে ভিক্ষা দিত। কেহই বিমুখ করিত না।

এমনি দিন যায়। দিন-পনের ত সেই আমবাগানের মধ্যেই কাটিয়া গেল। দিনের বেলা কোন বালাই নাই, শুধু রাত্রে মশার কামড়ের জ্বালায় মনে হইত—থাক্ মোক্ষসাধন! গায়ের চামড়া আর একটু মোটা করিতে না পারিলে ত আর বাঁচি না! অন্যান্য বিষয়ে বাঙ্গালী যত সেরাই হোক, এ-বিষয়ে বাঙ্গালীর চেয়ে হিন্দুস্থানী-চামড়া যে সন্ন্যাসের পক্ষে ঢের বেশি অনুকূল, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

সেদিন প্রাতঃস্নান করিয়া সাত্ত্বিক ভোজনের চেষ্টায় বহির্গত হইতেছি, গুরুমহারাজ ডাকিয়া বলিলেন—

"ভরদ্বাজ মুনি বসহিঁ প্রয়াগা
যিনহি রামপদ অতি অনুরাগা—"

অর্থাৎ স্ট্রাইক দি টেন্ট—প্রয়াগ যাত্রা করিতে হইবে। কিন্তু কাজ ত সহজ নয়। সন্ন্যাসীর যাত্রা কিনা। পা-বাঁধা টাট্টু খুঁজিয়া আনিয়া বোঝাই দিতে, উটের উপরে মহারাজের জিন কষিয়া দিতে, গরু-ছাগল সঙ্গে লইতে,

পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধিতে গুছাইতে একবেলা গেল। তার পরে রওনা হইয়া ক্রোশ-দুই দূরে সন্ধ্যার প্রাক্কালে বিঠৌরা গ্রামপ্রান্তে এক বিরাট বটমূলে আস্তানা ফেলা হইল। জায়গাটি মনোরম, গুরুমহারাজের দিব্য পছন্দ হইল। তা ত হইল, কিন্তু সেই ভরদ্বাজ মুনির আস্তানায় পৌঁছিতে যে কয় মাস লাগিবে, সে ত অনুমান করিতেই পারিলাম না।

এই বিঠৌরা গ্রামের নামটা কেন আমার মনে আছে, তাহা এইখানে বলিব। সে দিনটা পূর্ণিমা তিথি। অতএব গুরুর আদেশে আমরা তিনজনই তিন দিকে ভিক্ষার জন্য বাহির হইয়া পড়িয়াছিলাম। একা হইলে উদরপূর্তির জন্য চেষ্টাচরিত্র মন্দ করিতাম না। কিন্তু আজ আমার সে চাড় ছিল না বলিয়া অনেকটা নিরর্থক ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। একটা বাড়ির খোলা দরজার ভিতর দিয়া হঠাৎ একটি বাঙ্গালী মেয়ের চেহারা চোখে পড়িয়া গেল। তার কাপড়-খানা যদিচ দেশী তাঁতে-বোনা গুণচটের মতই ছিল, কিন্তু পরিবার বিশেষ ভঙ্গিটাই আমার কৌতূহল উদ্রেক করিয়াছিল। ভাবিলাম, পাঁচ-ছয়দিন এই গ্রামে আছি, প্রায় সব ঘরেই গিয়াছি কিন্তু বাঙ্গালী মেয়ে ত দূরের কথা—একটা পুরুষের চেহারাও ত চোখে পড়ে নাই। সাধু-সন্ন্যাসীর অবারিত দ্বার। ভিতরে প্রবেশ করিতেই, মেয়েটি আমার পানে চাহিয়া রহিল। তাহার মুখখানি আমি আজও মনে করিতে পারি! তাহার কারণ এই যে, দশ-এগারো বছরের মেয়ের চোখে এমন করুণ, এমন মলিন উদাস চাহনি আমি আর কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাহার মুখে, তাহার ঠোঁটে, তাহার চোখে, তাহার সর্বাঙ্গ দিয়া দুঃখ এবং হতাশা যেন ফাটিয়া পড়িতেছিল। আমি একেবারেই বাঙ্গলা করিয়া বলিলাম, চাট্টি ভিক্ষে আনো দেখি মা। প্রথমটা সে কিছুই বলিল না। তার পরে তার ঠোঁট দুটি বার-দুই কাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিল; তার পরে সে ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

আমি মনে মনে একটু লজ্জিত হইয়া পড়িলাম। কারণ, সম্মুখে কেহ না থাকিলেও, পাশের ঘর হইতে বেহারী মেয়েদের কথাবার্তা শুনা যাইতেছিল। তাহাদের কেহ হঠাৎ বাহির হইয়া এ অবস্থায় উভয়কে দেখিয়া কি ভাবিবে, কি বলিবে, তাহা ভাবিয়া না পাইয়া—দাঁড়াইব, কি প্রস্থান করিব, স্থির করিবার পূর্বেই মেয়েটি কাঁদিতে কাঁদিতে এক নিঃশ্বাসে সহস্র প্রশ্ন করিয়া ফেলিল,—তুমি কোথা থেকে আসচ? তুমি কোথায় থাক?

তোমার বাড়ি কি বর্ধমান জেলায়? কবে সেখানে যাবে? তুমি রাজপুর জানো? সেখানকার গৌরী তেওয়ারীকে চেনো?

আমি কহিলাম, তোমার বাড়ি কি বর্ধমানের রাজপুরে?

মেয়েটি হাত দিয়া চোখের জল মুছিয়া বলিল, হ্যাঁ। আমার বাবার নাম গৌরী তেওয়ারী, আমার দাদার নাম রামলাল তেওয়ারী। তাঁদের তুমি চেনো? আমি তিনমাস শ্বশুরবাড়ি এসেছি—একখানা চিঠিও পাইনি। বাবা, দাদা, মা, গিরিবালা, খোকা কেমন আছে কিছু জানিনে। ঐ যে অশ্বত্থ গাছ—ওর তলায় আমার দিদির শ্বশুরবাড়ি। ও-সোমবারে দিদি গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে। এরা বলে, না—সে কলেরায় মরেছে।

আমি বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। ব্যাপারটা কি? এরা ত দেখছি পুরা হিন্দুস্থানী, অথচ মেয়েটি একেবারে খাঁটি বাঙ্গালীর মেয়ে। এতদূরে এ-বাড়িতে এদের শ্বশুরবাড়িটিই বা কি করিয়া হইল, আর ইহাদের স্বামী-শ্বশুর-শাশুড়ীই বা এখানে কি করিতে আসিল?

জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার দিদি গলায় দড়ি দিল কেন?

সে কহিল, দিদি রাজপুরে যাবার জন্য দিনরাত কাঁদত—খেতো না, শুতো না। তাই তার চুল আড়ায় বেঁধে তাকে সারা দিনরাত দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। তাই দিদি গলায় দড়ি দিয়ে মরেচে।

প্রশ্ন করিলাম তোমারও শ্বশুর-শ্বাশুড়ী কি হিন্দুস্থানী?

মেয়েটি আর একবার কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, হাঁ। আমি তাদের কথা কিছু বুঝতে পারিনে, তাদের রান্না মুখে দিতে পারিনে—আমি ত দিন-রাত কাঁদি। কিন্তু বাবা আমাকে চিঠিও লেখে না, নিয়েও যায় না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা, তোমার বাবা এতদূরে তোমার বিয়ে দিলেন কেন?

মেয়েটি কহিল, আমরা যে তেওয়ারী। আমাদের ঘর ও-দেশে ত পাওয়া যায় না

তোমাকে কি এরা মারধর করে?

করে না! এই দেখ না,—বলিয়া মেয়েটি বাহুতে, পিঠের উপর, গালের উপর দাগ দেখাইয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, আমিও দিদির মত গলায় দড়ি দিয়ে মরব।

তাহার কান্না দেখিয়া আমার নিজের চক্ষুও সজল হইয়া উঠিল। আর

প্রশ্নোত্তর বা ভিক্ষার অপেক্ষা না করিয়াই বাহির হইয়া পড়িলাম। মেয়েটি কিন্তু আমার পিছনে পিছনে আসিয়া বলিতে লাগিল, আমার বাবাকে গিয়ে তুমি বল্‌বে ত আমাকে একবার নিয়ে যেতে? নইলে আমি—বলিতে আমি কোনমতে একটু ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া দ্রুতবেগে অদৃশ্য হইয়া গেলাম। মেয়েটির বুক-চেরা আবেদন আমার দুই কানের মধ্যে বাজিতেই লাগিল।

রাস্তার মোড়ের উপরেই একটি মুদির দোকান। প্রবেশ করিতেই দোকানদার সসম্মানে অভ্যর্থনা করিল। খাদ্যদ্রব্য ভিক্ষা না করিয়া যখন একখানা চিঠির কাগজ ও কালি-কলম চাহিয়া বসিলাম, তখন সে কিছু আশ্চর্য হইল বটে, কিন্তু প্রত্যাখ্যান করিল না সেইখানেই বসিয়া গৌরী তেওয়ারীর নামে একখানি পত্র লিখিয়া ফেলিলাম। সমস্ত বিবরণ বিবৃত করিয়া পরিশেষে এ-কথাও লিখিতে ছাড়িলাম না যে, মেয়েটির দিদি সম্প্রতি গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে এবং সেও মারধর অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া সেই পথে যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছে। তুমি নিজে আসিয়া ইহার বিহিত না করিলে কি ঘটে বলা যায় না। খুব সম্ভব, তোমার চিঠিপত্র ইহারা মেয়েটিকে দেয় না। ঠিকানা দিলাম, বর্ধমান জেলার রাজপুর গ্রাম। জানি না, সে পত্র গৌরী তেওয়ারীর কাছে পৌঁছিয়াছিল কিনা এবং পৌঁছাইলেও সে কিছু করিয়াছিল কি না। কিন্তু ব্যাপারটা আমার মনের মধ্যে এমনি মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল যে, এতকাল পরেও সমস্ত স্মরণ রহিয়াছে এবং এই আদর্শ হিন্দুসমাজের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জাতিভেদের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহের ভাব আজিও যায় নাই।

হইতে পারে, এই জাতিভেদ ব্যাপারটা খুব ভাল; এই উপায়েই সনাতন হিন্দু-জাতিটা যখন আজ পর্যন্ত বাঁচিয়া আছে, তখন ইহার প্রচণ্ড উপকারিতা সম্বন্ধে সংশয় করিবার, প্রশ্ন করিবার আর কিছুই নাই। কে কোথায় দুটো হতভাগা মেয়ে দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া গলায় দড়ি দিয়া মরিবে বলিয়া ইহার কঠোর বন্ধন এক বিন্দু শিথিল করার কল্পনা করাও পাগলামি। কিন্তু মেয়েটার কান্না যে-লোক চোখে দেখিয়া আসিয়াছে, তাহার সাধ্য নাই, এ-প্রশ্ন নিজের নিকট হইতে থামাইয়া রাখে যে—কোনমতে টিকিয়া থাকাই কি চরম সার্থকতা? এমন অনেক জাতিই ত টিকিয়া আছে। কুকিরা আছে, কোল-ভীল-সাঁওতালরা আছে, প্রশান্ত মহাসাগরে অনেক ছোটখাটো দ্বীপের অনেক ছোটখাটো জাতির মানুষ সৃষ্টির শুরু হইতেই বাঁচিয়া আছে। আফ্রিকায় আছে, আমেরিকায় আছে। তাহাদেরও এমন সকল কড়া সামাজিক আইন-

কানুন আছে যে, শুনিলে গায়ের রক্ত জল হইয়া যায়। বয়সের হিসাবে তাহারা য়ুরোপের অনেক জাতির অতি-বৃদ্ধ-প্রপিতামহের চেয়েও প্রাচীন, আমাদের চেয়েও পুরাতন। কিন্তু তাই বলিয়াই যে, ইহারা আমাদের চেয়ে সামাজিক আচার-ব্যবহারে শ্রেষ্ঠ এমন অদ্ভুত সংশয় বোধ করি কাহারো মনে উঠে না। সামাজিক সমস্যা ঝাঁক বাঁধিয়া দেখা দেয় না। এমনই এক-আধটা ক্বচিৎ আবির্ভূত হয়। নিজের বাঙ্গালী মেয়ে দুটির খোট্টার ঘরে বিবাহ দিবার সময় গৌরী তেওয়ারীর মনে বোধ করি এরূপ প্রশ্ন আসিয়াছিল। কিন্তু সে বেচারা এই দুরূহ প্রশ্নের কোন পথ খুঁজিয়া না পাইয়াই, শেষে সামাজিক যূপকাষ্ঠে কন্যা দুটিকে বলি দিতে বাধ্য হইয়াছিল। যে সমাজ এই দুটি নিরুপায় ক্ষুদ্র বালিকার জন্যও স্থান করিয়া দিতে পারে নাই, যে-সমাজ আপনাকে এতটুকু প্রসারিত করিবার শক্তি রাখে না, সে পঙ্গু আড়ষ্ট সমাজের জন্য মনের মধ্যে কিছুমাত্র গৌরব অনুভব করিতে পারিলাম না। কোথায় একজন মস্ত বড়লোকের লেখায় পড়িয়াছিলাম, আমাদের সমাজ 'জাতিভেদ' বলিয়া যে একটা বড রকম সামাজিক প্রশ্নের উত্তর জগতের সমক্ষে ধরিয়া দিয়াছিল, তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি আজিও হয় নাই —এই রকম একটা কথা। কিন্তু এই সমস্ত যুক্তিহীন উচ্ছ্বাসের উত্তর দিতেও যেমন প্রবৃত্তি হয় না—'হয় নাই', 'হবে না' বলিয়া নিজের প্রশ্নের নিজেরই উত্তর প্রবল কণ্ঠে ঘোষণা করিয়া দিয়া যাহারা চাপিয়া বসিয়া যায়, তাহাদের জবাব দেওয়াও তেমনি কঠিন। যাক্ গে।

দোকান হইতে উঠিলাম। সন্ধান করিয়া বেয়ারিং পত্রটা ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিয়া যখন আস্তানায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তখনও আমার অন্যান্য সহযোগীরা আটা, চাল প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসে নাই।

দেখিলাম সাধুবাবা আজ যেন বিরক্ত। হেতুটা তিনি নিজেই ব্যক্ত করিলেন। বলিলেন, এ গ্রামটা সাধু-সন্ন্যাসীর প্রতি তেমন অনুরক্ত নয়, সেবাদির ব্যবস্থা তেমন সন্তোষজনক করে না; সুতরাং কালই এ-স্থান ত্যাগ করিতে হইবে। 'যে আজ্ঞা', বলিয়া আমি তৎক্ষণাৎ অনুমোদন করিলাম। পাটনাটা দেখিবার জন্য মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা প্রবল কৌতূহল ছিল, নিজের কাছে আর তাহা ঢাকিয়া রাখিতে পারিলাম না।

তা ছাড়া, এই সকল বেহারী পল্লীগুলিতে কোন রকম আকর্ষণই খুঁজিয়া পাই না। ইতিপূর্বে বাঙ্গলার অনেক গ্রামেই ত বিচরণ করিয়া ফিরিয়াছি

কিন্তু তাহাদের সহিত ইহাদের কোন তুলনাই হয় না। নরনারী, গাছপালা, জলবায়ু—কোনটাই আপনার বলিয়া মনে হয় না। সমস্ত মনটা সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত শুধু কেবল পালাই-পালাই করিতে থাকে।

সন্ধ্যাবেলায় পাড়ায় পাড়ায় তেমন করিয়া খোল-করতালের সঙ্গে কীর্তনের সুর কানে আসে না। দেব-মন্দিরে আরতির কাঁসর-ঘণ্টাগুলাও সেরূপ গম্ভীর মধুর শব্দ করে না। এ-দেশের মেয়েরা শাঁখগুলাও কি ছাই তেমন মিষ্ট করিয়া বাজাইতে জানে না। এখানে মানুষ কি সুখেই থাকে! আর মনে হইতে লাগিল, এই সব পাড়াগাঁয়ের মধ্যে না আসিয়া পড়িলে ত নিজেদের পাড়াগাঁয়ের মূল্য কোন দিনই এমন করিয়া চোখে পড়িত না। আমাদের জলে পানা, হাওয়ায় ম্যালেরিয়া, মানুষের পেটে-পেটে পিলে, ঘরে-ঘরে মামলা, পাড়ায়-পাড়ায় দলাদলি—তা হোক, তবু তারই মধ্যে যে কত রস, কত তৃপ্তি ছিল, এখন যেন তাহার কিছুই না বুঝিয়াও সমস্ত বুঝিতে লাগিলাম।

পরদিন তাঁবু ভাঙ্গিয়া যাত্রা করা হইল, এবং সাধুবাবা যথাশক্তি ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমের দিকে সদলে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু পথটা সোজা হইবে বলিয়াই হোক, কিংবা মুনি আমার মন বুঝিয়াই হোক পাটনার দশ ক্রোশের মধ্যে আর তাঁবু গাড়িলেন না। মনে একটা বাসনা ছিল। তা সে এখন থাক, পাপতাপ অনেক করিয়াছি—সাধুসঙ্গে দিনকতক পবিত্র হইয়া আসি গে।

একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে যে জায়গায় আমাদের আড্ডা পড়িল, তাহার নাম ছোট-বাঘিয়া। আরা স্টেশন হইতে ক্রোশ আষ্টেক দূরে। এই গ্রামে একটি মহাপ্রাণ বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সহিত পরিচয় হইয়াছিল। তাঁহার সদাশয়তার এইখানে একটু বিবরণ দিব। তাঁহার পৈতৃক নামটা গোপন করিয়া রামবাবু বলাই ভাল। কারণ এখনও তিনি জীবিত আছেন, এবং পরে অন্যত্র যদিচ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎলাভ ঘটিয়াছিল, তিনি আমাকে চিনিতে পারেন নাই। না-পারা আশ্চর্য নয়। কিন্তু তাঁহার স্বভাব জানি,—গোপনে তিনি যে সকল সৎকার্য করিয়াছিলেন, তাহার প্রকাশ্যে উল্লেখ করিলে তিনি বিনয়ে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িবেন, তাহা নিশ্চিত বুঝিতেছি। অতএব তাঁর নাম রামবাবু। কি সূত্রে যে রামবাবু এই গ্রামে আসিয়াছিলেন

এবং কেমন করিয়া যে জমিজমা সংগ্রহ করিয়া চাষ-আবাদ করিতেছিলেন, অত কথা জানি না। এইমাত্র জানি, তিনি দ্বিতীয় পক্ষ এবং গুটি তিনচার পুত্র-কন্যা লইয়া তখন সুখে বাস করিতেছিলেন।

সকালবেলা শোনা গেল, ছোটা-বড়া বাধিয়া ত বটেই, আরও পাঁচ-সাতখানি গ্রামের মধ্যে তখন বসন্ত মহামারীরূপে দেখা দিয়াছে। দেখা গিয়াছে যে, গ্রামের এই সকল দুঃসময়ের মধ্যেই সাধু-সন্ন্যাসীর সেবা বেশ সন্তোষজনক হয়। সুতরাং সাধুবাবা অবিচলিত-চিত্তে তথায় অবস্থান করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

ভাল কথা। সন্ন্যাসী-জীবটার সম্বন্ধে এইখানে আমি একটা কথা বলিতে চাই। জীবনে ইহাদের অনেকগুলিকেই দেখিয়াছি। বার-চারেক এইরূপ ঘনিষ্ঠভাবেও মিশিয়াছি। দোষ যাহা আছে, সে ত আছেই। আমি গুণের কথাই বলিব। নিছক 'পেটের দায়ে সাধুজী', আপনারা ত আমাকেই জানেন, কিন্তু ইহাদের মধ্যেও এই দুটো দোষ আমার চোখে পড়ে নাই। আর চোখের দৃষ্টিটাও যে আমার খুব মোটা তাও নয়। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে ইহাদের সংযমই বলুন, আর উৎসাহের স্বল্পতাই বলুন—খুব বেশি; এবং প্রাণের ভয়টা ইহাদের নিতান্তই কম—'যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ' ত আছেই; কি করিলে অনেকদিন জীবেৎ, এ খেয়াল নাই। আমাদের সাধুবাবারও এ-ক্ষেত্রে তাহাই হইল। প্রথমটার জন্যে দ্বিতীয়টা তিনি তুচ্ছ করিয়া দিলেন।

একটুখানি ধুনির ছাই এবং দু ফোঁটা কমণ্ডলুর জলের পরিবর্তে যে-সকল বস্তু হু-হু করিয়া ঘরে আসিতে লাগিল, তাহা সন্ন্যাসী, গৃহী—কাহারও বিরক্তিকর হইতে পারে না।

রামবাবু সস্ত্রীক আসিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন। চারদিন জ্বরের পর আজ সকালে বড় ছেলেটির বসন্ত দেখা দিয়াছে এবং ছোট ছেলেটি কাল রাত্রি হইতে জ্বরে অচৈতন্য। বাঙ্গালী দেখিয়া আমি উপযাচক হইয়া রামবাবুর সহিত পরিচয় করিলাম।

ইহার পরে গল্পের মধ্যে মাসখানেকের বিচ্ছেদ দিতে চাই। কারণ, কেমন করিয়া এই পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইল, কেমন করিয়া ছেলে দুটি ভাল হইল—সে অনেক কথা। বলিতে আমার নিজেরই ধৈর্য থাকিবে না, তা পাঠকের ত ঢের দূরের কথা। তবে মাঝের একটা কথা বলিয়া রাখি। দিন

পনের পরে রোগের যখন বড় বাড়াবাড়ি, তখন সাধুজী তাঁহার আস্তানা গুটাইবার প্রস্তাব করিলেন। রামবাবুর স্ত্রী কাঁদিয়া বলিলেন, সন্ন্যাসী-দাদা, তুমি ত সত্যিই সন্ন্যাসী নও—তোমার শরীরে দয়া-মায়া আছে। আমার নবীন, জীবনকে তুমি ফেলে চ'লে গেলে, তারা কখ্‌খনো বাঁচবে না। কই, যাও দেখি, কেমন ক'রে যাবে? বলিয়া তিনি আমার পা ধরিয়া ফেলিলেন। আমার চোখেও জল আসিল, রামবাবুও স্ত্রীর প্রার্থনায় যোগ দিয়া কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিলেন। সুতরাং আমি যাইতে পারিলাম না। সাধুবাবাকে বলিলাম, প্রভু, তোমরা অগ্রসর হও, আমি পথের মধ্যে না পারি প্রয়াগে গিয়া তোমার পদধূলি মাথায় লইতে পারিব, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রভু ক্ষুণ্ণ হইলেন। শেষে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া নিরর্থক কোথায় বিলম্ব না করি, সে বিষয়ে বারংবার সতর্ক করিয়া দিয়া সদলবলে যাত্রা করিলেন। আমি রামবাবুর বাটীতেই রহিয়া গেলাম। এই অল্পদিনের মধ্যেই আমি যে প্রভুর সর্বাপেক্ষা স্নেহের পাত্র হইয়াছিলাম, এবং টিকিয়া থাকিলে তাঁহার সন্ন্যাসী-লীলার অবসানে উত্তরাধিকারসূত্রে টাট্টু এবং উট দুটা যে দখল করিতে পারিতাম, তাহাতে কোন সংশয় নাই। যাক—হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিয়া, গত কথা লইয়া পরিতাপ করিয়া লাভ নাই।

ছেলে দুটি সারিয়া উঠিল। মারী এইবার প্রকৃতই মহামারীরূপে দেখা দিলেন। এ যে কি ব্যাপার, তাহা যে না চোখে দেখিয়াছে, তাহার দ্বারা লেখা পড়িয়া, গল্প শুনিয়া বা কল্পনা করিয়া হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। অতএব এই অসম্ভবকে সম্ভব করিবার প্রয়াস আমি করিব না। লোক পালাইতে আরম্ভ করিল—ইহার আর কোন বাছ-বিচার রহিল না। যে-বাড়িতে মানুষের চিহ্ন দেখা গেল, সেখানে উঁকি মারিয়া দেখিলেই চোখে পড়িতে পারিত—শুধু মা তাঁর পীড়িত সন্তানকে আগলাইয়া বসিয়া আছেন।

রামবাবুও তাঁহার ঘরের গরুর গাড়িতে জিনিসপত্র বোঝাই দিলেন। অনেকদিন আগেই দিতেন—শুধু বাধ্য হইয়াই পারেন নাই। দিন পাঁচ-ছয় হইতেই আমার সমস্ত দেহটা এমনি একটা বিশ্রী আলস্যে ভরিয়া উঠিতেছিল যে, কিছুই ভাল লাগিত না। ভাবিতাম. রাত জাগা এবং পরিশ্রমের জন্যই এরূপ বোধ হইত। সেদিন সকাল হইতেই মাথা টিপ-টিপ করিতে লাগিল। নিতান্ত অরুচির উপর দুপুরবেলা যাহা কিছু খাইলাম,

অপরাহ্নবেলায় বমি হইয়া গেল। রাত্রি ন'টা-দশটার সময় টের পাইলাম জ্বর হইয়াছে। সেদিন সারারাত্রি ধরিয়াই তাঁহাদের উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছিল, সবাই জাগিয়া ছিলেন। অনেক রাত্রে রামবাবুর স্ত্রী বাহিরের ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, সন্ন্যাসীদাদা, তুমি কেন আমাদের সঙ্গেই আরা পর্যন্ত চল না?

আমি বলিলাম, তাই যাব। কিন্তু তোমাদের গাড়িতে আমাকে একটু জায়গা দিতে হবে।

ভগিনী উৎসুক হইয়া প্রশ্ন করিলেন, কেন সন্ন্যাসী-দাদা? গাড়ি ত দুটোর বেশি পাওয়া গেল না—আমাদের নিজেদেরই যে জায়গা হচ্ছে না।

আমি কহিলাম, আমার হাঁটবার যে ক্ষমতা নেই দিদি। সকাল থেকেই জ্বর এসেছে।

জ্বর? বল কি গো?—বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই আমার নূতন ভগিনী মুখ কালি করিয়া প্রস্থান করিলেন।

কতক্ষণ পরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম বলিতে পারি না। জাগিয়া উঠিয়া দেখিলাম, বেলা হইয়াছে। বাড়ির ভিতর ঘরে-ঘরে তালা বন্ধ—জনপ্রাণী নাই।

বাহিরের যে ঘরটায় আমি থাকিতাম তাহার সুমুখ দিয়াই গ্রামের কাঁচা রাস্তাটা আরা স্টেশন পর্যন্ত গিয়াছে। এই রাস্তার উপর দিয়া প্রত্যহ অন্ততঃ পাঁচ-ছয়খানি গরুর গাড়ি মৃত্যুভীত নরনারী বোঝাই লইয়া স্টেশনে যাইত। সারাদিন অনেক চেষ্টার পরে ইহারই একখানিতে সন্ধ্যার সময় স্থান করিয়া লইয়া উঠিয়া বসিলাম। যে প্রাচীন বেহারী ভদ্রলোকটি দয়া করিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়াছিলেন, তিনি অতি প্রত্যুষেই স্টেশনের কাছে একটা গাছতলায় আমাকে নামাইয়া দিলেন। তখন আর আমার বসিবার সামর্থ্য ছিল না; সেইখানেই শুইয়া পড়িলাম। অদূরে একটা পরিত্যক্ত টিনের শেড্ ছিল। পূর্বে এটি মোসাফিরখানার কাজে ব্যবহৃত হইত; কিন্তু বর্তমান সময়ে বৃষ্টি-বাদলার দিনে গরু-বাছুরের ব্যবহার ছাড়া আর কোন কাজে লাগিত না। ভদ্রলোক স্টেশন হইতে একজন বাঙ্গালী যুবককে ডাকিয়া আনিলেন। আমি তাঁহারই দয়ায় জন-কয়েক কুলীর সাহায্যেই এই শেড্খানির মধ্যে নীত হইলাম।

আমার বড় দুর্ভাগ্য, আমি যুবকটির কোন পরিচয়ই দিতে পারিলাম

না ; কারণ, কিছুই জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। মাস পাঁচ-ছয় পরে জিজ্ঞাসা করিবার যখন সুযোগ এবং শক্তি হইল, তখন সংবাদ লইয়া জানিলাম, বসন্ত-রোগে ইতিমধ্যেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তবে তাঁহার কথা শুনিয়া এইমাত্র জানিয়াছিলাম, তিনি পূর্ববঙ্গের লোক এবং পনের টাকা বেতনে স্টেশনে চাকরি করেন। খানিক পরে তিনি তাঁহার নিজের শতজীর্ণ বিছানাটি আনিয়া হাজির করিলেন এবং বার বার বলিতে লাগিলেন, তিনি স্বহস্তে রাঁধিয়া খান এবং পরের ঘরে থাকেন। দুপুরবেলা একবাটি গরম দুধ আনিয়া পীড়াপীড়ি করিয়া খাওয়াইয়া বলিলেন, ভয় নাই, ভাল হইয়া যাইবেন ; কিন্তু আত্মীয়বন্ধুবান্ধব কাহাকেও যদি সংবাদ দিবার থাকে ত ঠিকানা দিলে তিনি টেলিগ্রাফ করিয়া দিতে পারেন।

তখনও আমার বেশ জ্ঞান ছিল। সুতরাং ইহাও বেশ বুঝিতেছিলাম, আর বেশিক্ষণ নয়। এমনি জ্বর যদি আর পাঁচ-ছয় ঘণ্টাও স্থায়ী হয় ত চৈতন্য হারাইতে হইবে। অতএব যাহা কিছু করিবার, ইতিমধ্যে না করিলে আর করাই হইবে না।

তা বটে ; কিন্তু সংবাদ দিবার প্রস্তাবে ভাবনায় পড়িলাম। কেন তাহা খুলিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই ; কিন্তু ভাবিলাম, গরীবের টেলিগ্রাফের পয়সাটা অপব্যয় করাইয়া আর লাভ কি ?

সন্ধ্যার পর ভদ্রলোক তাঁর ডিউটির ফাঁকে এক ভাঁড় জল ও একটা কেরোসিনের ডিবা লইয়া উপস্থিত হইলেন। তখন জ্বরের যন্ত্রণায় মাথা ক্রমশঃ বেঠিক হইয়া উঠিতেছিল। তাঁহাকে কাছে ডাকিয়া বলিলাম, যতক্ষণ আমার হুঁশ আছে, ততক্ষণ মাঝে মাঝে দেখবেন ; তার পরে যা হয় তা হোক ; আপনি আর কষ্ট করবেন না।

ভদ্রলোক অত্যন্ত মুখচোরা প্রকৃতির লোক। কথা সাজাইয়া বলিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। প্রত্যুত্তরে তিনি শুধু 'না না' বলিয়াই চুপ করিলেন।

বলিলাম, আপনি সংবাদ দিতে চেয়েছিলেন। আমি সন্ন্যাসী মানুষ, আমার যথার্থ আপনার জন কেহ নাই। তবে পাটনায় পিয়ারী বাইজীর ঠিকানায় যদি একখানা পোষ্টকার্ড লিখে দেন যে শ্রীকান্ত আরা স্টেশনের বাইরে একটা টিনশেডের মধ্যে মরণাপন্ন হয়ে পড়ে আছে, তা হ'লে—

ভদ্রলোক শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। আমি এখনি দিচ্ছি, চিঠি এবং

টেলিগ্রাফ দুই-ই পাঠিয়ে দিচ্চি,—বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন। আমি মনে মনে বলিলাম, ভগবান, সংবাদটা যেন সে পায়।

জ্ঞান হইয়া প্রথমটা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। মাথায় হাত দিয়া ঠাহর করিয়া টের পাইলাম, সেটা আইস্-ব্যাগ। চোখ মেলিয়া দেখিলাম, ঘরের মধ্যে একটা খাটের উপরে শুইয়া আছি। সুমুখের টুলের উপর একটা আলোর কাছে গোটা দুই-তিন ঔষধের শিশি; এবং তাহারই পাশে একটা দড়ির খাটিয়ার উপর কে একজন লাল-চেক্ র্যাপার গায়ে দিয়া শুইয়া আছে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত কিছুই স্মরণ করিতে পারিলাম না। তারপরে একটু একটু করিয়া মনে হইতে লাগিল, ঘুমের ঘোরে কত কি যেন স্বপ্ন দেখিয়াছি। অনেক লোকের আসা-যাওয়া, ধরাধরি করিয়া আমাকে ডুলিতে তোলা, মাথা-ন্যাড়া করিয়া ওষুধ খাওয়ানো—এমনি কত কি ব্যাপার।

খানিক পরে লোকটি যখন উঠিয়া বসিল, দেখিলাম ইনি একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক, বয়স আঠারো-উনিশের বেশি নয়। তখন আমার শিয়রের নিকট হইতে মৃদুকণ্ঠে যে তাহাকে সম্বোধন করিল, তাহার গলা চিনিতে পারিলাম।

পিয়ারী অতি মৃদুকণ্ঠে ডাকিল, বঙ্কু, বরফটা একবার কেন বদলে দিলিনে বাবা।

ছেলেটি বলিল, দিচ্চি, তুমি একটুখানি শোও না মা। ডাক্তারবাবু যখন ব'লে গেলেন বসন্ত নয়, তখন আর কোন ভয় নেই মা।

পিয়ারী কহিল, ওরে বাবা, ডাক্তারে ভয় নেই বললেই কি মেয়েমানুষের ভয় যায়? তোকে সে ভাবনা করতে হবে না বঙ্কু, তুই শুধু বরফটা বদলে দিয়ে শুয়ে পড়,—আর রাত জাগিস্ নে।

বঙ্কু আসিয়া বরফ বদলাইয়া দিল এবং ফিরিয়া গিয়া সেই খাটিয়ার উপর শুইয়া পড়িল। অনতিবিলম্বে তাহার যখন নাক ডাকিতে লাগিল, আমি আস্তে আস্তে ডাকিলাম, পিয়ারী।

পিয়ারী মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া, কপালের জলবিন্দুগুলা আঁচলে মুছাইয়া লইয়া বলিল, আমাকে কি চিনতে পারচ? এখন কেমন আছ? কা—

ভাল আছি। কখন এলে? এ কি আরা?

হাঁ, আরা। কাল আমরা বাড়ি যাবো।

কোথায়?

পাটনায়। আমার বাড়ি ছাড়া আর কি কোথাও এখন তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি?

এই ছেলেটি কে, রাজলক্ষ্মী?

আমার সতীন-পো। কিন্তু বঙ্কু আমার পেটের ছেলেই। আমার কাছে থেকেই ও পাটনা কলেজে পড়ে। আজ আর কথা ক'য়ো না, ঘুমোও—কাল সব কথা বলব।—বলিয়া সে আমার মুখের উপর হাত চাপা দিয়া আমার মুখ বন্ধ করিয়া দিল।

আমি হাত বাড়াইয়া রাজলক্ষ্মীর ডান-হাতখানি মুঠোর মধ্যে লইয়া পাশ ফিরিয়া শুইলাম।

বারো

যাহাতে অচৈতন্য শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছিলাম, তাহা বসন্ত নয়, অন্য জ্বর। ডাক্তারি-শাস্ত্রে নিশ্চয়ই তাহার একটা কিছু গালভরা শক্ত নাম ছিল, কিন্তু আমি তাহা অবগত নই। খবর পাইয়া পিয়ারী তাহার ছেলেকে লইয়া জন-দুই ভৃত্য এবং দাসী লইয়া আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই দিনই একটা বাসা ভাড়া করিয়া আমাকে স্থানান্তরিত করে এবং শহরের ভাল-মন্দ নানাবিধ চিকিৎসক জড় করিয়া ফেলে। ভালই করিয়াছিল। না হইলে, অন্য ক্ষতি না হোক, 'ভারতবর্ষে'র পাঠক-পাঠিকার ধৈর্যের মহিমাটা সংসারে অবিদিত থাকিয়া যাইত।

ভোরবেলা পিয়ারী কহিল, বঙ্কু, আর দেরি করিসনে বাবা, এই বেলা একখানা সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ি রিজার্ভ ক'রে আয়। আমি একদণ্ডও এখানে রাখতে সাহস করিনে।

বঙ্কুর অতৃপ্ত নিদ্রা তখনও দু'চক্ষু জড়াইয়া ছিল; সে মুদ্রিত-নেত্রে অব্যক্ত-স্বরে জবাব দিল, তুমি ক্ষেপেচ মা, এ অবস্থায় কি নাড়ানাড়ি করা যায়?

পিয়ারী একটু হাসিয়া কহিল, আগে তুই উঠে চোখে-মুখে জল দে দেখি, তার পরে নাড়ানাড়ির কথা বোঝা যাবে। লক্ষ্মী বাপ আমার, ওঠ্।

বঙ্কু অগত্যা শয্যা ত্যাগ করিয়া, হাত-মুখ ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া স্টেশনে চলিয়া গেল। তখন সবেমাত্র সকাল হইতেছিল—ঘরে আর কেহ ছিল না। ধীরে ধীরে ডাকিলাম, পিয়ারী!

আমার শিয়রের দিকে আর একখানা খাটিয়া জোড়া দেওয়া ছিল।

তাহারই উপর ক্লান্তিবশতঃ বোধ করি সে ইতিমধ্যে একটুখানি চোখ বুজিয়া শুইয়াছিল; ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া আমার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। কোমলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, ঘুম ভাঙ্গল?

আমি ত জেগেই আছি।

পিয়ারী উৎকণ্ঠিত যত্নের সহিত আমার মাথায় কপালে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে কহিল, জ্বর এখন খুব কম। একটুখানি চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা কর না কেন!

তা তো বরাবরই করচি পিয়ারী! আজ জ্বর আমার ক'দিন হ'ল?

তেরো দিন—বলিয়া সে কতই যেন একটা বর্ষীয়সী প্রবীণার মত গম্ভীরভাবে কহিল, দেখ, ছেলেপিলেদের সামনে আমাকে ও ব'লে ডেকো না। চিরকাল লক্ষ্মী ব'লে ডেকেচো, তাই কেন বল না?

দিন-দুই হইতেই আমি পূর্ণ সচেতন ছিলাম। আমার সমস্ত কথাই স্মরণ হইয়াছিল। বলিলাম, আচ্ছা। তারপরে যাহা বলিবার জন্য ডাকিয়াছিলাম, মনে মনে সেই কথাগুলি একটু গুছাইয়া লইয়া বলিলাম, আমাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করচ—কিন্তু তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি, আর দিতে চাইনে।

তবে কি করতে চাও?

আমি ভাবছি এখন যেমন আছি, তাতে তিন-চারদিনেই বোধ হয় একরকম সেরে যাবো। তোমরা বরঞ্চ এই ক'টা দিন অপেক্ষা করে বাড়ি যাও।

তখন তুমি কি করবে শুনি?

সে যা হয় একটা হবে।

তা হবে, বলিয়া পিয়ারী একটুখানি হাসিল। তার পর সুমুখে উঠিয়া আসিয়া খাটের একটা বাজুর উপর বসিয়া, আমার মুখের দিকে ক্ষণকাল চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া, আবার একটু হাসিয়া কহিল, তিন-চারদিনে না হোক, দশ-বারো দিনে এ রোগ সারবে, আমাকে বলতে পারো?

আসল রোগটা আবার কি?

পিয়ারী কহিল, ভাববে একরকম, বলবে একরকম, করবে আর এক-রকম—চিরকাল ঐ এক রোগ! তুমি জানো যে, একমাসের আগে তোমাকে চোখের আড়াল করতে পারব না—তবু বলবে—তোমাকে কষ্ট দিলুম, তুমি যাও।

ওগো দয়াময়! আমার ওপর যদি তোমার এতই দরদ তবে যাই হোক্ গে— সন্ন্যাসী নও, সন্ন্যাসী সেজে কি হাঙ্গামাই বাধালে। এসে দেখি, মাটির ওপর ছেঁড়া কাঁথায় পড়ে অঘোর অচৈতন্য! মাথাটা ধুলো-কাদায় জট পাকিয়েছে, সর্বাঙ্গে রুদ্রাক্ষি বাঁধা; হাতে দু গাছা পেতলের বালা। মা গো মা! দেখে কেঁদে বাঁচিনে।—বলিতে বলিতেই উদ্বেল অশ্রুজল তাহার দুই চোখ ভরিয়া টলটল করিয়া উঠিল। হাত দিয়া তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলিয়া কহিল, বঙ্কু বলে, ইনি কে মা? মনে মনে বললুম, তুই ছেলে, তোর কাছে সে-কথা আর কি বলব বাবা! উঃ কি বিপদের দিনই সে দিনটা গেছে। মাইরি, কি শুভক্ষণেই পাঠশালে দুজনের চার-চক্ষুর দেখা হয়েছিল! যে দুঃখটা তুমি আমাকে দিলে, এত দুঃখ ভূ-ভারতে কেউ কখনো কাউকে দেয়নি—দেবে না। শহরের মধ্যে বসন্ত দেখা দিয়েছে—সবাইকে নিয়ে ভালোয় ভালোয় পালাতে পারলে যে বাঁচি।—বলিয়া সে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

সেই রাত্রেই আমরা আরা ত্যাগ করিলাম। একজন ছোকরা ডাক্তারবাবু অনেক প্রকার ঔষধের সরঞ্জাম লইয়া আমাদের পাটনা পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতে সঙ্গে গেলেন।

পাটনায় পৌঁছিয়া বার-তেরো দিনের মধ্যেই একপ্রকার সারিয়া উঠিলাম। একদিন সকালে পিয়ারীর বাড়ি একলা ঘরে ঘরে ঘুরিয়া আসবাবপত্র দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইলাম। এমন যে ইতিপূর্বে দেখি নাই, তাহা নয়। জিনিসগুলি ভালো এবং বেশি মূল্যের, তা বটে; কিন্তু এই মাড়োয়ারী-পাড়ার মধ্যে এই সকল ধনী ও অশিক্ষিত শৌখিন মানুষের সংস্রবে এত সামান্য জিনিসপত্রেই এ সন্তুষ্ট রহিল কি করিয়া? ইতিপূর্বে আমি আরও যতগুলি এই ধরনের ঘরদ্বার দেখিয়াছি, তাহাদের সহিত কোথাও ইহার কোন সাদৃশ্য নাই। সেখানে ঢুকিলেই মনে হইয়াছে, ইহার মধ্যে মানুষ ক্ষণকালও অবস্থান করে কি করিয়া? ইহার ঝাড়-লণ্ঠন, ছবি, দেয়ালগিরি, আয়না গ্লাসকেসের মধ্যে আনন্দের পরিবর্তে আশঙ্কা হয়—সহজ শ্বাস-প্রশ্বাসের অবকাশটুকুও বুঝি মিলিবে না। বহুলোকের বহুবিধ কামনা-সাধনার উপহাররাশি এমনি ঠাসা-ঠাসি গাদাগাদিভাবে চোখে পড়ে যে, দৃষ্টিপাতমাত্রেই মনে হয়, এই অচেতন জিনিসগুলার মত তাহাদের সচেতন দাতারাও যেন এই বাড়ির মধ্যে একটুখানি জায়গার জন্য এমনি ভিড় করিয়া পরস্পরের সহিত রেষারেষি ঠেলাঠেলি করিতেছে। কিন্তু এ-বাড়ির কোন ঘরে আবশ্যকীয় দ্রব্যের অতিরিক্ত একটা

বস্তুও চোখে পড়িল না ; এবং যাহা চোখে পড়িল, সেগুলি যে গৃহস্বামিনীর আপনার প্রয়োজনেই আহৃত হইয়াছে, এবং তাহার নিজের ইচ্ছা এবং অভি-রুচিকে অতিক্রম করিয়া আর কাহারও প্রলুব্ধ অভিলাষ যে অনধিকার প্রবেশ করিয়া জায়গা জুড়িয়া বসিয়া নাই, তাহা অতি সহজেই বুঝা গেল। আরও একটা ব্যাপার আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। একটা নামজাদা বাইজীর গৃহে গান বাজনার কোন আয়োজন কোথাও নাই। এ-ঘর সে-ঘর ঘুরিয়া দোতলার একটা কোণের ঘরের দরজার সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম। এটি যে বাইজীর নিজের শয়নমন্দির, তাহা ভিতরে চাহিবামাত্রই টের পাইলাম ; কিন্তু আমার কল্পনার সহিত ইহার কতই না প্রভেদ! যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহার কিছুই নাই। মেজেটি সাদা পাথরের, দেয়ালগুলি দুধের মত সাদা ঝকঝক করিতেছে। ঘরের একধারে একটি ছোট তক্তপোশের উপর বিছানা পাতা। একটি কাঠের আলনায় খান-কয়েক বস্ত্র এবং তাহারই পিছনে একটি লোহার আলমারি। আর কোথাও কিছু নাই। জুতাপায়ে প্রবেশ করিতে কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ হইল—চৌকাঠের বাহিরে খুলিয়া রাখিয়া ভিতরে ঢুকিলাম। বোধ করি ক্লান্তি-বশতঃই তাহার শয্যায় আসিয়া বসিয়াছিলাম, না হইলে ঘরে আর কিছু বসিবার জায়গা থাকিলে তাহাতেই বসিতাম।

সুমুখের খোলা জানালা ঢাকিয়া একটা মস্ত নিমগাছ ; তাহার ভিতর দিয়া ঝিরঝির করিয়া বাতাস আসিতেছিল। সেই দিকে চাহিয়া হঠাৎ কেমন একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম। একটা মিষ্ট শব্দে চমকিত হইয়া দেখিলাম, গুন্‌গুন্‌ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে পিয়ারী ঘরে ঢুকিয়াছে। সে গঙ্গায় স্নান করিতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া নিজের ঘরে ভিজা কাপড় ছাড়িতে আসিয়াছে। সে এদিকে একেবারেই তাকায় নাই। সোজা আলনার কাছে গিয়া শুষ্কবস্ত্রে হাত দিতেই, আমি ব্যস্ত হইয়া সাড়া দিলাম—ঘাটে কাপড় নিয়ে যাও না কেন?

পিয়ারী চমকিয়া চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল। কহিল, অ্যাঁ—চোরের মত আমার ঘরে ঢুকে বসে আছ? না, না বসো বসো—যেতে হবে না ; আমি ও-ঘর থেকে কাপড় ছেড়ে আসছি ; বলিয়া লঘু-পদক্ষেপে গরদের কাপড়খানি হাতে করিয়া বাহির হইয়া গেল।

মিনিট-পাঁচেক পরে প্রফুল্ল মুখে ফিরিয়া আসিয়া, হাসিয়া কহিল, আমার

ঘরে ত কিছুই নেই; তবে কি চুরি করতে এসেছিলে বল ত? আমাকে নয় ত?

আমি বলিলাম, আমাকে এমনই অকৃতজ্ঞ পেয়েছ? তুমি আমার এত করলে, আর শেষে তোমাকেই চুরি করব? আমি এত লোভী নই।

পিয়ারীর মুখ ম্লান হইয়া গেল। কথাটায় সে যে ব্যথা পাইতে পারে, বলিবার সময় তাহা ভাবি নাই। ব্যথা দিবার ইচ্ছাও ছিল না, থাকা স্বাভাবিকও নয়। বিশেষতঃ দুই-একদিনের মধ্যেই আমি প্রস্থানের সঙ্কল্প করিতেছিলাম; বেফাঁস কথাটা সারিয়া লইবার জন্য জোর করিয়া হাসিয়া বলিলাম, নিজের জিনিস বুঝি কেউ চুরি করতে আসে? এই বুঝি তোমার বুদ্ধি?

কিন্তু এত সহজে তাকে ভুলানো গেল না। মলিন মুখে কহিল, তোমাকে আর কৃতজ্ঞ হতে হবে না—দয়া করে সে-সময়ে যে একটা খবর পাঠিয়েছিলে, এই আমার ঢের।

তাহার শুদ্ধস্নাত প্রফুল্ল হাসি-মুখখানি এই রৌদ্রোজ্জ্বল সকালবেলাটাতেই ম্লান করিয়া দিলাম দেখিয়া, একটা বেদনার মত বুকের মধ্যে বাজিতে লাগিল। সেই হাসিটুকুর মধ্যে কি যেন একটা মাধুর্য ছিল যে, তাহা নষ্ট হইবামাত্র ক্ষতিটা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। ফিরিয়া পাইবার আশায় তৎক্ষণাৎ অনুতপ্ত-স্বরে বলিয়া উঠিলাম, লক্ষ্মী, তোমার কাছে ত লুকানো কিছু নেই—সবই ত জানো। তুমি না গেলে আমাকে সেই ধুলোবালির উপরেই মরে থাকতে হ'ত, কেউ ততদূর গিয়ে একবার চেষ্টা পর্যন্তও করত না। সেই যে চিঠিতে লিখে-ছিলে, সুখের দিনে না হোক, দুঃখের দিনে যেন মনে করি—নেহাৎ পরমায়ু ছিল বলেই কথাটা মনে পড়েছিল, তা এখন বেশ বুঝতে পারি।

পারো?

নিশ্চয়।

তা হ'লে আমার জন্যই প্রাণটা ফিরে পেয়েছ বল?

তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই।

তা হলে ওটা দাবি করতে পারি বল?

তা পার। কিন্তু আমার প্রাণটা এত তুচ্ছ যে, তার 'পরে তোমার লোভ হওয়াই উচিত নয়।

পিয়ারী এতক্ষণ পরে একটু হাসিয়া বলিল, তবু ভাল যে নিজের দামটা

এতদিনে টের পেয়েচ। কিন্তু পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া কহিল, তামাশা থাক—অসুখ ত একরকম ভাল হ'ল এখন যাবে কবে মনে করচ?

তাহার প্রশ্ন ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। গম্ভীর হইয়া কহিলাম, কোথাও যাবার ত আমার এখন তাড়া নেই। তাই আরও কিছুদিন থাকব ভাবছি।

পিয়ারী কহিল, কিন্তু আমার ছেলে প্রায়ই আজকাল বাঁকিপুর থেকে আসচে। বেশিদিন থাকলে সে হয়ত কিছু ভাবতে পারে।

আমি বলিলাম, ভাবলেই বা। তাকে ত তোমার ভয় করে চলতে হয় না! এমন আরাম ছেড়ে শীঘ্র কোথাও নড়ছি নে।

পিয়ারী বিরস-মুখে বলিল, তা কি হয়! বলিয়া হঠাৎ উঠিয়া গেল।

পরদিন বিকালবেলায় আমার ঘরের পশ্চিমদিকের বারান্দায় একটা ইজি-চেয়ারে শুইয়া সূর্যাস্ত দেখিতেছিলাম, বঙ্কু আসিয়া উপস্থিত হইল। এতদিন তাহার সহিত ভাল করিয়া আলাপ করিবার সুযোগ হয় নাই। একটা চেয়ারে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া বলিলাম, বঙ্কু, কি পড় তুমি?

ছেলেটি অতিশয় সাদাসিধা ভালমানুষ। কহিল, গতবৎসর আমি এণ্ট্রান্স পাশ করেছি।

এখন তা হ'লে বাঁকিপুর কলেজে পড়ছ ত?

আজ্ঞে হাঁ।

তোমরা ক'টি ভাই বোন?

ভাই আর নেই। চারটি বোন।

তাদের বিয়ে হয়ে গেছে?

আজ্ঞে হাঁ, মা ই বিয়ে দিয়েছেন।

তোমার আপনার মা বেঁচে আছেন?

আজ্ঞে হাঁ, তিনি দেশের বাড়িতেই আছেন।

তোমার এ মা কখনো তোমাদের বাড়িতে গেছেন?

অনেকবার! এই ত পাঁচ-ছ' মাস হ'ল এসেছেন।

সেজন্য দেশে কোন গোলযোগ হয় না?

বঙ্কু একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, হলোই বা। আমাদের 'একঘরে' করে রেখেছে বলে ত আর আমি আপনার মাকে ত্যাগ করিতে পারিনে। আর অমন মা-ই বা ক'জনের আছে!

মুখে আসিল জিজ্ঞাসা করি, মায়ের উপর এত ভক্তি আসিল কিরূপে? কিন্তু চাপিয়া গেলাম।

বন্ধু কহিতে লাগিল, আচ্ছা আপনিই বলুন, গান-বাজনা করাতে কি কোন দোষ আছে? আমার মা ত শুধু তাই করেন। পরনিন্দা পরচর্চা ত করেন না! বরঞ্চ গ্রামে আমাদের যারা পরম শত্রু, তাদেরই সাত-দশজন ছেলের পড়ার খরচ দেন, শীতকালে এত লোককে কাপড় দেন, কম্বল দেন। এ কি মন্দ কাজ করেন?

আমি বলিলাম, না, এ ত খুব ভাল কাজ।

বন্ধু উৎসাহিত হইয়া কহিল, তবে বলুন ত। আমাদের গাঁয়ের মত পাজি গাঁ কোথাও আছে? এই দেখুন না, সে-বছর ইঁট পুড়িয়ে আমাদের কোঠাবাড়ি তৈরী হ'লো। গ্রামে ভয়ানক জলকষ্ট দেখে মা আমার মাকে বললেন, দিদি, আরও কিছু টাকা খরচ করে ইঁটখোলাটাকেই একটা পুকুর কাটিয়ে দিই। তিন-চার হাজার টাকা খরচ করে তাই করে দিলেন, ঘাট বাঁধিয়ে দিলেন। কিন্তু গাঁয়ের লোক সে পুকুর মাকে প্রতিষ্ঠা করতে দিলে না! অমন জল—কিন্তু কেউ খাবে না, ছোঁবে না, এমনি বজ্জাত লোক। কেবল এই হিংসায় সবাই মরে যায় যে, আমাদের কোঠাবাড়ি তৈরি হ'ল। বুঝলেন না?

আমি আশ্চর্য হইয়া বলিলাম, বল কি হে! এই দারুণ জলকষ্ট ভোগ করবে, তবু অমন জল ব্যবহার করবে না?

বন্ধু একটু হাসিয়া কহিল তাই ত। কিন্তু সে কি বেশি দিন চলে? প্রথম বছর ভয়ে কেউ সে জল ছুঁলে না; কিন্তু এখন ছোটলোকেরা সবাই নিচ্ছে, খাচ্ছে—বামুন-কায়েতরাও চৈত্র-বৈশাখ মাসে লুকিয়ে জল নিয়ে যাচ্ছে—কিন্তু তবু পুকুর প্রতিষ্ঠা করতে দিলে না—এ কি মায়ের কম কষ্ট?

আমি কহিলাম, নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভাঙ্গবার যে একটা কথা আছে, এ যে দেখি তাই!

বন্ধু জোর দিয়া বলিযা উঠিল, ঠিক তাই। এমন গাঁয়ে আলাদা, একঘরে হয়ে থাকাই শাপে বর। আপনি কি বলেন?

প্রত্যুত্তরে আমি শুধু হাসিয়া ঘাড় নাড়িলাম, হাঁ-না স্পষ্ট করিয়া কিছুই বলিলাম না। কিন্তু সেজন্য বন্ধুর উদ্দীপনা বাধা পাইল না। দেখিলাম, ছেলেটি তাহার বিমাতাকে সত্যই ভালবাসে। অনুকূল শ্রোতা পাইয়া ভক্তির

আবেগে সে দেখিতে দেখিতে মাতিয়া উঠিল এবং তাঁহার অজস্র স্তুতিবাদে আমাকে প্রায় ব্যাকুল করিয়া তুলিল।

হঠাৎ এক সময়ে তাহার হুঁশ হইল যে, এতক্ষণের মধ্যে আমি একটি কথাতেও কথা যোগ করি নাই। তখন সে অপ্রতিভ হইয়া কোনমতে প্রসঙ্গটা চাপা দিবার জন্য প্রশ্ন করিল, আপনি এখন কিছুদিন এখানে আছেন ত?

আমি হাসিয়া বলিলাম, না, কাল সকালেই আমি যাচ্ছি।

কাল?

হাঁ, কালই!

কিন্তু আপনার দেহ ত এখনো সবল হয়নি। অসুখটা একেবারে সেরেচে বলে কি আপনার মনে হচ্ছে?

বলিলাম, সকাল পর্যন্ত সেরেচে বলেই মনে হয়েছিল বটে, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, না। আজ দুপুর থেকেই আবার মাথাটা ধরেছে।

তবে কেন এত শীঘ্র যাবেন? এখানে ত আপনার কোন কষ্ট নেই,—বলিয়া ছেলেটি চিন্তিত-মুখে আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

আমিও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া তাহার পানে চাহিয়া তাহার মুখের উপর ভিতরের যথার্থ কথাটা পড়িতে চেষ্টা করিলাম; যতটা পড়িলাম, তাহাতে সত্য গোপনের কোন প্রয়াস অনুভব করিলাম না। তবে ছেলেটি লজ্জা পাইল বটে, এবং সেই লজ্জাটা ঢাকিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিল, কহিল, আপনি এখন যাবেন না।

কেন বল দেখি?

আপনি থাকলে মা বড় আনন্দে থাকেন। বলিয়া ফেলিয়াই মুখ রাঙা করিয়া চট্ করিয়া উঠিয়া গেল।

দেখিলাম, ছেলেটি খুবই সরল বটে; কিন্তু নির্বোধ নয়। পিয়ারী কেন যে বলিয়াছিল, আর বেশি দিন থাকলে আমার ছেলে কি ভাববে। কথাটার সহিত ছেলেটির ব্যবহার আলোচনা করিয়া অর্থটা যেন বুঝিতে পারিলাম বলিয়া মনে হইল। মাতৃত্বের এই একটা ছবি আজ চোখে পড়ায় যেন একটা নূতন জ্ঞান লাভ করিলাম; পিয়ারীর হৃদয়ের একাগ্র বাসনা অনুমান করা আমার পক্ষে কঠিন নয়; এবং সে যে সংসারে সব দিক্ দিয়া সর্বপ্রকারেই স্বাধীন, তাহাও কল্পনা করা বোধ করি পাপ নয়। তবুও সে, যে মুহূর্তে এই একটা দরিদ্র বালকের মাতৃপদ স্বেচ্ছায় গ্রহণ

করিয়াছে, অমনি সে নিজের দুটি পায়ে শত-পাকে বেড়িয়া লোহার শিকল বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। আপনি সে যাই হোক, কিন্তু সেই আপনাকে মায়ের সম্মান তাহাকে ত এখন দিতেই হইবে। তাহার অসংযত কামনা, উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি যত অধঃপথেই তাহাকে ঠেলিতে চাউক, কিন্তু একথাও সে ভুলিতে পারে না—সে একজনের মা! এবং সেই সন্তানের ভক্তিনত দৃষ্টির সম্মুখে তাহার মাকে ত সে কোনমতেই অপমানিত করতে পারে না। তাহার বিহ্বল-যৌবনের লালসামত্ত বসন্তদিনে কে যে ভালবাসিয়া তাহার পিয়ারী নাম দিয়াছিল, আমি জানি না; কিন্তু এই নামটা পর্যন্ত সে তাহার ছেলের কাছে গোপন করিতে চায়, এই কথাটা আমার স্মরণ হইয়া গেল।

চোখের উপর সূর্য অস্ত গেল। সেই দিকে চাহিয়া আমার সমস্ত অন্তঃকরণটা যেন গলিয়া রাঙা হইয়া উঠিল। মনে মনে কহিলাম, রাজলক্ষ্মীকে আর ত আমি ছোট করিয়া দেখিতে পারি না। আমাদের বাহ্য ব্যবহার যত বড় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াই এতদিন চলুক না, স্নেহ যতই মাধুর্য ঢালিয়া দিক না, উভয়ের কামনা যে একত্র সম্মিলিত হইবার জন্য অনুক্ষণ দুর্নিবার-বেগে ধাবিত হইতেছিল, তাহাতে ত সংশয় নাই। কিন্তু আজ দেখিলাম, অসম্ভব। হঠাৎ বঙ্কুর মা অভ্রভেদী হিমালয়ের ন্যায় পথ রুদ্ধ করিয়া রাজলক্ষ্মী ও আমার মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মনে মনে বলিলাম, কাল সকালেই ত আমি এখান হইতে যাইতেছি, কিন্তু তখন যেন মনের মধ্যে লাভালাভের হিসাব করিতে গিয়া হাতের পাঁচ রাখিবার চেষ্টা না করি। আমার এই যাওয়াটা যেন যাওয়াই হয়। দেখিতে পাই নাই—ছল করিয়া একখানি অতিসূক্ষ্ম বাসনার বাঁধন রাখিয়া না যাই, যাহার সূত্র ধরিয়া আবার একদিন আসিয়া উপস্থিত হইতে হয়।

অন্যমনস্ক হইয়া সেইখানেই বসিয়াছিলাম। সন্ধ্যার সময় ধুনুচিতে ধূপ-ধুনা দিয়া সেটা হাতে করিয়া রাজলক্ষ্মী এই বারান্দা দিয়াই আর একটা ঘরে যাইতেছিল, থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, মাথা ধরেচে, হিমে বসে কেন—ঘরে যাও।

হাসি পাইল। বলিলাম, অবাক করলে লক্ষ্মী! হিম এখানে কোথায়?

রাজলক্ষ্মী কহিল, হিম না থাক্, ঠাণ্ডা বাতাস ত বইচে। সেইটাই কোন ভাল?

না, সেও তোমার ভুল। ঠাণ্ডা গরম কোন বাতাসই বইচে না।

রাজলক্ষ্মী কহিল, আমার সমস্তই ভুল। কিন্তু মাথাধরাটা ত আর আমার ভুল নয়—সেটা ত সত্যি? ঘরে গিয়ে একটু শুয়েই পড না। রতন কি করচে? সে কি একটু ওডিকোলন মাথায় দিয়ে দিতে পারে না? এ-বাড়ির চাকরগুলোর মত 'বাবু' চাকর আর পৃথিবীতে নেই।—বলিয়া রাজলক্ষ্মী নিজের কাজে চলিয়া গেল।

রতন যখন ব্যস্ত এবং লজ্জিত হইয়া ওডিকোলন জল প্রভৃতি আনিয়া হাজির করিল এবং তাহার ভুলের জন্যে বারংবার অনুতাপ প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন আমি না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না।

রতন সাহস পাইয়া আস্তে আস্তে কহিল, এতে আমার যে দোষ নেই, সে কি আর আমি জানিনে বাবু? কিন্তু মাকে ত বলবার জো নেই যে, তুমি রেগে থাকলে মিছিমিছি বাড়িসুদ্ধ লোকের দোষ দেখতে পাও।

কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিলাম, রাগ কেন?

রতন কহিল, সে কি কারো জানবার জো আছে। বড়লোকের রাগ বাবু শুধু শুধু হয়, আবার শুধু শুধুই যায়। তখন গা-ঢাকা দিয়ে না থাকতে পারলেই চাকর-বাকরদের প্রাণ গেল।

দ্বারের নিকট হইতে হঠাৎ প্রশ্ন আসিল—তখন তোদের কি আমি মাথা কেটে নিই রে, রতন? আর বডলোকের বাড়িতে যদি এত জ্বালা ত আর কোথাও যাস্‌নে কেন?

মনিবের প্রশ্নে রতন কুণ্ঠিত অধোমুখে নিরুত্তরে বসিয়া রহিল। রাজলক্ষ্মী কহিল, তোর কাজটা কি? ওঁর মাথা ধরেচে—বঙ্কুর মুখে শুনে আমি তোকে জানালুম। তাই এখন আটটা রাত্তিরে এসে আমার সুখ্যাতি গাইচিস। কাল থেকে আর কোথাও কাজেব চেষ্টা করিস্—এখানে হবে না। বুঝলি?

রাজলক্ষ্মী চলিযা গেলে, রতন ওডিকোলনের জল দিয়া আমার মাথায় বাতাস করিতে লাগিল। রাজলক্ষ্মী তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কাল সকালেই নাকি বাডি যাবে?

আমার যাবার সঙ্কল্প ছিল বটে, কিন্তু বাড়ি ফিরিবার সঙ্কল্প ছিল না। তাই প্রশ্নটার আর একরকম করিয়া জবাব দিলাম, হাঁ কাল সকালেই যাব।

সকাল ক'টার গাডিতে যাবে।

সকালেই বেরিয়ে পড়ব—তাতে যে গাড়ি জোটে।

আচ্ছা। একখানা টাইম-টেবিলের জন্য কাউকে না-হয় স্টেশনে পাঠিয়ে দিই গে। বলিয়া সে চলিয়া গেল।

তার পরে যথাসময়ে রতন কাজ সারিয়া প্রস্থান করিল। নীচে ভৃত্যদের শব্দ-সাড়া নীরব হইল; বুঝিলাম, সকলেই এবার নিদ্রার জন্য শয্যাশ্রয় করিয়াছে।

আমার কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসিল না। ঘুরিয়া ফিরিয়া একটা কথা কেবলই মনে হইতে লাগিল, পিয়ারী বিরক্ত হইল কেন? এমন কি করিয়াছি যাহাতে সে আমার যাওয়ার জন্যই অধীর হইয়া উঠিয়াছে? রতন বলিয়াছিল, বড়লোকের ক্রোধ শুধু শুধু হয়। কথাটা আর কোন বড়লোকের সম্বন্ধে খাটে কি না জানি না, কিন্তু পিয়ারীর সম্বন্ধে কিছুতেই খাটে না। সে যে অত্যন্ত সংযমী এবং বুদ্ধিমতী, সে পরিচয় আমি বহুবার পাইয়াছি; এবং আমার নিজেরও বুদ্ধি নাই থাক, প্রবৃত্তি-সম্পর্কে সংযম তার চেয়ে কম নয়—বোধ করি কারও চেয়ে কম নয়। বুকের মধ্যে যাই হোক, মুখ দিয়া তাহাকে বাহির করিয়া আনা আমার অতি বড় বিকারের ঘোরেও সম্ভব বলিয়া মনে করি না। ব্যবহারেও কোন দিন কিছু ব্যক্ত করিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। তাহার নিজের কার্যের দ্বারা লজ্জার হেতু কিছু ঘটিয়া থাকে ত সে আলাদা কথা; কিন্তু আমার ওপর রাগ করিবার তাহার কিছুমাত্র কারণ নাই। সুতরাং বিদায়ের সময় তাহার এই ঔদাসীন্য আমাকে যে বেদনা দিতে লাগিল, তাহা অকিঞ্চিৎকর নয়।

অনেক রাত্রে হঠাৎ এক সময়ে তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া চোখ মেলিলাম। দেখিলাম, রাজলক্ষ্মী নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিয়া টেবিলের উপর হইতে আলোটা সরাইয়া ওদিকে দরজার কোণে সম্পূর্ণ আড়াল করিয়া রাখিয়া দিল। সুমুখের জানালাটা খোলা ছিল—তাহা বন্ধ করিয়া দিয়া আমার শয্যার কাছে আসিয়া এক মুহূর্ত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া কি যেন ভাবিয়া লইল। তারপরে মশারির ভিতরে হাত দিয়া প্রথমে আমার কপালের উত্তাপ অনুভব করিল; পরে জামার বোতাম খুলিয়া বুকের উত্তাপ বারংবার অনুভব করিতে লাগিল। নিভৃতচারিণীর এই গোপন করস্পর্শে প্রথমটা কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইয়া উঠিলাম; কিন্তু তখনই মনে হইল, সংজ্ঞাহীন রোগে সেবা করিয়া যে চৈতন্য ফিরাইয়া আনিয়াছে, তাহার কাছে আমার লজ্জা পাইবার আছে কি! তাহার পরে সে বোতাম বন্ধ করিল; গায়ের কাপড়টা সরিয়া গিয়াছিল, গলা পর্যন্ত টানিয়া

দিল ; শেষে মশারির ধারগুলা ভাল করিয়া গুঁজিয়া দিয়া অত্যন্ত সাবধানে কপাট বন্ধ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

আমি সমস্তই দেখিলাম, সমস্তই বুঝিলাম। সে গোপনেই আসিয়াছিল, তাহাকে গোপনেই যাইতে দিলাম। কিন্তু এই নির্জন নিশীথে সে যে তাহার কতখানি আমার কাছে ফেলিয়া রাখিয়া গেল, তাহা কিছুই জানিতে পারিল না। সকালে প্রস্ফুট জ্বর লইয়াই ঘুম ভাঙ্গিল। চোখ-মুখ জ্বালা করিতেছে ; মাথা এত ভারি যে, শয্যাত্যাগ করিতেও ক্লেশ বোধ হইল। তবু যাইতেই হইবে। এ-বাটিতে নিজেকে আর একদণ্ডও বিশ্বাস নাই,—সে যে-কোন মুহূর্তেই ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে। নিজের জন্যও তত নয়! কিন্তু রাজলক্ষ্মীর জন্যই রাজলক্ষ্মীকে ছাড়িতে হইবে, তাহাতে আর কিছুমাত্র দ্বিধা করা চলিবে না।

মনে মনে ভাবিয়া দেখিলাম, সে তাহার বিগত-জীবনের কালি অনেকখানিই ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। আজ তাহার চারিপাশে ছেলে-মেয়েরা মা বলিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই প্রীতি ও ভক্তির আনন্দধাম হইতে তাহাকে অসম্মানিত করিয়া, ছিনাইয়া বাহির করিয়া আনিব—এত বড় প্রেমের এই সার্থকতা কি অবশেষে আমার জীবন অধ্যায়েই চিরদিনের জন্য লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিবে ?

পিয়ারী ঘরে ঢুকিয়া কহিল, এখন দেহটা কেমন আছে ?

বলিলাম, খুব মন্দ নয়। যেতে পারব।

আজ না গেলেই কি নয় ?

হাঁ, আজ যাওয়া চাই।

তা হলে বাড়ি পৌঁছেই একটা খবর দিয়ো। নইলে আমাদের বড ভাবনা হবে।

তাহার অবিচলিত ধৈর্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া বলিলাম, আচ্ছা আমি বাড়িতেই যাব। আর গিয়েই তোমাকে খবর দেব।

পিয়ারী বলিল, দিয়ো। আমিও চিঠি লিখে তোমাকে দু'একটা কথা জিজ্ঞাসা করব।

বাহিরে পাল্‌কিতে যখন উঠিতে যাইতেছি, দেখি দ্বিতলের বারান্দায়

পিয়ারী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার বুকের ভিতরে যে কি করিতেছিল, তাহার মুখ দেখিয়া তাহা জানিতে পারিলাম না।

আমার অন্নদাদিদিকে মনে পড়িল। বহুকাল পূর্বেই একটা শেষদিনে তিনিও যেন ঠিক এমনি গম্ভীর, এমনি স্তব্ধ হইয়াই দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার সেই দুটি করুণ চোখের দৃষ্টি আমি আজিও ভুলি নাই, কিন্তু সে চাহনিতে যে তখন কত বড় একটা আসন্ন বিদায়ের ব্যথা ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা ত পড়িতে পারি নাই। কি জানি, আজিও তেমনি ধারা একটা-কিছু ওই দুটি নিবিড় কালো চোখের মধ্যেও আছে কি না।

নিঃশ্বাস ফেলিয়া পাল্‌কিতে উঠিয়া বসিলাম। দেখিলাম, বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না—ইহা দূরেও ঠেলিয়া ফেলে। ছোটখাটো প্রেমের সাধ্যও ছিল না—এই সুখৈশ্বর্যপরিপূর্ণ স্নেহ-স্বর্গ হইতে মঙ্গলের জন্য, কল্যাণের জন্য আমাকে আজ একপদও নড়াইতে পারিত। বাহকেরা পাল্‌কি লইয়া স্টেশন-অভিমুখে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। মনে মনে বারংবার বলিতে লাগিলাম, লক্ষ্মী, দুঃখ করিও না ভাই, এ ভালই হইল যে, আমি চলিলাম। তোমার ঋণ ইহজীবনে শোধ করিবার শক্তি আমার নাই। কিন্তু যে জীবন তুমি দান করিলে, সে জীবনের অপব্যবহার করিয়া আর না তোমার অপমান করি—দূরে থাকিলেও এ-সঙ্কল্প আমি চিরদিন অক্ষুণ্ণ রাখিব।

———

॥ পর্যালোচনা ॥

লেখক পরিচিতি :

প্রথম আবির্ভাবেই সকলকে সচকিত, সম্মোহিত করে বাঙ্‌লা উপন্যাস সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব। তখন রবীন্দ্রনাথ-প্রভাতকুমারের গল্প-উপন্যাস বাঙ্‌লার পাঠকচিত্তকে মোটামুটি আবিষ্ট রেখেছে ; তখন কেউ ভাবতে পারেনি যে ১৯০৩-এর কুন্তলীন-পুরস্কার বিজয়ী 'মন্দির' গল্পের অখ্যাত লেখক পরবর্তীকালে রবীন্দ্র-কিরণ ও প্রভাত-রশ্মিকে আচ্ছন্ন করে বাঙালী পাঠকের প্রাণে শরৎ পূর্ণিমার চন্দ্রালোক ছড়িয়ে দেবে। ১৯০৭-এ 'ভারতী' পত্রিকায় লেখকের নাম ছাড়া 'বড়দিদি' যখন প্রকাশিত হয় তখন বঙ্গদর্শন-সম্পাদক শৈলেশ মজুমদার ও সমগ্র পাঠকসমাজ মুগ্ধ-মনে সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই 'বড়দিদি'র লেখক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন জানালেন যে তিনি 'বড়দিদি'র লেখক নন তখন সত্য আবিষ্কৃত হলো। এইভাবে বাঙ্‌লা গল্প-উপন্যাসের পাঠকসমাজকে সচকিত-সম্মোহিত ক'রে আবির্ভূত হয়েছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি নিজেই এক সময় বলেছেন—'In Bengal, I am the only writer who has not had to struggle.'

এত সহজে যে শরৎচন্দ্র পাঠক-মন জয় করতে পেরেছিলেন তার কারণ তিনি যে বাস্তবজীবনে ছবি এঁকেছেন তার সঙ্গে একটা সূক্ষ্ম রোমান্সের বিস্ময়বোধ বিজড়িত ছিল। প্রতিদিনের সঙ্গে দিনাতীতের, প্রত্যক্ষের সঙ্গে পরোক্ষের, বাস্তবের সঙ্গে রোমান্সের বিস্ময়কর মিল ঘটাতে পেরেছিলেন ব'লেই তাঁর লেখা সাধারণ মানুষের জীবনের সাধারণ কাহিনী পাঠকের মন প্রবলভাবে আকৃষ্ট করেছে। পাঠক এইসব রচনায় নিজের মনের আয়নায় যেন নিজের জীবনেরই প্রতিচ্ছবি দেখেছে।

বাঙ্‌লাদেশের সমাজ ও সমাজপতিদের হৃদয়হীনতা, তাদের পীড়নে-পেষণে দলিত অসহায় নরনারীর বিচিত্র বেদনাকে সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত করেছেন শরৎচন্দ্র। যারা উপেক্ষিত-অবহেলিত, যারা নিন্দিত-ভর্ৎসিত—সকলেরই মধ্যে মনুষ্যত্বের মহিমা সন্ধান করেছিলেন তিনি। সহজ ভাষায় সহজ প্রাণের সকরুণ ব্যথাকে রূপ দিয়েছিলেন তিনি। সমাজের পীড়নে ক্লিষ্ট নরনারীর হৃদয়বেদনাকে পাঠকের সহানুভূতির সামগ্রী করতে চেয়েছিলেন শরৎচন্দ্র

হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর শরৎচন্দ্রের জন্ম হয়। তিনি পিতামাতার দ্বিতীয় সন্তান। প্রথম সন্তান অনিলা-দেবী শরৎচন্দ্রের দিদি। পিতা মতিলাল চট্টোপাধ্যায়, মাতা ভুবনমোহিনী দেবী। হালিশহরের রামধন গঙ্গোপাধ্যায় সরকারী কর্মোপলক্ষে ভাগলপুরে ছিলেন এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস সুরু করেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের মাতামহ, ভুবনমোহিনীর পিতা। রামধন গঙ্গোপাধ্যায়ের পাঁচপুত্র পরবর্তীকালে ভাগলপুরে সম্পন্ন যৌথ পরিবারে অন্তর্ভূর্ক্ত থাকতেন। সেখানেই (মাতুলালয়ে) শরৎচন্দ্রের বাল্য ও কৈশোরের অধিকাংশ ভাগ কেটেছে। শরৎচন্দ্রের জীবনে ও সাহিত্যে এই ভাগলপুরের প্রভাব অতিশয় ব্যাপক। শরৎচন্দ্রের বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের অনেকদিন ভাগলপুরের এই যৌথ পরিবারে কেটেছে ব'লেই বোধকরি বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারের যৌথ-জীবনযাত্রার সরস, প্রত্যক্ষ ও বর্ণবহুল চিত্রাঙ্কনে তিনি বাঙ্‌লা সাহিত্যে অদ্বিতীয় নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পেরেছেন।

জীবন ও সাহিত্য :

শরৎচন্দ্রের পিতা মতিলাল চট্টোপাধ্যায় ছিলেন অস্থিরচিত্ত ভবঘুরে ধরণের মানুষ। তাঁর ছিল সাহিত্যরচনার নেশা। অস্থিরচিত্ততার জন্য তিনি কখনও কোন চাকুরীতে টিকে থাকতে পারেননি, এবং, অনেক কিছু লিখলেও কোন কিছু সম্পূর্ণ করতে পারেননি। তিনি শ্বশুরবাড়িতে থেকে স্কুলের পাঠ শেষ করেন, কলেজে ভর্তি হয়ে পড়া শেষ না ক'রে দেবানন্দপুরে ফিরে যান, আবার ভাগলপুরে ফিরে আসেন। একবার ডিহরিতে কিছুদিনেব জন্য চাকুরী করেন। কোথাও তিনি পাকাপাকিভাবে থাকেননি।

উত্তবাধিকাব :

শরৎচন্দ্র লিখেছেন—From my father I inherited nothing, except, as I believe, his restless spirit and his keen interest in literature'. মতিলালের এই দুইটি চরিত্র-বৈশিষ্ট্য—অস্থিরচিত্ততার ফলে ভবঘুরে স্বভাব ও সাহিত্যানুরাগ—পুত্র শরৎচন্দ্রের মধ্যে কিছুটা সংক্রমিত হয়েছিলো। শরৎচন্দ্র অল্প বয়সে ভবঘুরে হ'য়ে বহুদেশ ঘুরে এসেছিলেন এবং সারাজীবন স্বপ্নবিভোর হয়ে কাটিয়েছেন। ভাগলপুর-রেঙ্গুন-কলকাতায় যেমন তার

জীবন ও কর্ম প্রসারিত হয়েছে, তেমনি সাহিত্যসৃষ্টি থেকে স্বদেশী আন্দোলন পর্যন্ত তাঁর আত্মনিয়োগের ক্ষেত্র বিস্তৃতি লাভ করেছে।

শরৎচন্দ্রের জন্মের পর মতিলাল বেশ কিছুদিন দেবানন্দপুরে বসবাস করেন। সেখানেই পাঁচ বছর বয়সের শরৎচন্দ্রকে তিনি 'প্যারীপণ্ডিতের পাঠশালায়' ভর্তি ক'রে দেন। এই পাঠশালায় পডার সময়ে কোনও বালিকার গাঁথা বৈঁচিফুলের মালা শরৎচন্দ্র লাভ করতেন কিনা তা' যদিও জানা যায় না, তবে, এইটুকু জানা গেছে যে তিনি পণ্ডিতমশায়ের উপর দৌরাত্ম্য ক'রে সেখান থেকে পলায়ন করেছিলেন। ইন্দ্রনাথের কাহিনীতে তারই প্রতিফলন পাওয়া যায়।

মতিলাল কখনও ভাগলপুর ছেড়ে দেবানন্দপুরে আবার দেবানন্দপুর ছেড়ে ভাগলপুরে এসে বসবাস করতেন। অবশেষে দেবানন্দপুরের বাস উঠিয়ে স্থায়ীভাবে ভাগলপুরে এসে গেলেন। অল্পদিন ডিহরীতে চাকুরী উপলক্ষে ছিলেন এবং স্ত্রীর মৃত্যুর পর ভাগলপুরের শ্বশুরালয় ছেডে ভাগলপুরেরই সন্নিকটে খঞ্জরপুরে ভাড়া বাড়িতে বসবাস সুরু করেন। এই খঞ্জরপুরে বাসকালে নিদারুণ অর্থসংকট দেখা দেওয়ায় শরৎচন্দ্র এফ-এ পরীক্ষার ফী দিতে না পেরে বনেলী এস্টেটে চাকুরী গ্রহণ করেন। কিন্তু, পিতার মতই অল্পদিনে সে কাজ ছেডে দিয়ে ভাগলপুরে ফিরে আসেন। খঞ্জরপুরের এই ভাডা বাড়িতে থাকাকালে মতিলাল এবং শরৎচন্দ্র আর্থিক দিক দিয়ে চরম দুর্গতির মধ্যে পডেন। এক সময়ে শরৎচন্দ্র সন্ন্যাসীর বেশে গৃহত্যাগ করে নিরুদ্দেশ হন। সন্ন্যাসীর বেশেই তিনি মজঃফরপুরে অনুরূপা দেবীর গৃহে উপস্থিত হন। মজঃফরপুরে তিনি মহাদেব শাহু নামে এক জমিদার-তনয়ের সান্নিধ্যে আসেন এবং তার আশ্রয়ে কিছুদিন ছিলেন। সেখানে থাকাকালেই তিনি পিতা মতিলালের মৃত্যুসংবাদ পান। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র ভাগলপুরকে পিছনে ফেলে ক'লকাতায় এসে উপস্থিত হন। শরৎচন্দ্রের এই ভাগলপুর জীবন শ্রীকান্ত ১ম পর্বে অনেকাংশে প্রতিফলিত হয়েছে।

শরৎচন্দ্র ও শ্রীকান্ত :

ভাগলপুরের বাঙ্গালীটোলায় গাঙ্গুলীদের যৌথ পরিবারে মা ভুবনমোহিনী ও বাবা মতিলালের সঙ্গে শরৎচন্দ্র বাল্যজীবন কাটিয়েছেন। শ্রীকান্ত-১ম পর্বের পিসিমা ও পিসেমশাইকে ভুবনমোহিনী ও মতিলালের মধ্যে সহজেই

সন্ধান করা যায়। মেজদাদার নেতৃত্বে পড়াশোনায় যে চিত্র বর্ণিত আছে তাকে সহজেই গাঙ্গুলীদের বৈঠকখানায় খুঁজে নেওয়া যেতে পারে। কুমার সাহেবের তাঁবুকে মজঃফরপুরের জমিদার-তনয় মহাদেব শাহুর তাঁবু ভেবে নিতেও কোন অসুবিধা হবার কথা নয়। খঞ্জরপুর থেকে সন্ন্যাসীবেশে নিরুদ্দেশ হ'য়ে যাওয়া শরৎচন্দ্র যথার্থই শ্রীকান্তর মত গাঁজার উপকরণ ও দুই চেলা পরিবৃত 'গুরুজী'র শিষ্যত্ব সাময়িকভাবে নিয়েছিলেন কিনা তা অনুমানসাপেক্ষ। শ্রীকান্ত ১ম পর্বে যে দুঃসাহসী বালক রাতের অন্ধকারে গোঁসাইবাগানের সর্পসঙ্কুল ভয়াবহ জঙ্গলের ভিতর দিয়ে বাঁশি বাজিয়ে চলে আসতো কিংবা প্রহরারত জেলেদের ফাঁকি দিয়ে দুরন্তস্রোত তুচ্ছ করে নৌকা চালিয়ে মাছ চুরি ক'রে আনতো তার মধ্যে শরৎচন্দ্রের নিজের বাল্যজীবনের প্রতিবিম্ব খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। এ বিষয়ে মনীষী সমালোচক জানাচ্ছেন—"গ্রামে তিনি নৌকা চালাইয়া মাছ ধরিয়া সময় কাটাইতেন। ভাগলপুরে আসিয়া তিনি নানা খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করিতেন, নদীতে সাঁতার কাটিতেন, সাপ ধরিতে চেষ্টা করিতেন এবং গভীর রাত্রিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার না ছিল সাপের ভয়, না ছিল ভূতের ভয়।" শরৎচন্দ্র তাঁর এই বাল্যজীবনের ছবি মনে মনে অনুধ্যান ক'রেই কি 'মহাপ্রাণ' ইন্দ্রনাথকে সৃষ্টি করেছিলেন ?

মাটি থেকে রস আহরণ করে গাছ, কিন্তু ফুলটি যখন সে ফোটায় তখন আর মাটিতে নয়, আকাশে। বাস্তবের মাটি থেকে রস আহরণ ক'রে কবির মনোতরু ফুলটি ফোটান কল্পনার আকাশে। সাহিতি ক তাঁর সৃষ্টির উপাদান সংগ্রহ করেন বাস্তবজীবন থেকে ; কিন্তু, সাহিত্য বাস্তবের হুবহু প্রতিচ্ছবি নয়। বস্তু জগতের অভিজ্ঞতা লেখকের কল্পনার যোগে নূতন রূপে মণ্ডিত হ'য়ে সাহিত্যে রূপলাভ করে। ব্যক্তি শরৎচন্দ্রের অভিজ্ঞতা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের মানসকল্পনার রসে জারিত হয়ে নূতন মূর্তি পরিগ্রহ করেছে শ্রীকান্ত ১ম পর্বে।

শ্রীকান্ত ১ম পর্বের পর্যালোচনা :

১৯১৫ খৃষ্টাব্দ থেকে, ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ১৩ মাস ধ'রে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় 'শ্রীশ্রীকান্ত শর্মা' নামে এক লেখকের 'শ্রীকান্তর ভ্রমণ কাহিনী' প্রকাশিত হতে থাকে। প্রথম দুইটি সংখ্যার পরেই লেখকের নাম দেখা

যায় শ্রীকান্ত শর্মার পরিবর্তে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৯১৭-র ১২ই ফেব্রুয়ারী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'শ্রীকান্ত ১ম পর্ব' পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। বলাবাহুল্য, গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে 'ভ্রমণ কাহিনী' শব্দটি বর্জিত হয়। এর্ মধ্য দিয়ে লেখকের দুইটি অভীপ্সা প্রকটিত হয়। এক, লেখক এই রচনাটিকে 'ভ্রমণ কাহিনী' হিসাবে গণ্য করতে চাননি। দ্বিতীয়, তিনি শ্রীকান্তকেই এই কাহিনীর কেন্দ্রীয় চরিত্র বা নায়ক রূপে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন। যদিও গ্রন্থের সুরুতেই শ্রীকান্ত তার 'ভবঘুরে' জীবনের বৃত্তান্ত বলতে সুরু করেছেন এবং গ্রন্থ মধ্যে 'ভারতবর্ষের' পাঠক-পাঠিকার উল্লেখ থেকে গেছে। এককথায়, 'শ্রীকান্তর ভ্রমণ কাহিনী'-রই পরিমার্জিত রূপ 'শ্রীকান্ত' ১ম পর্ব।

কাহিনী :

শ্রীকান্ত ১ম পর্বের কাহিনীকে দুইটি সুস্পষ্ট ভাগে ভাগ করা যায়। দ্বাদশটি পরিচ্ছেদে গ্রথিত এই শ্রীকান্ত-কথার প্রথম সাতটি অধ্যায় নিয়ে একটি ভাগ ও শেষ পাঁচটি অধ্যায় নিয়ে আরেকটি ভাগ। প্রথমভাগে শ্রীকান্তর বাল্য ও কৈশোরের কাহিনী, দ্বিতীয়ভাগে যৌবনের দিনে বিচিত্র প্রণয়সঞ্চারের বৃত্তান্ত।

কাহিনীর সূত্রপাত ফুটবল খেলার মাঠে। দুইদলের প্রচণ্ড মারামারির মধ্যে পড়ে গোবেচারা শ্রীকান্ত যখন দিশাহারা তখনই বিপদ্-তারণ রূপে অচেনা ইন্দ্রনাথের আবির্ভাব। তার আজানুলম্বিত বাহুর শক্তিতে শ্রীকান্তর বিপদমুক্তি। ইন্দ্রনাথের পকেটে শুক্‌নো সিদ্ধিপাতা ও তার অকুতোভয় ধূমপান শ্রীকান্তকে বিস্ময়ে বিহ্বল করে। মনে মনে ইন্দ্রনাথের জন্য শ্রীকান্তর বিচিত্র আকর্ষণবোধ জাগে। মেজদাদার কৌতুককর শাসনে সন্ত্রস্ত ছোট ভাইদের পাঠাভ্যাস, অকস্মাৎ 'হুম্' শব্দে ব্যাঘ্ররূপী বহুরূপীর আবির্ভাবে মেজদাদার চৈতন্যলোপ, সারা বাড়ির সকলে ভয়ে সন্ত্রস্ত, পিসেমশাইদের 'সড়কি লাও', 'বন্দুক লাও' চিৎকার,—ওদিকে গোঁসাইবাগানের সর্পসঙ্কুল জঙ্গলের পথ বেয়ে বাঁশি বাজিয়ে ইন্দ্রনাথের আগমন। চেঁচামেচি শুনে সকলের সাবধান-বাক্য উপেক্ষা করে অকুস্থলে তার আবির্ভাব এবং বিনা দ্বিধায় প্রাঙ্গনের ডালিমগাছের তলায় লুকিয়ে থাকা শ্রীনাথ বহুরূপীর উদ্ধার। দুঃসাহসী নির্ভীক ইন্দ্রনাথের মোহময় আহ্বানে সাড়া, রাতের অন্ধকারে

প্রবল স্রোতোধারা উপেক্ষা ক'রে ইন্দ্রের সাহচর্যে জেলেদের মাছ চুরি করা, সেই মাছ বিক্রয় করা, ফেরার পথে শ্মশান ঘাটের সিঁড়ির কাছে সাত-আট বছরের শিশুর মৃতদেহের প্রতি ইন্দ্রনাথের মমত্ব, শ্রীকান্তর গৃহে প্রত্যাবর্তনে মেজদার শাসনের উদ্যোগ পিসিমার হস্তক্ষেপে ব্যাহত ও বাড়ির অন্যান্য বালকদের মেজদার অধিকার-চ্যুতিতে উল্লাস। আট দশ দিন পরে ইন্দ্রের পুনরাবির্ভাব, দিদির কাছে যাওয়ার জন্য শ্রীকান্তর সম্মতি-আদায়, নৌকাযোগে ঘন বনাচ্ছাদিত সাপুড়ের ঝুপড়িতে আসা, নেশাচ্ছন্ন শাহজীর প্রসন্নতার প্রত্যাশায় ইন্দ্রর আকুতি, গোখরো সাপ নিয়ে ইন্দ্রর খেলার ব্যর্থ চেষ্টা, অন্নদাদিদির আবির্ভাবে শ্রীকান্তর মুগ্ধ বিস্ময়, মন্ত্র-তন্ত্র না-জানার স্বীকারোক্তি, ইন্দ্রের ক্ষোভ, শাহজীর প্রহারে অন্নদাদিদির আর্তনাদে ইন্দ্রনাথের উত্তেজনা ও শাহজীকে শাসন, পুলিশের নামোচ্চারণে শাহজীর নির্বাক হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুব্ধচিত্তে ইন্দ্রনাথের শ্রীকান্তকে নিয়ে স্থানত্যাগ। তিন-চার মাস পরে দত্তদের বাড়ির কালীপূজোয় নাটকাভিনয়ের কৌতুককর বর্ণনা। ইন্দ্রের আবির্ভাব ও শ্রীকান্তকে দিদির আহ্বানের কথা জ্ঞাপন, উভয়ের অন্নদাদিদির কুটিরে উপস্থিতি। সর্পদংশনে শাহজীর মৃত্যু, মৃতদেহ কবরস্থ করা। অন্নদাদিদির এই প্রথম স্বীকারোক্তি যে শাহজী তাঁর স্বামী ছিলেন। তিনদিন পরে শ্রীকান্তকে লেখা অন্নদাদিদির চিঠি—অন্নদাদিদিও হিন্দুর মেয়ে এবং শাহজীও হিন্দুই ছিলেন। বিধবা শ্যালিকাকে হত্যার পরে অন্তর্ধান করেছিলেন। মুসলমান হয়ে সাপুড়েরূপে দেখা দেওয়ায় অন্নদাদিদি স্বামীকে চিনতে পারেন এবং স্বামীর সঙ্গেই গৃহত্যাগ করেন। তিনি কুলটা নন, তিনি পতিব্রতা। তারপরেই শ্রীকান্তর জীবনে চিরস্থায়ী প্রভাব রেখে অন্নদাদিদির অন্তর্ধান। ইন্দ্রও কিছুদিন অন্তর্হিত। হঠাৎ একদিন আবার তার কাছ থেকে থিয়েটার দেখার আহ্বানে শ্রীকান্তর সাড়া দিতে হ'লো। ইন্দ্রর নতুনদা—দর্জিপাড়ার ছেলে—তার কৌতুককর কার্যকলাপ ও হীন আচরণের মধ্যদিয়ে শ্রীকান্তর জীবনে মানুষের হীনতার চিহ্ন রেখে গেল। এইখানেই কাহিনীর প্রথমার্ধের সমাপ্তি, নৌকাচড়ার সমাপ্তি, শ্রীকান্তর জীবনে ইন্দ্রনাথের সাহচর্যেরও সমাপ্তি। বাল্য ও কৈশোর অতিক্রান্ত হয়ে শ্রীকান্তর যুবাবয়সের সূত্রপাত।

দ্বিতীয়ার্ধে, অনেকদিন পরে, অন্নদাদিদির স্মৃতিটাও যখন শ্রীকান্তর চিত্তে ঝাপসা হয়ে গেছে তখন একদিন স্কুলের সহপাঠী এক রাজতনয় কুমার সাহেবের

শিকার পার্টিতে আমন্ত্রণ এলো। সেখানে গিয়ে পাটনা থেকে আগতা বাইজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ, নাম পিয়ারী বাইজী। প্রথম রাতে বাইজীর মনপ্রাণ দিয়ে গাওয়া গানে শ্রীকান্ত যখন মুগ্ধ তখনই এক অপ্রত্যাশিত আঘাত এলো বাইজীর কাছ থেকে—'আপনি এই পনেরো-ষোল দিন ধ'রে এর মোসাহেবি করবেন! যান, কালকেই বাড়ি চলে যান।' তারপর বিস্ময়ের উপর বিস্ময়। বাইজী আসলে বহুকাল আগে যার মৃত্যু হয়েছে বলে রটনা সেই রাজলক্ষ্মী। শৈশবে শ্রীকান্তর অনেক জুলুম নীরবে সহ্য করেছে, বৈঁচিফুলের মালা গেঁথে শ্রীকান্তকে উপহার দিয়েছে, সে বড হবার পর বিরিঞ্চি দত্তের পাচক কুলীন ব্রাহ্মণ একসঙ্গে দুই বোন সুরলক্ষ্মী ও রাজলক্ষ্মীকে সত্তর টাকা পণে বিয়ে করে অন্তর্ধান হয়েছে। বছর দেড়েক পরে প্লীহাজ্বরে সুরলক্ষ্মীর মৃত্যু, রাজলক্ষ্মীর মায়ের সঙ্গে কাশীযাত্রা এবং সেখানে ওলাউঠায় মৃত্যুর সংবাদই শ্রীকান্তর জানা ছিল।

কুমার সাহেবের তাঁবুতে ভূতের গল্প শ্রীকান্তর ভূতে অ-বিশ্বাস, শনিবারের অমাবস্যার রাতে শ্মশান-পরিক্রমার অঙ্গীকার এবং তা' জেনে পিয়ারী বাইজীর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, অনুনয়-অনুরোধ। শ্রীকান্তর শ্মশান গমনোদ্যোগের মুহূর্তে পিয়ারীর সকরুণ মিনতি। শ্মশানের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, নিরুদিদির স্মৃতি, রাত্রির শেষপ্রহরে শ্মশানভূমিতে শ্রীকান্তর সন্ধানে পিয়ারীর ভৃত্য রতনের সদলবলে আবির্ভাব শ্রীকান্তর জন্য বাইজীর আন্তরিক উৎকণ্ঠার পরিচয় দেয়। শ্রীকান্ত পিয়ারীর অনুরোধ রক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেয়—গৃহে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত। শ্মশান পরিক্রমার পরের দিন অজ্ঞাতসারে শ্রীকান্তর পথে বেরিয়ে পড়া, নিবিড জঙ্গলে পথ ভুলে সঞ্চরণ, অন্ধকারের রূপ সম্পর্কে অবহিতি, এবং দেশে প্রত্যাবর্তন।

দোলপূর্ণিমার রাতে আবার অজ্ঞাতকারণে গৃহত্যাগ, বিবাগী-চিত্তে পথ-পরিক্রমা, পাটনার সন্নিকটে বাড-স্টেশনে ট্রেন থেকে বিনা-সিদ্ধান্তে উত্তরণ, সামনে পায়ে-চলা অজানা পথ। পায়ে পায়ে এগিয়ে চলে শ্রীকান্ত, বনের মধ্যে ধোঁয়া দেখে মানুষের সন্ধানে গিয়ে সাক্ষাৎ পান এক ভণ্ড সাধুর, সন্ন্যাসীর বেশ পরিধান ক'রে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ছোটবাঘিয়া গ্রামে গুরুজীসহ আবির্ভাব, সেখানে মহামারীরূপে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব, গুরুজীর পলায়ন, শ্রীকান্তর সঙ্গে রামবাবুর পরিবারের ঘনিষ্ঠতা, গ্রামত্যাগের আয়োজনে ব্যস্ত রামবাবুর পরিবার, শ্রীকান্তর জ্বর এবং তাকে ছেড়ে

আতঙ্কিত রামবাবুর গ্রামত্যাগ। জরাক্রান্ত শ্রীকান্তর এক অপরিচিত যুবকের সাহায্যে পাটনায় পিয়ারী বাইজীর কাছে সংবাদ প্রেরণ, পিয়ারীর সদলবলে আগমন ও শ্রীকান্তকে পাটনায় নিজগৃহে আনয়ন। পিয়ারী-বাইজী বা রাজলক্ষ্মীর অকৃপণ সেবায় শ্রীকান্তর রোগমুক্তি। ক্লান্তদেহে রাজলক্ষ্মীর অনুধ্যান, প্রণয়ের পদসঞ্চার, রাজলক্ষ্মীর পালিতপুত্র বঙ্কুর উপস্থিতিতে রাজলক্ষ্মীর মধ্যে প্রেমিকা-মূর্তির তুলনায় মাতৃমূর্তির প্রাধান্য। বঙ্কুর কারণে রোগমুক্ত শ্রীকান্তকে বিদায় দিতে রাজলক্ষ্মীর আগ্রহ। প্রেমিকার কাছে আত্মসমর্পণ করতে শ্রীকান্ত যখন মনে মনে প্রস্তুত, তখনই রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তর চ'লে যাওয়ার জন্য অধীর হ'য়ে উঠলো। শ্রীকান্তকে পাটনা থেকে বিদায় নিতে হ'লো, বুঝতে হ'লো যে, বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না, দূরেও সরিয়ে দেয়।

শ্রীকান্ত-১ম পর্বের শ্রেণী-বিচার :

'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবার কালে যে কাহিনীর নাম ছিল 'শ্রীকান্তর ভ্রমণ কাহিনী', পরবর্তীকালে গ্রন্থাকারে তা' যখন প্রকাশ পেলো তখন লেখক নিজেই 'ভ্রমণ কাহিনী' শব্দটুকু শিরোনাম থেকে বর্জন করেছেন। সুতরাং, এই কাহিনীকে 'ভ্রমণ কাহিনী'-রূপে গ্রহণ করা শরৎচন্দ্রের অভিপ্রেত ছিল না। যদিচ, এতে ভ্রমণের কথা ভূরি ভূরি আছে, লেখক নিজেকে 'ভবঘুরে' ব'লে আখ্যাত করেছেন, বাল্য-কৈশোর-যৌবনের নানা ছোটখাট বিচিত্র ভ্রমণ-বৃত্তান্ত কাহিনীকে আদ্যন্ত আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে—তবু, এ কাহিনীতে ভ্রমণ-রস প্রধান হ'য়ে ওঠেনি ব'লেই বোধকরি লেখক একে ভ্রমণ কাহিনী বলতে চাননি। আজকাল উপন্যাস-রসসিক্ত ভ্রমণবৃত্তান্ত রচনা করা খুব চালু হয়েছে, কিন্তু সেখানেও উপন্যাস রচনা লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য ভ্রমণ-কথা। জীবনের পথে পরিভ্রমণ করতে গিয়ে যে সব বিচিত্র চরিত্র, বিচিত্র ঘটনা ও বিচিত্র পরিবেশের মুখোমুখি শ্রীকান্ত নামধেয় মানুষটি হয়েছেন তারই সরস সজীব বর্ণনা গ্রন্থমধ্যে স্থান পেয়েছে। এতে ভ্রমণ কথার চেয়ে জীবন-কথা প্রধান হ'য়ে উঠেছে। তাই, একে নিছক ভ্রমণ কাহিনী বলা সঙ্গত নয়।

তবে, সাহিত্য হিসাবে 'শ্রীকান্ত-১ম পর্ব' কোন্ শ্রেণীর রচনা? একে কি 'আত্মজীবনী' বলা যাবে? বলা যেতো, যদি, এই কাহিনী শরৎচন্দ্রের

জবানীতে বিবৃত হ'তো। শ্রীকান্ত নামের এক কল্পিত চরিত্রের জবানীতে এখানে সব কথা বলা হয়েছে। লেখকের স্ব-রচিত জীবন কাহিনীকেই আত্মজীবনী বলা হয়। তাতে সমসাময়িক যুগের প্রতিচ্ছবি থাকে—এক অর্থে আত্মজীবনী লেখকের সমকালের সামাজিক, রাষ্ট্রীক জীবনের পরোক্ষ ইতিহাস। 'শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত' কিংবা রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' যে অর্থে আত্মজীবনী, সেই অর্থে শ্রীকান্ত-১ম পর্ব কোনক্রমেই শরৎচন্দ্রের আত্মজীবনী নয়। উত্তম পুরুষে কথিত হ'লেই তা' আত্মজীবনী হয় না। যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী' বা রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে' আত্মজীবনী নয়।

তা'হলে কি আমরা শ্রীকান্ত-১ম পর্বকে উপন্যাস ব'লে ধ'রে নিতে পারি? বাঙ্‌লা উপন্যাস-সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সমালোচক ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'শ্রীকান্ত'-কেই শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ব'লে নির্দেশ করেছেন। কিন্তু 'শ্রীকান্ত' আদৌ পরিপূর্ণ উপন্যাস কিনা সে বিষয়ে তাঁর সংশয় ছিল। তিনি নিজেই লিখেছেন—"ইহাকে ঠিক উপন্যাস বলা চলে কিনা, তাহা একটু বিবেচনার বিষয়। উপন্যাসের নিবিড়, অবিচ্ছিন্ন ঐক্য ইহার নাই; ইহা কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ের বিচ্ছিন্ন পরিচ্ছেদের সমষ্টি।" অন্যদিকে, শরৎ-সাহিত্যের প্রথম ও প্রধান সমালোচক ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত 'গৃহদাহ'-কে শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলেছেন, 'শ্রীকান্ত'-কে তিনি গণ্য করেন নি। তাঁদের তুলনায় আমরা নিতান্তই অর্বাচীন: আমাদের সমস্যা হ'লো, আমরা শ্রীকান্ত-১ম পর্বকে সাহিত্যের শ্রেণী-বিচারে কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করবো?

উপন্যাস মানবজীবনের আপাত-বিন্যাস। মানুষের জীবনে যা ঘটে বা ঘটা সম্ভবপর তারই বাস্তব ছবি উপন্যাসে ফুটে উঠবে। তাতে একটি আদ্যোপান্ত কাহিনী থাকবে, নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে চরিত্রগুলি বিকশিত হবে এবং চরিত্রগুলির মধ্যে একজন সমস্ত ঘটনার কেন্দ্রে বিরাজিত থাকবে যাকে কেন্দ্র করে অন্য চরিত্রগুলি আবর্তিত হবে। সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি মূল ঘটনা, একটি সুডৌল কাহিনী উপন্যাসে অবশ্যই থাকতে হবে যার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিকের একটি বিশিষ্ট বক্তব্য পরিস্ফুট হবে। 'শ্রীকান্ত'তে একটি কেন্দ্রীয় চরিত্র আছে, সে শ্রীকান্ত, এবং অন্যান্য সব চরিত্রই তাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছে; কিন্তু, নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে একটি অমোঘ-পরিণতি 'শ্রীকান্ত'তে খুঁজে পাওয়া যাবে না। মনে রাখতে হবে, শ্রীকান্ত-১ম পর্বটিই আমাদের বিচার্য। এই ১ম পর্বে কোনও সুডৌল কাহিনীও নেই। শ্রীকান্তর

জীবনপথে অনেকে এসেছে, গিয়েছে, ছাপ রেখে গেছে শ্রীকান্তর হৃদয়ে—এই পর্যন্ত। শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর যে কাহিনী গড়ে উঠতে পারে তার সম্ভাবনাটুকু আভাষিত করেই ১ম পর্ব শেষ ঃ সেখানে লেখকের একটিই বক্তব্য—'বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না, দূরেও সরিয়ে দেয়'। ১ম পর্বের দ্বাদশটি পরিচ্ছেদের মধ্যে প্রথম সাতটি পরিচ্ছেদে রাজলক্ষ্মীর চিহ্নমাত্র নেই। সুতরাং শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর কাহিনী এখানে মূল কাহিনী হয়ে ওঠেনি, তার চেয়ে বেশী প্রাধান্য পেয়েছে ইন্দ্রনাথের কথা এবং সেই সূত্রে অন্নদাদিদির প্রসঙ্গ। তাই, শ্রীকান্ত ১ম পর্বকে একটি অমোঘ পরিণতি-সম্পন্ন সুডৌল-কাহিনীযুক্ত উপন্যাস ব'লে অভিহিত করা কঠিন।

তার চেয়ে, লেখকের অনভিপ্রেত হ'লেও শ্রীকান্ত-১ম পর্বকে উপন্যাস-রসসিক্ত ভ্রমণ-কাহিনী বলাই বেশি সংগত হবে। ভ্রমণ-বৃত্তান্ত আছে অনেক, সবই সন্নিকটে এবং অধিকাংশই নৌকাযোগে। শ্রীনাথ বহুরূপীর আখ্যানের পরেই রাতের অন্ধকারে ইন্দ্রনাথের সঙ্গে নৌকাযোগে দুঃসাহসিক অভিযান, শেষরাতে প্রত্যাবর্তনের পথে ৬/৭ বছরের শিশুর মৃতদেহকে ঘিরে ইন্দ্রনাথের মমত্বপ্রকাশ, কয়দিন পরে আবার ইন্দ্রর সঙ্গে নৌকো বেয়ে নিবিড় বনমধ্যে সাপুড়ের ঝুপড়িতে গমন, অন্নদাদিদি ও শাহজীর সঙ্গে পরিচয়; আবার ৩/৪ মাস পরে দত্তদের বাড়ির কালীপূজোর প্রাঙ্গণ থেকে ইন্দ্রর আহ্বানে সাপুড়ের কুটিরে যাওয়া, শাহজীকে সমাধিস্থ করা—কিছুদিন বাদে আবার রাতের অন্ধকারে ইন্দ্রর নতুনদাকে নিয়ে নৌকার গুণটানার বিচিত্র অভিজ্ঞতা—এ সবই সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত। শ্মশান পরিক্রমা, অন্ধকারের রূপ আবিষ্কার সবই ভ্রমণ কাহিনীরই অঙ্গীভূত। অনেকদিন পরে আবার এক দোলপূর্ণিমার রাতে অকস্মাৎ শ্রীকান্তর গৃহত্যাগ, 'বাড' ষ্টেশনে ট্রেন থেকে অবতরণ, পদযাত্রা, বনমধ্যে ধোঁয়া দেখে সন্ন্যাসীর আস্তানায় উপস্থিতি, গুরুজীর সঙ্গে বিঠোরাগ্রামে উপস্থিতি, সন্ন্যাসীর বেশ পরিধান—সবই ভ্রমণকথার অঙ্গ। কিন্তু সেই ভ্রমণকথার সঙ্গে সর্বদাই নানা বিচিত্র ঘটনার বর্ণনা, নানা চরিত্রের বিচিত্র বিকাশ, নানা পরিবেশের সরস বর্ণনা—ভ্রমণকথাকে উপন্যাস-রসে মণ্ডিত করেছে। নতুনদার হৃদয়হীনতা, শাহজীর কৃতঘ্নতা ও ইন্দ্রনাথের মহাপ্রাণতা যেমন আছে তেমনি আছে অন্নদাদিদির পাতিব্রত্য ও রাজলক্ষ্মীর অন্তর্লীন প্রেম। সব মিলিয়ে শ্রীকান্ত-১ম পর্ব যেমন ভ্রমণকাহিনী তেমনি আপাত-উপন্যাস। সুতরাং একে উপন্যাস-রসসিক্ত ভ্রমণকাহিনী বলাই

বিধেয়। যদি 'শ্রীকান্ত'র সব কয়টি পর্ব একত্র ক'রে বিচার করতে হয় তবে 'শ্রীকান্ত' অবশ্যই উপন্যাস। কিন্তু শুধু ১ম পর্বকে উপন্যাস নামে অভিহিত করা সমীচীন হবে না।

ইন্দ্রনাথ:

ফুটবল খেলার মাঠে দুই বিবদমান-পক্ষের মারামারির মধ্যে পড়ে শ্রীকান্ত যখন বিপন্ন তখনই তার জীবনে ত্রাণকর্তা-রূপে আবির্ভাব ঘটেছিলো ইন্দ্রনাথের। ইন্দ্রনাথ তখন শৈশব অতিক্রম করে কৈশোরে পা দিয়েছে। এই আজানুলম্বিত বাহু কিশোর সেদিন শুধু শ্রীকান্তকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছে তা নয়, সে শ্রীকান্তর জীবনে চিরস্থায়ী দাগ রেখে গেছে। দুর্দম, দুঃসাহসী এই কিশোরের শিশুসুলভ সারল্য ও নির্লিপ্ততা আমাদের মনে অপার-বিস্ময় ও বিহ্বলতার সঞ্চার করে। সমগ্র বাঙ্‌লা সাহিত্যে শুধু নয়, পৃথিবীর কোনও সাহিত্যেই তার মত আরেকজনকে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। ইন্দ্রনাথের আচার-আচরণ ও কার্যকলাপের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের এমন একটা ছাপ আছে যা তাকে মহামানবের পর্যায়ে উন্নীত করেছে। তদ্গতচিত্তে শ্রীকান্ত একদিন তাকে 'মহাপ্রাণ' ব'লে অভিহিত করেছে।

ইন্দ্রনাথ যথার্থই মহামানব। নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়ে অক্ষত অনাহত অবস্থায় বেরিয়ে আসা তার প্রায় প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গ। খেলার মাঠে মারামারি, গঙ্গার উজান বেয়ে মাছ চুরি, জেলেদের অতন্দ্র-প্রহরাকে ফাঁকি দিয়ে অকুতোভয়ে মাছ নিয়ে পালানো, বন্যজন্তুসঙ্কুল পথ দিয়ে রাতের অন্ধকারে নির্ভয়-নির্লিপ্ত মনে বাঁশি বাজিয়ে চলা—সবই সে এত সহজে এত অনায়াসে করে যে মনে হয় আর পাঁচজনের কাছে যা অসম্ভব ইন্দ্রনাথের কাছে তা' অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক। যে পথে পদে পদে কন্টকের অভ্যর্থনা সেই পথই ইন্দ্রনাথের কাছে কুসুমাস্তীর্ণ। বড়লোকের বকাটে ছেলের সব দোষ তার মধ্যে আছে, পকেট থেকে সিদ্ধিপাতা বের ক'রে চিবিয়ে খাওয়া, যত্রতত্র প্রকাশ্যে ধূমপান করা—ঐ বয়সে যা কিছু গর্হিত কাজ সবই সে নির্দ্বিধায় করে। তার নিঃশঙ্ক সাহস নানাভাবে প্রকাশ পায়। বন্যজন্তুকে তার ভয় নেই, দাঙ্গায় উন্মত্ত মুসলমান ছেলেদের সে ভয় করে না, শাহজীর উদ্যত বর্শাকে সে ভয় করেনি, ভীমবেগে প্রধাবিত গঙ্গার স্রোতকে সে ভয় করে না, এমনকি মাছ চুরি করার সময়ে জেলেরা

যদি চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে তা'তেও তার ভয়ের কারণ নেই। ভয় শুধু আছে ভূতের, কিন্তু সে ভয় জয় করার মন্ত্র তার জানা আছে—রাম নাম। হিন্দুধর্মের সর্ববিধ সংস্কারে তার অগাধ বিশ্বাস। অন্নদাদিদির মুসলমান হওয়াকে সে সহ্য করতে পারেনি; কালীর জবাফুলে আসক্তি, রামনামের মাহাত্ম্য, ক্ষুদ্র শিশুর মৃতদেহের পিছনে তার প্রেতাত্মার অস্তিত্বে ইন্দ্রনাথের দ্বিধাহীন বিশ্বাস। অথচ, বন্যশৃগাল বা অন্য জন্তুর হাত থেকে ভাসমান শিশুর মৃতদেহ গভীর মমতায় সে যখন উত্তোলন করেছে তখন শ্রীকান্তর আপত্তি খণ্ডন করতে গিয়ে সে বলে—'মড়ার আবার জাত কি?' মাছ চুরি করে নিজের জন্য নয়, অন্নদাদিদিকে সাহায্য করার জন্য। পরোপকারের জন্য সর্ববিধ ঝুঁকি নিতে সে সর্বদা প্রস্তুত। হৃদয়হীন স্বার্থপর নতুনদাকে রক্ষা করতে, অসহায় শ্রীকান্তকে মারামারির মধ্য থেকে উদ্ধার করতে, শ্রীকান্তদের বাড়ির ভীত-সন্ত্রস্ত সকলকে নেকড়ে বাঘের ভয় থেকে মুক্ত করতে সে দ্বিধাহীন চিত্তে এগিয়ে যায়। শিশুর সারল্য, বজ্রের কাঠিন্য, অপার মমতা ও আশ্চর্য সহৃদয়তায় গড়া এই ইন্দ্রনাথ যথার্থই মহামানব।

ইন্দ্রনাথ শ্রীকান্তর জীবনে দমকা বাতাসের মতই অকস্মাৎ এসেছে এবং অকস্মাৎ চলে গেছে। দমকা বাতাসের মতই ক্ষণিকের জন্য এসে শ্রীকান্তর মধ্যবিত্ত জীবনের সব প্রচলিত বিশ্বাসকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেছে। শ্রীকান্তর জীবনকে সে নির্ভীকতায় মণ্ডিত করে গেছে, পরোপকারে উদ্বুদ্ধ করে গেছে, তার চিত্তে জাগিয়ে দিয়ে গেছে নারীর প্রতি সম্ভ্রমবোধ, সমাজ-পরিত্যক্তার প্রতি মমত্ববোধ। বহু দুঃসাহসিক কাজ ইন্দ্রনাথ করেছে, কিন্তু তার জন্য তার মনে কোনও অহমিকা জাগেনি। তার নির্লিপ্ততাই তার চরিত্রের সবচেয়ে বড় গুণ। পরের উপকার করতে সে সদাজাগ্রত। তার জন্য সর্ববিধ কষ্ট স্বীকার করতে সর্বদা প্রস্তুত। অথচ নিজের সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। সে যা কিছু করেছে সবই অন্যের ভালর জন্য করেছে, নিজের কথা ভেবে কিছু করেনি। ব্যাঘ্রবেশী শ্রীনাথ বহুরূপী যখন একবাড়ি লোকের আতঙ্কের কারণ হয়েছে, দোর্দণ্ডপ্রতাপ মেজদা শেজ উল্টে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে, উঠোনের কোণে ডালিম গাছের তলায় বাঘ কিংবা ভল্লুক কিংবা রয়েল বেঙ্গল টাইগার যখন বাড়ির ছেলে, বুড়ো, দরোয়ান, মনিব-সকলকে প্রাণভয়ে অস্থির ক'রে তুলেছে তখন সেখানে এসে পড়েছে ইন্দ্রনাথ। সব ব্যাপার শুনে তার কোনও ভয় হয়নি, হয়েছে শুধু কৌতূহল।

সে ধীর শান্তভাবে সকলের নিষেধবাক্য উপেক্ষা করে ডালিমগাছের দিকে এগিয়ে গেছে এবং শ্রীনাথ বহুরূপীকে আবিষ্কার তথা উদ্ধার করেছে। সে শুধু নির্ভীক নয়, সে নির্লিপ্ত। তার বীরত্বের মধ্যে আস্ফালন নাই, আড়ম্বর নাই—আছে শুধু সাহস ও সরলতা। একদিন যখন সে অতি-প্রত্যুষে ঘরবাড়ি, বিষয়-আশয়, আত্মীয়স্বজন সব পরিত্যাগ করে চলে গেল, আর ফিরে এলো না, তখন তার সেই বিদায়ের মধ্যেও কোনও ঘোষণা নেই, কোনও আড়ম্বর নেই। ক্ষণিকের অতিথির মতই সে সমাজে-সংসারে ছিল, যতক্ষণ ছিল বিজয়ী বীরের মতই ছিল, যখন চলে গেল তখন সব বন্ধন, সব প্রলোভন তুচ্ছ করে নির্লিপ্তের মতই চলে গেল। এক উদাস-বৈরাগ্যের ছায়া রেখে গেল শ্রীকান্তর জীবনে।

অন্নদাদিদি :

শ্রীকান্তর অন্নদাদিদি সম্পর্কে বাঙ্‌লা উপন্যাস-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সমালোচকের মন্তব্য প্রথমেই স্মরণ করতে হয়—'এক একজন লোক আছে যাহারা সর্বদা রাস্তায় জিনিষ কুড়াইয়া পায়। শ্রীকান্ত তাহার জীবনযাত্রার প্রারম্ভেই অতি অবজ্ঞাত আবেষ্টনের মধ্যে যে রত্ন কুড়াইয়া পাইয়াছে, তাহা তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের পাথেয় হইয়াছে।' অন্নদাদিদি শ্রীকান্তর জীবন-পথের সেই পাথেয়। নারীকে শুধু তার সাধারণো-প্রচারিত পরিচয়ে আবদ্ধ না রেখে তার হৃদয়ের তলদেশ সন্ধান করে তার মহিমময়ী মূর্তিকে আবিষ্কার করার শিক্ষা অন্নদাদিদিকে দেখেই শ্রীকান্ত পেয়েছিল। সংসার যাকে কুলটা ব'লে ধিক্কার দেয়, সমাজ যাকে পতিতা ব'লে অবজ্ঞা করে তার মধ্যেও যে মনুষ্যত্বের মহিমা কতখানি বিরাজিত থাকতে পারে সে শিক্ষা শ্রীকান্ত পেয়েছে ইন্দ্রর দিদি অন্নদাকে দেখে। পদস্খলিতা হতভাগিনী নিরুদিদির মুখের উপরে সমস্ত হিন্দুসমাজ যখন দরজা বন্ধ ক'রে দেয় তখন যে সেই মৃত্যুপথ-যাত্রিণীর একমাত্র সঙ্গী ও শুশ্রূষাকারী হয়েছিল শ্রীকান্ত তার কারণ সে আগেই ইন্দ্রর অন্নদাদিদিকে দেখেছে। যে অন্নদাদিদিকে প্রথম দর্শনেই শ্রীকান্তর মনে হয়েছিল 'যেন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি। যেন যুগ-যুগান্তরব্যাপী কঠোর তপস্যা সাঙ্গ করিয়া এইমাত্র আসন হইতে উঠিলেন।'

অন্নদাদিদি হিন্দুর মেয়ে, ব্রাহ্মণকন্যা। তিনি রাতের অন্ধকারে মুসলমান সাপুড়ে শাহজীর সঙ্গে কুলত্যাগ করেছেন, তাই সমাজের চোখে তিনি

'কুলটা'। পিত্রালয়ের দরজা তাঁর কাছে বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু যার সঙ্গে তিনি কুলত্যাগ ক'রে এসেছেন সেই শাহজীই আসলে অন্নদাদিদির স্বামী। এই স্বামীটি অন্নদার বিধবা বড়বোনের সঙ্গে অবৈধ সংস্পর্শে লিপ্ত হয় এবং শেষ পর্যন্ত সেই শ্যালিকাকে হত্যা ক'রে নিরুদ্দেশ হয়। খুনের অপরাধে গ্রেপ্তারের ভয়ে সে ধর্মান্তর নিয়ে সাপুড়ের বৃত্তি গ্রহণ করে। সেই স্বামী যখন অনেকদিন পরে সাপুড়ের বেশে অন্নদাদিদির পিত্রালয়ের দরজায় সাপের ঝাঁপি নিয়ে উপস্থিত হ'লো তখন অন্য কেউ তাকে চিনতে না পারলেও পেরেছিলেন অন্নদাদিদি। হিন্দুসমাজ নারীকে শিখিয়েছে যে পতিই তার একমাত্র গতি; সে পতি ঘৃণ্য হোক, বর্বর হোক, ব্যভিচারী হোক—তার বিচার করার অধিকার নারীর নেই। হিন্দুসমাজের সেই অনুশাসন অন্নদাদিদির রক্তে ও মজ্জায় ছিল মিশে। খুনী স্বামীর পরিচয় প্রকাশ পেলে বিপদ হবে, তাই অন্নদা সেদিন আত্মীয়পরিজন ও সমাজ-সংস্রব পরিত্যাগ করে স্বামীর অনুগমন ক'রে চলে এসেছিলেন নির্জন বনাঞ্চলে সাপুড়ের আস্তানায়। বহু অত্যাচারে, লাঞ্ছনায়, নির্যাতনেও অন্নদাদিদির একনিষ্ঠ পতিভক্তি বিন্দুমাত্র টলেনি। শ্রীকান্ত দেখেছে নিবিড় বনমধ্যে দারিদ্র্যজড়িত জীর্ণ কুটিরে স্বধর্মত্যাগী, গাঁজাখোর, অত্যাচারী, প্রবঞ্চক হৃদয়হীন স্বামীর সেবারতা, সর্বংসহা কল্যাণীবধূ অন্নদাদিদির জীবনচিত্র। এখানে হিন্দু রমণীর বহুকালমণ্ডিত পাতিব্রত্যধর্মের যে বিচিত্র ও বিস্ময়কর ছবি ফুটেছে তা তুলনাহীন।

শাহজী ইন্দ্রনাথকে বশ করতে বিষপাথর দিয়ে তিনদিনে মড়া-বাঁচানো যায়, মন্ত্র দিয়ে শাপকে বাঁধা যায়, কিংবা শিকড়ের অত্যাশ্চর্য গুণের কথা বলেছে, কিন্তু অন্নদাদিদি শিশুচিত্ত ইন্দ্রকে সেই মিথ্যার জালে আবদ্ধ রাখতে চাননি, সত্যকে উদ্ঘাটন করে দিয়েছেন। তার জন্য ইন্দ্রর কাছে গালাগাল খেয়েছেন, শাহজীর দ্বারা নির্যাতীত হয়েছেন—কিন্তু ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্তর জন্য গভীর স্নেহে সবই সহ্য করেছেন। ইন্দ্রনাথকে অন্নদাদিদি একেবারে সমস্ত মন দিয়ে চিনেছিলেন, তাই বিদায়বেলায় নিজ জীবনের গোপনকাহিনী ব্যক্ত করে যে চিঠি তিনি লিখে গেছেন তা' ইন্দ্রর উদ্দেশে নয়, শ্রীকান্তর উদ্দেশে। 'বাঁ কাঁকালে আটিবাঁধা কতকগুলি শুকনো কাঠ এবং ডান হাতে ফুলের সাজির মত একখানা ডালার মধ্যে কতকগুলি শাক্‌সজী' নিয়ে দারিদ্র্য-মূর্তি অন্নদাদিদি শ্রীকান্তর সম্মুখে প্রথম আবির্ভূতা হয়েছিলেন।

তখন তাঁর কৃচ্ছ্রসাধনার ছবি দেখে অভিভূত হয়েছিলো শ্রীকান্ত। কিন্তু ইন্দ্রর অনুরোধে দিদিকে সাহায্য করার জন্য পাঁচটি টাকা দিতে গিয়ে যখন প্রত্যাখ্যাত হ'লো তখনই শ্রীকান্ত অন্নদাদিদির হৃদয়-মহিমাকে আরও বেশি ক'রে উপলব্ধি করলো। মুদীর দোকানে মৃত স্বামীর সব ঋণ কড়ায়-গণ্ডায় শোধ ক'রে দিয়ে তিনি যখন অন্তর্ধান করলেন চিরদিনের জন্য, তখনই শ্রীকান্ত প্রথম অন্নদাদিদির চিঠিতে তাঁর পূর্বকাহিনী জানলো। নারীর প্রেম ও পতি-সংস্কারের মূর্তবিগ্রহ অন্নদাদিদি শ্রীকান্তর জীবনে চিরস্থায়ী প্রভাব রেখে গেলেন। জীবন-যাত্রার প্রারম্ভকালে কুড়িয়ে পাওয়া এই রত্ন শ্রীকান্তর জীবনপথের পাথেয় হ'য়ে রইলো।

কৌতুক রস :

আমরা দুঃখে কাঁদি, সুখে হাসি, কিন্তু কৌতুকে হাসি কেন? কৌতুক তো ঠিক সুখ নয়! এই প্রশ্নের মীমাংসা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে আমাদের জীবনের চারিদিকে একটা যথাযথতা ও যথাপরিমিততার গণ্ডী আছে, যখনই সেই যথাযথতার মধ্যে কিছু অযথা ও অপরিমিতির প্রবর্তন ঘটে তখন আমাদের চিত্তে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। সেই উত্তেজনা যখন স্বল্প পরিমাণে ঘটে তখন আমরা কৌতুকবোধ করি। এককথায়, সঙ্গতের মধ্যে অস'গতের প্রবর্তনা কৌতুকের মূলে। মানুষের মধ্যে সঙ্গত পরিমাণের বুদ্ধি থাকার কথা, কিন্তু যদি কোনও মানুষের সেই সঙ্গত বুদ্ধির অভাব ঘটে তখন সে এমন সব কাজ করে, এমন সব কথা বলে যা কৌতুকের সৃষ্টি করে। সঙ্গত-বুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষও ক্ষেত্র-বিশেষে বুদ্ধি হারিয়ে এমন কাজ ক'রে বসে যা অপরের মনে কৌতুকের যোগান দেয়। তাই, একজনের কাছে যা প্রবল দুঃখের, অপরের কাছে তা কৌতুকের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। আমরা তাই কৌতুক অনুভব করি তাকে নিয়েই যে বুদ্ধিতে আমাদের চেয়ে হীন। এসব বিষয়ে মানবসমাজের একটা মাপকাঠি আছে, যাকে রবীন্দ্রনাথ যথাযথতা ও যথাপরিমিততা বলেছেন। মানুষ মাত্রেরই কিছু স্বার্থবুদ্ধি থাকে, কিন্তু মানুষের মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় তার স্বার্থত্যাগের দ্বারা। আবার, মানুষ বুদ্ধিজীবী অথচ মানুষের নির্বুদ্ধিতাও অশেষ। সাহিত্য মানুষের জীবনের ছবি। সাহিত্যের হাস্যরসও প্রধানতঃ মানুষের স্বার্থবুদ্ধিও নির্বুদ্ধিতাকে কেন্দ্র করে স্ফুরিত হয়। মানুষের স্বার্থপরতা ও

হীনত্ব এবং মানুষের বুদ্ধিহীনতা নিয়েই প্রধানতঃ সাহিত্যে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়।

শরৎচন্দ্র তাঁর 'শ্রীকান্ত'-১ম পর্বে যে কৌতুকরসের পরিবেশন করেছেন তা' প্রধানতঃ মানুষের নির্বুদ্ধিতা, হীনত্ব ও স্বার্থপরতাকে মূলধন ক'রেই। মেজদা, নতুনদা, সন্ন্যাস-ব্যবসায়ী গুরুজী, দত্তবাড়ির পাচক ব্রাহ্মণ, কালীপূজার প্রাঙ্গণে মঞ্চে যুদ্ধরত মেঘনাদের অভিনেতা বা শিকার-পার্টিতে কুমার সাহেবের স্তাবকদের নিয়ে তিনি যে কখনও স্পষ্ট, কখনও ইঙ্গিতবহ কৌতুক করেছেন তা' যেমন উপাদেয় তেমনি শিল্পসুষমাপুষ্ট। বারবার এন্ট্রান্স-ফেল করা মেজদার অকালপক্কতা, ছোটদের পাঠাভ্যাসে ছেদ না পড়ার জন্য তার 'চিরকূট'-প্রথার প্রয়োগ, তার প্রচণ্ড-গম্ভীর শাসকমূর্তির একটি-মাত্র 'হুম্' শব্দে শেজ-উল্‌টিয়ে মূর্ছিত হওয়ার যে চিত্র শরৎচন্দ্র এঁকেছেন তা অনাবিল কৌতুকরসের সৃষ্টি করেছে। কৌতুকের বুদ্ধি মার্জিত প্রয়োগ পিসেমশাই-এর শ্রীনাথ বহুরূপীর ব্যাঘ্রবেশের লাঙ্গুল কর্তন-প্রস্তাবে পিসীমার—'রেখে দাও, তোমার ওটা অনেক কাজে লাগবে'—উক্তিতে উজ্জ্বল হয়ে ফুটেছে। রাশভারী পিসেমশাই, বিশালবপু হিন্দুস্থানী দরোয়ান ও বাড়ির মেয়েদের ভয়ার্ত চিৎকার এবং চোরভ্রমে ভট্‌চায্যিমশাই-এর পিঠে কিলঘুষিবর্ষণ—সব জড়িয়ে সমস্ত আখ্যানটি শরৎচন্দ্রের কৌতুকরস সৃষ্টির অসাধারণ দক্ষতার পরিচয়বহ।

মানুষের নির্বুদ্ধিতা কেমন কৌতুকরসের অবলম্বন হ'যে ওঠে তার দৃষ্টান্ত এই শ্রীনাথ বহুরূপীর আখ্যান। সেই নির্বুদ্ধিতার সঙ্গে যখন নিষ্ঠুরতা, নীচতা ও স্বার্থপরতা জড়িত থাকে তা' অনেক সময় প্রগাঢ় কৌতুকের বিষয় হয়। শরৎচন্দ্র তারই ছবি এঁকেছেন ইন্দ্রনাথের 'নতুনদা'র প্রসঙ্গে। ইন্দ্রের এই নতুনদা অখণ্ড স্বার্থপরতার জীবন্ত প্রতীক। এই দর্জিপাড়ার বীরপুঙ্গব সখের থিয়েটারে হারমনিয়ম বাজানোর জন্য দুইটি কিশোরের উপরে যে রকম বিধিবদ্ধভাবে অত্যাচার চালিয়েছে তার সেই স্বার্থপরতার তুলনা হয় না। হাতে দস্তানা, মাথায় টুপী, গায়ে ওভারকোট, পায়ে মোজা ও পাম্পসু—রাজবেশেসজ্জিত এই বাবুটির নির্জন নদীতীরে ভয় কাটাবার জন্য গাওয়া ঠুনঠুন পেয়ালা গানের সমঝদার-শ্রোতা কুকুরের দলের আবির্ভাব এবং সেই সারমেয়দলের তাড়নায় শীতের রাত্রে আকণ্ঠ

নিমজ্জিত অবস্থায় কাটানর যে ছবি শরৎচন্দ্র এঁকেছেন, কৌতুকচিত্র হিসাবে তা' তুলনাহীন। সেই নিমজ্জিত অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার পরে প্রথম যে কথাটি এই মহাপুরুষের মুখ থেকে উচ্চারিত হ'লো—'আমার আরেকটি পাম্প'—তার মধ্যে আমরা কৌতুকের চূড়ান্ত রূপ দেখতে পাই। রাজলক্ষ্মী ও সুরলক্ষ্মীর মাতুল যে ভঙ্গকুলীন পাত্রটিকে দত্তবাড়ির রন্ধনশালা থেকে ভাগ্নীদায় উদ্ধারের তাগিদে আবিষ্কার করেছিলেন সেই পাচক ব্রাহ্মণ নিজের বাজার-দর ঘোষণা করতে গিয়ে যখন প্রশ্ন তোলে যে, 'পঞ্চাশ টাকায় একজোড়া ভাল রামছাগল পাওয়া যায় না—তা জামাই খুঁজছেন' তখন সনাতন হিন্দু বিবাহ পদ্ধতির প্রতি শরৎচন্দ্রের শাণিত বিদ্রূপ ব্যক্ত হয়।

সন্ন্যাসকে যে সব তথাকথিত সন্ন্যাসী পেশা হিসাবে নেয় তারা প্রায়ই মূর্খ হয়, ভক্তমনে মোহের সঞ্চার করাই তাদের বেসাতি—অপরকে প্রবঞ্চনা ক'রে তারা যখন নিজেদের বুদ্ধিমত্তায় আত্মপ্রসাদ লাভ করে তখন তারা নিজেরা কেমন প্রবঞ্চিত হয় তার একটি বিরল-দৃষ্টান্ত 'শ্রীকান্ত'-১ম পর্বে আছে। শ্রীকান্ত 'বাড়' স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে পথ চলতে গিয়ে এমনি এক সন্ন্যাসীর আস্তানায় উপস্থিত হয়েছে এবং সহজেই তার প্রবঞ্চনা ধ'রে ফেলেছে। অবজ্ঞাভরা মন নিয়ে শ্রীকান্ত সেই 'গুরুজী'কে বলেছে—'বাবা, মহাভারতে লেখা আছে, মহাপাপিষ্ঠ জগাই-মাধাই বশিষ্ঠ মুনির পা ধরিয়া স্বর্গে গিয়াছিলেন, আর আপনার পা ধরিয়া আমি মুক্তি পাইব না? নিশ্চয়ই পাইব।' সাধুজী খুশি হয়ে উত্তর দিলেন, 'বাত তেরা সাচ্চা হ্যায়'। শ্রীকান্ত সন্ন্যাসীর পরিধেয় অর্জনের পর নিজের মূর্তি দেখার জন্য গুরুজীর চেলার কাছ থেকে গোপনে রক্ষিত আয়নাটিও পেয়ে গেল। সব জড়িয়ে এই সব পেশাদার সন্ন্যাসী ও চেলাদের ব্যবসায়-বুদ্ধির অন্তরালে নিবু'দ্ধিতায় অস্তিত্ব উদ্‌ঘাটন ক'রে শরৎচন্দ্র কৌতুক করেছেন।

প্রত্যক্ষ কৌতুকের বর্ণনা শিশুর বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টির মাধ্যমে দত্তবাড়ির কালীপূজা উপলক্ষে নাটমঞ্চের যুদ্ধ-বর্ণনায়। বীরদর্পে মেঘনাদ মঞ্চে প্রবেশ মাত্রই তার কটিবন্ধ ছিঁড়ে যাওয়ায় নগ্নতা-নিবারণের প্রয়াসে একহাতে তার পরিধেয় পরিচ্ছদ চেপে ধরা ও অন্য হাতে শুধু তীর দিয়ে প্রতিপক্ষের সঙ্গে প্রবল যুদ্ধ করার যে চিত্র শরৎচন্দ্র এঁকেছেন তার মধ্যেও নির্ভেজাল কৌতুকরস পরিবেশিত হয়েছে। বস্তুতঃ শ্রীকান্তর জবানীতে পরিণত বয়সে বাল্য-কৈশোরের কাহিনী বর্ণনা করেছেন লেখক শ্রীকান্ত-১ম পর্ব-তে।

ফেলে আসা অতীতের দিকে যে দৃষ্টি তিনি নিক্ষেপ করেছেন তা' প্রধানতঃ কৌতুকের দৃষ্টি। অন্নদাদিদি, নিরুদিদি কিংবা গৌরী তেওয়ারির কন্যার জন্য যত বেদনাই তাঁর মনে পুঞ্জীভূত থাকুক, তাঁর সমস্ত চেতনায় ব্যাপ্ত হ'য়ে বিরাজিত কৌতুক। এর মধ্যে শিল্পীমনের হংসধর্মের প্রকাশ। জীবনসায়রের দুঃখবেদনার প্রতিটি জলকণাকে ডাঙ্গায় উঠে ডানা ঝাপ্‌টে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে লেখকের চিত্তহংস যখন ফেলে-আসা জীবনের দিকে তাকিয়েছে তখন সে-দৃষ্টিতে কৌতুক মাখানো।

রাজলক্ষ্মী :

কুমারসাহেবের শিকার পার্টিতে আমন্ত্রিত হ'য়ে এসে শ্রীকান্ত পাটনা থেকে মুজরো নিয়ে আসা পিয়ারী বাইজির গান শুনে যেমন অভিভূত হয়েছে তেমনি বিস্মিত ও বিরক্ত হয়েছে সেই বাইজির কথায়—'টাকা নিয়েছি আমাকে তো গাইতেই হবে, কিন্তু আপনি এই পনেরো ষোল দিন ধরে এর মোসাহেবী করবেন? যান, কালকেই বাড়ি চ'লে যান।' এ কোন্ হিতৈষিণী যে নিজে বাইজী হয়ে মুজ্‌রো করতে এসে শ্রীকান্তকে উপদেশ দেয়? এ অধিকার তার কোথা থেকে পাওয়া?

সে অধিকার ভালবাসার অধিকার। অনেক অত্যাচার সহ্য ক'রে, অনেক বৈঁচির ফল সংগ্রহ ক'রে মালা গেঁথে বালিকা-বয়সে এ অধিকার সে অর্জন করেছে। চিরকাল সে পিয়ারী বাইজী ছিল না। দিনে দিনে পিয়ারী বাইজীর অন্তরালে রাজলক্ষ্মীকে চিনে নিতে হয়েছে শ্রীকান্তকে। পিতৃ-পরিত্যক্তা সুরলক্ষ্মী ও রাজলক্ষ্মী মাতুলালয়ে গলগ্রহ। কৌলীন্যরক্ষার জন্য তাদের বিবাহ স্থির করা হ'লো দত্তবাড়ির ভঙ্গকুলীন ব্রাহ্মণ পাচকঠাকুরের সঙ্গে। কিন্তু তার বরপণ সম্পূর্ণ না পাওয়ার জন্য কুশণ্ডিকা না ক'রেই সেই কুলীন বর পলায়ন করে। সুরলক্ষ্মী লোকলজ্জায় ও গ্লানিতে ছয়মাসের মধ্যেই মারা যায়। রাজলক্ষ্মীর মা রাজলক্ষ্মীকে নিয়ে কাশীতে যান এবং একা গ্রামে ফিরে এসে রাজলক্ষ্মীর মৃত্যুসংবাদ রটনা করান। সুতরাং যার মৃত্যু হয়েছে ব'লে এতদিন জানা ছিল তাকে জীবিতা পিয়ারী বাইজীর মধ্যে চিনে নেওয়া শ্রীকান্তর পক্ষে সহজ ছিল না। কেমন করে এক বৃদ্ধ মুসলমান ওস্তাদের সস্নেহ-আশ্রয়ে রাজলক্ষ্মী নৃত্যে-গীতে পারদর্শী হয়ে পিয়ারী বাইজীতে পরিণত হয়েছে তা শ্রীকান্তর জানার কথা নয়

শ্রীকান্ত-১ম পর্বে উপন্যাস-রস যা আছে তার নায়িকা এই রাজলক্ষ্মী। রমনীর প্রেম ও জননীর স্নেহের মিলিত মূর্তি রাজলক্ষ্মী সমগ্র বাঙ্‌লা সাহিত্যের বিস্ময়। বাইজীর পঙ্কিল জীবনেও ধর্মরক্ষা করে চলেছে পিয়ারী, দুই পরস্পরবিরোধী প্রবৃত্তি তাকে ধর্মের পথে অবিচল রেখেছে। নয় বৎসরের যে বালিকা বৈঁচির মালা দিয়ে শ্রীকান্তকে বরণ করেছিলো সেই নবীনপ্রেমের দীপ জীবনের নানা ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যে অম্লান থেকে পরিণত বয়সে তার শুচিতাকে রক্ষা করতে সাহায্য করেছে। স্বামীর সঙ্গে যে বিয়ে তার সম্পূর্ণ হয়নি, যে স্বামীর সঙ্গে সে কখনও বসবাস করেনি, সেই দত্তবাড়ির ষাট বছরের বৃদ্ধ পাচক ব্রাহ্মণের মৃত্যুর পর সে নিজেকে বিধবা ব'লে মেনেছে এবং সেই পাচকের অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র বঙ্কুকে আপন পুত্রবৎ প্রতিপালন করেছে। একদিকে বঙ্কুর প্রতি রাজলক্ষ্মীর মাতৃস্নেহ, অন্যদিকে বালিকা-বয়সের হৃদয়দেবতা শ্রীকান্তর প্রতি ভালবাসা—দুই-এর দ্বন্দ্বজাত শক্তি পিয়ারীকে অপরের লালসাবহ্নি থেকে আত্মরক্ষার সামর্থ যুগিয়েছে।

একদিকে বঙ্কুর মা, অন্যদিকে শ্রীকান্তর বাল্যপ্রণয়িনী—রাজলক্ষ্মীর এই দুই সত্তা একদেহে বিরাজিত থেকে সমগ্র চরিত্রকে এক বিস্ময়ের সামগ্রী করে তুলেছে। শ্রীকান্তর জন্য রাজলক্ষ্মীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষা যতই উচ্ছ্বাসহীন, আতিশয্য বর্জিত হোক না কেন, সে অন্তর্লীন ফল্গুস্রোতের মত সর্বদাই বহমান। অথচ, একথা রাজলক্ষ্মী কখনই ভুলতে পারে না যে সে বঙ্কুর মা এবং হৃদয়ের গোপন প্রেমকে সন্তানের ভক্তিনত দৃষ্টির সম্মুখে ব্যক্ত ক'রে সে মাতৃত্বের মহিমা ক্ষুণ্ণ হ'তে দিতে পারে না। তাই, পাটনার বাড়ি থেকে শ্রীকান্তকে সে চলে যেতে বলে। বঙ্কুর মা যখন প্রণয়িনী রাজলক্ষ্মী ও প্রেমাস্পদ শ্রীকান্তর মাঝখানে এসে দাঁড়ালো তখনই রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তর কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিল। শ্রীকান্ত সে কথা বুঝতে পেরে সারারাত নিদ্রাহীন চোখে জেগে রইলো। অনেক রাতে রাজলক্ষ্মী গোপনে ঘরে ঢুকে আলো নিভিয়ে, জানালা বন্ধ ক'রে শ্রীকান্তর দেহের উত্তাপ পরীক্ষা ক'রে গভীর যত্নে শ্রীকান্তর গায়ের চাদর ঠিক ক'রে দিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে চলে গেল। বিদায়ের আগের রাতে নিভৃতচারিণী রাজলক্ষ্মীর এই আচরণ যে কী গভীর প্রেম ও বেদনার স্পর্শ রেখে গেল তা' ভেবে বিদায়কালে শ্রীকান্ত বুঝলো যে বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না। দূরেও সরিয়ে দেয়।

রাজলক্ষ্মী ও অন্নদাদিদি :

'শ্রীকান্ত'-১ম পর্বে যে দুইটি নারীচরিত্র প্রাধান্য পেয়েছে তাঁরা হলেন অন্নদাদিদি ও রাজলক্ষ্মী। তাঁরা দুজনেই কুলত্যাগিনী, অথচ দু'জনেই শুদ্ধান্তঃকরণশালিনী। দু'জনেরই কুলত্যাগের মূলে রয়েছে বিবাহ, অথচ দু'জনেই বিবাহের অচ্ছেদ্য বন্ধনকে কখনই অস্বীকার করেন নি। দু'জনেই হিন্দু সমাজের রক্ষণশীল অনুশাসন ও হৃদয়হীনতার শিকার। তুলনাহীন প্রেমের প্রতিমূর্তি দু'জনেই, অফুরান স্নেহের ভাণ্ডার দু'জনেরই আছে, কিন্তু এত সব মিল সত্ত্বেও অ-মিল আছে অনেক। দু'জনেই কুলত্যাগ করেছেন প্রেমের দায়ে। কিন্তু সেই প্রেমের স্বরূপও ভিন্ন ভিন্ন।

অন্নদাদিদি যে প্রেমের দায়ে কুলত্যাগ করেছেন তা স্বামীপ্রেম। তাঁর মধ্যদিয়ে বহুকাল সঞ্চিত হিন্দুনারীর পাতিব্রত্য ধর্মের বিচিত্র ও বিস্ময়কর ছবি ফুটে উঠেছে। রাজলক্ষ্মী যে প্রেমের অন্তঃসলিলা ধারাকে বুকে নিয়ে কুলত্যাগ করেছেন তার মূলে আছে বাল্যপ্রেম ও বিবাহ নামধেয় প্রহসন। অন্নদাদিদি স্বামীকে সর্বস্ব জ্ঞান করে পরিশেষে লোকচক্ষুর অন্তরালে অন্তর্ধান করেছেন, রাজলক্ষ্মী স্বামীর অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রকে আপনপুত্র জ্ঞান ক'রে বাল্য-প্রণয়ীর প্রতি গভীর প্রেমে তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। দু'জনেরই স্বামী পাষণ্ড। অন্নদাদিদির স্বামী শ্যালিকার সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হ'য়ে তাকে খুন ক'রে নিরুদ্দেশ হয়েছে, এবং সাপুড়েবেশে পরবর্তীকালে অন্নদাদিদির প্রতি অবর্ণনীয় অত্যাচার ও নিপীড়ন চালিয়েছে। রাজলক্ষ্মীর স্বামী বরপণের টাকা সম্পূর্ণ আদায় না হওয়ায় কুশণ্ডিকা না ক'রে প্রস্থান করেছে, আর কখনও ফিরে আসেনি। দু'জনেরই মনের গভীরে যে বিশ্বাস সব কিছুকে ছাপিয়ে বিরাজিত থেকেছে তা' হচ্ছে হিন্দুনারীর চিরকালের স্বামী-সংস্কার।

যে প্রেম একদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে নয় বছরের বালিকার হৃদয়ে জন্মলাভ করেছিলো তা' পরিণত বয়সে সমাজ-সম্মত প্রেমের মর্যাদা পেতে আগ্রহী হয়েছে, কিন্তু, রাজলক্ষ্মীর স্বামী-সংস্কার ও 'বঙ্কুর মা' সত্তার অভিভবে তা' পূর্ণতা পায়নি। অন্নদার যে প্রেম সমাজ-বিধির অনুমোদন নিয়ে বিবাহের মন্ত্রোচ্চারের মধ্যদিয়ে একদিন উন্মেষিত হয়েছিলো তা' শত বাধাবিঘ্ন, অনাচার অত্যাচারের পথ বেয়ে সমাজের বাইরে লোকচক্ষুর অন্তরালে এসে তার পূর্ণরূপ প্রকট করেছে। শাহজীর মৃত্যুনীল ওষ্ঠাধরে বুকভরা ভালবাসার

শেষ স্বাক্ষর অন্নদাদিদি এঁকে দিয়েছেন যখন, তখন সমাজ সেখানে উপস্থিত নেই।

অন্নদাদিদি ভালবাসার জন্য সমাজকে ত্যাগ করেছেন, রাজলক্ষ্মী সমাজের কথা ভেবে ভালবাসার ধনকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন।

অন্নদাদিদিকে সমাজ কুলটা ব'লে পরিত্যাগ করেছে, কারণ, তিনি একজন মুসলমান সাপুড়ের সঙ্গে গৃহত্যাগ করেছেন। হিন্দুনারীর পাতিব্রত্যের আদর্শ বজায় রেখেও তিনি 'কুলটা', কারণ, সেই সাপুড়েই তাঁর স্বামী, নারীঘাতী এবং মুসলমান হ'লেও তিনি স্বামী। সেই নিষ্ঠুর, নারীঘাতী, নেশাখোর স্বামীকে তিনি সর্বতোভাবে সেবা করেছেন, শত নির্যাতনেও কোনও অভিযোগ কখনও করেননি। তাঁর সারা জীবন ত্যাগ ও দুঃখভোগের দ্বারা আকীর্ণ।

রাজলক্ষ্মীকেও সমাজ কুলটা ব'লে পরিত্যাগ করেছে, কারণ, তিনি বাইজী, নৃত্য-গীতে রাজা-জমিদারের মনোহরণ করা তাঁর পেশা। সে পেশা স্বেচ্ছায় রাজলক্ষ্মী গ্রহণ করেন নি। কৌলীন্যের বলি রাজলক্ষ্মীর স্বামী বরপণ বুঝে না পেয়ে প্রস্থান করায় সমাজের নিন্দা-বিদ্রূপ থেকে মুক্তি পাবার আশায় সেই পেশা তাঁকে বেছে নিতে হয়েছে। তবু, তিনি সেই বিবাহ-ব্যবসায়ী ভঙ্গকুলীন স্বামীর সন্তানকেই নিজের সন্তান জ্ঞান করে বাল্য প্রেমের উৎসমুখে পাথর চাপা দিয়েছেন। প্রাচুর্যের মাঝখানে ব'সে রাজলক্ষ্মী রিক্তা। সমাজের চোখে তিনি বারাঙ্গনা, কিন্তু আসলে হৃদয়ের ঐশ্বর্যে তিনি বরাঙ্গনা।

সংসারের কাছে অন্নদাদিদির কোনও প্রার্থনা নেই। রাজলক্ষ্মীর আছে সকরুণ মিনতি।

ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিরূপে অন্নদাদিদি আবির্ভূত, বায়ুতাড়িত হয়ে পরিণামে তিনি নিরুদ্দেশ। অঙ্গারখণ্ডের ঔজ্জ্বল্য নিয়ে পিয়ারী বাইজী রূপে রাজলক্ষ্মীর আবির্ভাব, প্রেমের করুণ কোমলতার প্রশান্ত পাষাণরূপে তাঁর পরিণতি।

অন্নদাদিদি তাপসী, রাজলক্ষ্মী প্রেয়সী। সমাজের বিচারে দু'জনেই নিন্দিতা, হৃদয়ের তুলাদণ্ডে দু'জনেই নন্দিতা।

নিসর্গ বর্ণনা :

শরৎচন্দ্রের অনুভূতির সঙ্গে রোমান্টিক কবির অনুভূতির সাদৃশ্য আছে, কিন্তু তাঁর বর্ণনা, বিশ্লেষণ ও পুঙ্খানুপুঙ্খপর্যবেক্ষণ তাঁকে বস্তুতান্ত্রিক

সাহিত্য-রচয়িতার আসন দিয়েছে, রোমান্টিক কবির আবেগ সেখানে প্রধান হ'য়ে ওঠেনি। শরৎচন্দ্র 'শ্রীকান্ত'-১ম পর্বের সুরুতেই বলেছেন —'ভগবান আমার মধ্যে কল্পনা-কবিত্বের বাষ্পটুকুও দেন নাই, এই দুটো পোড়া চোখ দিয়ে আমি যা কিছু দেখি ঠিক তাহাই দেখি।' মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অতি বাস্তব ছবি আঁকতে গিয়ে তার পটভূমিকে নিসর্গ-প্রকৃতি ঠিক যেমনটি আছে অতিরঞ্জন বাদ দিয়ে তেমনটি বর্ণনা করা শরৎচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য। মানুষের হৃদয়-স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে গেলে মানুষকে চারদিক থেকে ঘিরে থাকা নিসর্গ-প্রকৃতিতে অবলোকন করতেই হয়, সেই সূত্রেই শ্রীকান্ত প্রকৃতিকে দেখেছে। দুঃসাহসী ইন্দ্রনাথকে চিত্রিত করতে হ'লে তাকে কৃষ্ণরজনীতে উত্তাল-নদীর বুকে ডিঙ্গি নৌকায় স্থাপন করলেই শুধু হয় না। রাতের প্রকৃতি-চিত্র সেখানে অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ভূত প্রেতের ভয়ের অসারতা প্রতিপন্ন করতে হ'লে অন্ধকার রাত্রিতে শ্মশানের বর্ণনা অবশ্যই প্রয়োজন হ'য়ে ওঠে এবং তারই সূত্র ধ'রে অনৈসর্গিক অস্তিত্বের সন্ধানে অন্ধকারের রূপ কৌতূহলী মানব-দৃষ্টিতে ধরা দেয়। এককথায় বলা যায়, শরৎচন্দ্র যখনই নিসর্গ-বর্ণনায় লিপ্ত হয়েছেন তখনই দৈনন্দিন বাস্তবজীবনের প্রেক্ষাপটেই তিনি প্রকৃতিকে দেখেছেন। প্রকৃতি তাঁর কাছে আবেগের লীলাভূমি নয়, প্রত্যহের পরিচিত পটভূমি। তাঁর সহজ, সরল, স্বচ্ছন্দ ভাষায় তিনি চির-পুরাতনকে শুধু নূতন ক'রে আবিষ্কার করেছেন। তাঁর বাস্তবপ্রিয়তার সঙ্গে কবিপ্রতিভা জড়িত ছিল, একথা অস্বীকার করা যায় না। বিশ্বপ্রকৃতির মহিমার প্রতি তাঁর দৃষ্টি চিরনিবদ্ধ এবং সে দৃষ্টিতে ছিল অসাধারণ তীক্ষ্ণতা।

প্রকৃতিকে আমরা সবাই সর্বদা প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু, আমাদের এই প্রতিদিনের দেখা আর শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তর দেখার মধ্যে প্রভেদ অনেক। আমাদের নিত্যদিনের পরিচিত প্রকৃতিকেই শ্রীকান্ত দেখেছে, প্রকৃতির শোভা দর্শনের জন্য তাকে দূরদেশে যেতে হয়নি। এ যেন 'ঘর হতে শুধু দুইপা ফেলিয়া একটি ধানের শিষের উপরে একটি শিশির বিন্দু'কে দেখা। অন্ধকারে কলনাদিনী নদী, গ্রামের শ্মশান কিংবা ঝোপঝাড় আচ্ছন্ন করা অমাবস্যার অন্ধকারে পথ-হারানো শ্রীকান্তর চোখে অন্ধকারের রূপ উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠার জন্য বড় কোনও আয়োজন করতে হয় নি। যে প্রকৃতির বর্ণনা শ্রীকান্ত-১ম পর্বে আছে তা' আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের পরিচিত প্রকৃতি।

তারই মধ্য থেকে অপরিচয়ের বিস্ময় ব্যক্ত হয়েছে শরৎচন্দ্রের কবিপ্রতিভার স্পর্শে।

অন্ধকার রাতে আকাশের পটে খণ্ড খণ্ড মেঘ ও চাঁদকে একসঙ্গে প্রত্যক্ষ করা একটি সাধারণ ব্যাপার, কিন্তু শরৎচন্দ্র সেই সাধারণ ব্যাপারকে কি ভাবে অসাধারণ করে তোলেন তা' শ্রীকান্তর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অন্ধকারে নদীবুকে ডিঙ্গি-নৌকায় শুয়ে মেঘ আর চাঁদের খেলা দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে শ্রীকান্তর হঠাৎ মনে হ'লো চাঁদটা মেঘের মধ্যে একটা লম্বা ডুব সাঁতার দিয়ে একেবারে ডানদিক থেকে বাঁ দিকে গিয়ে মুখ বার করলো। মাছ চুরির নৈশ অভিযানে বেরিয়ে প্রকৃতির যে রূপকে শ্রীকান্ত প্রত্যক্ষ করেছে তা' হচ্ছে কৃষ্ণা রজনীর দ্যুলোক-ভূলোকব্যাপ্ত সূচীভেদ্য অন্ধকারে বর্ষণস্ফীত গঙ্গার রুদ্র-ভৈরবী মূর্তি। সেই গঙ্গাবক্ষে ভাসমান ডিঙ্গি-নৌকায় বসে শ্রীকান্ত দেখেছে—'বায়ুলেশহীন, নিষ্কম্প, নিস্তব্ধ নিশীথিনীর সে যেন এক বিরাট কালীমূর্তি, নিবিড় কালো চুলে দ্যুলোক ও ভূলোক আচ্ছন্ন হইয়া গেছে, এবং সেই সূচীভেদ্য অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া করাল দংষ্ট্রারেখার মত দিগন্তবিস্তৃত এই তীব্র জলধারা হইতে কি এক প্রকারের অপরূপ স্তিমিত দ্যুতি নিষ্ঠুর চাপা হাসির মত বিচ্ছুরিত হইতেছে।' তন্ত্রসাধকের চোখে জগজ্জননীর যে রূপ প্রতিভাত হয়, রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে শরৎচন্দ্র শ্রীকান্তকে দিয়ে সেইরূপই বারবার দেখিয়েছেন। শ্রীকান্ত ১ম পর্বের ১০ম পরিচ্ছেদে শ্মশানের সন্নিকটে বসে শ্রীকান্ত অন্ধকারের রূপ দেখেছেন—'অন্তহীন কালো আকাশতলে পৃথিবীজোড়া আসন করিয়া গভীররাত্রি নিমীলিত চক্ষে ধ্যানে বসিয়াছে, আর সমস্ত বিশ্বচরাচর মুখ বুজিয়া নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া অত্যন্ত সাবধানে স্তব্ধ হইয়া সেই শান্তি রক্ষা করিতেছে।' মহাকবি কালিদাস তপোমগ্ন ধূর্জটির যে চিত্র 'কুমারসম্ভব'-এ এঁকেছেন এখানে শরৎচন্দ্রের বর্ণনায় সেই কবিত্বেরই আভাস লক্ষ্য করা যায়। রাত্রির রূপের যে বর্ণনা তিনি এখানে দিয়েছেন তা' অনন্যসাধারণ। অজানা অন্ধকার শ্রীকান্তরূপী শরৎচন্দ্রকে দূর থেকে দূরে নিয়ে যায়নি। তিনি এই অন্ধকারের দুরধিগম্য রহস্যকে স্পষ্ট, মূর্তিময় ও নিকট করতে চেয়েছেন। অগাধ বারিধি, গহন অরণ্যানী—সর্বত্রই অন্ধকার, সর্বত্রই সেই কালো, যে কালো রূপ শ্রীরাধার দুই চোখ ভ'রে মোহন মূর্তিতে দেখা দিয়ে প্রেমের বন্যায় জগৎ ভাসিয়ে দিয়েছে, সেই

কালোর সঙ্গে তুলিত হয়ে রূপহীন মৃত্যু অপরূপ রূপে প্রতিভাত হয়েছে বিহ্বল-বিস্মিত শ্রীকান্তর হৃদয়ে। শ্রীকান্ত সেই সর্ব দুঃখ-ভয়-ব্যথাহারী অনন্তসুন্দর মূর্তিকে মনে মনে অভিবাদন জানিয়েছে। যা রহস্যময়, যা দুর্জ্ঞেয়, যা দূরস্থিত—তা' অন্ধকারের রূপের মধ্য দিয়ে তার হৃদয়ের সন্নিকটে এসে সহজ ও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। এইখানেই শরৎচন্দ্রের নিসর্গ-বর্ণনার বৈশিষ্ট্য।